# জেনানা মহ্‌ফিল

# জানানা মহ্‌ফিল

## বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা
## ১৯০৪-১৯৩৮

সম্পাদনা
শাহীন আখতার মৌসুমী ভৌমিক

প্রেক্ষাপট
ইয়াসমিন হোসেন

স্ত্রী ॥ কলকাতা ৭০০ ০২৬

# মোলাকাত

এই বই জুড়ে আপনার উপস্থিতি, ইলিয়াসভাই

আমরা ধন্যবাদ জানাই তাঁদের যাঁরা লেখিকাদের লেখা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন ; যাঁরা তাঁদের সাক্ষাৎকার সংকলিত করবার অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ।

প্রকাশক

# সূচীপত্র

## দ্বিতীয় পর্ব : মোলাকাত

# মুখবন্ধ

বইশেষে বই-এর প্রথম পাতাগুলি লিখতে বসে একটা অদ্ভুত শূণ্যতাবোধের কবলে পড়ে গেছি। মনে হচ্ছে যেন ঘরে কোনও অনুষ্ঠান ছিল, অতিথিরা এসেছিলেন, চলেও গেছেন ; কিন্তু সবাই এসেছিলেন কি না, যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ঠিকমত আপ্যায়ন করা হয়েছিল কি না, কিছুই ঠিক মনে পড়ছে না। তবু ফিরেও যাওয়া যায় না, সেই শুরুর সময়টা থেকে ফের শুরুও করা যায় না।

*জানানা মহফিল*-এর আয়োজন ঠিকমত হয়েছিল কি না, তার বিচারের দায় পাঠকের। সম্পাদক হিসাবে আমাদের একটা দায় থেকে যায়, কেন এবং কীভাবে মহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল, তা বুঝিয়ে বলার।

১৯৯৪ সালে আমরা শুরু করেছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা নিয়ে। বেগম রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী', 'সুলতানার সপ্ন'-র সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। আর বেশি কিছুই জানতাম না। আনিসুজ্জামানের বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার তালিকা থেকে, নির্ঘন্ট ঘেঁটে ঘেঁটে এক একটা নাম খুঁজে পেয়ে লেখাগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যে ঐতিহাসিক সোনিয়া নিশাত আমিনের কাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। আনিসুজ্জামানের পত্রিকা-তালিকায় আমরা যে লেখাগুলির উল্লেখ পাচ্ছিলাম এবং কিছু কিছু ইতিমধ্যে সংগ্রহও করেছিলাম, সোনিয়ার গবেষণায়ও সেই সব লেখা আর লেখিকাদের প্রসঙ্গ দেখতে পেলাম। সোনিয়ার কাজে অবশ্য এর বাইরেও আরও অনেক তথ্য, সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। এব পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, এম. ফাতেমা খাতম, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, শামসুননাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া কামাল এবং রোকেয়ার কিছু কিছু লেখা এবং ওঁদের ওপর লেখা কিছু বই হাতে আসতে থাকে। একটা লেখা আর একটা লেখার দিকে এগিয়ে দেয়, কোনওটাই সম্পূর্ণ মনে হয় না, তবু কিছু পথনির্দেশ পেয়ে যাই আমরা।

১৯৯৫-এর শেষের মধ্যে একটা আবছা ধারণা তৈরি হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের লেখালেখি সম্পর্কে। কিন্তু সময়টাকে বুঝতে, সমাজটাকে বুঝতে আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে অনুভব করি। কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন লাইব্রেরি, ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়ানো ছিটোনো লেখা থেকে এগার বারোজন মুখ্য লেখিকার নাম পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁদের ভাল মতন চিনতে পারছিলাম না। আমরা তাই ১৯৯৬-৯৭, এই দুটো বছর ধরে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি খোঁজার চেষ্টা করেছি সেই মানুষদের যাঁরা আমাদের লেখিকাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিনতেন, তাঁদের জীবন-জগৎ সম্পর্কে

জানতেন। এই সংকলনের লেখিকা-পরিচিতিতে প্রত্যেক লেখিকাকে তাঁর পরিবার, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন লেখিকাকে তাঁর ঘর আর বাহিরের জগতের মধ্যে রেখে না দেখলে, তাঁর দৈনন্দিন দিয়ে তাঁকে বিচার না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয় বলে আমরা মনে করি। তাই স্বর্ণকুমারী, শৈলবালা, প্রিয়ম্বদা, কৃষ্ণভাবিনী, সীতা-শান্তা, সরলাদেবীর সঙ্গে কোনও তুলনামূলক বিচার করতে যাইনি রোকেয়া, ফাতেমা খানম, শামসুননাহার, আখতার মহল, সুফিয়া কামালের—সেই তুলনা না হয় আর কেউ করবেন। আমরা নিজেরাই যাঁদের নাম আগে জানতাম না, যাঁদের লেখা কখনও পড়িনি, এই *জানানা মহ্‌ফিল*-এ তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছি।

*সওগাত* পত্রিকার মেয়েদের পাতার নাম ছিল 'জানানা মহ্‌ফিল'। অর্থাৎ মুসলমান গৃহের অন্তঃপুরের সভা, মেয়েরাই সেখানে সভ্য, সদস্য, শিল্পী। তার মানে, মেয়েরাই লিখবে, পড়বে এবং অন্য মেয়েদের লেখাতে উদ্বুদ্ধ করবে। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের একান্ত ইচ্ছা ছিল জানানার বাইরে জানানাবাসীদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেবার। আমাদের মহ্‌ফিলের অংশগ্রহণকারীও প্রধানতঃ মেয়েরাই। শ্রোতা-পাঠক নারী পুরুষ, হিন্দু মুসলমান, এ বাংলা ও বাংলায় সর্বত্র পাব আশা করি।

*সওগাত*-এর মতন একটি পত্রিকার যে অসাধারণ ভূমিকা ছিল নারীজাগরণে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি ? সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দুই সম্পাদিকার একজনের (শাহীন আখতারের) সঙ্গে সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবের একটা যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দু বছর আগে, ১৯৯১-এ। সেই সময় তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক সূত্র নির্দেশ করেছে।

এও আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আমাদের মনে জাগা অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন নিয়ে সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম, হামিদা খানম, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতন মানুষদের কাছে যেতে পেরেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা হয়। তাতে আমাদের অনেক ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা তাই সেই 'মোলাকাত' পর্বটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি, *জানানা মহ্‌ফিল*-এর জগৎটাকে বুঝতে কিছুটা সুবিধে হতে পারে, এই ভেবে।

আমরা দুঃখিত যে এই কাজ করতে গিয়ে যতজনের লেখার আমরা সন্ধান পেয়েছি, সবার প্রতি সুবিচার করতে পারিনি। *সওগাত* ছাড়াও *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, *নওরোজ*, *শিখা*, *মোহাম্মদী*, *আন্নেসা*, *গুঁলিস্তা* ইত্যাদি পত্রিকায় অনেক মহিলার চোখে পড়ার মতো প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাপা হয়েছিল, যাঁরা আমাদেরই অক্ষমতার দোষে এই সংকলনের বাইরে থেকে গেলেন। আমরা আশা করি যে কবি মোতাহেরা বানু, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, আনোয়ারা বেগম (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মা), প্রবন্ধ-রচয়িত্রী কাসেমা খাতুন, ওমদাতুন্নেসা খাতুন, আয়েষা আহমেদদের নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চা হবে। কবি হাসন রাজার বোন ছহিফা বিবির লেখাপত্র সম্ভবত সিলেটে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে—সময়াভাবে আমরা তা করে

উঠতে পারিনি। কিন্তু ছহিফা বিবির কবিতার যতটুকু নমুনা আমরা দেখেছি, (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* গ্রন্থে), তার আধ্যাত্মিক সুর আমাদের লোক-কবি হাসন রাজার কথা মনে করিয়েছে। সারা তয়ফুর সে সময়কার একজন অগ্রণী নারী ছিলেন, তাঁর সপ্রতিভভাবের কথা অনেকের কাছ থেকে আমরা জেনেছি, অনেকের লেখায় তাঁর উল্লেখ পেয়েছি। কিন্তু তাঁর 'ফোস্তাত' প্রবন্ধ (*বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, বৈশাখ ১৩২৫) বা *স্বর্গের জ্যোতি* গ্রন্থ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭১, পঞ্চম সংস্করণ) নেহাতই ধর্মবিষয়ক রচনা। এই সংকলনটি হয়ত তেমন লেখা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। 'সফিয়া খাতুন বি. এ.' একটি হেঁয়ালি যার সমাধান আমরা করতে পারিনি, 'পরিশিষ্ট'তে তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে।

ভাষাগত সমস্যার একটা দিক এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙালি হিন্দু বা ব্রাহ্ম এবং বাঙালি মুসলমানের ভাষায়, বিশেষ করে সম্বোধনে, কিছু কিছু পার্থক্য তো রয়েইছে। অনেক মুসলমান লেখক, লেখিকা, তাঁদের লেখার মধ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বা বিকল্প শব্দ বুনে দিয়ে থাকেন, এতে হিন্দু-ব্রাহ্মর ভাষার 'আধিপত্য'ই প্রকাশ পায়। সব শব্দ 'জল' আর 'পানির' মতন সহজ নাও হতে পারে। বিভ্রান্তি তৈরি হয় খালা-মাসি, ফুফু-পিসি, দাদা-ঠাকুর্দা, নানী/নানু-দিদা, বড় ভাই-দাদা, অজু, ইন্তেকাল, বেহেশত ইত্যাদি শব্দ নিয়ে। শুধুমাত্র আমাদের লেখিকাদের লেখাতেই নয়, *জানানা মহ্‌ফিল*-এর যুগ্ম সম্পাদিকা আমরা, অবস্থানগত কারণে আমাদের ভাষাতেও এই ভিন্নতা ধরা পড়েছে। ভিন্নতাকে আমরা আমাদের সত্য বলে মেনে নিয়েছি ; এই বইয়ে তাই দুরকম শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে, পাঠকের সামান্য অসুবিধে হতে পারে জেনেও। কোন পাঠকের জন্য কতটুকু, কী আমরা ব্যাখ্যা করে দেবো, তা স্থির করতে পারিনি। হিন্দু পাঠককে বোঝাতে হলে বলতে হয় যে 'আপা' মানে কিন্তু 'দিদি', মুসলমান পাঠকের জন্য বলতে হয় 'দিদি' হলো 'বড় বোন'/'আপা'/'বুবু'—এই ব্যাখ্যার ঝুঁকি আমরা নিতে চাইনি।

আরও একটি সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তের কথা জানাতে চাই পাঠককে। আমরা মূল লেখার ভাষা ও বানানে কলম ছোঁয়াইনি, মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করেছি শুধু।

এই পর্যায়ে *জানানা মহ্‌ফিল*-এর অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমরা কেবল আশা রাখি যে এই কাজ থেকে নতুন প্রশ্ন, নতুন চিন্তা, নতুন কাজ জন্ম নেবে, এবং বাঙালি মুসলমান মেয়েদের নিয়ে চর্চা ক্রমশ সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে।

সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা ছিল আমাদের সংকলনের ভূমিকা লেখার। ইলিয়াসভাই সে সময় গুরুতর অসুস্থ। তবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রসিকতা করায় তাঁর কোনও জুড়ি ছিল না। একবার একটা চিঠিতে লিখেছিলেন : '. . . ফের বলি, এই কাজের জন্য তোমরা উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করোনি। আমার বোলচাল আর বাখোয়াজি দেখে তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছো। এখনও সময় আছে, যোগ্য লোক বেছে নাও। আমার লেখা ভূমিকা দেখে তখন পস্তাবার চেয়ে আগে ভাগে সাবধান হওয়া কি ভাল নয় ?'

পস্তাতে তো আমাদের হচ্ছেই। ইলিয়াসভাই-এর অকাল মৃত্যুতে *জানানা মহ্‌ফিল*-এর অসম্পূর্ণতা বেড়ে গেছে।

আমরা কৃতজ্ঞ ফরিদা শাহনাজ, লুনা, এবং সুমিত অধিকারীর কাছে লাইব্রেরি থেকে বেশ কিছু লেখা সংগ্রহ করে দেবার জন্য। বহরমপুর খোশবাসপুরের সৈয়দ আবদুর রহমান ফিরদৌসী এবং নীলাঞ্জন সৈয়দ তাঁদের সংগ্রহের অনেক পত্রিকা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ঢাকা বাংলা একাডেমীর সঙ্গে আমাদের প্রথম যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন ইলিয়াসভাই; সেখানে আমিরুল মোমেনিন ও অন্য সদস্যরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে অসীম মুখোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য বই নিজের হাতে খুঁজে এনে দিয়েছেন। লেখিকাদের ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে হাজির হয়েছিলাম অনেকের কাছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় কুমিল্লার রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, চট্টগ্রামের উমরতুল ফজল, আবুল মোমেন, আবুল মনসুর, ঢাকার সাঈদা খানম, সালাউদ্দীন আহমেদ, রোকেয়া রহমান কবীর, সিদ্দিকা জামান, সেলিনা বাহার জামান, শামা কাদের, আবুল মকসুদ, আখতার ইমামের কথা।

এই বই-এর জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে নূরজাহান বেগম, সুফিয়া কামাল, হামিদা খানম, সৈয়দ মুস্তাফা ফিরাজ আমাদের ধন্য করেছেন। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অভিজিৎ সেন, তাঁকে ধন্যবাদ। ইয়াসমিন হোসেন কেবলমাত্র এই সংকলনের প্রেক্ষাপট লিখে দেননি, যখন তখন জানতে চাওয়া প্রশ্নের উত্তর তিনি একটুও দেরী না করে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুদূর লন্ডন থেকে। মালেকা বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কিছু বই আমাদের সংগ্রহ করে দেবার জন্য। অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়কে ওঁর মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। বহরমপুরের অনুপম ভট্টাচার্য্য শেষ মুহূর্তে একটি হারানো লেখা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ঈপ্সিতা হালদার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাক্ষাৎকারটির অনুলিখনে সাহায্য করেছেন। নাজেস আফরোজ ইয়াসমিনের লেখাটি অনুবাদ করে দিয়েছেন এবং অন্য আরও বহু কাজে আমাদের পাশে থেকেছেন। 'স্ত্রী' প্রকাশনা, বিশেষ করে মন্দিরাদি নিরন্তর উৎসাহ না দিলে এই কাজ করার সাহস আমরা পেতাম না। হাবীবুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের জন্য। সর্বোপরি, পেজমেকার্স-এর সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না।

শ.আ.

জানুয়ারি, ১৯৯৮ ম.ভ.

# প্রেক্ষাপট

## ইয়াসমিন হোসেন

বাংলার মুসলিম মহিলাদের জন্য সংস্কার আন্দোলন এখনও অনেকটাই অজানা বিষয়। এই সংস্কার বিষয়ক বিতর্ক, সেই প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে সেই সংস্কারের অন্তিম রূপ কী হয়েছিল—এ সবই পাওয়া যায় মহিলাদের লেখা পত্রে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, মহিলাদের লেখাপত্রের একটি বড় অংশ এখনও লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে এবং কলকাতা ও ঢাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগার বা মহাফেজখানায় সেগুলির ওপর ধুলোর আস্তরণ বেড়েই চলেছে। এগুলি উদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরি কারণ এর থেকে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে যেমন একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে, তেমনই বাঙালি মুসলিম মহিলাদের জীবনে সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কেও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। বর্তমান সংকলনটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকের বাঙালি মুসলিম লেখিকাদের লেখার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখানে লেখিকা পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে, খায়রন্নেসা, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, এম. ফাতেমা খানম, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, ফজিলতুন নেসা, মিসেস এম. রহমান, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, শামসুননাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল এবং সর্বোপরি রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নির্বাচিত রচনার সাহায্যে সংস্কার-বিতর্ক ঘিরে জটিলতা ও ঘটনাপ্রবাহ—বিশেষ করে শিক্ষা, পর্দা ও বিবাহ সংক্রান্ত—উন্মোচিত করা হয়েছে। এ বিষয়গুলিতে, অনেক সময়, মহিলাদের মতামত নিরপেক্ষ থাকলেও সেগুলি আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক মতামত হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত কারণ এত যুগ ধরে নীরব থাকা মহিলাদের প্রথম প্রকাশ্যে রাখা বক্তব্যের একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অধিকারের কথা সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)।

বাংলায় মহিলাদের জন্য সংস্কার প্রক্রিয়া মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে সংঘটিত হলেও, তা রোকেয়ার আবির্ভাবের জন্য একটি সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করেছিল। ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানকে মাপকাঠি করে ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেছিল এবং তার মাধ্যমেই অন্তঃপুরের জন্য সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বাংলায় প্রথমদিকের সংস্কারকরা যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশব চন্দ্র সেন পুরুষদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক সংস্কার শুরু করলেন। এর মধ্যে সব থেকে

উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৬ সালের বিধবা-বিবাহ আইন যার সাহায্যে হিন্দু বিধবারা আবার বিয়ে করার অনুমতি পেলেন। ১৮৬০ সালের আর একটি আইনের দ্বারা বিবাহের ন্যূনতম বয়স দশ বছর ধার্য করা হল।

ধর্মই ছিল এ সময়ের সমস্ত সামাজিক সংস্কারের মূল কাঠামো। ১৮২২ সালে রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করলেন। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার স্থাপনা করলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুটি প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজে, হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কথা বলা হল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মহিলাদের শিক্ষার সপক্ষে বাঙালি সমাজে প্রচারও শুরু হল। এর পরবর্তীকালে যে সব সংস্কারক এলেন—এমন কি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও—তাঁরাও ধর্মকে জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলে স্বীকার করলেন এবং দেখালেন যে সমাজ জীবনে মূল্যবোধের যাবতীয় ধারক ও বাহক হচ্ছেন মহিলারাই। মহিলাদের বিষয়ে বিতর্ক তোলার জন্য নিঃসন্দেহে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে Geraldine Forbes লিখেছেন যে সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল পরিবারে মহিলাদের অবস্থান ও মান উন্নত করা কিন্তু এঁরা কেউই চান নি যে মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে ও আইনগতভাবে স্বাধীন হন।[১]

প্রায় একই সময়ে ভারতীয় মুসলিমরা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ধ্বংস হওয়ার বাস্তবতা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন স্বীকার করে নেওয়া শুরু করেছেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতীয় মুসলিমরা সমসাময়িক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার মূল্যায়ন শুরু করেন। এবং অবধারিতভাবে মুসলিম সমাজে মেয়েদের অবস্থানের বিষয়টিও নতুনভাবে দেখা শুরু হয়। Peter Hardy-র মতে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের ফলে, অন্ততঃ শিক্ষিত মুসলিমরা বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশরা ভারতে থাকবে এবং তারা তাদের নিজের শর্তানুযায়ীই থাকবে।[২] এই উপলব্ধির ফল হল দু রকমের। এক দিকে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মহিলাদের জন্য সংস্কারের কট্টর বিরোধিতা করেও মুসলিমদের বোঝানর চেষ্টা করলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনৈসলামিক নয়।[৩] কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকরা, যেমন আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমির আলি যথাক্রমে ১৮৬৩ সালে Muhammadan Literary and Scientific Society এবং ১৮৯১ সালে National Mahommedan Association স্থাপন করলেন। ১৮৭৬ সালে Central Mahommedan Association স্থাপিত হয় সৈয়দ আমির আলি ও সৈয়দ আমির হুসেনের উদ্যোগে। এই সংস্থাগুলি সমাজের উচ্চবর্গের মানুষদের নিয়ে তৈরি হবার ফলে সাধারণ মুসলিম সমাজে এগুলির বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নি।

অন্যদিকে আর এক দল ছিলেন, যাঁরা ছিলেন কট্টরভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী। 'সাচ্চা' ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিমদের এই অংশটি তাঁদের নিয়মনীতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামো পুনর্গঠন করলেন। ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে মৌলানা মহম্মদ কাসিম নানোতাওয়ি যে আন্দোলন শুরু করেন, তাতে গোটা ভারতে বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিমদের একটি অংশ আকৃষ্ট হয়। Barbara Metcalf

দেওবন্দের সংস্কার আন্দোলন এবং আশরাফ আলি থানাওয়ির *বিহিস্তি জেওয়ার*-এর সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে একটি 'স্থানচ্যুত' (dislocated) মুসলিম সংস্কৃতির ওপর অপর একটি 'উগ্র বিকল্প সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ' আরোপিত হবার উল্লেখ করেছেন। থানাওয়ির সংস্কার কোনভাবেই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য তৈরি করা দুটি পৃথক সামাজিক নিয়ম বদলানর চেষ্টা করে নি এবং পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের নিম্ন অবস্থানকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।[8] এই মহলে বলা হত, মহিলাদের যথাসম্ভব পর্দা ও অন্তঃপুরের আড়ালে থাকাকেই মেনে নিতে হবে। *বিহিস্তি জেওয়ার*-এ বলা হত যে স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আল্লার প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশেরই সামিল। কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই বইয়ে লেখা হয়েছিল যে মহিলারা পুরুষদের সম্পত্তি এবং কোনদিন মহিলারা সমাজে অগ্রণী ভূমিকা নিলে তা পৃথিবী ধ্বংসের চিহ্ন বলে ধরে নিতে হবে। থানাওয়ির বক্তব্য ছিল যে মহিলারা ত্যদের সাংস্কৃতিক সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের বিপরীত। তিনি মহিলাদের সামাজিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে দেখার বিরোধিতা করেছিলেন।

'আধুনিক মহিলা' তৈরি করার জন্য যে সংস্কার শুরু হয়েছিল তা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের মধ্যে। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের আবির্ভাবের আগে মুসলিম মহিলারা এই সংস্কারের বাইরে রয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু মহিলাদের জন্য সংস্কার আন্দোলনের তুলনায় মুসলিম মহিলাদের সংস্কার আন্দোলন অনেকাংশেই পৃথক ছিল কারণ জেনানা মহল থেকে উদ্ভূত রোকেয়া মহিলাদের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে পুরুষদের রাজনীতির বাইরে বিতর্ক ও আলোচনার সাহায্যে তাঁর কর্মসূচি তৈরি করে নিয়েছিলেন।

রোকেয়া যে কর্মসূচি তৈরি করে নিয়েছিলেন তার মাধ্যমে তিনি জায়া ও জননী, নারীর এই প্রথাগত ভূমিকাকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁর আগের ও পরের সংস্কারকরা তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে নারীর এই প্রথাগত ভূমিকা বদলের কোন চেষ্টাই করেন নি এবং তাঁরা সামান্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রোকেয়া প্রয়োজন মত বিবাহ ও গেরস্থালির বাইরে মেয়েদের কর্মসংস্থানের কথা বলেছিলেন। সংস্কারের এই কর্মসূচি ক্রমেই বাংলার মুসলিমরা গ্রহণ করলেন এবং নারীর চিরাচরিত ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করা শুরু হল। একই সঙ্গে নারী মুক্তি সম্পর্কে পুরুষ সংস্কারকদের তৈরি করা ছকটিও ভেঙে গেল। এই সংস্কার আন্দোলনের একটি চমকপ্রদ দিক হচ্ছে এই যে হিন্দু সমাজে মহিলাদের জন্য সংস্কার আন্দোলনের আগে যে ধরনের বিতর্ক হয়েছিল, এক্ষেত্রে সে ধরনের কোন বিতর্কই হয় নি। কোন পূর্বসূরীর পথ-নির্দেশ ছাড়াই রোকেয়া ভ্রূণ অবস্থা থেকে তাঁর ধ্যান ধারণাকে মাত্র দুই দশকের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত করেছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনও ব্যাপিত ছিল এই দুই দশক ধরে।

## মুক্তির উপায় শিক্ষা

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের জন্য সংস্কারের প্রয়াস আবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের মধ্যে। ১৮১০-এর দশকে ইংরেজ ও মার্কিনি মিশনারিদের দ্বারা মেয়েদের জন্য প্রথম প্রথাসিদ্ধ স্কুল স্থাপিত হয়। মিশনারিদের মধ্যে মিস কুক কিছু দরিদ্র মুসলিম মেয়েকে এই সব স্কুলে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হলেও, সাধারণভাবে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা আবদ্ধ ছিল জেনানা মহলে, চিরাচরিত গার্হস্থ্য বিদ্যা ও কোরান পাঠের মধ্যেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম মেয়েদের জন্য যেভাবে স্কুল তৈরি হওয়া শুরু হল তাতে বোঝা যায় যে মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছিল। তবে মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসার বিতর্ক শুরু করে এই যে স্কুল তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অচিরেই বিফলে পরিণত হল এবং অধিকাংশ স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম কারণ এটি স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের আধুনিক করার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছিল।

মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলই মহিলাদের মধ্যে প্রথম যিনি ১৮৯৭ সালে কলকাতায় মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল তৈরি করেছিলেন। এর পরে মেয়েদের জন্য যে স্কুল তৈরি হয় সেটি হচ্ছে ১৯০৯ সালের সুরাওয়ার্দি গার্লস স্কুল। এর দু বছর পরেই রোকেয়া তাঁর স্কুল তৈরি করলেন। ১৯১৩-১৪ সালের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে সুরাওয়ার্দি গার্লস স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশেষ অনুদান পেত।[৫] ১৯১৩ সালের এক রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে সুরাওয়ার্দি বেগম স্কুলে মিডল ইংলিশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয় এবং এই স্কুলের ১২ জন ছাত্রী তার আগের বারে বৃত্তি পেয়েছিল। ১৯১১ সালের পর পরই মেয়েদের জন্য অনেকগুলি স্কুল চালু হল। ১৯১৬ সালে আরও চারটি মুসলিম মেয়েদের স্কুল সরকারি অনুদান পেত। সেগুলি হল মিদনাপুর মোসলেম গার্লস স্কুল, আসানসোল হানিফা মোসলেম গার্লস স্কুল, কুমিল্লার হুসামিয়া গার্লস স্কুল এবং রংপুরের মুন্সিপাড়া স্কুল। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে জেনানা স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিডল স্কুল, হাই স্কুল, কারিগরী ও শিল্প শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলিম মেয়েদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।

যে সময় রোকেয়া কলকাতায় এসে পৌঁছলেন, সে সময় বাংলায় মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালের সব ধর্মের মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি করার উদ্দেশ্যে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে বাংলায় একটি Female Education Committee গঠন করা হয়েছিল।[৫] এর ফলে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যাও অনেকাংশে বেড়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যটি অস্পষ্টই থেকেই গিয়েছিল। পরিবর্তনশীল সমাজে মেয়েদের অবস্থান কী হবে? শিক্ষিতা নারীকে কি এখন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষের জায়া-জননী-কন্যা হিসেবেই গণ্য করা হবে? না কি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-কাঠামোর বাইরেও তার অন্য কোন ভূমিকা

নির্দিষ্ট হবে? রোকেয়া যুগের মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা প্রবন্ধকাররা এই বিতর্ককে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লেখিকাদের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল না। বরং তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী মত ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ করেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী কেউই ছিলেন না। এমন কি রক্ষণশীল পুরুষ প্রবন্ধকাররাও নয়। তাঁরা এ বিষয়টিকে একটি 'প্রয়োজনীয় পাপ-কাজ' বলে গণ্য করতেন এবং সে জন্যই তাঁরা ইসলামিক ও চিরাচরিত শিক্ষার কথা বলতেন। এফ এম আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী *সওগাত*-এ লিখেছিলেন, 'এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মেয়েদের জন্য আমরা কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। তদুত্তরে আমার বক্তব্য যে সাধারণ স্কুল কলেজ হইতে তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী বিভিন্ন হউক। . . . এক কথায় আগেকার সুখ-শান্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৈন্য ঘুচিয়া নিরানন্দ সংসারে আনন্দ ফিরিয়া আসে, সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।'[৬] এই দুঃখ-দৈন্যের প্রসঙ্গ সে সময় সমস্ত পুরুষ প্রবন্ধকারের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একটি প্রবন্ধে বলা হচ্ছে যে মেয়েদের মূল দায়িত্ব গৃহকর্ম করা, স্বামীর দেখভাল করা, সন্তান প্রতিপালন করা, অতিথির আপ্যায়ন করা ও গৃহে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা। ঐ লেখক নারীকে এই সব দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে নতুন ও গতিশীল জীবনে দেখতে নারাজ।

স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে আর একদল লেখকের যুক্তি ছিল 'আধুনিক মহিলা' তৈরি করা। মহম্মদ ওয়াজেদ আলির 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতিতে সেই সময়ের বহু পুরুষ প্রবন্ধকারের বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়: 'নারীদিগকে আমরা বিশ্বের জ্ঞানালোকে পরিস্নাত করাইব, অধর্ম্মীয় পর্দ্দার বাহিরে আনিয়া মুক্ত আলো-বাতাসের "হিসসা" দান করিব, তাঁহাদের দেহমনের পঙ্গুতা দূব করিব; কিন্তু তাঁহারা মুখ্যতঃ এবং স্বভাবতও আমাদের জননী, ভগিনী, গৃহিনী—ইহা বিস্মৃত হইব না।' এই গোটা প্রবন্ধে মহম্মদ ওয়াজেদ আলি মেয়েদের অবস্থানের উন্নতির কথা বলছেন কিন্তু প্রথম থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে পূর্ণ নারী-মুক্তি তাঁর প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে নেই। তিনি লিখছেন, 'সেইরূপ, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্থাপিত হতে পারে না। যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে গৃহ-জীবন (family-life) ধ্বংস হইবে।'[৭] ওয়াজেদ আলি ও তাঁর সমসাময়িক অনেকেই মনে করেছিলেন যে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মেয়েদের গৃহকর্মের পরিধি কিছুটা বাড়ানো। বহু মহিলার লেখার মধ্যেও এই একই চিন্তাধারা লক্ষ করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে নারী-মুক্তি আসতে পারে, কর্মসংস্থান হতে পারে বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া যেতে পারে—এমন কোন কথা এঁরা কেউই বলেন নি। সৈয়দা জয়নাব খাতুন বরং বলছেন যে স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীমুক্তির কথা বলে তিনি পুরুষ ও নারীর সমানাধিকরের কথা বলছেন না।[৮] বস্তুতঃ তাঁর সমসাময়িক অনেক লেখিকার বক্তব্যই ছিল একই সুরে বাঁধা। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এমন যুক্তিও বহু ক্ষেত্রে দেওয়া হত যে অশিক্ষিত স্ত্রীর সান্নিধ্যে স্বামী ক্লান্তি বোধ করবে, ফলে সে বেশ্যালয়ে যেতে চাইবে। স্ত্রী-শিক্ষার ফলে গৃহের পরিবেশ আনন্দময়

হয়ে উঠবে যার দ্বারা স্বামী গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সংসারের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

জননী হিসেবে নারীর ভূমিকার ওপরই সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হত। কাসেমা খাতুন তাঁর 'নারীর কথা'য় লিখছেন যে যেহেতু শিশু তার মায়ের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়, সেজন্য মায়ের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তিনি আলি ভাইদের উদাহরণ দিয়েছেন যাঁরা দৃঢ় ও সুশিক্ষিত মা বি আম্মনের ছায়ায় বড় হয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'এমন কোন্ মূর্খ আছে, যে পুরুষজাতির ভবিষ্যত জীবন গঠনকারিনী মহিয়সী মাতৃ-জাতির শিক্ষার আবশ্যকতার বিরুদ্ধতা করিতে অগ্রসর হইবে ?'[৯] ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা ছাড়াও স্বামীর কাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনের জন্য স্ত্রী-শিক্ষার কথাও কাসেমা খাতুন বলেছেন। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন, 'অশিক্ষিতা স্ত্রীর অজ্ঞতা ও প্রতিকূলতা কত পুরুষের কর্ম্মজীবন যে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্ত্রী যদি স্বামীর চিন্তার সত্য অনুভূতি হৃদয়গ্রহ করিতে পারে, তবে সে সমস্ত প্রাণ দিয়া স্বামীর চিন্তা ও কার্য্যের সাহচর্য্য করিতে পারে। তাহাতে স্বামীর কর্ম্ম-সাধনার ভিতরে যে মাধুর্য্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক।'[১০] এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে সব মহিলা স্ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাও স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী মনে করতেন যে মেয়েদের জীবনের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা নিতে হবে ; শৈশবে মা-বাবার কাছ থেকে, কৈশোরে ভাইয়ের কাছ থেকে, যৌবনে স্বামীর কাছ থেকে এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের কাছ থেকে। এই যুক্তির পক্ষে তিনি নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'এই যে মনের ভাবগুলি যেমন তেমন করিয়া প্রকাশ করার শক্তি, ইহা আমি আমার মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। তিনি শিক্ষিতা না হইলে এটুকু হইত কিনা সন্দেহ। কন্যার জন্য মাতাই উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী।'[১১] ১৯২৯ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের ছাত্রীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন সৈয়দা জয়নাব খাতুন লিখেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বদলে এদের কি বাড়িতে শিক্ষা দেওয়া যেত না। মুসলিম মেয়েদের কী ধরনের শিক্ষা পাওয়া উচিত এ বিষয়ে এই সময়ের লেখিকারা সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন। এবং তাঁরা প্রায় সকলেই এই মত পোষণ করতেন যে মেয়েদের শিক্ষা ইসলামকে ভিত্তি করেই করতে হবে এবং গৃহস্থালির শিক্ষা দিতে হবে। কেউ কেউ পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি উপেক্ষার ভাব পোষণ করতেন, যা কখনও কখনও তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পেত। চিরাচরিত মূল্যবোধকে নষ্ট করার জন্য এবং ইসলামে নিবেদিত পুরুষ ও মহিলাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য এই শিক্ষাকে দায়ী করা হত। কাসেমা খাতুন তো লিখেইছিলেন যে পাশ্চাত্যের শিক্ষার ফলে দুর্বল, ভীরু, নিচ, উড়নচণ্ডী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ তৈরি হয়। তিনি একাই এ ধরনের মন্তব্য করেন নি। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এঁদের এটা স্বীকার করতে হয়েছিল যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা শুধু হুজুগ নয়, এর সাহায্যে কর্মসংস্থান সম্ভব। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী লিখেছিলেন যে এই ধরনের শিক্ষার দ্বারা কেবল কর্মসংস্থানই হয়, এর

অন্য কোনও মূল্য নেই। এই প্রসঙ্গটি আমাদের মেয়েদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে নজর দিতে বাধ্য করে।

## মেয়েদের কাজ

উপরোক্ত মত যাঁরা পোষণ করতেন তাঁরা মেয়েদের চাকরি করারও বিরোধী ছিলেন। ঘরের বাইরে কাজ করতে বেরোনটা ভয়ের চোখে দেখা হতো কারণ পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ফলে মেয়েদের ন্যায়নীতির বোধ প্রভাবান্বিত হতে পারে এমনটি আশঙ্কা করা হতো। তার সঙ্গে এটাও মাথায় রাখা হতো যে মেয়েরা চাকরি নিলে পুরুষদের মধ্যে বেকারি সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। অধিকাংশ লেখিকাই এটা মনে করতেন যে মেয়েদের চিরাচরিত গৃহস্থালির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাটাই শ্রেয়। তবে এই মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও এই লেখিকারাই একই লেখায় অনেক সময় স্ববিরোধী কথা বলতেন। কখনও একটি বাক্যে বা চকিতে এমন সব মন্তব্য করা হতো যার থেকে মনে হতে পারে যে এই লেখিকারা মহিলাদের গার্হস্থ্য ভূমিকার বাইরে আরও অনেক বেশি কিছু চাইছেন। ফিরোজা বেগম জায়া ও জননী হিসেবে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখছেন, 'আজ সত্যই মুসলিম মাতা-ভগিণীগণের মুক্তি চাই, শিক্ষা চাই।'[১২] তিনি আরও লিখছেন, 'ঘরে ঘরে আছে কেবল দায়িত্ব, কিন্তু প্রীতি নাই, কর্তব্য আছে, আনন্দ নাই ; কর্ম্ম আছে, অবসর নাই। এই সমস্তের মাঝে কি মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে।'[১৩] চিরাচরিত গার্হস্থ্য কাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলে তিনি লেখা শেষ করেছেন।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীও একটি প্রবন্ধে বলছেন, 'একথাও সত্য আমরা মুক্ত আলো, হাওয়া, শিক্ষা, সবই চাই। আল্লাহতালার সৃষ্ট যা কিছু—তাতে সবারই সমান অধিকার।'[১৪] তিনি বিয়ের ন্যূণতম বয়স ১৮ করার কথা বলেছিলেন যাতে এর মধ্যে মেয়েরা কিছুটা পরিমাণে শিক্ষা পেতে পারে ও বিবাহের এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কাসেমা খাতুনও পুরুষদের আক্রমণ করে লিখেছেন, 'আমাদের বাপ, ভাই, মামু, খালু, চাচা, প্রভৃতি অর্থাৎ যাদের নিয়া পুরুষ সমাজ গঠিত, সেই পুরুষ সমাজের শিক্ষাহীনতাই যে নারী-জাতির অশিক্ষা দোষের জন্য অনেকাংশে দায়ী তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। পুরুষেরা নিজে শিক্ষার আলোক যথেষ্ট পাইলে যে ঘরের মা, বোন, খালা, জায়া এদের চিরদিন শুধু ভাত রাঁধুণী অথবা দুনিয়ার যত সব কু-শিক্ষা ও কু-সংস্কারে জড়াইয়া চাকরাণীর মত রাখিয়া দিতে পারিতেন না সে অনুমান অনেকটা সত্যি।'[১৫] পাশ্চাত্য-শিক্ষার পক্ষ নিয়ে আয়েষা আহমদ মহিলাদের কর্মসংস্থানের কথা জোর দিয়ে বলেছেন এবং শিক্ষার আর্থিক প্রতিদানের যুক্তি দেখিয়েছেন।[১৬] আর এক অগ্রণী লেখিকা ফজিলতুন নেসা লিখছেন, 'সমাজের জন্য সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া অন্যায়—এটাই নবীন যুগের নূতন বাণী।'[১৭] আর একটি নিবন্ধে তিনি বলছেন, 'জগত পরিবর্ত্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝোড়ো

হাওয়া বহু-কাল সুপ্ত মুস্‌লিম নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তা'রা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে ; এবং তা'দের তুলনায় নিজেদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষ ভাবে লজ্জিত হ'য়ে পড়ছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না।. . . কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র—শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তা'দের নাই . . .।'[১৮] ওমদাতন্নেসা খাতুন তাঁর প্রবন্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছেন। 'যে সকল মোল্লা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া আমাদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে চির-মূর্খ করিয়া রাখিতেছে, ভারতের বিশ লক্ষ মুসলিম ললনাকে অবরোধ-কারার বন্দিনী করিয়া অসহায়া অবলা করিয়া রাখিতেছে, আমাদিগকে অতি-জঘন্য অপমানসূচক "আওরাত" নামে অভিহিত করিয়া আমাদের অবমাননা করিয়াছে,—আমরা তাহাদের উচ্ছেদ কামনা করি।'[১৯]

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে ১৯৩০-এর সূচনাতেও ফজিলতুন নেসা ছাড়া সব লেখিকাই স্ত্রী-শিক্ষার জন্য পুরুষমুখাপেক্ষী হয়ে ছিলেন। এমন অজস্র মন্তব্য দেখা যাবে যেখানে তাঁরা বলছেন যে পুরুষদেরই উচিত সেই শিক্ষা দেওয়া যার দ্বারা নারীরা তাদের উপযুক্ত হতে পারে। কেবল ফজিলতুন নেসাই লিখেছেন যে, পুরুষের ওপর নির্ভর করে নয়, মেয়েদের নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। এই বিদ্রোহী পদক্ষেপটিই রোকেয়া গ্রহণ করেছিলেন সেই ১৯১১ সালে, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপনের দ্বারা।

## সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ

রোকেয়ার আবির্ভাবের আগে কয়েকজন মুসলিম লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলিম লেখিকাদের ইতিহাস নির্মাণে এবং রোকেয়ার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করার জন্য এঁদের নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মুহম্মদ এনামুল হক রহিমুন্নেসাকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে ১৭৬৫-৭৫-এর মধ্যে রহিমুন্নেসাই ছিলেন মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের একমাত্র মুসলিম লেখিকা।[২০] তবে সম্প্রতি আবদুল হক চৌধুরি এই তত্ত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[২১] তিনি বলছেন যে রহিমুন্নেসা ছিলেন আধুনিক কোন লেখিকা যিনি পুঁথি-সাহিত্যের নকলে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। রহিমুন্নেসাকে যদি আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যিক বলে ধরে নিই, তবে তাঁর সঙ্গে তাহেরন লেসার [নেসা] আবির্ভাবের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান তৈরি হয়। তাহেরন লেসার গদ্য ১৮৬৫ সাল *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছিল।[২২] তারপরই আসেন নবাব ফয়জুন্নেসা। ১৮৭৬ সালে তিনি গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা *রূপজালাল* প্রকাশ করেন।[২৩] তিনি সঙ্গীতের ওপর দুটি বই লেখেন—*সঙ্গীত স্বর* ও *সঙ্গীত লহরী*। ১৮৮৭ সালে *তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত* নামে

তাঁর চতুর্থ বইটি প্রকাশিত হয়।[২৪] এর ঠিক দশ বছর পরে পরবর্তী মুসলিম লেখিকার লেখা পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৯৭ সালে লতিফন্নেসার কবিতা 'বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের প্রতি' প্রকাশিত হয় *বামাবোধিনী পত্রিকায়*। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলিম লেখিকার নাম আজিজন্নেসা। *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় ১৯০২ সালে তাঁর লেখা ছাপা হয় এবং ইনি হচ্ছেন প্রথম মুসলিম মহিলা যাঁর লেখা মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৫] ১৯০২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচজনের পর, ষষ্ঠ মুসলিম লেখিকা হিসেবে রোকেয়ার আবির্ভাব।

রোকেয়া নিয়মিত লিখেছেন। তবে তিনিই তাঁর সময়ের একমাত্র মুসলিম লেখিকা নন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের সূচনা হয় যখন অনেক লেখিকাই তাঁর দ্বারা উত্থাপিত বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে শুরু করেন। *নবনূর, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, আল ইসলাম, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা* ইত্যাদি পত্র পত্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন, শামসুননাহার, নূরন্নেছা খাতুন, কাসেমা খাতুন, নুরুন্নাহার খাতুন, আসাদুন্নেসা, মোতাহেরা বানু, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা খাতুন, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী এবং বেগম সুফিয়া হোসেন [কামাল]।

১৯২০-র দশকের মুসলিম পত্রপত্রিকাগুলি মুসলিম লেখিকাদের সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রগতির অভাব উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে। মুসলিম মেয়েদের আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার বেশ কিছু সমর্থক ছিলেন যাঁরা এই লেখিকাদের পত্রপত্রিকায় লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। *সওগাত* পত্রিকায় এক নিবন্ধে লেখা হয় যে মিসেস আর. এস. হোসেন, শামসুননাহার, নাসিমুন্নেসা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, মিসেস এস. এন. হোসেন, নূরন্নেছা খাতুন, কাসেমা খাতুনদের লেখা দেখে সমাজের উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সম্পর্কে মনে আশা জাগে। একদিন হয়তো তাঁদের নিয়ে সমাজ গর্ব করতে পারবে।

তবে পুরুষ সমর্থকদের পিঠ চাপড়ানোর মনোভাবে কেউ কেউ আপত্তিও জানিয়েছিলেন। *সওগাত*-এর সম্পাদককে সুফিয়া কামাল লিখেছিলেন, 'আপনি "সওগাত" মহিলা-সংখ্যার জন্য এ মাসেই একটি প্রবন্ধ চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ লিখ্‌তে আমি অভ্যস্তা নই, ও-প্রবৃত্তিও আমার নেই, কারণ আজকাল যত প্রবন্ধ অথবা লেখা বেরুচ্ছে সে সব তীব্রভাবেই পুরুষের প্রতি মেয়েদের বিদ্বেষ সূচক ; আর সব লেখাগুলো বেরুচ্ছে পুরুষের সম্পাদিত কাগজগুলিতেই ! আপনাদের নামে আপনাদের কাছে কুৎসা গাইতে আমার প্রবৃত্তি নেই। যুগ যুগ ধ'রে নারীরা যে অত্যাচার অবহেলা সয়ে এসেছে খেলার পুতুল হয়ে, তাকে দূর করতে কেবল দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখেই নয়—এর প্রতিকার হবে বিদ্রোহে। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিদ্রোহ করবে কা'রা, এবং কাদের বিরুদ্ধে ? করবে পুরুষের বিরুদ্ধেই ! কিন্তু সে বিদ্রোহিনী নারী আজো জন্মায়নি বাংলা দেশে, অবশ্য আছে—কিন্তু মোস্‌লেম-সমাজে নেই।'[২৬]

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখিকার মধ্যে নারী-মুক্তির প্রশ্নে পুরুষদের ধারণা ও মতামতকে সমর্থন করার প্রবণতাই লক্ষ করা যায়। আধুনিক মহিলা তৈরি হবার

প্রয়াসে সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। প্রকাশ্যে মহিলারা তাঁদের কণ্ঠ ধ্বনিত করলেন। রোকেয়ার যুগান্তকারী লেখাগুলি মেয়েদের লেখার বাঁধ ভেঙে দিল। এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় লেখিকাদের লেখার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল মহিলাদের সাহিত্যকর্ম। এই লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিম মহিলারা তাঁদের আত্ম-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করলেন। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী লিখেছিলেন, 'মন বুঝে চলা যাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতময় কাহিনী, কঠিন পথের দুঃখ বেদনার সান্তনা বাণী, লোকে সেই নারীদের মুখেই শুনতে চায়।'[২৭] তিনি আরও বলছেন, 'চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখে মনে হয়, নারী শুধু দেহের খোরাকেই সন্তুষ্ট নয়, মনের খোরাকও সে চায়! আজ যে শুধু এ তৃষ্ণা নারীর মনে জেগেছে তা নয়, এ চিরদিনের . . .।[২৮] অনেক লেখিকাই মেয়েদের সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষার কথা আবেগ ভরে লিখেছেন। রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী বলেছেন, 'এই ধরণের বহু ছড়া পল্লীগৃহিণীদের মুখে শোনা যায়। বোধ হয় অধিকাংশ তাদের স্বরচিত এবং বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতা ও দুঃখ বেদনার সাক্ষী। এ সব কি দেশ-কাল-শ্রেণী নির্বিশেষে মনের ক্ষুধা ও তা মিটানোর চেষ্টা করার প্রমাণ নয়? এই মনের খোরাকের নামই সাহিত্য।'[২৯]

যদিও মুসলিম মহিলারা লিখতে শুরু করেছিলেন তবুও জেনানা মহলের অবরোধ তাঁদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। লেখিকাদের একটি গোষ্ঠী—যা একে অন্যকে উৎসাহিত করবে—তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। অধিকাংশ মহিলাই ছিলেন একাকী যাঁদের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ অবরোধ প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি গোষ্ঠী তৈরি করার প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই ভাবে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করা সম্ভব হবে, এমন কি সাহিত্যে অনভিজ্ঞ মহিলাদেরও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করানো যাবে।[৩০] এই ধরনের কোনও গোষ্ঠী তখন তৈরি করা যায় নি। যদিও বেগম সুফিয়া কামাল বলেছিলেন যে পুরুষদের সম্পাদিত কাগজে পুরুষদের সমালোচনা শোভা পায় না, তবুও অনেকদিন পর্যন্ত আধুনিক মুসলিম পুরুষদের সমর্থনে, তাঁদেরই সম্পাদিত পত্রপত্রিকাকে মঞ্চ হিসেবে অবলম্বন করে লেখিকারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মজীবনী, ডায়েরি, চিঠি, পত্রিকা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এই সংকলনটির গুরুত্ব বিবেচিত হওয়া উচিত।

## তথ্যসূত্র


১. Geraldine Forbes, 'The Indian Women's Movement : A Struggle for Women's Rights or National Liberation?' in Gail Minault, ed., *The Extended Family : Woman and Political Participation in India and Pakistan*, (Delhi : Chanakya Publication, 1981), pp. 49-82

২. Peter Hardy, *The Muslims of British India*, (London : Cambridge University Press, 1972), p 61

৩. Gail Minault, 'Making Invisible Women Visible . Studying the History of Muslim Women in South Asia' in *South Asia Journal*, 9:1 June, 1986, pp. 1-14. Gail Minault, 'Sayyid Mumtaz Ali and Tazib un-Niswan : Women's Rights in Islam and Women's Journalism in Urdu', in Kenneth W Jones, ed., *Religious Controversy in British India : Dialogues in South Asian Languages*, (New York : State University of New York Press, 1992), pp. 179-199

৪. Barbara Daly Metcalf, *Perfecting Women, Maulana Ashraf Ali Thanawi's Behisti Zewar : A Partial Translation with Commentary*, (Berkeley, University of California Press, 1990), p. 4

৫. *Report on Public Instruction in Bengal*, 1912-13 to 1916-17, v/24/985, (London, India Office Library)

৬. এফ এম আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, 'নারী সমস্যা', *সওগাত* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৯২৭, পৃ. ৭৬৭-৬৮

৭. মহম্মদ ওয়াজেদ আলি, 'স্ত্রী শিক্ষা', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬

৮. সৈয়দা জয়নাব খাতুন, 'বঙ্গীয় মুসলিম পল্লী নারী', *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯২৯, পৃ. ৭

৯. কাসেমা খাতুন, 'নারীর কথা', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃ. ১০১

১০. ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃ. ৩৪৮

১১. রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের শিক্ষাব-ধারা', *রাজিয়া খাতুন চৌধুরানীর রচনা সংকলন*, মোহম্মদ আবদুল কুদ্দুস (সম্পা.), (কুমিল্লা : রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, ১৯৮২), পৃ. ৮

১২. ফিরোজা বেগম, 'আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ৬৭

১৩. ঐ

১৪. রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, 'পর্দ্দা ও অবরোধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৫. কাসেমা খাতুন, 'নারীর কথা', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃ. ৪৮

১৬. আয়েষা আহমেদ, 'মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ৪৩

১৭. ফজিলতুন নেসা, 'মুসলিম নারীর মুক্তি', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬
১৮. ফাজিলতুন নেসা, 'মুস্লিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *সওগাত*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
১৯. ওমদাতন্নেসা খাতুন, 'কোন মোল্লায় অভক্তি', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ৩৫
২০. দ্র. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ঢাকা : ১৯৫৭, পৃ. ৫৩
২১. আবদুল হক চৌধুরী, 'রহিমুন্নেসা ও তাঁর সময়কাল', *আজাদী*, অক্টোবর ১৯৮৬
২২. তাহেরন নেসা, 'বামাগণের রচনা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ১৮৬৫
২৩. ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, *রূপজালাল*, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, সম্পা., ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪
২৪. দ্র. আলী আহমদ সংকলিত, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩৬
২৫. আজিজন্নেসার যে লেখাটি *ইসলাম প্রচারক*-এ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ছিল একটি কবিতা, 'হাম্‌দ্‌ অর্থাৎ ঈশ্বর স্তুতি' (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২)।
২৬. এই চিঠিটি সুফিয়া কামাল লিখেছিলেন ১৯২৯-এ, এবং তা পরে *সওগাত* পত্রিকায় ছাপা হয়। দ্র. এই সংকলন, পৃ. ২৩০
২৭. রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, 'মুসলিম মহিলার সাহিত্য সাধনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
২৮. ঐ, ২৬
২৯. ঐ, ২৭
৩০. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, 'সাহিত্য চক্র', *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯২৯, পৃ. ৪০

# প্রস্তাবনা

## সীমান্ত

সময়টা শরৎকাল, ১৯৯৬। জলপাইগুড়ি শহরে রাত কাটিয়ে সকালবেলায় বাসে চেপে আমরা এসেছিলাম ময়নাগুড়িতে, সেখান থেকে আর একটা বাসে করে এখানে। পশ্চিমবাংলার উত্তরবঙ্গে এই আধা শহরের নাম চ্যাংড়াবান্ধা। শহর বলতে একটা থানা, একটা বাজার, গোটা কয়েক ঝরঝরে বাস, কিছু রিক্সা আর ভ্যানরিক্সা। সেই ভ্যানরিক্সা অলিগলি ঘুরে, ঘরগৃহস্থালির গা ঘেঁষে এসে পৌঁছেছে সীমান্তে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।

একটা বাঁশের ছাউনির চাঘরে ভারতের টাকা আর বাংলাদেশের টাকা, দুইই চলে। আরও একটু দূরে আর একটা বাঁশের ঘরে চেকপোস্ট, কাস্টম্‌স্‌, দুই দেশের আধা-সেনার পাহারা, গল্পগুজব। চারপাশে ছড়ানো মাঠ আর ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কোনও এক অলীক সীমান্তরেখা, যাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে হয়। সেই সীমান্তরেখা পেরিয়ে *জানানা মহ্‌ফিল*-এর যুগ্ম সম্পাদিকার একজন চলে যাব ও পাড়ে, একজন রয়ে যাবো এ পাড়ে।

সীমানাকে চোখ দিয়ে বোঝা যায় না। কিন্তু যখন আমরা দুজন দুদিকে চলে যাই, তখন আমাদের ভিন্ন অস্তিত্ব, ভিন্ন অবস্থান বাস্তব হয়ে ওঠে।

অবস্থানের এই ভিন্নতা আমরা আমাদের এই সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে বার বার উপলব্ধি করেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নিয়ে আমরা চর্চা করব কেন, তার পেছনেও দুজন দু রকমের যুক্তি খাড়া করেছি। এই ভিন্নতা কেবল আমরা দুটি আলাদা মানুষ বলেই নয়, ভিন্নতা আমাদের ভৌগলিক অবস্থানে, আমাদের ইতিহাসে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, নামে, ভাষায় আর লেখনীতে।

## গোড়ার কথা

পশ্চিমবাংলার বাঙালি হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়েরা মুসলমান সমাজের কিছুমাত্র সংস্পর্শে না এসেই দিব্যি বড় হয়ে উঠতে পারে। একজনও মুসলমান সহপাঠী নেই, প্রতিবেশী নেই, বন্ধু নেই, এমন তো কত মানুষের জীবনেই ঘটে! আমার নিজের ছেলেবেলায় ইস্কুলে দু একজন শবনম, শাহনাজ ছিল ঠিকই, একজন মিসেস আহমেদ আমাদের

পড়াতেনও। কিন্তু আমাদের সেই ইংলিশ মিডিয়াম পাহাড়ি স্কুলে মিসেস আহমেদ আর মিসেস করের তফাত আমরা বিশেষ বুঝতাম না। ক্লাসের শাহনাজ হাজারিকা যেমন ছিল, হেদার রিচমণ্ডও তেমনই, একই ছাঁচে গড়া মন্দিরা বসুমাতারি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে* আমার মায়ের প্রিয় বই ছিল, ছেলেবেলায় আমরাও তারিয়ে তারিয়ে তার রস আস্বাদন করেছি। কিন্তু মুজতবা আলীকে আলাদা করে মুসলমান বলে চিনিনি। আমরা কেবল জানতাম যে পাবনায় থাকার সময় বাবারা ইস্কুলে যেতেন নৌকো বেয়ে। তারপর দেশটা ভাগ হয়ে গেল। আর জানতাম যে মুসলমানরা খুব দাঙ্গা করেছিল। বাড়িতে সরাসরি এমন কথা না শুনলেও আমাদের পরিবেশে কথাটা শোনা যেত। সেই ছেলেবেলাতেই কেন যেন কথাটা আমার বিশ্বাস হতে চাইত না। মনে হতো, দাঙ্গা কি কেউ একলা একলা করে? পরবর্তীকালে এমন আরও হাজারটা প্রশ্ন মনে জমা হয়েছে। তেমনই কিছু প্রশ্ন থেকে এই বই-এর জন্ম।

গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে ইতিহাসচর্চায় যে অশ্রুত কণ্ঠস্বর শোনার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক অজানা মানুষের লেখা, অচেনা জীবনযাত্রা, কথা বলার ভঙ্গি, ভাষা, গানের সুরের সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। এই সময়টাতে মহিলাদের লেখা, মেয়েদের জগৎ নিয়েও বিশেষভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-বিষয়ক চর্চার কেন্দ্র (Women's Studies centres) গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকাশক এই বিষয়টিকে তাঁদের প্রকাশন-সূচিতে আলাদা করে স্থান দিয়েছেন। এই বিষয়ের বইপত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলেজ জীবনে। স্কুল পেরিয়ে কলেজে-পৌঁছনো একটি মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তার অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়, স্বাধীনতা-বোধ নিয়ে নানা প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব, সংকটের মুখোমুখি হয়। সে সময় আমার বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি *Second Sex, Our Bodies Our Selves*-এর পাতায়, *নাথবতী অনাথবৎ* আমাদের উদ্বেল করেছে।

'স্ত্রী'-তে কাজ করতে আসার সুবাদে মহিলাদের লেখা, মহিলাদের জীবন-জগৎ নিয়ে লেখা বই, এবং প্রকাশনা প্রস্তাব পড়ার সুযোগ আমার বেড়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে এই বিষয় নিয়ে আমি যতটুকু নাড়াচাড়া করেছি, তাতে বাঙালি মুসলমান মহিলাদের অনুপস্থিতি আমার বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। Susie Tharu আর K. Lalita সম্পাদিত দু খণ্ডের বৃহৎ সংকলন *Women Writing in India: 600 B. C. to the Present* (New York and Delhi: 1991, 1993) বইয়ে বাঙালি মুসলমান মহিলা বলতে কেবল রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের উপস্থিতি দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই দীর্ঘ সময়ে আর একজনও বাঙালি মুসলমান লেখিকা কি ছিলেন না যাঁকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া যেত? গোলাম মুরশিদের *সংকোচের বিহ্বলতায়* তো মুসলমান সমাজ প্রায় উহ্যই থেকে গেছে।[১] ওঁর পরবর্তী কাজ *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*-তে দুই মুসলমান লেখিকাকে নিয়ে চর্চা হয়েছে কিছুটা, (বেগম রোকেয়া এবং তাহেরন নেছা), কিন্তু বিস্তারিতভাবে বাঙালি মুসলমান নারীর প্রসঙ্গ সেখানে

আলোচিত হয়নি।[২] সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর *অন্দরে অন্তরে* বইয়ে লেখক স্বীকারই করেছেন যে বাঙালি মুসলমান সমাজকে সেভাবে চেনা হয়নি বলেই তাঁর উনিশ শতকের নারী-বিষয়ক গবেষণা তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৩]

এই সব পড়ে, শুনে আমার মনে হয়েছে যে কোথাও একটা বড় রকমের দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে চলেছি। একটা সমাজকে চেনা হয়নি বলে সমাজটাকে চেনার চেষ্টাও করিনি। একে তো বাংলায় মেয়েদের লেখা নিয়েই চর্চা কম হয়েছে, তায় আবার বাঙালি মুসলমান মেয়েদের লেখা ; নেহাত রোকেয়াকে উপেক্ষা করা যায় না বলেই তাঁকে গোলাম মুরশিদ থেকে সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, আনিসুজ্জামান থেকে সুজি থারু, সবার কাজের মধ্যে পেয়েছি। কিন্তু রোকেয়ার আগে, পরে এবং পাশাপাশি কি আর কেউ ছিলেন না, যেমন ছিলেন স্বর্ণকুমারী, কৃষ্ণভাবিনীর যুগে ? তখন তো আরও অনেক হিন্দু এবং ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন যাঁরা লিখছিলেন, পড়ছিলেন ! মনের এই ভাবনাটুকু আমি আমার ঢাকার বন্ধু শাহীন আখতারের সঙ্গে ভাগ করে নিই।

## কেন ১৯০৪

গোলাম মুরশিদ বলেছেন, বাঙালি নারীজাগরণের ইতিহাসে 'ব্যক্তির ভূমিকা' ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৪] এই কথার সত্যতা যাচাই করা যায় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জীবনের দিকে তাকালে। আমাদের *জানানা মহ্ফিল* শুরু হচ্ছে ১৯০৪ থেকে। এই বছরই রোকেয়ার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় *নবনূর*-এ। রোকেয়ার আগে, শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় আজিজন্নেসার লেখা ছাপা হয়েছিল *ইসলাম প্রচারক*-এ।[৫] তারও আগে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী বা রহিমুন্নেসার মতন বাঙালি মুসলমান মহিলারা বই লিখেছেন, কিন্তু সেই লেখাকে আধুনিক নারীজাগরণের যুগের লেখা বলা যায় না।[৬] আজিজন্নেসার কবিতাও রোকেয়ার 'নিরীহ বাঙ্গালী' (মাঘ ১৩১০) বা 'গৃহ' (১৩১১) প্রবন্ধের মতন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

রোকেয়াকে আমরা এই সংকলনে দেখতে চেয়েছি একটি যুগের সূচনা হিসেবে। সব সময় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবেও এক একটা মানুষের হাতে এক একটা সময় গড়ে ওঠে। রোকেয়ার লেখার ভাষা এবং বিষয়, দুইই ছিল সময়ের তুলনায় আশ্চর্য রকমের নতুন। এবং সেই লেখা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান গৃহের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে যায়। সংকলিত প্রায় প্রত্যেক লেখিকার লেখায় এবং তাঁদের পরিচিতিতে, এবং সাক্ষাৎকার পর্বে রোকেয়ার প্রভাবের বিস্তারটি ধরা পড়েছে। রোকেয়াকে একটি যুগ বলার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এই সংকলনের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে আমরা অস্বীকার করতে চাইছি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের এই সংকলন প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তার বিপরীত। আমরা চেয়েছিলাম *জানানা মহ্ফিল*-এর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাঁর পরিবার

পরিস্থিতি এবং হয়ে-ওঠার গল্পের মধ্য দিয়ে হাজির করতে। আমরা চেয়েছিলাম আলাদা করে প্রত্যেকটি কণ্ঠস্বরকে শুনতে এবং শোনাতে।

এই সংকলনের সব লেখিকা এবং সাক্ষাৎকারদাতা যে সরাসরি এবং সমানভাবে রোকেয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অবশ্যই নয়। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার একক জীবনযাপনের সাহস তিনি রোকেয়ার থেকে সঞ্চয় করেছিলেন, এমন কথা বলতে পারি না ; ফজিলতুন নেসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ফাতেমা খানমও সম্ভবত নিজের ভিতরকার জোরেই একলা চলার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। শামসুননাহার, আখতার মহলের ছেলেবেলা কেটেছিল সৃজনশীলতার মধ্যে। নূরন্নেছা, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, আনোয়ারা বেগমের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীরা বন্ধু এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন, হামিদা খানম যে বাড়িতে জন্মেছিলেন, সেখানে তাঁর উচ্চশিক্ষা এবং বিলেতযাত্রা কোনও অস্বাভাবিক পরিণতি ছিল না। নূরজাহান বেগম তো তাঁর বাবা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের আদর্শে বড় হয়েছিলেন। আর নাসিরুদ্দীন স্বয়ং তাঁর কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন প্রতিবেশী হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজ থেকে এবং তুরস্ক ও আফগানিস্থানের পটপরিবর্তন থেকেও।[৭] তবুও এই ব্যক্তিগত পরিচয়গুলির আড়ালে নিহিত আছে একটি যুগের পরিচয়, যে যুগকে আমরা রোকেয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে চেয়েছি।

বেগম রোকেয়ার রোকেয়া হয়ে ওঠার পেছনে কেমনতর প্রভাব কাজ করেছিল ? এ নিয়ে বিস্তর ভাবনা চিন্তা হয়েছে। 'প্রেক্ষাপটে' ইয়াসমিন হোসেন লিখেছেন উনিশ শতকের হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলনের কথা, কোথাও লেখা হয়েছে তাঁর বড় বোন, বড় ভাই এবং স্বামীর অবদানের কথা। তিনি কী ধরনের বই পড়তেন তার একটি ছবি গোলাম মুরশিদ তুলে ধরেছেন।[৮] রোকেয়ার লেখায় কেউ কেউ Mary Wollstonecraft-এর ছায়াও দেখতে পেয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, যখন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে, ততদিনে বাঙালি হিন্দু এবং ব্রাহ্ম মহিলারা সাহিত্যসৃষ্টি আর সমাজভাবনায় অনুধাবনযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে,[৯] রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীও,[১০] কৃষ্ণভাবিনী দাসের *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠক ও চিন্তাশীল সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।[১১] *অন্তঃপুর*, *পরিচারিকা*, *তত্ত্ববোধিনী*, *বামাবোধিনী* ইত্যাদি পত্রিকায় মেয়েদের লেখা এবং নারী-বিষয়ক লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।[১২] সর্বভারতীয় স্তরে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতা রমাবাঈ তখন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, এবং বাংলায়ও তাঁর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।[১৩]

রোকেয়ার প্রথম এবং শেষ লেখার মধ্যিখানে কেটেছিল তাঁর অসম্ভব কর্মব্যস্ত জীবন। এ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি লেখার দিকে আলাদা করে তাকানো যেতে পারে।

একটি 'আমাদের অবনতি', যা ১৩১১ সালের *নবনূর*, ভাদ্র সংখ্যায় (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিই এক বছর পরে *মতিচূর* প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ততদিনে প্রবন্ধের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'স্ত্রীজাতির

অবনতি', এবং মূল প্রবন্ধ থেকে পাঁচটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে। রোকেয়ার যে দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ্য, সেটি তাঁর সর্বশেষ অসমাপ্ত রচনা, যা তিনি লিখছিলেন তাঁর মৃত্যুর রাতে, ১৯৩২-এ। লেখাটিতে রোকেয়া পুরুষের এক তরফা তালাক দেবার এবং বার বার বিয়ে করার শাস্ত্রসম্মত অধিকারের সমালোচনা করছিলেন : 'আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা ?' এমন সরাসরি ধর্মীয় আইনের সমালোচনা রোকেয়া খুব বেশি করেননি, যদিও তিনি বক্রভাবে ধর্মকে আক্রমণ করেছেন বহু লেখায়, যেমন জীবনের শেষের দিকে রচিত 'অবরোধবাসিনী'-তে।

এই সংকলনের অনেক লেখাতেই দেখা যাবে যে লেখিকারা হয়ত মোল্লাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করছেন, অবরোধের বিরোধিতা করছেন, কিন্তু পর্দাকে ইসলাম-সম্মত বলে মেনে নিচ্ছেন। অনেকেই বলছেন যে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট অধিকার দিয়েছে। তার যথাযথ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। এখানে একটা কথা হয়ত বলা যায়। উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দু সমাজে সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত করার চেষ্টা হয়েছিল। অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জীবন-জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হলো, তখন কিন্তু তেমন কোনও আইনি সংস্কারের কথা তোলা হলো না। রোকেয়ার স্কুল স্থাপনা কিংবা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের *সওগাত*-এর মেয়েদের পাতায় খুঁজে খুঁজে নতুন নতুন লেখিকাদের তুলে আনা—এমনতর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মুসলমান সমাজের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যেমন হিন্দু শাস্ত্রকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁদের হিন্দু আইন সংস্কারের সমর্থনে, মুসলমানরাও তেমনই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বা অবরোধের বিরোধিতায় বার বার কোরানের পাতা থেকে যুক্তি তুলে এনেছেন। এমন যুক্তির নিদর্শন এই সংকলনের অনেক লেখাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ফজিলতুন নেসা বা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার মতন কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করে থাকলেও ধর্মীয় আইনে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রশ্ন তখন ওঠেনি। ইসলামের কঠোরতাই যদি এর কারণ হয়ে থাকে, তাহলে সমকালীন তুরস্ক বা আফগানিস্থান নিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের উত্তেজনাকে ব্যাখ্যা করব আমরা কীভাবে ? তাহলে কি এ কথা বলা যায় যে আইনি সংস্কারের জন্য তখনও বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রস্তুত ছিল না ?

কারণ সে যাই হোক, বাঙালি মুসলমান সমাজে এমন পরিবর্তন আসার জন্য কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬১ সালে পারিবারিক আইনে সংস্কার আনা হয়। সেই আলোচনা পাওয়া যাবে এই সংকলনের জন্য রচিত সুফিয়া কামালের পরিচিতিতে।

## রোকেয়া থেকে সুফিয়া কামাল

*জানানা মহ্‌ফিল* শেষ হচ্ছে ১৯৩৮-এ এসে। সেই বছর সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, *সাঁঝের মায়া*, প্রকাশিত হয়। তার আগের বছর তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন *কেয়ার কাঁটা* ছাপা হয়েছিল। একই বছর, অর্থাৎ ১৯৩৭-এ, শামসুননাহার মাহমুদের *রোকেয়া-জীবনী* প্রকাশিত হয়। সে ছিল রোকেয়া যুগের অন্যতম সৃষ্টির যুগস্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

১৯৩৭ বা ৩৮ খুব বড় কথা নয়। আসলে, আমাদের *জানানা মহ্‌ফিল* শেষ হচ্ছে তিরিশের দশকের শেষে পৌঁছে। রোকেয়া থেকে সুফিয়া কামাল—বাঙালি মুসলমান মহিলার শিক্ষা, কর্ম এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণের ঐ ছিল একটা নতুন যুগ। এর আগে পর্যন্ত দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে বৌরা যে ঘর থেকে বেরোত না, এমন অবশ্যই নয়। তাদের ক্ষেত্রে পর্দার কড়াকড়িও খাটত না। কিন্তু সে ছিল নেহাতই অর্থনৈতিক কারণে ঘরের বাইরে বেরোনো। বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার প্রশ্নগুলি বার বার উচ্চারিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক ধরে। ব্যতিক্রমী মহিলারা তখন তাঁদের লেখা এবং জীবনযাপন দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন, এবং সমাজের অন্য মহিলাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিলেন।

শতকসূচনায় বপন করা বীজ চার দশক বাদে ফসল ফলাতে শুরু করেছিল। শামসুননাহারের গ্র্যাজুয়েশন সীমিত অর্থে রোকেয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়ে দাঁড়াল। শামসুননাহার তাঁর *রোকেয়া-জীবনী*-তে লিখেছেন, 'রোকেয়ার সঙ্গে দেখা হইলে প্রায়ই অনুযোগ করিতেন—"তোমাকে আর কত বলিব ? বি. এ. পরীক্ষাটা শেষ না করিয়া কেন যে ফেলিয়া রাখিয়াছ জানি না।" আনন্দের বিষয় এই যে মৃত্যুর বৎসরেই তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিন তাঁহার চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেহ হয় নাই।'[১৪]

বেগম রোকেয়া সুফিয়া কামালকে 'ফুলকবি' বলতেন। তিনি বলতেন, কেবল কবিতা লিখলে তো হবে না, 'সমাজের কাজ করতে হবে।' এই সংকলনে আমরা সুফিয়া কামালকে রোকেয়া যুগের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চেয়েছি। তিরিশের দশকশেষে তিনি একজন পরিণত সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তখন তিনি নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, অবরোধের বেড়াজাল অনেকখানি ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। এছাড়া, ততদিনে যে শিক্ষিত, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ একটু একটু করে আকার ধারণ করছিল, সেই সমাজের নারী-পুরুষ ও তাদের সম্পর্ক তাঁর গল্পে স্থান করে নিচ্ছিল। *কেয়ার কাঁটা*-র গল্পগুলিতে নাগরিক সম্পর্কের একটা ইঙ্গিত আমরা দেখতে পেয়েছি।

*সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনেরও একান্ত ইচ্ছা ছিল যে বাঙালি মুসলমান সমাজের নারী পুরুষ যত দূর সম্ভব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, প্রতিবেশী হিন্দুদের মতন, ব্রাহ্মদের মতন। শুধু এই আশায় তিনি

ফজিলতুন নেসার উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতযাত্রার ব্যবস্থা করতে এতটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেদিন ফজিলতুন নেসার জন্য তিনি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন, সেদিন তাঁকে কিছু গোঁড়া মুসলমান যুবক আক্রমণ পর্যন্ত করেছিল এবং পরদিন রক্ষণশীল কাগজগুলিতে তাঁর নামে কুৎসা রটিয়েছিল।[১৫] তবু তিনি পিছপা হননি। সমাজের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূর করার জন্য এই লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে। নজরুলের জন্য তিনি *সওগাত*-এর প্রাঙ্গনে বিশেষ আসন পেতে দিয়েছিলেন। নাসিরুদ্দীনের মনের ইচ্ছা যেন নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা।' নাসিরুদ্দীনের কথা, নজরুলের কথা এই সংকলনে বার বার এসেছে, মুসলিম নারীজাগরণের সঙ্গে তাঁরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিলেন বলেই।

নাসিরুদ্দীন সাহেব তাঁর মেয়ে নূরজাহান বেগমকে নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এবং সফলও হয়েছিলেন। আজও নূরজাহান বেগম তাঁর বাবার দেখানো পথ ধরেই হেঁটে চলেছেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও। সেই ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে তিনি আমাদের বলেছিলেন, কেমন করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন চার দশক ধরে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের একটি 'সাখাওয়াত গ্রুপ' তৈরি হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৯ সালে কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক সোনিয়া নিশাত আমিন লিখেছেন : 'The Lady Brabourne College of Calcutta was founded mainly–but not exclusively–for Muslim girls. . . This gave institutional form to the struggle for women's educational rights.'[১৬] ব্রেবোর্ন কলেজের স্থাপনাকে এক অর্থে রোকেয়া যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী—স্ত্রীশিক্ষা—এর স্বীকৃতি হিসেবে মনে করা যায়। আমাদের দেয়া সাক্ষাৎকারে ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, হামিদা খানম, বলেছেন : 'চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের কলেজে আসাটা আমাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। হস্টেলে যারা থাকছে, তারা কিন্তু কলকাতার মুসলমান নয়, সারা বাংলার। ফজলুল হক সাহেব বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ করেছিলেন।'[১৭]

মুসলমান মেয়েদের স্কুল কলেজে বেশি সংখ্যায় আসা, অবরোধ কিছুটা ভেঙে যাওয়া, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের একটু একটু করে নানা পেশা গ্রহণ করা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—এসব নিঃসন্দেহে সাফল্যের সূচক। কিন্তু, একই সঙ্গে কি চল্লিশের দশক থেকে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লড়াই করার স্পৃহা কিছুটা কমে গিয়েছিল? ১৯৪০-এর পর থেকে বহু ঘটনাবলী বাঙালি সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছিল—মন্বন্তর, দেশভাগের রাজনীতি, হিন্দু মুসলমানের চরম দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক—বাঙালি সমাজে এত বড় পরিবর্তন আসছে দেখেও কেন রোকেয়া, মিসেস এম. রহমান, ফজিলতুন নেসাদের উত্তরসূরীরা এ নিয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছিলেন না? তাহলে কি একথা বলতে হয় যে, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা, কঠোর পর্দা,

বহুবিবাহের যন্ত্রণা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের নারীদের সামনে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, চল্লিশের প্রজন্মের মেয়েরা তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পটপরিবর্তন সেভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন না ? তার কারণ কি এই যে ঐ পটপরিবর্তন তখন আর শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যা বলে প্রতিভাত হচ্ছিল না ?

## সুলতানার স্বপ্ন

শামসুননাহার মাহমুদ বি. এ. পাশ করার পর বেগম রোকেয়া একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : 'আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায় ?. . . যে বাদশাহ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।'[১৮]

'সুলতানের স্বপ্ন' কি নিছক পরীক্ষা পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ? মনে তো হয় না। কিছুদিন আগে নারী-বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িত্রী চিত্রা দেব রোকেয়া প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর 'স্বজাতীয়াদের জন্য' খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন।[১৯] স্বজাতীয়া ? শব্দটায় একটু হোঁচট খেতে হয়। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ এমন একটি সমাজ সৃজনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে 'সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না' ; যেখানে ধর্ম বলতে 'প্রেম ও সত্য' বোঝায় ; যেখানে 'নরনারী উভয়ে একই সমাজদেহের অঙ্গ—পুরুষ শরীর, রমনী মন' ; যেখানে 'কোঁদল করিবার অবসর' মেলে না ; যেখানে 'নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে' না ; যেখানে মানুষ 'অতল জ্ঞান সাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ' করে, 'দুই দশ বিঘা জমির জন্য রক্তপাত' করে না।

সত্যিই কি আর এমন দেশ সৃজন করা যায় ? যায় না বুঝি ; তবু অবরুদ্ধ জানানায় বসেও যাঁরা এমন স্বপ্ন দেখার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁদের আর—মুস্তাফা সিরাজের ভাষায়—'শীতল ঔদাসীন্য' নিয়ে উপেক্ষা করি কেমন করে ?

কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮ মৌসুমী ভৌমিক

## তথ্যসূত্র

১. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)। বইটির 'সূচনা'-য় (পৃ. ৮) গোলাম মুরশিদ লিখেছেন : 'এ-গ্রন্থে বস্তুত ভদ্রলোক পরিবারের, বিশেষত ব্রাহ্ম পরিবারের মহিলাদের কথাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলা এবং তাহেরন নেসা ও রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মতো স্বল্প সংখ্যক মুসলমান মহিলার মতামতও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে. . .'

২. গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)। তাহেরন নেসা সম্পর্কে লেখকের মতামত : 'তাঁর পরিচয় অথবা পটভূমির কথা কিছুই আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর একটি রচনা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক হিসেবে রয়ে গেছে। তখন যে মুসলমানরা, এমন কি, ব্যতিক্রম হিসেবে দু-একজন মুসলমান মহিলাও, ধীরে ধীরে শিক্ষার দিকে সসংকোচে এগিয়ে যাচ্ছিলেন,. . .।' রোকেয়া প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ মূলতঃ তাঁর নারীবাদ নিয়েই আলোচনা করেছেন।

৩. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, (কলকাতা : স্ত্রী, ১৯৯৫), পৃ. সাত

৪. গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৫. আর্চডিকন পার্নেলের 'হারমিট' কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন আজিজন্নেসা (কলকাতা : ১৯০৬)। এর আগে তাঁর *ইসলাম প্রচারক*-এর কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। আনিসুজ্জামানের *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) থেকে জানছি যে তিনি *নবনূর*-এও কবিতা লিখতেন। আরও আলোচনার জন্য দ্র. সোনিয়া নিশাত আমিন, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939*, Leiden; New York; Koln : 1996, পৃ. ২২, ২১৭

৬. ফয়জুন্নেসা এবং রহিমুন্নেসার ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. 'প্রেক্ষাপট', এই সংকলন, পৃ. কুড়ি-একুশ ; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৭৭-১৭৯ ; সোনিয়া নিশাত আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫-২১৭

৭. ১৯১৯ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে তুরস্কে একটি বড় রকমের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয় মুস্তাফা কামাল পাশা (কামাল আতাতুর্ক)-এর নেতৃত্বে। ব্রিটিশ-সমর্থিত গ্রীকদের পরাস্ত করে এবং সুলতানের রাজতন্ত্র হটিয়ে ১৯২৩-এ তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৯২৪-এ ধর্মগুরু খলিফাকে উৎখাত করেন। *সওগাত* ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে 'কামালের তুরস্ক' প্রবন্ধে লেখা হয় : '. . . এক কথায় একদা দুর্বল তুরস্ক আজ নব বলে বলীয়ান হইয়া প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রসমূহের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইল।... তুরস্কের আকস্মিক সংস্কারকার্য্য সম্যক বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় অনেক সমালোচক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, নব-জাগ্রত তুরস্ক আজ যে ধর্ম্ম

*মানিয়া চলিতেছে বস্তুতঃ তাহা ইসলাম ধর্ম্ম নহে। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা বিচারশক্তির* অভাব হইতেই উদ্ভুত। বর্ত্তমান তুরস্ক প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মোল্লাদের প্রভাব বিনষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু ইসলামের মৃত্যুহীন বাণীকে অস্বীকার করে নাই।. . . ধর্ম্মীয় বর্ম্মকেই একমাত্র আরাধ্য মনে না করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্মস্থলের সন্ধান পাইয়াছে। তাই আজ নারীর মর্য্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে, বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের গোড়াপত্তন হইয়াছে।' ১৯২১-২৮ বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্‌র শাসনাধীন আফগানিস্থানে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় নানা ধরনের আধুনিকীকরণ প্রকল্প গৃহীত হয়, বিশেষ করে মেয়েদের অবরোধের বাইরে নিয়ে এসে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৯২৮-এ আমানুল্লাহ্‌কে সরিয়ে দিয়ে সে দেশে মোল্লাদের নেতৃত্বে কট্টর ইসলামিক শাসন জারি হয়। আমানুল্লাহ্‌র পারজয়ে *সওগাত*-এ লেখা হয় : 'জাগ্রত এসিয়ার অদৃষ্টগগনে যে কয়টি দীপ্ত সূর্য্যের উদয়ে প্রাচ্য জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছিল, তাহার একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বোধহয় চিরদিনের জন্য রাহুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আফগানিস্থানে আশার আলো নিবিয়া গিয়াছে।' (৫ মাঘ ১৩৩৬)

৮. গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৯. স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান। প্রথম উপন্যাস *দীপনির্বাণ* প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ। *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৯), *বিরোধ* (১৮৯০), *স্নেহলতা বা পালিতা* (১৮৯২, ৯৩)-এর পর প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *কাহাকে ?* (১৮৯৮)। এটি *The Unfinished Song* নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন ১৮৮৫-১৯০৫, ১৯০৯-১৯১৫।

১০. রাসসুন্দরী দেবী (১৮১০— ?), *আমার জীবন*, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬। বাংলায় লিখিত প্রথম আত্মজীবনী হিসেবে স্বীকৃত।

১১. কৃষ্ণভাবিনী দাস, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫।

১২. দ্র. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, 'গ্রন্থপঞ্জী', *অন্দরে অন্তরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯-২৩৮

১৩. মহারাষ্ট্রের পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী (১৮৫৮-১৯২২), উনিশ শতকশেষের এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার অন্যতম প্রধান প্রগতিশীল চিন্তাবীদ, লেখক, সমাজসংস্কারক ছিলেন। ১৮৮৮-তে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ *The High-Caste Hindu Woman* সারা দেশে এবং বিলেত ও আমেরিকায়ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর নারীর বেদ-উপনিষদজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি কলকাতায় আইনজীবী বিপিন বিহারী দাসকে বিয়ে করেছিলেন, ১৮৮২-তে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরে যান। এহেন একজন নারীর প্রভাব রোকেয়ার উপর পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শামসুননাহার একটি লেখা লিখেছিলেন পন্ডিতা রমাবাঈকে নিয়ে, *আন্নেসা* পত্রিকার কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায়।

১৪. শামসুন নাহার, *রোকেয়া-জীবনী*, (কলকাতা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৮), পৃ. ৯২

১৫. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৪), পৃ. ৫৮৮-৫৯২
১৬. সোনিয়া নিশাত আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. xiii
১৭. দ্র. এই সংকলন, পৃ. ২৮৮
১৮. শামসুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
১৯. চিত্রা দেব, 'শেখার আগ্রহ অনেকেরই ছিল, সুযোগ ছিল না', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

# কেন আমি *জানানা মহ্ফিল*-এ

*জানানা মহ্ফিল*-এর কাজ করার সময় ঢাকায় প্রায়ই আমি কতগুলো ঝাঁঝালো প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলাম। সেগুলো হচ্ছে : কেবল বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের লেখার সংকলন কেন আমরা করছি ? এটা ভয়ানক সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু লেখিকাদের কেন অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না ? এ ধরনের বই বার করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি।[১] প্রথম প্রথম এসব প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়ে যেতাম। শত চেষ্টায় মুখ থেকে একটাও যুৎসই জবাব বেরোত না, যা দিয়ে প্রশ্নকারীদের ঘায়েল করা যায়। উল্টো আমিই আমার ওপর দোষারোপ করছিলাম। ভাবছিলাম, পশ্চিম বাংলায় কারও এ কাজে দায়বদ্ধতা থাকতে পারে, এটা তাদের ঐতিহাসিক দায় হতে পারে, তার ভেতর আমি কেন ?

দেশভাগের আগে সেই কোন কালে বাঙালি মুসলমানদের না-হয় অবহেলিত হওয়ার বড় রকমের একটা অভিযোগ ছিল, এ নিয়ে মর্মপীড়া, অভিমানও কম ছিল না তাদের। গোটা উনিশ শতকের চোখ ধাঁধানো রোশনাইয়ের তলায় সংখ্যাগুরু মুসলমানরা এতখানি আঁধার-ঢাকা ছিল যে, ভিনদেশী কেউ যদি ভুল করে মন্তব্য করতেন, তৎনকার বাংলায় একজনও মুসলমান ছিল না—সেটাও বোধ করি মারাত্মক ভুল হতো না। কিন্তু আজ এতদিন পরে, '৭১ পেরিয়ে এসে, পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি স্মরণ করে, মুসলমান বাঙালি লেখকদের লেখা নিয়ে আলাদা বই প্রকাশের দাবি বা ইচ্ছা, আর যা হোক বাংলাদেশের সেক্যুলার বাঙালির হতে পারে না।

এপারের ওপারের বাঙালি মাত্রই আমরা জানি, বাংলাদেশ শিল্প সংস্কৃতির দিক দিয়ে এখনও কলকাতা-মুখাপেক্ষী। আনন্দ, দে'জ, আজকাল কি প্রতিক্ষণ একটা বই প্রকাশ করল তো ঢাকার বিপনীকার সঙ্গে সঙ্গে সেটি দোকানে তোলেন। আর পাঠক তো চাতক পাখী, কলকাতার বৃষ্টি-জল আকণ্ঠ পান করে তবে তার তৃষ্ণা মেটে। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় এমনও সিরিয়াস বই-পড়ুয়া আছেন, যারা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাম শোনেননি। এ নিয়ে ঢাকার বিদ্বৎসমাজের হয়ত রুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। কারণ, যখন দরকার হবে আপনিই তারা পড়বে, বিলম্বের মাসুল দিতে হলেও।

কিন্তু এ বাংলার ঐ বাংলার—বলা ভাল সারা পৃথিবী জুড়ে নারীর কর্ম-কীর্তি ধুয়ে মুছে ফেলার ব্যাপারে দারুণ একটা মিল রয়েছে। একাজে তারা একে অন্যের ওপর টেক্কা দিয়ে চলেন। *জানানা মহ্ফিল* মুসলমানি লেবাস নিয়ে প্রকাশিত হলেও বিস্মৃতির অতলে চালান করে দেয়া বেশ কজন লেখিকা এতে ঠাঁই পেয়েছেন। তাঁরা অবিভক্ত বাংলার অবহেলিত মানুষ। মুসলমান বলে যতটা না, তার চেয়ে বেশি নারী হিসেবেই। একজনের একটা লেখা হয়ত ঢাকার বাংলা একাডেমী পাঠাগারে পাওয়া

গেল না, খোঁজো কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। তারপর দেখা গেল, সেটি জরা-জীর্ণ দেহে সিলেট কিংবা মুর্শিদাবাদের কোনও অখ্যাত পাঠাগারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। লেখা যদিও মিলল, লেখকটি কে ? অর্থাৎ কী তাঁর পরিচয় ? তিনি কোথায় কবে জন্মালেন, মারা গেলেনই-বা কখন ? অবরোধ অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে মিটিমিটি আলোতে যিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন ? কী রকম ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ? চার দেয়ালের চৌকো পরিসরে গণ্ডিবদ্ধ ছিল যাঁর পৃথিবী, তিনি লেখার প্রেরণাই-বা পেলেন কোথায় ! অবরোধের অন্ধকার গর্ভগৃহে এবার হাতড়ে হাতড়ে খোঁজো তাঁকে। আমাদের পরম সৌভাগ্য *জানানা মহ্‌ফিল* -এর কয়েকজন বিস্মৃতপ্রায় লেখিকার উত্তরসূরী তাঁদের কীর্তি এবং স্মৃতি আগলে এখনও বেঁচে আছেন।

এই একগুচ্ছ লেখিকার মধ্যে ছোটবেলায় সুফিয়া কামালের কবিতা এবং স্বয়ং রোকেয়া আমাদের পাঠ্য ছিল। রোকেয়া প্রসঙ্গে সেখানে লেখা ছিল, তিনি চুপিচুপি মোমের আলো জ্বালিয়ে রাত জেগে লেখা-পড়া করতেন। যে সময়টায় লোডশেডিংয়ের অজুহাতে পড়াশোনার বাহুগ্রাস থেকে আমরা আপ্রাণ মুক্তি চাইতাম, তখন একজন নারী কেন রাত জেগে—তাও আবার চুপিচুপি এবং মোমের আলোয় পড়তেন, তার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। পাঠ্যবই-প্রণেতা হর্তা কর্তা বিধাতাগন এই তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি ঘোমটা দেয়া, ফুলহাতা ব্লাউজ পরা, ভারি বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রোকেয়ার ছবি ছাপিয়ে আমাদের যেন ভয় দেখাতেই চাইতেন।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর 'চাষা' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি হচ্ছে : 'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা/ দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা/দধীচি কি ইহার চেয়ে সাধক ছিল বড় ?/ পূণ্য অত হবে নাকো সব করিলেও জড়।' স্কুলের কোনও এক ক্লাসে এই পঙক্তিমালার ভাবসম্প্রসারণ আমাদের করতে হতো। কার ভাবসম্প্রসারণ করে আমরা পরীক্ষায় নম্বর পাচ্ছি, তখনও জানতাম না। মনে হয়, স্কুলটিচারদেরও এই কবির নাম জানা ছিল না। এভাবে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী নাম-পরিচয় হারিয়ে আমাদের পাঠ্যবইয়ে জায়গা পেয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি শামসুননাহার হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলাম। নজরুল সাহিত্য পড়ার সূত্রে আমার জানা ছিল, হবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুননাহার দুই ভাই-বোন, যাঁদের নিয়ে কবি নজরুল কবিতা বেঁধেছিলেন, 'কে তোমাদের ভালো ?/বাহার আন গুলশান গুল্ নাহার আন আলো।' ব্যাস এটুকুই।

শামসুননাহার হলের গা ঘেঁষে রোকেয়া হল। ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার মৃত্যুদিনে বছর বছর মিলাদ মহ্‌ফিল হতো সেখানে। অজু করে ঘোমটা দিয়ে মেয়েরা তাতে শরিক হতেন। আমরা উঁকি দিয়ে, মিলাদ শেষে আলখাল্লা পরা লম্বা দাড়ির মওলানা সাহেবের রোকেয়ার রুহের মাগফেরাত (আত্মার শান্তি) কামনা করা দেখতাম।

ঠিক সেই সময় বিদ্যাপীঠের বাইরে ঢাকায় নারী সংগঠনগুলো নেকাব খুলে খোলা আকাশের নিচে রোকেয়াকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সময়টা আশির দশকের মাঝামাঝি। ততোদিনে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে হয়ে গেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী

সম্মেলন। ঢাকায় রোকেয়ার ওপর কয়েকটা গবেষণাধর্মী বই,[২] এবং 'অবরোধবাসিনী' ইংরেজিতে অনুবাদও হয়ে গেছে।[৩] দেখতে দেখতে রোকেয়ার র‍্যাডিকাল রচনার অংশবিশেষ চয়ন করে অনেক অনেক পোস্টার লেখা হলো। '৮৮ সালে সামরিক রাষ্ট্রনায়ক এরশাদ বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' জারি করে। তার প্রতিবাদে রোকেয়ার ছবি ও বাণী সম্বলিত পোস্টার প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে নারীরা রাজপথে নামলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিপীড়নের বিরুদ্ধে রোকেয়া সেদিন আমাদের কণ্ঠে ভাষা যুগিয়েছিলেন।

নব্বইয়ের দশকে রোকেয়াকে নিয়ে বিকল্প ধারার প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।[৪] ওঁকে নিয়ে বানিজ্যিক ছবি করার কথাও শোনা যাচ্ছে। মোট কথা রোকেয়া এখন বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির মূলধারায় আপাদমস্তক ঢুকে পড়েছেন। তারপরও কে কীভাবে রোকেয়াকে দেখাচ্ছে, কে কী দরে তাঁর মূল্য হাঁকাচ্ছে সেসব কথা থেকেই যায়। এ ব্যাপারে শুদ্ধবাদী, নারীবাদী কারোরই এখন করার কিছু নেই। যার যার মত-পথ-সুবিধে-সামর্থ অনুযায়ী রোকেয়াকে তারা ভাসাচ্ছে, ডোবাচ্ছে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরাও একাজে পিছিয়ে নেই। হয়ত এই ঘোলাজলের ঘূর্ণাবর্ত থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে রোকেয়া একদিন ঠিকঠাক বেশে উঠে আসবেন। তার জন্য আমাদের কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

দিনে দিনে রোকেয়া আলোয় আলোয় যত উদ্ভাসিত হচ্ছেন, তত বেশি করে এক সুফিয়া কামাল ছাড়া বাদবাকি তাঁর সমসাময়িক কনিষ্ঠ লেখিকারা সেই পাদপ্রদীপের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছেন। একথা সত্যি যে তিনি নতুন যুগের প্রবর্তক এবং একাই তার কাণ্ডারী। তাঁর সহযোগী মাঝি-মাল্লার ভূমিকায় আরও আরও নারীও তো ছিলেন, যাঁরা হাতে হাল তুলে নিয়ে প্রতিকূল স্রোত ঠেলে ঠেলে তাঁর সঙ্গে তীরের মাটি ছুঁতে চেয়েছিলেন! সে সময় রোকেয়ার পক্ষে যে সকল নারী কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস এম. রহমান অন্যতম ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নিজস্ব ঢং-এ রোকেয়া-উদ্ভাবিত নারী-বিষয়ে লিখে লিখে রোকেয়ার মতধারায় নাব্যতা এনেছিলেন। সেদিনের নারীজাগরণ-বিমুখ পাঠকের আস্থা অর্জনে রোকেয়া-অনুসারীদের এই পুনরাবৃত্তির ভূমিকাও কম ছিল না। *জানানা মহ্ফিল*-এর বেশ কজন লেখিকা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম-এ কাজ করেছেন, এমনকি রোকেয়ার মৃত্যুর পর এবং দেশভাগের সময় পর্যন্ত। রোকেয়ার দীর্ঘজীবিতার যে বেদী আজকের বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে, তার কোথাও কি সে সব লেখিকা বা নারী-আন্দোলনকারীদের নাম থাকতে নেই?

বাংলা একাডেমীর জীবনীগ্রন্থমালা সিরিজের ২২০ জন লেখক বুদ্ধিজীবীর পাশে *জানানা মহ্ফিল*-এর চার জন লেখিকা জায়গা পেয়েছেন। এই ভাগ্যবতীরা হচ্ছেন, নূরন্নেছা বিদ্যাবিনোদিনী, এম. ফাতেমা খানম, শামসুননাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা। রোকেয়া সাখাওয়াৎ, সুফিয়া কামাল এই প্রকল্পের আওতায় না এলেও, তাঁদের জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, এ নিয়ে আক্ষেপ করার কিছু নেই। ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটিতে ১১ বছরেও রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী,

মিসেস এম. রহমান, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, খায়রন্নেসা, ফজিলতুন নেসা জায়গা পেলেন না। ভবিষ্যতে পাবেন কিনা জীবনীগ্রন্থমালার প্রকাশক এবং আমরা, কেউ এখনও জানি না। খায়রন্নেসার, মিসেস এম. রহমানের জীবন বৃত্তান্ত এখন এত দুষ্প্রাপ্য যে, বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ চাইলেও তাঁদের ওপর একটি গোটা বই লেখার জীবনীকার হয়ত খুঁজে পাবেন না। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন ঘরের কোণে বসে গদ্য-পদ্য লেখা স্বল্পায়ু মানুষ। বয়সকালে পক্ককেশে সভা সমিতি করে সশরীরে নিজেদের জানান দেয়ার আয়ুই তো তাঁরা পেলেন না। বাংলা একাডেমী কিংবা অন্য কোনও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছে, তাঁরা কতখানি প্রকাশযোগ্য, কে জানে!

কিন্তু ফজিলতুন নেসার প্রসঙ্গে এসে আমাদের বড় ধরণের একটা হোঁচট খেতে হয়। তিনি মারা গেছেন ১৯৭৫ সালে এই ঢাকা শহরেই। ইডেন কলেজে লেখা-পড়া করেছেন। এম. এ. ডিগ্রিটাও তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর তো ইডেনের প্রিন্সিপালই ছিলেন। জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য এক্ষেত্রে তথ্যের অভাব এখনও পর্যন্ত হওয়ার কথা নয়। তার ওপর তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রী। ফলিত গনিত-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় নারীদের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বোরকা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে ইঁট পাটকেলও খেয়েছেন। একা একা উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত গেছেন। এতসব ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা মাইল-ফলকের, তিনি কেন বাংলা একাডেমীর জীবনীগ্রন্থমালায় এখনও জায়গা পেলেন না, এ প্রশ্ন কেবল আমাদের না, অনেকের।

নারীদের জীবনীগ্রন্থ যে কখানা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে নারী হিসেবে তাঁরা কে কত 'ভাল' ছিলেন, সেটা দেখাতেই জীবনীকাররা প্রাণপাত করেছেন। ফলশ্রুতিতে ভাল ভাল গুণপনা মিলেমিশে নারীরা হয়ে উঠেছেন একে অন্যের যমজ বোন। কী আদব কায়দায়, কী স্বভাব চরিত্রে। রক্তমাংসের ব্যক্তিমানুষটিকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। এই জনমনতুষ্ট পদ্ধতিতে আর যা হোক ফজিলতুন নেসার জীবনী লেখা যাবে না। তাঁকে না ফেলা যাবে মুসলমান আদর্শ নারীর খোপে, না বাঁধা যাবে আদর্শ ভারতীয় নারীর ছকে। প্রথার বাইরে যে বেপরোয়া জীবন তিনি যাপন করে গেছেন, তার সবটা ঝেড়ে ফেলে দিলে কয়েক পৃষ্ঠার জীবনপঞ্জি হতে পারে, জীবনীগ্রন্থ হবে না। তাই হয়ত আমাদের জীবনীকাররা, প্রকাশকেরা ফজিলতুন নেসাকে কালের ভয়াল স্রোতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরা পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজছেন।

সবশেষে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার দেখা সেই মানুষটিকে, যিনি *জানানা মহ্‌ফিল*-এর ভেতরের নারীদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মৃত্যুর পরও পরম স্নেহে, গভীর মমতায় তাঁদের লালন করে গেছেন। তিনি *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন।

ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৮ শহীন আখতার

## তথ্যসূত্র

১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ : বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। এটি মূলতঃ ইসলাম ধর্মচর্চার কেন্দ্র।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩) ; মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য,* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৬৮) ; মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

৩. Rowshan Jahan, ed. and transl., *Inside Seclusion : The Abarodhbasini of Rokeya Sakhawat,* ( Dhaka : Women for Women. 1981)

৪. মানজার হাসীন মুরাদের ছবি, *রোকেয়া* । নির্মাণকাল ১৯৯৫-৯৬।

## আগের পাতার চিত্রসূচী

ওপরে বাঁদিক থেকে, ঘড়ির কাটা অনুসারে : শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া এন. হোসেন (কামাল), রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, ফজিলতুন নেসা, এম. ফাতেমা খানম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

# বেগম রোকেয়ার নারীবাদ ও বাস্তবতা
## ১৮৮০-১৯৩২

সাহিত্যিক ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ১৯৩৭ সালে রোকেয়ার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তাঁর জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে লিখেছিলেন, 'আশ্চর্য বিষয় এই যে, এই প্রেরণা [বাঙালি জাতির জাতীয় প্রেরণা] এমন করিয়া একজন নারীকেই আশ্রয় করিয়াছে—বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মা ও বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে একটি নারীপ্রতিমা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী চরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না ; কারণ বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে।'[১]

মোহিতলাল রোকেয়ার জীবনী পড়ে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছিলেন তা হলো : (১) তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মা ও বিবেকবুদ্ধি ; (২) সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু নারীদের থেকে রোকেয়া প্রাগ্রসর ; (৩) তিনি একজন খাঁটি বাঙালি। রোকেয়া সাখাওয়াৎ ছিলেন একাধারে লেখক ও সমাজকর্মী। তাঁর লেখালেখি, স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং নারী সংগঠন পরিচালনা, সমস্ত কাজই ছিল অন্যোন্য নির্ভর। নারীজাগরণের মতো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

আমাদের এই সংকলনে আমরা রোকেয়ার পরিচয়ের ব্যাপ্তি অথবা বহুমুখিনতা, কিছুই পুরোপুরি ধরতে পারিনি। বিশ শতকের প্রথম চার দশকের বাঙালি মুসলিম নারীদের মূলতঃ নারী-বিষয়ক লেখা যেখানে আলোচ্য বিষয়, সেখানে আমরা রোকেয়ার পরিচিতি তাঁর সেই সব লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি, যে লেখার ভিত্তিতে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন শতকসূচনায় গোটা শতাব্দীর নারীমুক্তির পথনির্দেশকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ, নারীজাগরণের কালোত্তীর্ণ লেখিকা রোকেয়া এখানে আলোচ্য বিষয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি রোকেয়ার সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের পাঠক-গবেষকদের প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের জমিদার পরিবারে। বাবা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ

করে মেয়েদের বাংলাশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শোনা যায়, তখনকার সামাজিক চাপই নাকি তাঁর এই গোঁড়ামির কারণ। রোকেয়া বড় বোন করিমুন্নেসা আর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের সহযোগিতায় বাংলা ও ইংরেজি শেখার সুযোগ পান। এছাড়া তাঁর আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষাও জানা ছিল। শৈশব থেকেই কঠোর পর্দায় বড় হয়েছেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ কখনও পাননি। আনুমানিক ১৬ বছর বয়সে বিহারের অধিবাসী বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। ১৯০৯ সালের ৩ মে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াৎ মারা যান। আর রোকেয়া মারা যান ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, ৫৩ বছর বয়সে। এই হলো রোকেয়া সাখাওয়াতের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত।

রোকেয়ার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করে নারীজাগরণের পক্ষের তখনকার পুরুষরাও বুঝতে পারছিলেন না, তাঁদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত। ১৯০৫ সালে *মতিচূর* প্রকাশের পর মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এবং সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন : 'মতীচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। . . . এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতীচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। . . . লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতীচূর প্রকৃত মতীচূরই বটে।'

উক্ত সমালোচনায় লেখকদ্বয় আরও লেখেন, 'সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতীচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।'[২]

উল্লেখ্য যে, রোকেয়ার 'চাবুক-মারা' লেখাগুলি বেশির ভাগ *নবনূর*-এ প্রকাশিত হয়। এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন উক্ত সমালোচকদ্বয়ের একজন, সৈয়দ এমদাদ আলী। শুধু তাই নয়, 'আমাদের অবনতি' *নবনূর*-এর ১৩১১ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর, এই পত্রিকার আশ্বিন, কার্তিক সংখ্যায় পর পর প্রতিবাদ ছাপা হতে থাকে। প্রতিবাদের ভাষা ছিল এরকম : 'নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।'[৩] অন্য আরেকটি লেখায় নওশের আলী খান ইউসুফজী লেখেন, 'পাঠিকাগণ! সত্যই কি আপনারা দাসী? . . . অলংকারগুলি কি সত্যই আপনাদেব দাসত্বের নিদর্শন? . . . পোশাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি, সাধিত হইতে পারিবে না?'[৪] 'আমাদের অবনতি' প্রকাশিত হবার প্রায় ২৪ বছর পর রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'অবরোধবাসিনী' *মাসিক মোহাম্মদী*-তে ১৩৩৫ থেকে ১৩৩৭ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *মাসিক মোহাম্মদী*-র ১৩৩৮ সংখ্যায় জনৈক লেখক লেখেন, 'অবরোধ

প্রথার নিন্দা করিতে যাইয়া মাননীয়া লেখিকা কতকগুলি অপকথার অবতারণা না করিলেই বোধ হয় পাঠিকাগণ বেশী সুখী হইতেন।'

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোকেয়া তাঁর লেখার জন্য বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। সেই সময়ের 'প্রগতিশীল' পুরুষেরাও তাঁর লেখা অনুধাবনে ব্যর্থ হন। নারীজাগরণ যদিও তাঁরা চেয়েছিলেন, রোকেযার মতো অতোটা জাগরণ বুঝি চাননি। তাঁদের কাছে রোকেয়া ছিলেন সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। নিজের যুগের তুলনায় অগ্রসর চিন্তাশীল কোনও লেখক, তার ওপর তিনি যদি হন নারী, সেক্ষেত্রে তাঁর বিনা চ্যালেঞ্জে পার পাওয়ার নজির বিশেষ একটা নেই। রোকেয়াও পার পান নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পর 'বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা'-য় শিবনারায়ণ রায় লেখেন, 'তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মতিচূর*-এ (প্রথম খণ্ড ১৯০৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২১) তিনি শুধু সমাজের সমালোচনা করেননি, ধর্মবিশ্বাসেও নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর সমকালীন কোন হিন্দু মহিলা এ ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন বলে জানা নেই।'[৫]

১৯০৫ সালে প্রকাশিত *মতিচূর* গ্রন্থে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো 'স্ত্রী-জাতির অবনতি'। সেই সঙ্গে বর্জিত হয মূল প্রবন্ধের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ।

স্বামীর মৃত্যুর আগে ও পরে অনেকগুলো বছর রোকেয়া কিছু লেখেননি। পরবর্তী পর্যায়ের লেখা সম্পর্কে লেখক গোলাম মুরশিদ তাঁর 'প্রথম নারীবাদী বেগম রোকেয়া' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ১৯১৮ সাল থেকে রোকেয়া যখন আবার লিখতে শুরু করেন, 'আগ্নেয়গিরির উত্তাপ' তখন নিভে গেছে, 'অবশিষ্ট কেবল নারীজাগরণের আন্তরিক প্রয়াস।'[৬] এই পর্বের লেখা সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বেগম রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদক জনাব আবদুল কাদির। সম্পাদকের নিবেদনে তিনি লিখেছেন, 'এ-কথা ভাবতে আমার স্বতঃই ইচ্ছা করে যে, মার্জিতমনা স্থিতধী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের প্রশ্রয়েই রোকেযা "আমাদের অবনতি" ও "Sultana's Dream" লিখতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং সেরূপ প্রসন্ন পরিবেশের অভাবেই তেমন মুক্তভাবদীপ্ত নির্ভীক চাঞ্চল্যকর রচনা তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী থেকে আর নির্গত হলো না।'[৭]

রোকেয়ার জীবনের দুই পর্বের লেখা ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রন্থভুক্ত করা হলো। সেই সঙ্গে রয়েছে নানান সময়ে বিভিন্নজনকে লেখা রোকেয়ার কয়েকটি চিঠি। কেবল চিঠিপত্রেই ব্যক্তি রোকেয়া তাঁর একাকীত্বের বোধ, শোকসন্তাপ, সমস্যা পীড়ন নিয়ে ধরা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, রোকেয়া সাখাওয়াৎ বিধবা হয়েছিলেন মাত্র ২৯ বছর বয়সে। তারপর শুরু হয় তাঁর একাকী, কঠিন সংগ্রামের দিন। একদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর আগের পক্ষের কন্যা ও জামাতার চক্রান্তে ভাগলপুর (স্বামীর ভিটে) থেকে বিতাড়িত হওয়া, অন্যদিকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল নিয়ে তাঁর আজীবনের সংগ্রাম।

তা-ও একা একা। এই স্কুলটির জন্য তাঁর গলদঘর্ম পরিশ্রম তো ছিলই। সেই সঙ্গে জীবনযাপনেও আপোষকামী হতে হলো তাঁকে। এক ধরনের অবগুণ্ঠনের আড়ালে রোকেয়া সারাটা জীবন কাটালেন। *সওগাত* সম্পাদক নাসিরুদ্দীনের স্মৃতিচারণে দেখা যায়, তিনি অনাত্মীয় পুরুষদের দেখা দিতেন না, কথাবার্তা সারতেন পর্দার আড়ালে বসে।[৮] এই নিয়ম তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছিল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিকে মৌলবাদীদের কোপানল থেকে বাঁচাবার জন্য। তারপরও আমরা তাকে আড়াল ভেঙে অন্তরঙ্গ হতে দেখি কিছু কিছু ব্যক্তিগত চিঠিতে। বেগম রোকেয়া এমনই কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে, পাবনাবাসী সিনিয়র পুলিস ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইয়াসীনকে।

রোকেয়ার সন্তান-সন্ততি ছিল না। বোনের মেয়ে নুরীকে তিনি নিজের কাছে রেখে বড় করছিলেন। সেও সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে পড়ার সময় মাত্র বারো বছর বয়সে মারা যায়। সেসময় চাচাতো বোন মোহসেনা রহমান (মোনা)-কে লেখা একটি চিঠিতে রোকেয়া তাঁর বিবাহিত জীবনের অপূর্ণতা ও সন্তানহীনতার কষ্ট প্রকাশ করেছেন।

রোকেয়া অবিভক্ত ভারতবর্ষের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। স্কুলের ছুটিছাটায় সুযোগ পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন। পাহাড় যেন তাঁর তীর্থ ছিল। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সিদ্দিকার সঙ্গে লতিফের কারসিয়ঙ্গে দেখা হয়েছিল। জীবনের শেষ বছরগুলিতে ক্লান্ত রোকেয়া বার বার ঘাটশিলায় ফিরে ফিরে গেছেন। মৃত্যুর আগে সেখানে অবসরজীবন যাপনের জন্য তাঁর একটি বাড়ি বানানর কাজ চলছিল।

শ.আ.

# স্ত্রীজাতির অবনতি[১]
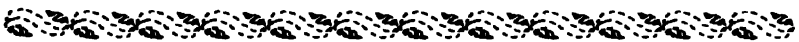
পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন?—কারণ আছে।*

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্থলে আমরা ধর্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না—কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি ? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল ! ক্রমে পুরুষ-পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদেব বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,—প্রকারান্তরে পুরুষের—দাসী হইয়াছি ! ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন ; "The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and silliness, * * * Such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun.)

(ভাবার্থ—স্ত্রীজাতীর অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই--[কোন বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। * * * নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার !" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল্-আকেল" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreason-able) বলিয়া থাকেন। আমাদের এ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশে জামাতা খুব আদরণীয়—এমন কি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া

উঠিলেন।* আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল! ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তার" এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

---

* "Although the Japanese wife is considered only the *first servant* [of] *her husband*, she is usually addressed in the house as the honorable mistress. Acquaintance with European customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women" (Japan.)

ভাবার্থ- (যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয়া গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে, এখন ইউরোপীয় রীতি-নীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ রমণীব অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।)

"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইযাছেন, তবে ওবূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি মুড়কীর শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয। পত্নীটি রন্ধনেব পব "স্বামী" কে যে একমুঠা-আধপেটা অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কি চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন?

হ্যাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে "দাসী" বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন। যাহাকে অর্থ দ্বারা "ক্রয়" করা হয়, তাহাকে "ক্রীতদাসী" ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাশবিক্রয়ের কথা, কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে "বর বিক্রয় হয়" এরূপ বলে না। বিশেষতঃ বরের পাশই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোন গুণ বা 'পাশ' থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়। একদা কোন সম্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?" তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা-ব্যাচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে ক'রলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে ক'রবে।"

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোন দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এইজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্য অবশ্যপালনীয়।

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে ; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল।* তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি ! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না ! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে ! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন ! ! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন। অতএব দেখিলেন ভগিনী ! আপনাদের ঐ বহুমুল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? আবার মজা দেখুন তাঁহার দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা !

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে ! তাই দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই ! অভ্যাসের কি অপার মহিমা ! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্বে স্ফীতা হই !

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন ! বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী"

---

* পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শামস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন "নথ নাকেল-এর (নাকাদড়ীর)-ই রূপান্তর।"

নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে !! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখান বইত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরের দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন ? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে।* এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে ? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo) কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন ? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা হয়, তাহাই কি কম নিন্দনীয় ? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে ? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব" ! কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ"। অর্থাৎ 'হে বীরগণ ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না।' আমাদের পোষাক পরিলে তাহাদের অপমান হয় ! দেখা যাউক সে পোষাকটা কি—কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড শাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি ? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladies's jacket' শুনা যায়, "Gentlemen's jacket' ও শুনিতে পাই ! তবে "জামা-এ-জানাঁ" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবতঃ রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া—ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি ! ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদের সুখের সামগ্রী আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন ?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই ; কিন্তু ভ্রাতঃ ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার ! সত্য বস্তু—কবিতা নহে—

* অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

"কাব্য উপন্যাস নহে—এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে—ইহা প্রকৃত ভবন—"

তাই যা কিছু মুস্কিল !! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয় বিহ্বলা—" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Acrial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে ; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা উই-এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন—

"কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি,"

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ। বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি !! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে ? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।*

---

* সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলের) একখানা উর্দু কাগজে দেখিলাম ঃ—

তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন, যে "চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটি এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ—

(১) প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না। (যেহেতু "অবলাগণ" নগর রক্ষা করিবেন।)

(২) সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সেপাহী হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।

ব্যাঘ্র ভাল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসুলা, জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই। এমন কি অনেকে মূৰ্চ্ছিতা হন। একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সমান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে

---

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

(৪) অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা উর্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্নমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।" দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কি উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন "মুসলমানী পুঁথির" পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই—(যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

"জয়গুন নামে বাদশাহ্‌জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার" ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডী কেরানী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূৰ্চ্ছা যাইবেন না ত?

(পর্দার অনুরোধে ?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুল্‌হিন্‌বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার। শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।
২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।
৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।
৬। চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাসার্ধ চারি ইঞ্চি!* পরিহিত পা-জামা বেচারা সল্‌মা চমুকির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত!

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন ? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে ; ইহার কারণ ত্রিবিধ—(১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফ্‌শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুম্‌কি বসান হইয়াছে, ভ্রূযুগল চুম্‌কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয় ? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখী শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালিন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি

---

* কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়! ওজন এক ছটাক!!

আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক-পরলোক—উভয়ই নষ্ট"। যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ীর একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাবদিহি (explanation) দিবে?" সে বলিল, 'আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়'—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা-ফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝলি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না-পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "*স্ত্রীশিক্ষা*" শব্দ শুনিলেই "*শিক্ষার কুফলের*" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"!

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটীভ খ্রীস্টিয়ান হয় ত মনে করিবেন যে, রমণীয় জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ। যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।*

* পরন্তু ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের বিশ্বাস যে, Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যীশুখ্রীস্ট

যাহা হউক "শিক্ষার" অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal) ; কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি ; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার ! দেখিলেন, ভগিনি ! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে ! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব ?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ী পরিষ্কার রাখিস !" দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে রাখিল—কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ী ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ীর দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে ? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশী হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন ?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি,

---

আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "Through woman came curse and sin : and through woman came blessing and salvation also." ভাবার্থ—নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে। পুরুষ খ্রীস্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যীশু খ্রীস্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

"ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবন হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সুচির্ক বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভুত্ব সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।* ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই :

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি ; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে জানি ; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি!!** (এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত, কোন ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ["but nevertheless it (Earth) does move"]!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনুদিত হইল :

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি

* বঙ্গীয় কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

** সমাজের সমঝদার (reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু "unreasonable" অবলাসরলাগণ (যাঁহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা) শতমুখী ও আঁইস-বঁটির ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল"!

কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে!

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা* লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়,তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?**

---

*আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র আমরা সমাজের কন্যা! আমরা ইহা বলি না যে, "কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।" বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।"

**কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক-প্রজা থাকিতে জমীদার কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকর ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরানী ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়—সেখানে শীত নাই,—গ্রীষ্ম নাই, কেবল চির বসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকতলতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে!! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডী-ভাইসরয় হইবার কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্যে উপমা দিব?

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন ? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যেকাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২। অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার ? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না ? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull hcad) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে ? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে ? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এবিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

---

আবার ইহাও বলি, লেডী-কেরানী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডী-কেরানী বা লেডী-ব্যারিস্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে "স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-বক্তা, স্ত্রী-চিকিৎসক, স্ত্রী-রাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম—সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

## 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের বর্জিত অনুচ্ছেদ[১০]

আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন—রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার, মস্তক চূর্ণ হইয়াছে! অবশ্য এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শুনিতে পাই : 'প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম।' সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়!

শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন : 'ঘুমা শিগ্‌গীর ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!' ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেইরূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : 'ঘুমাও ঘুমাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গাম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়।

তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুণি ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু এবং কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন

আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। (পাদটীকা ঃ 'একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কি ?') যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।

কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন ?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে ; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

*নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২১৬-২১৮

## সৃষ্টিতত্ত্ব[১১]

সেদিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, জিন, পরী ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন, কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন ! মিস্ ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এক কোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কিনা, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল, তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিসের শব্দ হলো ?"

"বলতে পারি না। কিছুদিন হ'লো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙে কোন বাড়ীর ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙ্গা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল ! আমাদের এ উলু খাওয়া ভাঙ্গা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন-ল্টেন এসে পড়েনি ত ? জানালা খুলে দেখুন না ?"

মিসেস্ বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগ্‌গির !"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, "যে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলবে কি করে ? তাছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন !"

"আচ্ছা, আমি জানালা খুলে দেখছি",—বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবা মাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গেই মস্ত এক উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের ত চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্বাক ! আমরা চীৎকার করিয়া বাড়ীময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নিস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ময় মনুষ্য-মূর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য অনেক সময় অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্তি বলিলেন,—

"বৎসে ! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ ? আমি অভয় দিতেছি, কোন ভয় নাই।"

শিরীন। সেদিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি ?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ীর কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ত টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্তি। (সতেজ) না, মা ! আমি সে সব কিছু নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি।

"ত্বস্তি" নাম শ্রবণ করিবা মাত্র বীণা ও ননী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় "নারীসৃষ্টি" লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বস্তিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, "অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে "ধূলি" না বলিয়া "পদকর্দম" বলিতে হয় !) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

ত্বস্তি। কারণ ? (আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা !

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, "মহাত্মা বলেন কি, আমি ?"

ত্বস্তি। হ্যাঁ, তুমি ! তুমি আমার নারী-সৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কি ; কতক দোষ "সওগাত" আফিসের।

ননী। সে কি রকম ?

ত্বস্তি। তাহা এই :— ইনি "নারীসৃষ্টি" লেখাটা "সওগাত" নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না : আফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইঁহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা-অভাবে রচনা স্থল বিশেষ দুর্বোধ হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ! তখন তাঁহারা বলেন, "ডাক ব্যাটা ত্বস্তিকে, ইহার

কোথায় কি ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক !" তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন ; কতকগুলি যুবক "সত্যগ্রহ" ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, "সত্যগ্রহ" ছাড়িয়া "মিথ্যাগ্রহ" গ্রহণ কর। কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। "মিথ্যাগ্রহণ" না করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিল বাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ীর অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জান, "চোর না শুনে ধরম কাহিনী।" রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদাজল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া "মিথ্যাগ্রহণ"-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেক্‌চার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান ; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন ! রাত্রি ১২টা-১টা পর্যন্ত উকিল বাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যা হোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি. আই. ডি.আছে : কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এত রাত্রে উকিল বাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টি ভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব ! বাতায়নের লোহার গরাদে আছে যে !

ত্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদে। বিশেষতঃ আমাকে আটকায় কে ?

ননী। দেব ! আপনি কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতুহল হয়।

ত্বস্তি। না, বাছা ! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,) মারো—

ত্বস্তি। (সচকিতে) সে কি ? কাহাকে মারিবে ?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ত্বস্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি ?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরাণী ডাকিতে গেলেন। উহার চাকরাণীর নাম "মারো" !*

---

* বেচারী চাকরাণীর সুন্দর "মরিয়ম" নামটি বিকৃত হইয়া "মারো"তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ

ত্বস্তি। তোমরা নেহাৎ ছাড়িবে না, তবে আর কি করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি, উকিল বাবুদের চেয়ে কম নও ! তাঁহারা তবু আইন-কানুনের দোহাই মানে, তোমরা কিছুই মান না। শুনিলে ত তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননি, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেব ! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যাণ্ডের তিনশত শব্দ লিখিতে পারি।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা ত্বস্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা ত্বস্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনও বা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন ; আবার কখনও চক্ষুমর্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন ! একবার তিনি গর্জনস্বরে বলিলেন,—

"জান বৎসেগণ ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোন বস্তুই ছিল না, সুতরাং আমাকে কোন দ্রব্যের গন্ধ, কোন বস্তুর স্বাদ এবং কোন পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল,—হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি, হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দুলের সমস্ত নখর লইয়াছি, মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজন-কালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম। পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি। বাছা ! তুমি তাহাই লিখ।"

বীণা লিখিলেন (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

ত্বস্তি। বৎসে ! মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় তুষার খণ্ড,—এমন কি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ, বীণা ?

---

করিয়াছিলাম। যথা—"হাশো, "লাতো", "দল্লু", "উল্লু", "জুব্বা" ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনীও ত্বস্তিদেবের মত ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, "হাশমত আরা", "লতিফুন্নেসা", "দৌলতন্নেছা", "অলিউন্নেসা" এবং "জোবেদা"।

বীণা কাগজ দেখাইলেন—(তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Vesuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

"জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার-মূর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ।"

আবার পর মুহূর্তেই (অবশ্য "পার্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রভাব")—

"সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
আ-খণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।"

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা স্বস্তি বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমন কি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক ওদিক না হয়।"

বীণা। তাহাই হইবে, আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে—এখন ত কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে!

অতঃপর স্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কি জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি তখনও সোফায় বসিয়া, গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজী রাখিয়া ঘুমাইতেছেন! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

# অবরোধবাসিনী[১২]

## ভূমিকা

"অবরোধ-বাসিনী" লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু পাক-ভারতের অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বারংবার এই কথাই মনে পড়ে,—আমরা কোথা হইতে

আসিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছি ! যে মুসলিম সমাজ এককালে সমস্ত জগতের আদর্শ ছিল, সেই সমাজের এক বিরাট অংশ এখন প্রায় সমস্ত জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

কোথায় বীরবালা খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "অবরোধ-বাসিনী" পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

সর্বশেষে লেখিকাকে এই সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাই। "অবরোধ-বাসিনীর" প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আবদুল করিম (বি.এ., এম.এল.সি.)

## নক্সা ১২

পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শাশুড়ী ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুডী ও স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা--সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনস্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন : আ রে ! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে !—প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে, এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে।

## নক্সা ২৯

একবার আমি কোন একটি লেডীজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা কিছু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন—"আর বলিবেন না—এই বোরকা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে !" পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এই :—

তিনি কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোরকা-সহ) দেখিবা মাত্র সেখানকার ছেলেমেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পালাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাহাকে সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে

বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চিৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থর থর কাঁপিত।

তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে বোরকা-সহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ও মা! ওগুলো কি গো?" একে অপরকে বলে, "চুপ কর!—এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে বোরকার নেকাব একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত—"দেখ্ রে দেখ্! ভুতগুলার শুঁড় নড়ে! বাবা রে! পালা রে!

তিনি এক সময় দার্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম স্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে—বামনটা উচ্চতায় একটা ৭-৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োঃপ্রাপ্ত যুবকের, মুখ-ভরা দাড়ী গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে। দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকা-ধারিণীকে দেখিতে লাগিল!

অতঃপর দার্জিলিং পৌঁছিয়া তাঁহারা আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ রিক্‌শ গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলেন। 'মেলে' গিয়া দেখিলেন, অনেক ভীড়; সেদিন তিব্বত হইতে সেনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভীড়। তাঁহার রিক্‌শখানি পথের এক ধারে রাখিয়া তাঁহার কুলিরাও গেল—তামাসা দেখিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখেন, দর্শকেরা সকলেই এক একবার রিক্‌শর ভিতর উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে।

তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই একটা পার্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার-শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে!*

একবার তাঁহার পরিচিতা আরও চারি পাঁচজন বিবির সহিত বেড়াইবার সময় একটা ক্ষুদ্র ঝরণার ধারে কঙ্করবিশিষ্ট কাদায় সকলেই বোরকায় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকটবর্তী চা বাগান হইতে কুলিরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের তুলিল; আর স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলিল, "একে ত জুত্তা পরেছ, তার উপর আবার ঘেরাটোপ—এ অবস্থায় তোমরা গড়াইবে না ত কি করিবে?" আহা! বিবিদের কারচুবি কাজ করা দো-পাট্টা কাদায় লতড়-পতড়, আর বোরকা ভিজিয়া তর-বতর!

কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিত—"চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়—ঐ! ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা!!"

---

* বাঙ্গালী ও গুর্খায় প্রভেদ দেখুন; যৎকালে বাঙ্গালী ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইত, সে সময় গুর্খাশিশু আত্মরক্ষার জন্য ঢিল তুলিয়াছে সে ভয়াবহ বস্তুকে মারিতে।

## নক্সা ৩৮

আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, "বাবা! আপনাদের—মুসলমানদের বাড়ী গেলে আমাকে যা নাকাল হতে হয়! না পাওয়া যায় সময়মতো একটু গরম জল, না পাওয়া যায় এক খণ্ড নেকড়া!"

একবার তাহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে, বউ-বেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতে বেদনা নহে—প্রসব বেদনা। তিনি এখন কি করেন ? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এতদূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শহরতলী—পাড়া গ্রামের মত স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা পাল্কী পাওয়া যায় না।

কোন প্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাতে রোগিণীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে বাড়ীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন ? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, "পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কি বলিতাম ? তোবা ছিয়া! মর্দুয়াকে ও-কথা বলিতাম কি করিয়া ? আপনি কেমন ডাক্তারণী যে, লোকের কথা বুঝেন না ?"

## নক্সা ৩৯

সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন ; সেই জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচী-কর্ম করিতে থাকিবে—নড়িবে না। এমন কি দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন বিকালে উঠোনে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে চালে ঠেকান একটা ছোট মই আছে। তাহেরার (সেই বালিকা) মনে কি হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া এক হেচকা টানে নামাইয়া দিলেন।

তাহেরা পিতার অতি আদরের একমাত্র কন্যা—পিতার আদর ব্যতীত অনাদর

কখনও লাভ করে নাই ; কখনও পিতার অপ্রসন্ন মুখ দেখে নাই। অদ্য পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ও রূঢ় হেচকা টানে সে এত অধিক ভয় পাইল যে, কাঁপিতে কাঁপিতে বে-সামাল হইয়া কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল !

অ-বেলায় স্নান করাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া এবং অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সেই রাত্রে তাহেরার জ্বর হইল। একে বড় ঘরের মেয়ে, তায় আবার অতি আদরের মেয়ে, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর সদর জেলা হইতে সিভিল সার্জন ডাক্তার আনা হইল। সেকালে (অর্থাৎ ৪০-৪৫ বৎসর পূর্বে) ডাক্তার ডাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার সাহেবের চতুর্গুণ দর্শনী, পাল্কী ভাড়া, তদুপরি বত্রিশজন বেহারার সিধা ও পান তামাক যোগান—সে এক বিরাট ব্যাপার।

এত যত্ন সত্ত্বেও তৃতীয় দিনেও তাহেরার জ্বর ত্যাগ হইল না। ডাক্তার সাহেব বেগতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল ! (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

## নক্সা ৪৭

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে :

"কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন।"

প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর বাস প্রস্তুত হইল। পূর্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী, মেম সাহেবা মিস্ত্রিখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার। "না বাবা। আমি কখনও মোটরে যাব না।" বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল,—বাসের পশ্চাতে দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরা না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ি পৌঁছান হইল। চাকরানী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ি বড্ড গরম হয়,—মেয়েরা বাড়ি যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটরে পাঠাবার সময় উপরোক্ত মেম সাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙিন কাপড়ের পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি ছাত্রীগণ স্কুলে আসিলে দেখা গেল,—দুই তিনজন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই চারিজনে বমি করিয়াছে, কয়েকজনের মাথা ধরিয়াছে, ইত্যাদি। অপরাহ্নে মেম সাহেবা বাসের দুই পাশের দুইটি খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আপনাদের মোটর বাস ত বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে, আলমারি যাচ্ছে নাকি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়। আমার ভাইপো এসে বললে, 'ও পিসিমা ! দেখ, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।' তাই ত, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কি করে ?"

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে চারি-পাঁচজন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, "আপকা মোটর ত খোদা কা পানাহ্। আপ লাড়কীয়ো কো জীতে জী কবর মে ভর রহি হয়।" আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিলাম, কি করি, এরূপ না হইলে ত আপনারাই বলিতেন, 'বেপর্দা গাড়ি।' তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তব কেয়া আপ জান মারকে পর্দা করেঙ্গী ? কালসে হামারী লাড়কীয়াঁ স্কুল মে নেহী আয়েঙ্গী।" সে দিনও দুই তিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরানীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটরবাসে আসিবে না।

সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানা-রহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজি চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন, "Brother-in-Islam." বাকি তিনখানা উর্দ্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ি বেপর্দা করে। যদি আগামীকল্য পর্যন্ত মোটরে ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিছ' 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন, এরূপ বেপর্দা গাড়িতে কি করিয়া মেয়েরা আসে।

এ তো ভারি বিপদ,—

"না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ !"

রাজার আদেশে এমন করিয়া আর কেহ বোধ হয় জীবন্ত সাপ ধরে নাই। অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষ হইতে বলিতে ইচ্ছা করিল,—

"কেন আসিলাম, হায় ! এ পোড়া সংসারে,<br>কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে।"

# চিঠি

১

86/A, Lower Circular Road
Calcutta
30-4-31

পরম স্নেহাস্পদা মোনা,[১৩]

করুণাময় আল্লাহ্‌ তোমাদের মঙ্গল করুন . . .।

এবার গেল নুরী।[১৪] নুরী যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের কাছে মাফ চেয়ে গেছে। সকলকে আদাব লিখতে বলে গেছে।

ভগিনী! আমার আশা নৈরাশ্যের কথা আর কি বলব! আমি ত জানিই যে, —"জীবন এমন ভ্রম কে জানিত রে?"

* * *

ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরাগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দূর্গ প্রাকারে।

আহা! "কেয়া টিড্ডি, কেয়া টিড্ডি কা রান!" কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার আবার আশা ভরসা! সুতরাং যে কয়দিন বেঁচে আছি খাই দাই—আরাম করি, হাসি খেলি, বাস! আর যদি পারি ত', প্রাণ-ভরে একটু আল্লাহকে ডাকি। তা' ছাই ডাকতেও ত পারি না। আমার মত দুর্ভাগিণী, অপদার্থ বোধ হয়, এ দুনিয়ায়, আর একটা জন্মায় নি।

শৈশবে বাপের আদর পাই নি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম—তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। সুতরাং নুরী আর আমাকে বেশী কি কাঁদাবে? সে ত বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুণছি।

তোমার স্নেহের
আপা

২

14. 12. 31
1, Nripendra Lodge
Ghatsila P.O.
Singhbhum
B.N.Rly.

স্নেহাস্পদা ভগিনী,[১৫]

পরম করুণাময় আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। . . . এখন এখানে বেড়াইবার বড় আরাম। ধান কাটা হইয়াছে, সেই সব ক্ষেতের নরম খড়ের উপর হাঁটিতে কি মজা। প্রাণ ভরিয়া হাঁটিয়া বেড়াই। একা হাঁটিতে ভাল লাগে না, কেবল আপনাদের মনে পড়ে।

আপনি কোলের মেয়েটিকে আর রশীদাকে সঙ্গে লইয়া ভাই সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া যদি দুই চারিদিনের জন্য বেড়াইয়া যান তবে কি মজাই হয়। মানুষের জীবন দুঃখ ও সংগ্রামে ভরা, তারই মধ্যে দুই এক দিন একটু হাসি খুসি পাওয়া যায়, তাহাই গণিমত [যথেষ্ট]। বাক্যকালে একটি গান শুনিয়াছিলাম :

"হেসে লও, দু'দিন বই ত নয়,
আছে ত জীবন ভরা দুঃখ!"

ঘাটশীলা আমাকে যেন তাহাই বলিতেছে :

"হেঁটে লও, দু'দিন বই ত নয়,—
আছে ত কলিকাতার বন্দী-খানা!"

তাই বলি, আপনারা আসিয়া দুই চারদিনের জন্য আনন্দ দিয়া যান। আপনাদের জলপাইগুড়ির বাংলার তুলনায় আমার এ বাসাটুকু একটা গোহাল ঘর বিশেষ।

আমার ঘাটশীলা—লীলা সম্বরণের আর অধিক দেরী নাই। আল্লাহ্ চাহে এই মাসের ৩০শে তারিখে দিনের ১২টার গাড়ীতে রওয়ানা হইব। সুতরাং ২৯শে তারিখ হইতেই ল্যাজ গুটাইতে (অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করিতে) হইবে।

আপনার পত্রের আশায় রহিলাম. . .আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন।

আপনার স্নেহের আপা
রোকেয়া

৩

13, European Asylum Lane
Calcutta
10-9-13

Dear Sir,[১৬]

Many thanks for your very kind letters, received yesterday. These letters worked like some medicine which I required for my soul. Sometimes we yarn to tell somebody of our sorrows and difficulties. I hope you will come to Calcutta soon. I would like to tell you some of my. . .

৪

1.10.13

(page 3)

I could not finish this letter yesterday, so I take up the writing again today. Fortune and misfortune are seldom in our hands, and not very often, as you say. Failure of a bank, for instance, can never be under one's control, but at the same time the poor depositor has to suffer the consequence for no fault his own. We may very well advise the depositor not to mind his loss ! But who is to meet his unavoidable expenses ? We cannot expect a hungry person to be satisfied and happy. Can you ?

No. I am not unfortunate provided this school works well and I can achieve my literary talents. Only the other day I became very happy when I won the first prize in a rhyme-competition. There were some under-graduates & graduates and above all some English lady graduates too among the lady competitors. I enclose herewith a copy of my composition, which. . .

৫

11.3.14

Dear Sir,

I got your letter dated the 18th, yesterday evening. I am sorry you did not get my last letter.

I am really very sorry to learn that you are not keeping well. Life is short, what is the use of pining over this & that ? Human life does not always find smooth paths, but still I think a gentleman of your position need not be disheartened with life. After all, life is a very valuable thing and should not be wasted for nothing.

It is a pity you feel so lonely. But I fear your selection was not correct in choosing an ill-fated person like me whose life has been "lost in misadventure", to write to.

Since two months I am suffering from some kind of fever–the fever is not much as the temp. never rises above 100 but I have become very weak. The weakness seems almost unbearable. I dread pen and paper; don't like even reading. I attend school with great difficulty : speaking to the girls tires me so much that many a time I let them have their own ways. I would very much like to write a nice letter to you but unfortunately I am unable to do so now.

More after hearing from you. Let me assure you that your letters are always welcome : so please write to me as often as you please. It was very kind of you to select me out to your so many friends; I feel honoured—rather proud of it, though I fear I do not deserve it.

Yours very truly
R.S. Hossein

৬

19.4.14

My dear Sir,

I am so thankful to you for your very kind letters dated the 19th & 31st March respectively. Your kind enquiries about me overjoyed me so much that I could not help addressing you as "my dear Sir" and I hope I did no wrong in doing so. You are such a good friend, may God bless you with long life and prosperity. I am so helpless and friendless; even my nearest relatives are so heartless that they do not hesitate in trying to deprive me of my daily food ! In this state of affairs friends like you and Mr Ahmed Ali (the Secretary of our School) are blessings of heaven.

Dear friend ! Kindly pray to God to save me from my relatives.

Well, I must stop talking rubbish now. Our prize distribution has been postponed to the end of this month.

I do not get fever now but am dreadfully weak. I look 15 years older than my actual age ! I will consult a lady doctor again tomorrow.

Yes, the Prize distribution of Suhrawardi Purdanashini (পর্দানশিনী) Madrassa is over. Have you read all the correspondene and note in the "Mussalman" and "Comrade"?

Yes, God is sufficient for those only, who know how to rely on Him. The difficulty is, that we do not know how to stick to Him. In my opinion I won't care for anything else even if God were not sufficient !

The person about whose death Taifur & Baizid wrote to me was a first . . .

৭

86A, Lr. Circular Road
Calcutta
23-7-15

Dear Sir,

I owe you some apology for not replying to your kind letter earlier. I thought you would be in Calcutta soon & that I should get an opportunity of telling you everything in detail.

I sent a copy of our Annual Report & Syllabus for your kind perusal. It took a long time & botheration to get the Report printed. I hope one will excuse this unnecessary delay remembering that we are Mohamedans and the job was done by a Mohamedan Press !

I cannot understand why you want to resign your post. Do you find the dept. very wicked ? This world as a whole is wicked but the presence of some people like you is necessary to make oasis in this desert.

Hoping this will find you & yours in good health & spirit.

Can Zeenat smile now ? She will have to learn many things.

Sincerely yours
R.S.Hossein

## তথ্যসূত্র

১. শামসুন নাহারের *রোকেয়া-জীবনী* বইয়ের আলোচনা, *সওগাত*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪-এ প্রকাশিত।
২. 'গ্রন্থসমালোচনা', *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১২
৩. এস. এ. আল্-মুসাভী, 'অবনতি প্রসঙ্গে', *নবনূর*, আশ্বিন ১৩১১
৪. 'একেই কি বলে অবনতি ?', *নবনূর*, কার্ত্তিক ১৩১১
৫. *পুরোগামী*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
৬. *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৬
৭. 'সম্পাদকের নিবেদন', *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী , ১৯৮৪), পৃ. (১৬)
৮. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ( ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫), পৃ. ৫৩৫-৫৩৭
৯. *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১১ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি 'আমাদের অবনতি' নামে ছাপা হয়। ১৩১২ সালে *মতিচূর* প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় মূল রচনার পরিমার্জিত রূপ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামে ঐ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
এই প্রবন্ধের পাদটীকা সব রোকেয়ার রচনা।
১০. 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের অনুচ্ছেদ ২৩-২৭। এই প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্র. 'প্রস্তাবনা', বর্তমান সংকলন, পৃ. ১৯
১১. প্রথম প্রকাশ *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৩২৭, 'পুরুষ-সৃষ্টির অবতারণা' নামে। প্রবন্ধের পাদটীকা রোকেয়ার রচনা।
১২. প্রথম প্রকাশ *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্ত্তিক ১৩৩৫, ভাদ্র ১৩৩৬, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৭। পাদটীকা রোকেয়ার রচনা।
১৩. চাচাতো বোন মোহসেনা রহমান
১৪. রোকেয়ার বোনঝি ; সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ার সময় মারা যায়। রোকেয়া তাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করছিলেন।
১৫. অবিভক্ত বাংলার অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন, খানবাহাদুর তোসাদ্দক আহমেদ ছিলেন রোকেয়ার মুষ্টিমেয় শুভাকাঙ্ক্ষী, পরামর্শদাতার অন্যতম। তাঁরই স্ত্রী বেগম তোসাদ্দক আহমেদকে লেখা এই চিঠি।
১৬. চিঠি ৩-৭ পাবনা জেলার এক পদস্থ পুলিস অফিসার, মোহাম্মদ ইয়াসীনকে লেখা। আমরা গোলাম মুরশিদের বইয়ে এই চিঠির সন্ধান পেয়েছি।*রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*-তে তিনি লিখেছেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯) : '১৯১৩ সালে সাঈদা নামে তাঁর [মোহাম্মদ ইয়াসীনের] একটি কন্যাকে বেগম রোকেয়ার স্কুলে ভর্তি করতে চান। তখনও এই স্কুলের কোনও ছাত্রীনিবাস ছিলো না। অথচ এই কন্যাকে অন্য কোথাও রাখার মতো জায়গাও মোহাম্মদ ইয়াসীনের ছিল না। . . . [মেয়েকে] ভর্তি করাতে পারুন অথবা নাই পারুন, বেগম রোকেয়ার সঙ্গে মোহাম্মদ ইয়াসীনের আন্তরিক বন্ধুতা জন্মে।'

# শিক্ষাব্রতী খায়রন্নেসা

গ্রন্থভুক্ত লেখিকাদের মধ্যে খায়রন্নেসা খাতুন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এমন একজন মানুষ, যাঁর জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ উদ্ধারে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অথচ তিনি ছিলেন একাধারে নারী-শিক্ষার অগ্রদূত, লেখক এবং রাজনৈতিকভাবে তাঁর স্বদেশী পরিচয়েরও আভাস পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকটিতে বহুমুখী ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই যে তাঁর হারিয়ে যাওয়া, সেটা কি কেবল তিনি নারী ছিলেন বলেই? তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৯০ বছর পর এ প্রশ্নের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে আমাদের উপায় নেই। কারণ যে কোনও ক্ষেত্রেই একজন নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্মৃতি-প্রবণতা দেশ-কাল ভেদে লক্ষ করা যায় এবং এখন তা একটি চর্চার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে।[১]

খায়রন্নেসা ১৯০৪ সালে 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' (*নবনূর*, ৮ম সংখ্যা, ২য় বর্ষে প্রকাশিত) প্রবন্ধের পাদটীকায় নিজের সম্পর্কে একটুখানি ইঙ্গিত রেখে গেছেন। সেখানে আমরা দেখি, সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনায় আর্থিক অনটন নিয়ে তিনি উৎকণ্ঠায় ছিলেন। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্। তার প্রায় ২২ বছর পর মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা' প্রবন্ধে (*সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৩) লিখলেন, 'মরহুমা খায়রুন্নেসা খাতুন সাহেবা "সতীর পতিভক্তি" নামে একখানি উপাদেয় নারীগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।[২] ইনি সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার "সতীর পতিভক্তি" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার রচনাশক্তি ও বঙ্গভাষানুরাগের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি তদীয়া পূজনীয় স্বামী মৌঃ আসিরুদ্দিন সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থখানা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা যে মুসলমান সমাজে কতকটা আদৃত হইয়াছে, তাহা উহার চতুর্থ সংস্করণেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকর্ত্রী সাহেবা অকালে পরলোকগমন করায়, আমরা তাঁহার নিকট হইতে আর কোন গ্রন্থ পাইতে পারি নাই।'

*সতীর পতিভক্তি* যে সে সময়ের মুসলমানদের কাছে 'আদৃত' হয়েছিল, তার একটি ছোট্ট নমুনা আমার পরিবারের একটি ঘটনা থেকেও পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার নানা এই বইটি কিনে এনে পড়েছিলেন। এবং খায়রন্নেসার বইটি পাঠে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর প্রথম সন্তান, অর্থাৎ আমার বড় খালার নাম রাখলেন খায়রন্নেসা।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দিনের *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (১৯৬০ সালে

প্রকাশিত) গ্রন্থে খায়রন্নেসা সম্পর্কে ছোট্ট একটি লেখা রয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে, খায়রন্নেসা রচিত *সতীর পতিভক্তি* নামক একখানি আখ্যাপত্রহীন পুস্তক তিনি এক বন্ধুর সৌজন্যে উপহার পেয়েছেন। এবং 'এই পুস্তকখানায় মাত্র ৬৮ পৃষ্ঠা রহিয়াছে।' *সতীর পতিভক্তি* সম্পর্কে অধ্যাপক মনসুরউদ্দিনের আলোচনার অংশবিশেষ হচ্ছে : 'গ্রন্থকর্ত্রী এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন "আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন একটি মুসলিম মহিলা, আর কখনও কোন পুস্তকাদি লিখি নাই। কিন্তু যখন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়ত্রী ছিলাম, তখন সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতাম।"[৩]

'যদিও খায়রুন্নেসা [খায়রন্নেসা] নিজেকে বিদ্যাবুদ্ধিহীনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তৎসত্ত্বেও তাঁহার রচনার মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। লেখিকা যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পুত্র পরিজনের লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। লেখিকা গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল আবহাওয়া ও সমাজে বাস করার জন্য তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা বর্তমান কালপোযোগী ও প্রগতিপূর্ণ নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থে যে পরিবেশ ও চিন্তার খোরাক পাওয়া যায় তাহা প্রগতিবাদীদেরও কাজে লাগিবে। গৃহধর্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি যে ফিরিস্তি দিয়াছেন তাহা ভূয়ো দর্শনের ফল বহন করে :

(১) স্ত্রীলোকের হীনাবস্থাই সমাজের অধঃপতনের মূল।
(২) যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা দুঃখ পায় সেই পরিবার ত্বরায় উৎসন্ন যায়।
(৩) স্ত্রীলোক কেবল সন্তানের প্রসূতি নহেন, সকল সৎকার্যের প্রসূতি।
(৪) যে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট সে পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত।
(৫) স্বামীকে গৌরবজনক বিবিধ মহৎ কার্যে অনুপ্রাণিত করাতে মর্যাদাবতী স্ত্রীর গৌরব প্রকাশ পায়।'

২৫ জানুয়ারি ১৯৯৬ বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা *ইত্তেফাক*-এ 'খায়রননেসা [খায়রন্নেসা] খাতুন/আরেক বেগম রোকেয়া' নামে সৈয়দ আবুল মকসুদের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই লেখার সূত্রে আমরা পরিচিত হই সাংবাদিক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের সঙ্গে।[৪] তিনি ছোটবেলায় খায়রন্নেসার নাম শুনেছিলেন তাঁর বাবার মুখে। কারণ তাঁর দাদা, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা যান, তিনি খায়রন্নেসার সমসাময়িক স্কুলশিক্ষক ছিলেন। খায়রন্নেসা ছিলেন যমুনার ওপারের হোসেনপুর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, আর সৈয়দ আবুল মকসুদের দাদা তখন পদ্মার এপারের মানিকগঞ্জের তেওতা স্কুলের শিক্ষক। তারপর '৭৯ সাল নাগাদ খায়রন্নেসার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে আবুল মকসুদ সাহেব সিরাজগঞ্জের কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন।

আমাদের দেয়া মকসুদ সাহেবের সাক্ষাৎকারে (১০ অক্টোবর ১৯৯৭, ঢাকায় গ্রহণ করা) তখনকার মুসলমান সমাজ ও মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জের (এখন জেলা) অগ্রসর ভূমিকা প্রেক্ষাপটে রেখে খায়রন্নেসা খাতুনের একটি সম্ভাব্য আদলই কেবল ধরা পড়েছে। কেননা গোটা চিত্রটি রচিত হয়েছে লোকমুখে শোনা কথা থেকে এবং

তাঁরাও শুনেছেন খায়রন্নেসার সমসাময়িক কারও কারও কাছে। মকসুদ সাহেব বলেন: 'আমার দাদা সৈয়দ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ মানিকগঞ্জের তেওতা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই স্কুলটি ছিল মানিকগঞ্জ জেলার প্রথম দুটি হাইস্কুলের মধ্যে একটি। স্কুল প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন কিরণশংকর রায়, কুমুদশংকর রায়। ওনাদের গ্রাম অরিচা ঘাটের কাছে। খুব বড় জমিদার ছিলেন ওনারা। ঐ স্কুলে গত শতাব্দীর শেষের দিকে, মানে ১৮৯১-৯২ সালে, আমার দাদা শিক্ষকতা করতেন। তখন বাঙালি মুসলমানরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেবল আসছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কজন কবি সাহিত্যিকও আমরা পাই।

'গত শতাব্দীর শেষের দিকে তো বলতে গেলে সেক্যুলার যে একটা ট্র্যাডিশন বাঙালির, সেটা তখনও গড়ে ওঠেনি। একদিকে হিন্দু বাঙালিরা তাদের মতো তারা নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেছেন। অনেক দূর এগিয়ে গেছেন তাঁরা। আর এদিকে বাঙালি মুসলমানরা পেছনে পড়ে আছেন। যখন অনেকদূর এগিয়ে গেছেন হিন্দুরা, তখন এক গ্রুপ মুসলমান ভাবলেন, আমাদের কিছু করা দরকার। তাতে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়। আস্তে আস্তে তা-ও হয়, আমরা দেখি গত শতাব্দীর শেষের দিকে। সেসময়ে মুসলমানদের পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল *ইসলাম প্রচারক*, *মিহির ও সুধাকর*, শুধু *মিহির*, শুধু *সুধাকর*। এই যে কাগজগুলো বেরোচ্ছে, এই কাগজগুলোতে মুসলমানরা লেখালেখি করছেন। কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক কথাবার্তাও তাতে থাকছে। একই সঙ্গে হিন্দুদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তার জবাব ছাপা হচ্ছে। বঙ্কিমের *দুর্গেশনন্দিনী*-র প্রতিবাদে ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখছেন *রায়নন্দিনী*। এসব যে বড় রকমের অনৈক্য সৃষ্টি করেছিল, লেখালেখি দেখে মনে হয় না। কারণ সকলেই জানতেন, আমাদের অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ, এরা আমাদের দেশকে পরাধীন করেছে। এ ধরনের একটা অভিন্ন মনোভাব তাঁদের মধ্যে কাজ করছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষটা সবচেয়ে বেশি শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের সময়। এই বঙ্গভঙ্গ আবার মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ সমর্থন করেননি। তাদের ভেতর ইসমাইল হোসেন সিরাজীও ছিলেন। সিরাজগঞ্জে বাড়ি বলেই ওনার নামের শেষে বসানো হয়েছিল "সিরাজী"।

'খায়রন্নেসার বাড়িও সিরাজগঞ্জে। তাঁর যে কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাই, তাতে মনে হয় তিনি গত শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষকতা শুরু করেন। এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। শুধু তাই নয়, আমি শুনেছি যে উনি মেয়েদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাতেন। তিনি পর্দা না করলেও, ['আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' প্রবন্ধ পড়ে অবশ্য মনে হয় যে উনি পর্দানসীন ছিলেন] যেসব মেয়েদের তিনি পড়াবেন, তারা তো পর্দা করবে। সুতরাং তারা দিনের বেলায় বেরোবে না। তিনি নৈশ বিদ্যালয় এজন্য করেছিলেন যাতে মেয়েরা আসতে পারে। রাতে বেরোলে হয়ত রাস্তায় লোকজনের মুখোমুখি তারা হবে না। তখন তো আট ন' বছরের মেয়েদেরই ঘরের বাইরে বেরোতে দেয়া হতো না।

'হোসেনপুরের স্কুলটা একেবারেই চলতো না। চাঁদা তোলার ব্যাপারে, আমি শুনেছি, খায়রন্নেসা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতেন রান্না করার সময় মুষ্ঠিচাল যেন তারা রাখে। মাস শেষে হয়ত পরিবার পিছে এক কেজি, দেড় কেজি চাল হলো। তাতে কারও ওপর চাপও পড়ল না। এভাবে সংগৃহীত চাল বিক্রি করে স্কুলের জন্য টাকা যোগাড় করেছেন তিনি।

'খায়রন্নেসা ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের। গ্রামকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন কাজ করার জন্য। এবং দেখা যাচ্ছে যে, গোটা পাবনা জেলায় ফরিদপুরের গোয়ালন্দ, মানিকগঞ্জের কিছুটা অংশ, অর্থাৎ পদ্মার এপার-ওপার দুপারেই তাঁর কিছুটা প্রভাব ছিল। শিক্ষার দিক দিয়ে, মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য।

'আপনারা দেখবেন সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। কংগ্রেস অধিবেশন বসেছে সিরাজগঞ্জে। আমি বলতে চাচ্ছি, সেই কংগ্রেস অধিবেশনের আগেই সিরাজগঞ্জ ছিল অগ্রসর। সেই সময়ে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করে খায়রন্নেসা নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। শোনা যায়, সিরাজগঞ্জে সেসময় কংগ্রেসের মিছিলেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। যে কারণে হয়ত মুসলমানদের কাছে অবহেলিতও হন খায়রন্নেসা।

'হোসেনপুর ছিল সিরাজগঞ্জের খুব কাছে, যমুনার গা-ঘেঁষে। স্কুলটা তলিয়ে গেছে যমুনায়। সিরাজগঞ্জ শহরটাও যমুনার ভাঙনে বার বার ভাঙছে। খায়রন্নেসা ১৯০৮ ও ১৯১১ সালের মাঝামাঝি কোনও এক সময় মারা যান। কারণ ১৯০৮ সালে *সতীর পতিভক্তি* যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি বেঁচে। আবার ১৯১১ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যায়, তিনি প্রয়াত বলা হচ্ছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যিনি ভূমিকা রাখলেন, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁর বিশাল ভূমিকা, ১৯০৯ ও তার পরের অনেক পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে আমি খায়রন্নেসার মৃত্যুসংবাদটা কোথাও পেলাম না।'

শ.আ.
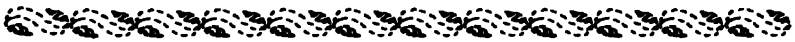
# আমাদের শিক্ষার অন্তরায়

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের (স্ত্রীজাতির) বিদ্যা শিক্ষার জন্য সমাজে বড়ই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অনেক কৃতবিদ্য ও সদাশয় মহাত্মা এ সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন। দেশের সংবাদ পত্র সমূহও এ বিষয়ে নীরব নহেন। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, আমাদের রীতিমত শিক্ষা না হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা নাই। বাস্তবিক কথাটা যে একান্ত যুক্তিসিদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিদ্যাহীন

জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। মূর্খ ব্যক্তি পশুর সঙ্গেই তুলনীয় হইতে পারে। যে বিদ্যা পুরুষকে সৌন্দর্য্যশালী ও গুণবান করে, সে বিদ্যা-রূপ অলঙ্কারে স্বভাবসুন্দরী নারীজাতির রূপ ও গুণগরিমা বর্দ্ধিত হইবে না, ইহা কোন্ কথা? চরিত্রবতী রমনী বিদ্যাবতী হইলে মণিকাঞ্চন-যোগের ন্যায় আরও সৌন্দর্য্যশালিনী হওয়ার কথাই বটে। মলয় পবন পরিমলসহ প্রবাহিত হইলে যে রূপ মানবগণকে অধিকতর সন্তোষ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সুশীলা নারী বিদুষী হইলেও সংসারকে অধিকতর সুখময় করিয়া তুলিতে পারেন। পুরুষ ও নারী উভয় জাতিরই বিদ্যাশিক্ষা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ('ফরজ') তাহা আমাদের হাদিস শরীফেও দেখা যায়; যথা—"তালেব্‌ল এল্‌মে ফরিজাতন্ আলা কুল্লে মোসলেমিন্ ও মোসলেমাত্।" হিন্দু-শাস্ত্রেও নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট বিধান আছে; যথা,—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।' অতএব যেদিক দিয়াই দেখুন না কেন, আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ও আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

ধনী, দরিদ্র, ভদ্র ও অভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হওয়া নিতান্ত দরকার, এ কথা পুরুষ পক্ষের আর বুঝিবার বাকী নাই। আমাদের ভগ্নীগণ মধ্যেও অনেকে এক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থলেও আমাদের শিক্ষার প্রসারণ হইতেছে না কেন? আমাদের শিক্ষালাভে বাধা বিঘ্ন কি, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা সেই সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কেহ কি কখন চিন্তা করিয়াছেন? কই কখন ত কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না! শিক্ষার মূলগত অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন দূর না করিয়া শত সহস্র বক্তৃতা এবং শত শত প্রবন্ধ দ্বারাও কখনও এ শিক্ষার যে বিস্তৃতি হইবে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে? আমাদের শিক্ষার অন্তরায় কি এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যাইতে পারে নিম্নে আমরা সে সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিতেছি।

আমরা মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা মান্য করিয়া চলিতে হয়। করুণাময় জগৎপিতা আমাদিগকে যে গণ্ডির অন্তর্ভূত করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহার সীমা অতিক্রম করিবার সাধ্য আমাদের নাই এবং করাও অবৈধ। হিন্দুর মেয়ে ছেলেদের ন্যায় আমাদের গ্রামান্তরে যাইবার অবাধ অধিকার নাই। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ত অবরোধ প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া অন্য বাড়ীতে যাওয়াই নিষিদ্ধ। সুতরাং উপযুক্ত স্থানে আমাদের উপযোগী বিদ্যালয়ের অভাবই আমাদের শিক্ষাবিস্তার না হওয়ার প্রধান ও প্রথম কারণ বটে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের বঙ্গের মোস্‌লেমসমাজ বড়ই দরিদ্র। অনেকে স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষনের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেই অক্ষম। তাহারা বালকগণেরই শিক্ষার্থে সামান্য ব্যয় করিতে অপারগ; কন্যাগনের কথা ত বহু দূরের! একে স্কুলের অভাব, তাহাতে আবার অর্থের অভাব। অর্থ যতই অনর্থের মূল হউক না কেন, আজকাল বিনা

পয়সায় শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। পুস্তক চাই, শ্লেট চাই, কাগজ কলম চাই ; ইহার উপর স্কুলের বেতন ত আছেই। মুসলমান সমাজে সুরীতি যতই থাকুক না কেন, একটি রীতি আমাদের মধ্যে আজও প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। শিক্ষা-বিষয়ে হিন্দুগণ পরস্পরে যেরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, আমাদের মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশ বিদ্যমান থাকিলেও প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। নিজের উপর ভর করিয়া চলিতে না পারলে মুসলমান বালকের বিদ্যাশিক্ষার সাধ, মূলেই ফুরাইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় দুঃখীর সন্তানদের লেখাপড়া না হইলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। কোন মহাত্মা কষ্টে সৃষ্টে স্কুল খুলিলেও তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি একাকী (তাঁহার অবস্থা সচ্ছল না হইলে) বহন করিতে পারেন না বলিয়া উহাকে ত 'ফ্রি স্কুলে' পরিণত করাই যায় না, অধিকন্তু দশজনের সাহায্য ব্যতীত স্কুলটির স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইতে হয়। ফাঁকা উপাধির লোভে পড়িয়া আমাদের দেশীয়েরা দান করিতে কুণ্ঠিত না হইলেও লোকহিতকর ও পুণ্যকার্য্যে দান করিবার সময়ে তাহাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়! অধুনা এরূপ কর্য্যে দান অতি বিরল।* মুষ্ঠিভিক্ষা করিয়া কেহ এরূপ স্কুল জীবিত রাখিবেন, সেরূপ প্রত্যাশা করাও নিতান্ত অন্যায়। যে কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে আশানুরূপ শিক্ষাবিস্তার ঘটিতেছে না, তাহার কথঞ্চিৎ ইহাতেই সকলের বোধগম্য হইবে। কি উপায়ে আমাদের মধ্যে সম্যক প্রকারে বিদ্যার বিমল আলো প্রসারিত হইতে পারে এখন তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে, এমনকি স্থান বিশেষে প্রত্যেক পাড়ায় আমাদের শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইবে। নগরের বিদ্যালয়গুলিতে সচ্চরিত্রা মুসলমান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা চাই ; এবং সেই স্কুলগুলি এমন স্থানে ও এমনভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে, তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া রমণীগণকে যেন অবরোধপ্রথার মর্য্যাদা হানি করিতে না হয়, এবং পুরুষ মাত্রেরই স্কুল সীমার মধ্যে প্রবেশাধিকার না থাকে। যে সকল বালিকাদিগের বাড়ী বা বাসাবাড়ী স্কুলের নিকটে হইবে, তাহারা দাসী বা চাকরানীর সমভিব্যাহারে অথবা তদভাবে ৪/৫ জন একত্র

---

* সৎকার্যে দান যে অধুনা বিরল, তাহা সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই বিদ্যালয়টি মুন্‌শী মোহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব কর্ত্তৃক ৮/৯ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মুন্‌শী সাহেবের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তথাপি তিনি এযাবৎ স্কুলের অধিকাংশ ব্যয়ই নিজে বহীয়া আসিতেছেন। এই স্কুলের ছাত্রীদিগের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না বরং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে পুস্তক, কাগজ কলমাদি দিতে হয়। এই গ্রামের অধিক লোকই অতিদরিদ্র। তাহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্কুলের বেঞ্চ টেব্‌ল ইত্যাদি অনেক আসবাবের অভাব আছে। সেই অভাবমোচনার্থে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এতদ্দেশীয় রাজা, নবাব, জমীদার ও ধনী মহোদয়গণের নিকট বহুসংখ্যক আবেদনপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি একটিমাত্র পয়সাও পাওয়া যায় নাই। ইহাতে পাঠক মহাশয় বুঝুন, দেশের মতিগতি কোন্ দিকে ছুটিয়াছে।

হইয়া স্কুলে যাইতে পারিবে। যুবতীদিগের পক্ষে প্রকাশ্য স্থান দিয়া পদব্রজে যাতায়াত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের জন্য কোনরূপ যানের বন্দোবস্ত করা চাই, গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে আপাততঃ শিক্ষয়িত্রী না হইলেও তত ক্ষতি নাই। বয়োবৃদ্ধ নিষ্ঠাবান মুসলমান শিক্ষকের দ্বারাই তাহার অধ্যাপনার কার্য্য চলিতে পারিবে। এই শ্রেণীর স্কুল খুলিলে সম্প্রতি যুবতীদিগকে তথায় শিক্ষার্থে প্রেরণ করিতে তাহাদের অভিভাবকগণ রাজি নাও হইতে পারেন, কিন্তু বালিকাদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ আপত্তি হওয়ার কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ যুবতীদিগের শিক্ষা ব্যাপার লইয়া আপাততঃ সমাজকে তত ব্যগ্র না হইলেও চলিতে পারে, মনে হয়। তাহাদের অভিভাবক-(স্বামী বা পিতা, ভ্রাতা যেই হউন) গনই তৎপক্ষে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। বালিকাদিগের উপরেই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং এখন তাহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে পারিলেই আমাদের পরম শ্রেয়োলাভ হইতে পারে।

এইরূপ স্কুল স্থাপন করিলে তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার কে বহন করিবেন, এক্ষণ এই কথার মীমাংসা করা চাই। নগরে অনেক ধনী লোক অবস্থিতি করেন। তথাকার স্কুলের জন্য অর্থের অনটন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছা করিলে একজনেও তদ্রূপ একটি স্কুল চালাইতে পারেন। নতুবা চাঁদা করিয়া চালাইলেও অবাধে চলিতে পারে। পল্লীগ্রামের স্কুল লইয়া যত বিভ্রাট। কারণ, প্রায় গ্রামের অবস্থাই এরূপ যে, তাহাতে দশজন লোককেই স্বচ্ছল অবস্থায় পাওয়া দুস্কর। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দুই চারিটি অবস্থাপন্ন লোক পাওয়া গেলেও তাহারা আবার স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। যে শ্রেণীর লোকের চৌদ্দপুরুষের মধ্যেও কাগজ কলমের সম্বন্ধ নাই, তাহারা কি কখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে? মূলকথা এই যে, অন্য স্থান হইতে কিছু আয় না হইলে, অনেক গ্রাম্য স্কুলই শুধু গ্রামের আয় দ্বারা চলিতে পারে না। প্রাদেশিক মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে কিনা জানি না। এতৎ সম্বন্ধে উহার কার্য্যপ্রণালী জানিবার জন্য স্বতঃই আগ্রহ জন্মে। দেশের ধনাঢ্য, জমিদার প্রভৃতি সমাজের প্রধান প্রবীন মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্না অবলা নারীজাতির শিক্ষা-পথ সুগম হওয়ার নহে। স্ব-সমাজের কল্যাণকামনায় তাঁহারা এ অধঃপতিত নারীজাতির শিক্ষা-বিধানের সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবেন না কি? সুসন্তান পাইতে হইলে সুমাতার প্রয়োজন, তাহাদিগকে একথা বুঝাইতে হইবে কি? যেই মুসলমান একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানের সমুচ্চ শিখরে আরোহন করিয়া ধরাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, আজ সেই মুসলমানেরই মাতৃকুল ঘোর অজ্ঞান তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছেন, এই লজ্জাকর ও শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াও তাঁহারা উদাসীন থাকিবে, ইহা ত সহজ বিশ্বাস হয় না!

*নবনূর*, ৮ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৯০৪

# স্বদেশানুরাগ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজে যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে, ইহাতে আমাদের অধঃপতিত দেশের সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বঙ্গ-বিচ্ছেদ যে এই আন্দোলনের আদি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ প্রত্যেক জেলার গ্রামে-শহরে রাজা, মহারাজা, উকীল, মোক্তার ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই বিরাট সভার আয়োজন করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ পরিকর হইতেছেন যে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিব না। এই সময় তাঁহাদের অন্তঃপুরচারিণীগণের কি করা কর্ত্তব্য এই প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিব।

ভগ্নিগণ, আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও স্বামিগণ যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যে সমস্ত বিষয়ে শরীর ও মন সমর্পণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত বিষয় তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিবার কি কোন অধিকার নাই ? অবশ্য, ইহাতে আমাদের সমান অধিকার আছে ! তাঁহাদের উপযুক্ত সাহায্য না করিলে, তাঁহাদের দুঃখ ও কষ্টে সহানুভূতি না দেখাইলে পিতৃ ও ভ্রাতৃস্নেহের অমর্য্যাদা করা হইবে এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী বা সহধর্ম্মিনী নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই মহাআন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদেরও সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া আমি তোমাদিগকে বিরাট সভার আয়োজন করিতে বলিতেছি না, অথবা বক্তৃতার জন্য টাউনহলে ও রাস্তাঘাটে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছি না। আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে ঘরের এক পার্শ্বে বসিয়াই পুরুষজাতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব। সাহায্য আর কিছু নয়, কতকগুলি বিষয়ে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ভগ্নিগণ, তোমাদের ত্যাগ স্বীকারে যদি মাতৃভূমির উপকার হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি স্বদেশ ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি ভারতে অস্তমিত শিল্পের পুনঃ আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কেন ত্যাগ স্বীকারে বিমুখ হইবে, ও ত্যাগ স্বীকার-জনিত কষ্ট উপভোগে কুণ্ঠিত হইবে ? আইস, আমরাও পুরুষজাতির মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হই। আমরাও সমাজকে দেখাই যে ভারত ললনার দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গলকার্য্য সাধিত হইতে পারে। ভগ্নিগণ, সকলেরই স্মরণ হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় রমনীগণ একদিন কতদূর ত্যাগস্বীকার করিয়া পুরুষজাতির সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের আদি [অতি] আদরের বহুমূল্য রত্নবিজরিত গাত্রালঙ্কার ও সুবর্ণ-খচিত গাত্রাচ্ছদন বিক্রয় করিতে এবং ছিলাবন্ধন জন্য শিরোশোভন কেশচ্ছেদনে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ আমরা সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব ? আজ আমরা যদি পুরুষজাতির পার্শ্বানুচারিণী হইয়া তাঁহাদিগকে এই সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে বিমুখ হই তবে কি আমাদের নারীজাতির উপর বিধাতার কোন অভিসম্পাত পড়িবে না ?

ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী সাড়ী পরিত্যাগ করি ;

বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ইত্যাদি ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেণ্ডারের পরিবর্ত্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী-সু পায়ে দিয়া চুচট্ খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। বোম্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে নানা রকমের ধুতি ও রেশমী শাড়ী এবং চিকণ কাপড় প্রস্তুত হয়। এই সকল বস্ত্র যেমন চাক্‌চিক্যশালী সেইরূপ টেক্‌সই। ইহা ব্যবহারে আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে, স্বদেশে শিল্পকার্য্যের প্রচুর উন্নতি হইবে এবং গরীব তন্তুবায় ও শ্রমজীবীরা খাটিয়া দুইটা শাকঅন্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। স্বদেশের উন্নতি আমাদের নারীজাতির চেষ্টার উপর যতদূর নির্ভর করে, বোধ করি পুরুষজাতির চেষ্টা ততদূর কার্য্যকরী নয়। আমরা যদি বিদেশী দ্রব্যাদি ঘরে আনতে না দিই তবে কি পুরুষেরা আনিতে পারেন? ঘরে আমাদের বেশী দখল আছে। যদি কোন পুরুষ বিদেশী দ্রব্যের পক্ষপাতীও হন, তবে আমাদের অনুনয় ও বিনয়ে কি তাহা ছাড়ান যায় না? অবশ্য যায় যদি না পারি তবে আমরা অর্দ্ধাঙ্গিনী কিসে?

দেশে প্রচুর কার্পাস ও রেশম উৎপন্ন হয়। আমরা তাহার আদর জানি না। বিদেশীরা তাহা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যায় ও ইহার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় কাপড় আমাদিগকে অতিদামে ক্রয় করিতে হয়। আমরা যদি দেশের কাপড় ব্যবহার করি, তবে অনেক কল কারখানা দেশেই হইতে পারে ও এই সমস্ত কার্পাস ও রেশম দেশেই ব্যবহৃত হইলে বিদেশীরা আমাদের ঘরের টাকা কোন মতেই জাহাজ ভরিয়া সাত সমুদ্র পারে লইয়া গিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে না।

আর দেখ, এনামেলের বাসন হইয়া আমাদের কি না সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমরা চিরদিন কাঁসা, পিতল ও তাম্রের বাসন, ঘটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে এই সমস্ত চাকচিক্যশালী অথচ ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যাদি আসিয়া আমাদের ঘর বাড়ী পরিপূর্ণ হইতেছে। আমাদের দেশীয় বাসন ভাঙ্গিয়া গেলেও অর্দ্ধমূলে বিক্রয় হয়; কিন্তু ভগ্নিগণ, কোনদিন কি দেখিয়াছ যে এই এনামেল ভাঙ্গিলে কিছু দাম হয়? কোন গৃহস্থের দশখানা কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য থাকিলে একদিন বিপদে পড়িয়া বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলেও দুই পয়সা পাওয়া যায়, এবং ইহা একটি সম্পত্তি বলিয়া গন্য করা যায়; কিন্তু এনামেল সামান্য পয়সার জিনিষ বলিয়াও কেহ মনে করে না। এই সব দ্রব্য যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিষ, ব্যবহার না করিলে, পুরুষজাতি কি জোর করিয়া ব্যবহার করাইতে পারেন? এস ভগ্নিগণ, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এই সমস্ত এনামেল হাত দিয়া স্পর্শ করিব না! দেখি আমরা আমাদের দেশীয় কাঁসা পিতলের পুনঃ প্রচলন করিতে পারি কিনা?

ভগ্নিগণ, তোমরা কি চেয়ে দেখনা, যে আমরা একেবারে উৎসন্ন গিয়াছি। আমরা নির্ব্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আসিয়া আমাদিগকে সামান্য জর্ম্মণ-সিল্‌ভারের গহনা ও বেলুয়ারী চুড়ির দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে আর আমরা মনে করিতেছি যে, বহুমূল্য

দ্রব্যলাভ করিলাম ! এই সব কি আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ নয় ? স্থির মনে চিন্তা করিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বিদেশীরা আমাদের উপর প্রকারান্তরে ডাকাতি করিতেছে। এক ভারত প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী দিতে পারে অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে যাহা পাওয়া যায় এক ভারতেই তাহা আছে। এই ভারতে বাস করিয়া আমরা দিন দিন কেন যে অধঃপাতে যাইতেছি তাহা কি তোমরা ক্ষণকালের জন্য ভাব ? আমাদিগকে নির্ব্বোধ দেখিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, স্কট্‌লন্ড, জর্ম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের বণিকগণ অনবরত সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাদের বহু শ্রমোৎপন্ন শস্যাদি স্বদেশে লইয়া যাইতেছে, আর আমরা দুমুঠা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে হা, হা করিয়া বেড়াইতেছি। যতদিন আমরা এই সমস্ত বিদেশী বণিকগণের প্রতারণার হাত হইতে নিস্কৃতি না পাইব ততদিন আমরা অধঃপাতে যাইতে থাকিব !

দেশের প্রায় অনেকেই দুধ খাইবার জন্য দুই একটি গাভী পুষিয়া থাকেন, এবং প্রায় সকল ভদ্রলোকেই প্রত্যহ দুগ্ধ খাইয়া থাকেন ; তথাপি বিদেশীয় কৌটার দুগ্ধ না হইলে চা যেন ভাল লাগে না। কি সর্ব্বনাশ ! এই সব চিন্তা করিলে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। যখন কোন দেশ একেবারে উৎসন্ন যায়, তখন তাহাদের অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় হইয়া পড়ে। ভগ্নিগণ ! চা খাও, এবং কৌটার দুগ্ধ অতি বিশুদ্ধ বলিয়া অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে খাওয়াও। কিন্তু মনে কি কখনও ভাব যে, এই দুগ্ধ গাধার কি ঘোড়ার ? সাত সমুদ্র পারে দুগ্ধ হয়, তাহাই যে আমাদের বাড়ীর গাভীর টাট্‌কা দুগ্ধ হইতে ভাল হইল, ইহা কেবল এই হতভাগ্য ভারতবাসীর নিকটেই ; বোধ করি অন্য কোন দেশের লোকের নিকট নয়।

গুড়, চিনি, মিশ্রি, আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমানে জন্মে। ভারতবাসী, ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে এই গুড় ও চিনি খাইয়াই পরিতৃপ্ত হইত। এখন আমাদের দেশীয় গুড়, চিনি ও মিশ্রি খাইতে ঘৃণাবোধ করি। এখন রিফাইন্ড চিনি না হইলে আমাদের চলে না। এখন আমরা দেশী গুড় ও চিনিতে ময়লা দেখিতে পাই। প্রত্যেক বৎসর এই ভারতে সাড়ে পাঁচ কোটী টাকার রিফাইন্ড চিনি আমদানী হয়। ভগ্নিগণ, এই সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা দেশে থাকিলে দেশের কি না উপকার হইতে পারে ? ইহা আমরা ক্ষণকালের জন্যও ভাবি না। ইচ্ছা করিলে কি দেশী গুড়কে রিফাইণ্ড করিয়া লইতে পারি না ? নিশ্চয়ই পারিব, আইস, আমরা একবার স্বদেশী গুড় ও চিনি খাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি।

আর একটি সর্ব্বনাশী কার্যে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে প্রচুর পরিমানে চলিয়া যাইতেছে। এইটি চুরুট ও সিগারেট। আমাদের দেশেও অনেক সুন্দর তামাক হয় ; তাহা ছাড়িয়া আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজের ছেলেরা বিদেশীয় চুরুট ও সিগারেট খাইতে বড়ই লালায়িত। কেন যে লালায়িত, বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; আমার বিবেচনায় এইটি বাবুগিরির একটি অংশ হইতে পারে। এই চুরুট ও সিগারেটে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা বিদেশে যায়। এই ত্রিশলক্ষ টাকা হইতে দেশে তামাকের

ও তাহার আবশ্যকীয় মসলাদির চাষ আবাদ করিলে সুন্দর চলিতে পারে ; অনেক টাকাও দেশে থাকিয়া যায়। ভগ্নিগণ, আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই সকল বিদেশীয় বিষাক্ত সিগারেট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তৎপ্রতি কি আমরা কোন দিন লক্ষ্য করি ? হায় ! পরিতাপের বিষয় আমরা স্নেহময়ী জননী হইয়া সন্তানগণকে এই সকল বিষাক্ত সিগারেট খাইবার জন্য নিষেধ না করিয়া প্রকারান্তরে উৎসাহই দিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা যদি চেষ্টা করি তবে কি আমাদের সন্তানগণকে এই বিষাক্ত দ্রব্যের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারি না ? আমাদের সন্তানদিগের মধ্যে সিগারেট স্পর্শ করার কঠিন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলে তাহারা কি আমাদের আদেশ উপেক্ষা করিবে ? আপনাদের মাতৃ-আজ্ঞার কি কোন মূল্য নাই ?

প্রিয় ভগ্নিগণ, অদ্য এই সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই প্রাণপণে স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। তোমরা চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে এই দরিদ্র ভারতের আর উপায় নাই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে। এখনও চাহিয়া দেখিলে আমাদের চেষ্টায় অনেক কার্য্য হইবে, আশা করি।

*নবনূর*, আশ্বিন ১৩১২

## তথ্যসূত্র

১. দ্র. 'প্রস্তাবনা', এই সংকলন, পৃ. ছাব্বিশ

২. *সতীর পতিভক্তি* বইটি আমরা বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করতে পারিনি। ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার বা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার—কোথাওই বইটির কপি মেলেনি। কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা কোনও অখ্যাত লাইব্রেরিতে বইটি থাকা অসম্ভব নয়, হয়ত কোনও পাঠক তার সন্ধান দিতে পারবেন।

৩. 'সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ'—এর মধ্যে কেবল দুটোর সন্ধান আমরা পেয়েছি, দুটোই ছাপা হয়েছিল *নবনূর* পত্রিকায়, এবং এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ লেখক, সাংবাদিক, গবেষক। তিনি ঢাকায় থাকেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি*, *হরিশচন্দ্র মিত্র* ও *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৯৫ সালে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' পান। বর্তমানে মকসুদ সাহেব ঢাকায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় বার্তা সম্পাদকের পদে কর্মরত।

# তেজস্বিনী মিসেস এম. রহমান
## ১৮৮৫-১৯২৬

রোকেয়া সাখাওয়াতের পর তেজদীপ্ত, বলিষ্ঠ লেখনীর জন্য যিনি বিশেষভাবে পরিচিত তিনি মিসেস এম. রহমান বা মাসুদা রহমান। এই স্বল্পপ্রজ লেখিকার লেখার জগতে আগমন-অবস্থান-বিদায় অনেকটা উল্কাপিণ্ডের মতোই চোখ-ধাঁধাঁনো, ক্ষণস্থায়ী ছিল। অথচ বিশের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা এই মিসেস এম. রহমানের ব্যক্তিগত পরিচয় পুঁথি-পত্র থেকে অতি সামান্যই এখন পাওয়া যায়। তার ওপর মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি মারা যান বলে, আমাদের জানা মতে, পরিবারের জীবিত সদস্যদের তাঁকে নিয়ে প্রত্যক্ষ কোনও স্মৃতি নেই। মৃত্যুকালে মিসেস এম. রহমানের উত্তরাধিকারী ছিলেন একমাত্র কন্যা মাহ্‌ফুজা খাতুন এবং ছ' বছরের দৌহিত্র মুহম্মদ আজিজ সুলতান কামরুজ্জামান চৌধুরী। দেশভাগের পর মিসেস এম. রহমানের আত্মীয় পরিজন দুই বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। পঞ্চাশ বছর পর আজ তাঁদের মধ্যকার যোগসূত্রও অতি ক্ষীণ। এসব কারণেই দুঃখজনকভাবে এই অসাধারণ নারীর জীবনচিত্র প্রস্ফুটিত না হয়ে অনেকটা উহ্যই থেকে গেল এই লেখায়। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* গ্রন্থ থেকে এবং তাঁর বোনের নাতনি সিদ্দিকা জামানের মারফত সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা মিসেস এম. রহমানের একটা পরিচয় এখানে দাঁড় করানর চেষ্টা করব।

মিসেস এম. রহমান জন্মেছিলেন হুগলি জেলার শেরপুর গ্রামে ১৮৮৫ সালে। বাবা খান বাহাদুর মজহারুল আনওয়ার চৌধুরী ছিলেন হুগলি জজকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী। তিনি ছোটলাটের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। হুগলির শেরপুরে তাঁদের জমিদারি ছিল। মিসেস এম. রহমানের মায়ের নাম বেগম মোয়জাতুন্নেসা। হুগলির সমৃদ্ধশালী, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে মিসেস এম. রহমান পিতৃগৃহে সামান্য বাংলা, উর্দু ও কোরান পড়তে শিখেছিলেন। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। মাত্র ১১ বছর বয়সে (ভিন্নমতে আট-ন বছর) তাঁর বিয়ে হয়ে যায় ফুরফুরার জমিদার কাজী মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে ; তিনি তখন ছিলেন রেজিস্ট্রার অফ ক্যালকাটা।

মিসেস এম. রহমানের লেখা প্রকাশের সন তারিখ দেখে মনে হয়, তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর লিখতে শুরু করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কবি নজরুল ইসলামের। তারও আগে *নবনূর*-এ প্রকাশিত রোকেয়া সাখাওয়াতের বিস্ফোরক প্রবন্ধসমূহ তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বোধ করি সেই সব লেখা পড়েই

তিনি লিখতে অনুপ্রাণিত হন। তখন থেকে মিসেস এম. রহমানের সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় ও পত্রালাপ। তাই হয়ত পরবর্তীকালে তিনি যখন লিখতে শুরু করেন, রোকেয়া-উদ্ভাবিত নারী-বিষয় তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে বার বার আসতে দেখি আমরা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব বেপরোয়া শব্দপ্রক্ষেপন এবং ক্রোধের দাহ। যেমন 'আমাদের দাবী' প্রবন্ধ (এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) শেষ হচ্ছে এইভাবে :

> প্রকাশ্য রাজসভায় যারা পূজনীয়া নারীকে উলঙ্গিনী ক'রেছিল, কারবালার মহাপ্রান্তরে জগতপূজ্যা শোকাতুরা মহিলাগণকে মস্তকাবরণহীনা (ওড়নাহীনা) ক'রেছিল, মাতৃজাতিকে যারা রক্তলোলুপা বাঘিনী বলতে কুণ্ঠিত হয় নাই (বর্ত্তমান সময়ে নারীর অপমান কহতব্য নয়) তারাই দেবে তোমাদিগকে সম্মান! মানুষের শ্রদ্ধা যে পায় না, সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। তাই আজ যুগে যুগের পুঞ্জিভূত অপমান, শুধু বাঘিনী নয়, ফণিনীও ক'রেছে আমাদিগকে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমানকারীদের হৃদয়ের রক্ত পান ক'রে শরম বেদনার উপশম ক'রবো, দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদ্‌গার ক'রে, দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জ্জরিত ক'রে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলবো।

তাঁর চাঁছাছোলা বক্তব্যের একটি নমুনা হলো (একই প্রবন্ধ), 'যদিই বা কোন কর্ত্তব্যপরায়ন পিতা বড় বেশী করেন তো পাখীপড়ানোর মত কোরআন পড়িয়ে কর্ত্তব্য পালন করার আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। যথা—"আমার মেয়ে খতম কোরআন" কিন্তু "খতম কোরআন"-এর একটা শব্দের একটা অক্ষরের মানে বোঝেন না।'

মিসেস এম. রহমান এরকম তীক্ষ্ণ সমালোচনায় পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের—সেই সঙ্গে তখনকার বাঙালি মুসলিম সমাজেরও—গায়ে হূল ফোটাতে ছাড়েননি। নারীর শিক্ষা, বিবাহ, পর্দার প্রশ্নে অসম অন্যায় আচরণের জন্য তাদের তুলোধুনো করেছেন। তাঁর লেখার বিষয় রোকেয়ার সমসাময়িক ও পরবর্তী মুসলিম লেখিকাদের মতো ইসলাম ধর্ম-প্রদত্ত নারীর অধিকার বাস্তবায়নের দাবীতে আবর্তিত হলেও তিনি এর বাইরে দুঃসাহসিক ছাপ রেখেছেন। তাঁর মারমুখি শব্দ প্রয়োগ, আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করে এক বিদ্রোহী লেখিকায় উত্তীর্ণ করেছিল। নিজের লেখনী সম্পর্কে *সওগাত* (আশ্বিন, ১৩৩৩)-এর এক লেখায় তিনি উল্লেখ করেন, 'বাংলা শিক্ষা পাইনি ; দুঃখ বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণের চকমকিতে আগুন জ্বলেছে ; সময় সময় কলমের মুখে তারই ফুল্‌কী ফুটে বেরোয় মাত্র।'[১]

মিসেস এম. রহমান মানুষটা ঠিক কেমন ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৭১ বছর পর আজ সেই চিত্র পাওয়া অসম্ভব। তাঁর সেজো বোন মর্জিনা বেগমের নাতনি সিদ্দিকা জামানের জন্ম হয় মিসেস এম. রহমানের মৃত্যুর প্রায় চোদ্দ বছর পর।[২] তিনি শুনেছেন, তাঁর দাদীর বোনেরা প্রত্যেকেই জেদি, স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁদের

চরিত্রে এমন সব দিক ছিল যা তখনকার মুসলিম সমাজে সত্যিই বিরল। সিদ্দিকা জামান ছোটবেলায় নিজের দাদীকে কেমন দেখেছেন, তাঁর সেই স্মৃতিচারণ থেকে মিসেস এম. রহমানের চরিত্রের আভাস হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

'আমরা তখন [কলকাতায়] কড়েয়া রোডে, তারপর বালু হক্কাক লেনে ছিলাম। আমি ও আমার ভাই বড় ছিলাম বলে মাঝে মাঝে দাদী আমাদের নিয়ে বেশ ঘুরতেন। সকালবেলার দিকে দাদী নিউমার্কেটে যেতেন। ওঁর সাথে আমি কয়েকবার গেছি— এটুকু আমার মনে আছে। দুপুরবেলা ভাত খেয়ে দাদী ম্যাটিনি শো দেখতে যেতেন। ওঁর সঙ্গে দেখা শেষ ছবিতে আমার মনে আছে, কাননদেবী, অশোককুমার অভিনয় করেছিল। সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে উনি গান শুনতে যেতেন। কিন্তু কোথায় যেতেন তখন জানতাম না, পরে জেনেছি। কীর্তন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ভাল কীর্তন হলে একাই রাতে শুনতে চলে যেতেন। দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর যেদিন বিশ্রাম নিতেন, দেখেছি তখন তিনি গান শুনতেন বা উপন্যাস পড়তেন। একটু অবাকই লাগত, আমার দাদা সিগারেট খেতেন না। কিন্তু দাদী হোল্ডার দিয়ে সিগারেটটা খেতেন, ভাত খাওয়ার পর। খুব বেশি না, নিয়মিত একটা-দুটো। আব্বার কাছে শুনেছি উনি হিন্দু পুরান খুব ভাল জানতেন। আমার দাদার সাথে ওঁর একটা তফাৎ দেখেছি। আমার দাদার বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি অতোটা আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু আমার দাদী সব সময় বাংলা গান শুনতেন। উনি বোরকা পরতেন না, just শাড়ি পরে মাথায় কাপড় দিতেন।'

মিসেস এম. রহমান সম্পর্কে সিদ্দিকা জামান নিচের এই একটিমাত্র গল্পই কেবল শুনেছেন :

> আমার দাদীর আরেক বোনের নাতনির কাছে শুনেছি, বাবার [মিসেস এম. রহমানের বাবা] সঙ্গে ওনাদের সম্পর্ক কখনও খুব গভীর বা হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু যখন কবি নজরুলকে এ্যারেস্ট করার কথা ওঠে বা আশঙ্কা করেছিলেন যে নজরুল এ্যারেস্ট হতে পারেন, তখন মিসেস এম. রহমান বাধ্য হয়ে তাঁর বাবাকে নজরুলকে ছাড়ানর ব্যাপারে বলেছিলেন। যেহেতু ওনার বাবা খান বাহাদুর ছিলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা ছিল, তিনি হয়ত মনে করেছিলেন বাবাকে বললে কিছুটা সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ওনার বাবা কোনও অবস্থাতেই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলতে রাজি হলেন না। যার জন্য উনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, জীবিতাবস্থায় উনি ঐ বাড়িতে আর আসবেন না, এলে ওনার লাশ আসবে। জীবিতাবস্থায় সত্যিই উনি আর কখনও ওনার বাবার বাড়ি যান নি।

কাজী নজরুল ইসলাম মিসেস এম. রহমানকে মা বলে ডাকতেন। ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার প্রমিলা সেনগুপ্তার সাথে নজরুলের বিয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তখন তিনিই হুগলিতে নজরুলের সস্ত্রীক থাকার ব্যবস্থা করে দেন। মিসেস

এম. রহমানের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর নজরুল 'মিসেস এম. রহমান' নামে সুদীর্ঘ একটি শোকগাথা রচনা করেন। *সওগাত*-এর মাঘ ১৩৩৩ সংখ্যায় চিঠিসহ এই বেদনাদীর্ণ এলেজি প্রকাশিত হয়।[৩] *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে লেখা নজরুলের সেই চিঠির অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হলো : 'আমি গাজী আবদুল করিমের বন্দীজীবন নিয়ে একটা কবিতা লিখছিলাম, এমন সময় মা'র [মিসেস এম. রহমানের] মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আবার আমার সব গুলিয়ে গেল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আপন পেটের ছেলের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন মা আমায়। আমি তার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন জীবনের জোয়ার-ভাঁটা দেখছি শুধু। মন বড় খারাব তাই এখন। মা'র নামে যে কবিতাটা পাঠালাম এটাই মাঘের সওগাতের প্রথমে দিয়ে দিবেন। মা আমায় ভালবাসতেন বলেই যে এ দাবী করছি, তা নয়। মূলতঃ সাহিত্যের দিক থেকেও এ দাবী করবার মতো গুণ মা'র ছিল। এটা ছেপে দিলে আমি বড় খুশী হব। মা'ও বেহেশত হতে তাঁর অবহেলিত প্রতিভার অসময়ে কদর দেখে হয়তো শান্তি লাভ করবেন।'

১৯২৬ সালের ২০ ডিসেম্বর মিসেস এম. রহমান মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে *সওগাত*-এ লেখা হয়েছিল, 'আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, মুসলমান সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা মিসেস এম. রহমান মাত্র ৪১ বছর বয়সে দুরন্ত বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে. . . রাজেউন)। তিনি নারীদের অধিকার রক্ষায় সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনায় নারী সমাজের প্রতি মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে এক তীব্র মনোভাব ফুটিয়া উঠিত। . . . বস্তুতঃ মিসেস এম. রহমানের ন্যায় একজন প্রতিভাশালিনী লেখিকা হারাইয়া মুসলমান সমাজ সত্যই দরিদ্র হইয়াছে।'

শামসুননাহার মাহমুদ *নওরোজ*-এর আষাঢ়, ১৩৩৪ সংখ্যায় 'মিসেস এম. রহমান স্মরণে' শিরোনামে লিখেছিলেন, '. . . বাঙলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মিসেস এম. রহমান আজ নাই—বড় অসময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন অন্ধকার যবনিকার পরপারে। তিনি আসিয়াছিলেন বাঙলার মুসলিম নারী-সমাজের বড় দুর্দ্দিনে—তাহাদের মুক্তির পথে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, তাহাদের আজাদীর নেশায় পাগল করিয়া তুলিবার নিমিত্ত, বাস্তবিকই নারীর যুগযাগান্তরের পুঞ্জিত ব্যথা-বেদনা যেন তাঁহাতেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।. . . তাহার "বঞ্চিত বুকে" যে অভিমান, যে ব্যথা-বিষ ফেনাইয়া উঠিয়াছিল—সকল অন্যায়, সকল অসত্য বুঝি তাহাতে একদিন পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে পারিত।'

মিসেস এম. রহমানের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ব্রিটিশ-বিরোধী হওয়ার কারণে তিনি খদ্দরের কাপড় পরতেন। এমনকি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কাফনও খদ্দরের কাপড়েই তৈরি হয়েছিল।

তিনি 'মা ও মেয়ে' নামে একটি উপন্যাস (পারিবারিক সূত্রে আত্মজীবনীমূলক বলা হয়) লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর *সওগাত*, ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে

তা ধারাবাহিকভাবে বার হয়।*চানাচুর* মিসেস এম. রহমানের একমাত্র প্রকাশিত বই, যা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এতে মূল প্রবন্ধগুলির কিছু পাঠভেদ আমরা লক্ষ করেছি। আলী আহমদ সংকলিত *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৬১৮-এ তাঁর একটি বইয়ের উল্লেখ আছে—*মুক্তির মূল্য*, যার বিজ্ঞাপন হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১-তে। *চানাচুর*-এর প্রকাশক ছিলেন তাঁর স্বামী কাজী মাহমুদুর রহমান। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪। অর্থাৎ, লেখিকা মৃত্যুর এক বছর পর। বইটির উৎসর্গপত্রে তাঁর একমাত্র সন্তান মাহফুজা খাতুন লিখেছিলেন, 'আমার দেবী প্রতিমা জননীর জন্য/যাঁহার যত্নের অবধি ছিল না/যাঁহার শিক্ষায় আমার মাতা দেশ ও জাতিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন—/বাংলার সেই মনস্বিনী নারী-/মিসেস আর. এস. হোসেন সাহেবার/পবিত্র চরণে—/পিতৃদেব মৌলবী কাজী মহম্মুদর রহমান সাহেবের/নির্দেশক্রমে/আমার স্বর্গগতা জননীর এই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদিত হইল।' উল্লেখ্য যে *সহচর* (১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৯)-এ মিসেস এম. রহমান রোকেয়া সাখাওয়াতের *মতিচূর* পড়ে, 'মতিচূর' (সমালোচনা) নামে একটি কবিতা লিখে রোকেয়ার প্রতি তাঁর মুগ্ধতার প্রমাণ রেখে গেছেন।

শ.আ.
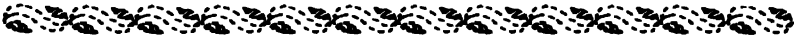
## বাড়বানল

শ্রদ্ধেয় বিজলী-সম্পাদক মহাশয়! শুনছি নাকি যে, দেশবন্ধু বেদ, উপনিষদ, কোরআন, গীতা খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন "সব শিয়ালের এক রা।" চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার ক্ষমতা থাকলে কি এমন ক'রেই দেখাতে হয়, একেবারে চোখের জলে, নাকের জলে একাকার? বেদ্ কোর-আন এক হয়ে গেলেই ত ঈশানের বিষাণ বা ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বেজে উঠবে। তাহ'লে বড় বেগতিক দেখছি। যা-ইচ্ছে বেজে উঠুক, কিন্তু আমার অভিলাষিত দৃশ্য দেখবার আগে যদি শিঙ্গা বাজায় তো আমি, পাদমেকং নঃ গচ্ছামি।

আচ্ছা, তিনি যে, মোরিয়া হ'য়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলেন, সুতা ছেঁড়ার দাড়ী নাড়ার ভয় করেন না বুঝি? তারা কিন্তু অল্পে ছাড়বে না, সে ছেলেই নয় তারা। এতটা দিন সত্য ধামা চাপা দিয়ে গণ্ডায় এণ্ডা চালিয়ে আসছে আর হটাৎ ডামাডোল!

মিথ্যা নিয়ে ঘর ক'রে বলেই তাদের উপদেশ এত কঠোর, এত নিরস। যার নাম ধর্ম্ম, সে মহান মঙ্গল বিধায়ক। সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপক, দুষ্টের দমনকারি, শিষ্টের রক্ষক, কল্যাণ-প্রসূ মণ্ডলী বিশেষ। কথায় বলে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট, আমি বলি, পণ্ডিত নামের কলঙ্ক মূর্খদের পাপে সমাজপতিদের

স্বেচ্ছাচারে, মানুষের পরিবর্ত্তে দেশে পশুরদল বৃদ্ধি হ'চ্ছে, তার ফলে দেশ অধঃপথে এগিয়ে গিয়েছে, জাতি মরনোন্মুখ।

হঠাৎ যুগভেরীর শব্দ জেগে ওঠে, দু-দশ জন কর্ম্মী অসুরের দীঘি খনন বা রাজকন্যার প্রমোদোদ্যান তৈরীর মত রাতারাতি দেশোদ্ধার ক'রে ফেলবে, কি দুরাশা! স্বরাজ পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর, কিছুদিন পোড় খেয়ে খাঁটি হও। স্বর্গীয় সত্যকবি মহাত্মার বাণী প্রচার ক'রে গিয়েছেন ;

"স্বরাজ প্রয়াসী জাগো দেশবাসী
স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন
কায়েম করিব তপে।"

প্রতিবাসীকে সন্তুষ্ট করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা সন্তুষ্ট করবে দেশবাসীকে ? আত্মশাসন করতে শিক্ষা যারা পায়নি, তারাই করবে দেশ শাসন ? জরাজীর্ণ আধমরা বহন করবে স্বাধীনতার পতাকা ? অনেকখানি বলবীর্য্যের আবশ্যক তাতে। গায়ের জোরে জিদের বশে পতাকাদণ্ড ধারণ করতে গেলেই পপাত ধরনী তলে।

রক্ষণশীল বৃদ্ধদের হাতে জপমালা দিয়ে তপোবনে রেখে এস, ভণ্ডমিথ্যাবাদীদের হাত থেকে ধর্ম্মগ্রন্থ কেড়ে নাও, দূর করে দাও অনাচারীদিগকে সমাজ মন্দিরের পবিত্র বেদী থেকে। মানবের হিতার্থে স্রষ্টার বাণী প্রচার কর।

কোরআন, কোরআন শরীফ, কালামে মজিদ, আমার রাক্ষসী ক্ষুধার আহার কোরআন, আমার কারবালা প্রান্তরের প্রাণঘাতী তৃষ্ণার সুশীতল পানীয় কোরআন, তোমায় আজও বুঝতে পারিনি। তোমায় বুঝতে চাই, জানতে চাই, তোমায় আমি খেয়ে ফেলতে চাই।

আমার গুরুজন আমায় কোরআনে দীক্ষা দেয়নি, করুণানিধি হজরত মোহম্মদের (দঃ) কল্যাণময়ী বাণী লুকিয়ে রেখেছিল আমার কাছে।

ধর্ম্মদ্রোহী মাতৃদ্রোহী সমাজ বিধান দিয়েছে, মেয়েমানুষ শুধু রসনা তৃপ্ত-কর খাদ্য রান্না করবে, কুক্কুরীর মত বছর বছর বাচ্ছা দেবে, নতমস্তকে তাদের স্বার্থ-কলুষ ভরা বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, অন্ধভাবে তাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দেবে!!

আমরা দেবী, আমরা নারী, সেই আমরাই ডাকিনী-যোগিনী। এখনও সাবধান হও, মা হয়েছি বলে কি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েছি ?

গলায় গাছকতক সুতা না থাকলে দেববানী উচ্চারণ করবার অধিকার পাবে না, থুতনীর নীচে ছাগলের মত লম্বা লোম না থাকলে কোরআন ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা থাকবে না, টোল, মাদ্রাসার উষ্ণীছাপ না পেলে, যতবড় জ্ঞানীই হও তোমার জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ গ্রাহ্য হবে না! এতবড় স্বার্থান্ধ যারা এতটা সঙ্কীর্ণ যারা, এমন গণ্ডীবদ্ধ মন যাদের, তারাই গড়বে মহাচেতা ত্যাগী কর্ম্মবীর!!

তারপর মা, তোমাদের মায়েরা যে, কতদূর নীচমনা, কতবড় বাঁদী সে খবর

রাখ ? এ হেন নব জাগরণের দিনে যারা গাভরা গয়না, বাক্সভরা টাকা পেয়ে নারীর কর্ত্তব্য ভুলে যায় তাদের ছেলেরা দেশ-ভাইদের পায়ে বেড়ী গলায় দড়ি দেবার হেতু না হয়ে আর কি হবে ! তাদের মেয়েদের মধ্যে কখনও 'মা' জাগবে না।

কর্ম্মীগণ ! রত্ন আহরণ করতে ছুটেছ, আহরীত রত্ন রাখবে কোথায় ? যাদুকরের মন্ত্র বলে উড়ে গিয়েছে, ধন রত্ন ভরা কোষাগার। মুক্তি পতাকা লাভের আশায় লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন অঙ্গের ভূষণ করেছে, সে পতাকা স্থাপন করবে কোন শীর্ষস্থানে ? উন্নতদুর্গ ভূমিসাৎ, ধূলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে ! সুবর্ণ দেউলে তুলবে, স্থান কৈ ? সোনার দেশ-শ্মশান ! ভূত প্রেত ডাকিনী প্রেতিনীর লীলাক্ষেত্র শকুনী, গৃধিনী শিবার বিচরণ স্থল ! নিঃশ্বাস রোধকারী পূতীগন্ধময় বিষবায়ু প্রবাহিত ! সে স্থান কি সুবর্ণ দেউল তোলবার উপযুক্ত। উড়িয়ে পুড়িয়ে ধুয়ে মুছে সব সংশোধন ক'রে নিতে হবে।

আমাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সে ঘৃণিত আবর্জ্জনাময় স্থান পরিস্কৃত, শোধিত করতে পারবে না। যেমন সারাটি বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সোনার ফসল তোমরা ঘরে আন কিন্তু ভেনে, কুটে চাল তৈরী করি আমরা। রক্তারক্তি করে জঞ্জাল বাড়াইও না, আমাদের কাজ আমরাই করবো। বুকে আমাদের শত বিসুবিয়াসের অগ্নিশিখা, হৃদয়ে আমাদের সহস্র সাইক্লোনের ভীষণ বাত্যা, নয়নে আমাদের অযুত মহাসাগরের অনন্ত বারিরাশী !

এস ভগ্নীগণ ! আমরা জমী তৈরী করি, আমাদের সোনার চাঁদ ছেলেরা মুক্তি-সৌধের ভিত পত্তন ক'রবে—অন্যায় অশুভ, ভণ্ডামী, পাশবিকতার মূলে আগুন ধরিয়ে দিই, এস। জ্বলে উঠুক আমাদের বুকের বাড়বাগ্নি, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক, ন্যাক্কারজনক আবর্জ্জনা স্তুপ। হৃদয় নিহীত ভীষণ বাত্যায় ভস্মরাশী উড়িয়ে দেবো, ভাসিয়ে দেবো আনন্দাশ্রু প্লাবনে অবশিষ্ট ছাইমাটি।

হীরক কিরীটিনী সুবর্ণ দেউল গঠিত হ'য়ে উঠবে রত্নপ্রসূ ভারতের বুকজুড়ে, তার উন্নত শীর্ষে উড্ডীয়মান হবে গগনচুম্বী মুক্তি-পাতাকা। নূতন জীবনে বেড়ে উঠবে, বীরাঙ্গনা জননীকোলে বীরপুত্র, কর্ম্মীভ্রাতার পাশে সাধিকা ভোগিনী, পুরুষ সিংহের বামে গরিয়সী সহধর্ম্মিনী।

যুগে যুগে বিরাজ ক'রবে ভারতবাসী, মুক্তিপতাকাতলে, সুবর্ণ সৌধে, জননী জন্মভূমীর কোলে।

এই বিরাট সৌন্দর্য্যময় মহানদৃশ্য মানসচক্ষে দেখে এ মরুহৃদয়ে অনন্তপিপাসা মিটবে না, চর্ম্মচক্ষে দেখতে চাই। এস ভগিনীগণ ! আমরা প্রার্থনা করি :—

এ বাসনা এ সাধনা যেন গো সফল হয়,
এই চাই আর নাই কোন সাধ দয়াময় !

*বিজলী*, ২রা চৈত্র ১৩২৯

# সদনুষ্ঠান

## "কথা বনাম কাজ"

কাজের পূর্ব্ব সূচনা হচ্ছে কথা। তবে কথার শেষে যদি কাজ আরম্ভ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে ওটা ভাত হজম বা সময় কাটাবার উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেক লজ্জাশীলার মতে, "সরম খেয়ে পাড়ায় দল বেঁধে বেড়ান ঘর ভাঙ্গাবার ছল" হতে পারে, কিন্তু সরম না খেয়েও পাড়ায় দল বেঁধে "ঘরের লক্ষ্মী" কর্ম্মীরা ঘরে বসে জাতির উপকার ক'রতে পারে, করবার মত প্রাণ অনেকের আছে তার প্রমাণ আমার অভিন্ন-হৃদয়া বন্ধু মিসেস রশাদ।

নারী জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তিনি অনেকদিন থেকে চিন্তা ক'রে আসছিলেন। অন্নাভাবই যে, আমাদের দুঃখ অসম্মানের একটি কারণ তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন। সে অনেকদিনের কথা, তখন তিনি সধবা।

বিধবা হবার পর তাঁর চিন্তার বিষয় হলো ভদ্রমহিলা বনাম শত নাগপাশবদ্ধা অভাগীর দল। আহা, একে ত শিক্ষাহীন, তায় অসম্মানে অবরোধের মধ্যে তারা তিল তিল করে মরণ-পথের পথিক হচ্ছে তার উপর দুমুটো ভাতের, একখানি বস্ত্রের জন্য আত্মীয় স্বজনদের নিকট কি অপমান লাঞ্ছনাই তাদের সহ্য করতে হয়!

যার আর্থিক স্বাধীনতা ও পরদুঃখকাতর প্রাণ আছে সে কখন এ প্রতিজ্ঞা না করে থাকতে পারে না। অগত্যা তিনি, তাঁর দিদি, আমি ও নীরব কর্ম্মী সাখাওৎ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপয়িত্রী মিসেস সাখাওৎ হোসেন এই চার জনে দল বেঁধে, দিনকতক পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালুম। জনৈক পুরুষপুঙ্গব ভয় দেখিয়ে তাঁর সাহস পরীক্ষা করলেন, বাহবা দিলেন, যথাসাধ্য সাহায্যের আশাও দিলেন, এমন কি এককালীন ২০০৲ এই সৎকর্ম্মে দান পর্য্যন্ত করবেন বল্লেন। (এ পর্য্যন্ত খতম! এখন চিঠি লিখে উত্তর পাই নে)।

হিতাকাঙ্ক্ষীদের ভয়-প্রদর্শন ঠাট্টা বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করেও করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে গত অক্টোবর মাসে তিনি একটি কার্য্যশালা খুলেছেন। নাম দিয়েছেন, "জানানা তালিমগাহ বা নারী শিল্প বিদ্যালয়" চরকায় সূতাকাটা, তাঁত বোনা, যাবতীয় সেলাই, বুকবাইন্ডিং, বাক্স ও টুপী (হ্যাট) তৈরী এবং নানাবিধ কলের চাটনি মোরব্বা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়া হবে।

বিধবা, সধবা ও কুমারী ভদ্রমহিলা ভর্ত্তি হতে পারবেন। অবস্থাপন্ন মহিলারা আপনাপন বাড়ী থেকে স্কুলে আসবেন বা খোরাকী দিয়া বোর্ডার থাকবেন, নিঃসম্বল ভদ্রমহিলাগণ কর্ম্মকর্ত্রীর কন্যারূপে বিদ্যালয়ে বাস করবেন। তাঁদের ছোট ছেলে মেয়ে থাকলে তারাও মায়ের কাছে থাকতে পারে।

এ পর্য্যন্ত তিনটি ছাত্রী এসেছে। এখন তিনি নিজেই সেলাই ও চরকায় সূতা কাটা শিক্ষা দিচ্ছেন, দশজন ছাত্রী হ'লে অন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত ও পূর্ব্বোক্ত শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হবে।

এক্ষণে চাই দেশের সাহায্য সহানুভূতি। দশজন ছাত্রী ও দস্তুর মত কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে অর্থ সাহায্যের আবশ্যক নাই, কার্য্যারম্ভে অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রী সংগ্রহ, সহানুভূতি ও পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য, কারণ তিনি চিররুগ্না ও শিশুর জননী। আমি ব্যক্তিকর্ত্তব্যরূপে নাগপাশে বাঁধা না পড়লে সমষ্টি কর্ত্তব্যে কারুর দৈহিক সাহায্যের আবশ্যক হ'তো না। যে কোনও ভদ্রমহিলা অসঙ্কচে তাঁর সঙ্গে সাক্ষৎ করতে পারেন।

সহৃদয় ভ্রাতৃগণের নিকট ছাত্রী সংগ্রহ ও সহানুভূতি পাবার আশা করি।

উন্নত-হৃদয়া স্নেহময়ী ভগিনীগণ! পরানুগ্রহে প্রতিপালিতা জাতিকে স্বাবলম্বী শিল্পীরূপে গড়ে তুলবে, এস! নিরুপায় বন্দিনীদিগকে মুক্তি দিবে এস! নারী শক্তির কেন্দ্র স্থাপন ক'রে সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে এস!

এহেন জাগরনের যুগেও কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে? আমরাও মানুষ, মানুষের সব কিছু অধিকার আমাদিগকেও পেতে হবে। আগেও বলেছি এখনও বলছি ভাল জিনিস কেউ কখনও হাতে তুলে দেয় না, দেবে না। জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে, পরিশ্রম করে অর্জন ক'রতে হবে। মানুষে যা পারে আমরাও তা পারবো।

*বিজলী*, ৩০শে চৈত্র ১৩২৯

## শান্তি ও শক্তি

ব'লতে পারো তোমরা কেন আমাদের মাথায় এসে হাজির হয় যত রাজ্যের সব সৃষ্টিছাড়া কথা?

এমন সৃষ্টিছাড়া যে তা ভাবলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়, শুনলে লোকে কাণে আঙ্গুল দেয়।

কিন্তু ঐ যে স্বভাব যায় না ম'লে। যত ধুয়ে মুছে ফেলতে চাই মন থেকে ঐ সৃষ্টিছাড়া খেয়ালগুলো। ততই যেন শিলালিপি হ'য়ে ওঠে।

কি করবো আমি, আমার হাত কি? নিরীহ বাঙ্গালী ঘরের অবলা কূপ-মণ্ডুক মেয়ের মনের আঁধার কোণে আশার বিদ্যুৎ চমকায় কেন? হাতকড়ি পরা, হাতে নিগড় ভাঙ্গবার দুঃসাহস আসে কোথা থেকে? পর্দ্দা প্রাচীরের ভিতর আরব মরুর মুক্ত সমীর প্রবাহিত হয় কেন? অধিকার বঞ্চিতা, অবহেলিতার হৃদয়াকাশে বিদ্রোহের ঝড় ওঠে কেন? এই কেনর উত্তর কে দেবে?

প্রমোদের সঙ্গিণী, কর্ত্তার পোষা তৈরি বা মিনি জাতীয় জীবের এই সৃষ্টিছাড়া খেয়াল, "নির্য্যাতনের জ্বালায় অস্থি-মাংস পর্যন্ত জ্বর জ্বর" যাঁরা, তাঁদের মনে কি ভাবের উদয় হয় তা আমার কল্পনার অতীত।

লাথি খেয়ে পা চাটায়, আর লাথি মারলে কেশর ফুলিয়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায়

একটু পার্থক্য আছে এই যা নইলে উভয়েই লাঙ্গুল বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু।

ছেলে বেলা থেকে শুনে আসছি দেশ প্রেমিক, আর্যবীরেরা দেশের উন্নতির জন্যে সর্ব্বস্বপণ করেছেন। এখন যিনি বা যাঁরা হাজার হাজার শৃঙ্খল ভূষিত হ'য়ে, নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছেন পূর্ব্বে তাঁদের মধ্যে অনেকে দেশ-প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়ে কারা বরণ করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা দেশকে বোঝাবার ইচ্ছে জন্মায় নি তখন।

তারপর লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষে, বাঙালীর জাগরণ-সূচক তূরী যখন বেজে উঠলো 'বন্দেমাতরম' রবে, সেই শুভ বা অশুভক্ষণে একখানা কাল মেঘ ভেসে উঠলো আমার হৃদয়গনের পশ্চিম কোণে।

অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন আর্ত্ত চীৎকার করে উঠতো ওগো কর্ম্মী! মাতৃজাতির দিকে তাকাও একবার। যুবক ও বালকবৃন্দকে দেশের ভবিষ্যৎ দেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর গড়তে হাপড় হাতুড়ী নিয়ে লেগে গিয়েছ, সে বেশ, কিন্তু তোমাদের মেয়েদের বোনেদের সহধর্ম্মিনীদের ত্যাগী জননী হবার উপযুক্তা ক'রে তৈরী করেছিলে কি? শেয়াল কাঁটার গাছেই কি গোলাপ ফোটাতে চাও?

ঐহিক, পারত্রিক ত্রানকর্ত্তারা বীজমন্ত্র আউড়েছে, "পুত্রার্থে ক্রীরতে ভার্য্যা" তারা পুত্র প্রসব করে কর্ত্তব্য পালন করেছে। তাই কি ছাই; জীবন্ত প্রসবের ক্ষমতা আছে? তারা প্রসবই করে আধমরা ছেলে মেয়ে।

নগেন্দ্র নন্দিনী উমা ষাড়, শিব, নন্দী ভৃঙ্গী ও ছেলেপিলে নিয়ে শান্তি জপিনী বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে ঘর ক'রেছিল। হঠাৎ সেই শান্ত মেয়েটিই নৃমুণ্ড মালিনী দিগম্বরী করালী হ'য়ে পতিবক্ষে দণ্ডায়মানা হ'লো কেন? জগৎপিতার আদ্‌রিনী মেয়ে মোহম্মদ (দ.) দুলালী দেবীকুল শিরোমণি ফতেমা জোহরা আরশের কাফুঁরা ভাঙ্গতে উদ্যত হ'য়েছিলে কেন? কেন জান? সহ্যগুণেরও সীমা আছে ব'লে, শান্তির মাঝে শক্তির বিকাশ আছে বলে।

দেবী হন বা মানবী হন পুরুষকার জাগিলে সকল মহাপুরুষকেই এই "নরকের দ্বার" দের পদতলে গড়াগড়ি দিতে হয়। অতি বড় আঘাত না পেলে এ জাতটা ক্ষ্যাপে না। তবে যে প্রাণ আনছে সে আগেই ব'লেছি।

স্বভাবের ধর্ম্ম কেউ কখনও এড়াতে পারে? মা হ'য়ে মার মায়া মমতা তার প্রাণে জাগবে না একথা ভেবে সারা "নারীর উন্নতি কস্মিনকালেও হবে না" ব'লে যুক্তি তর্কের অবতারণা ক'রতে পারে তাদের বলবার কিছু নেই।

*ধূমকেতু*, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯

# আমাদের স্বরূপ

আজকাল চারিদিকে জাগরণের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। সকলে ব'লছে জাগো! ভাল কথা, আর কত কালই বা লোকে মোহ ঘোরে আচ্ছন্ন থাকবে? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার ঘোষ ব'লেছেন,—

"জয় নারী গৌরব মঙ্গলে জাগো,
বাংলার ভগিনী বাংলার মাগো ;
গৃহকারা বন্দিনী স্বার্থের পণ্যা
প্রমোদের সঙ্গিনী আভরণ গণ্যা
অধিকার বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো
বাংলার ভগিনী বাংলার মাগো"—

দয়াময় কবিকে দীর্ঘজীবি করুন ইহাই প্রার্থনা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জেগে উঠে কি কাজ ক'রবো আমরা? সজাগ অবস্থায় কেউ কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারে না চোখের উপর হাজারো কাজ প'ড়ে রয়েছে, এলাহি-দত্ত হাত, পা ও মাথা নিয়ে কে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে থাকবে?

জাগতে হবে উঠতে হবে,
লাগতে হবে কাজে
মোদের লাগতে হবে কাজে ;—

কিন্তু কি নিয়ে কাজ ক'রবো? আমাদের শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, স্বাধীনতা নেই।

লোকে ব'লবে করবার ইচ্ছা থাকলে, বাধা বিপত্তি কেটে যাবে।

এই বাধা বিপত্তি কাটিয়া নিতে অনেকখানি মানসিক বলের ও আত্মবলির প্রয়োজন।

প্রথমেই জানতে চাই কে বা কাহারা আমাদিগকে অধিকার বঞ্চিতা ক'রছে, কাদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হ'চ্ছি।

সমাজ? সমাজের নাম শুনলেই অনেক প্রশ্ন মনে ওঠে। কাদের দ্বারা সমাজ গঠিত হ'য়েছে, আমাদেরই স্বজনদের দ্বারা নয় কি?

যাদিগকে নিয়েই সমাজ গঠিত হোক, সমাজরূপী শয়নতানকে দমন ক'রতেই হবে।

অবলা, সরলা, প্রমোদের সঙ্গিনী হ'য়ে আর কতকাল রাক্ষসদের ভক্ষ্য হবে, আর কতকাল কামুকদের কামবহ্নিতে ইন্ধন জোগাবে?

জননী সুলভ স্নেহ মমতা অতলে বিসর্জ্জন দাও, পর্য্যাপ্ত পরিমানে জিনিসটা ওদিগকে দিয়েছ, অতি লোভে ওরা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

জন্মের পূর্ব্ব থেকেই বোধহয় শুনে আসছি—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ
পিতাহি পরমতপ।

বাস্তবিক কথাই তাই। ভ্রূণাবস্থা থেকে শিক্ষা পাচ্ছি, "পতি পরম গুরু", জার্ম্মানীর গচবুণীতে লেখা "পতি পরম গুরু", ম্যানচেষ্টারের শাড়ীর পাড়ে লেখা, "পতি পরম গুরু", তাছাড়া রুমালে তোয়ালের বর্ডারে, সিন্দুর কৌটায় ক'টা জিনিসেরই বা নাম ক'রবো ;

"যে দিকে ফিরাই আঁখি
প্রভুময় সব দেখি,—"

কিন্তু এই জুতাওয়ালা বেটারা কি পাষণ্ড গা ! অশিক্ষিত লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

জিজ্ঞাসা করি ভগ্নীগণ পিতা ও পতি দেবতার কাছে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য কতটুকু পেয়েছ।

আমি তোমাদের মুর্খ, নগন্যা বোন, কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কথা, আমি ভুক্তভোগী। সবাইকে নেড়ে চেড়ে দেখে হার মেনে ব'সে আছি।

আমাদের ভরসা কেবল পতিত পাবন। আর জননীগণ, জননীরা কন্যাদিগকে সুশিক্ষিতা করুন সুগঠিতা চরিত্রা করুন, ধর্ম্মপ্রাণা করুন, হাত, পা ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার ক'রতে শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বিনী ও আত্মনির্ভরশীলা ক'রে গড়ে তুলুন।

আর একটা উপসর্গ বিবাহ। হিন্দু মুসলমান মহিলাদের ও ঝোঁকটা প্রবল বলেই জানতাম। ওমা ! এখন দেখি শিক্ষিতা খ্রীস্টান ব্রাহ্ম মহিলাদেরও 'দিল্লির লাড্ডুর' নেশাটা বড় কম নয়।

বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রেত যখন পুরুষ প্রকৃতির মিলন তখন কাজটা একদিন না একদিন হবেই, সে জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন।

সংসার ধর্ম্ম পালন করবার উপযুক্ত ক'রে গড়েই তোলো আগে। হিন্দু সমাজ ছাড়া অন্যান্য সমাজে বিধবা [বিবাহ] থাকা সত্ত্বেও যে সব সমাজের অনেক বাল বিধবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করছে আর কুমারীরা তা কিছুদিন পালন ক'রতে পারে না ? খুব পারে, মা বাপ ক'রতে দিলে তো ক'রবে।

নারীত্ব সার্থক করবার সহস্র পথ আছে, বিবাহ ছাড়াও করবার কাজ অনেক আছে।

আছে—সে গুলাই না হয় আগে ক'রতে দাও।

সমবেত শক্তি না হ'লে কাজ হবে না। যার যতটুকু শক্তি তাই গিয়ে অগ্রসর হও, যার যেমন চরিত্র সে তাকে সে ভাবেই কাজে লাগাও।

সাধনা প্রকৃত হ'লে সিদ্ধি আপনা হ'তেই ধরা দেবে।

মুসলমান সমাজে অনেক মহিলা জমিদার আছেন, তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা যথেষ্ট আছে।

হিন্দু সমাজে অনেক শিক্ষিতা নারী আছেন। খৃষ্টান ভগিনীরা শিক্ষিতা ও স্বাধীনা।

ইহা সত্ত্বেও একটু বেশী আশা করি আমাদের সুশিক্ষিতা, কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্ম ভগিনীদের।

তাঁরা অনেক নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে, সহিষ্ণুতা ও একনিষ্ট সাধনা বলে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন।

কে কোন ধর্ম্মাবলম্বিনী তা দেখবার ভাববার, মোটেই আবশ্যক নেই, সব চেয়ে বড় ক'রে দেখতে ও ভাবতে হবে যে আমরা সকলেই একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্ট জীব।

আমরা নির্য্যাতিতা, লাঞ্ছিতা, অধিকার বঞ্চিতা নারীজাতি। সকলে প্রার্থনা ক'রবো, দয়াময়। আমাদের জীবন সফল ও সার্থক করো, মুক্তি এবং স্বাধীনতা দাও। (আমিন)

পিতা জ্ঞানদান ক'রেছেন ? জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন ? অপার্থিব পিতৃস্নেহের সহিত এমন কিছু পার্থিব জিনিস দিয়েছেন, যাতে পরপ্রত্যাশী না হ'য়েও তুমি বেঁচে থাকতে পারো ? বিদ্বান সচ্চরিত্র, হৃদয়বান লোকের হ'স্তে সমর্পণ ক'রেছেন ?

(কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতারা নমস্য)

পতি দেবতার কাছে কি পেয়েছ ? তোমরা তাঁদের সহধর্ম্মিণী গৃহিণী, সঙ্গিনী, সন্তানের মাতা, না নির্ব্বিবাদে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, লাথি ঝাঁটা ও সময়শীরে পাতের মাছটুকু, দুধটুকু পাবার প্রত্যাশী পোষা কুকুর বিড়াল বিশেষ ? না প্রমোদের সঙ্গিনী ?

ছি! ছি! আত্মহত্যা ক'রে অবসান ক'রে দাও এমন ঘৃণিত নারীত্বের।

(সুধী দম্পতির উপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক)

তোমরা ধনী জমিদারের কন্যা জজের স্ত্রী ; তোমাদের পিতার ও পতির লোচন তৃপ্তিদায়ক মর্ম্মর প্রাসাদ আছে, সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি আছে। আর আছ তোমরা— তাঁদের হীরা জহরৎ রাখার সচল সজীব আয়রণ সেফ বা নয়ন বিমোহন গৃহশয্যা!

তোমাদের কিছু আছে কি ? তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে তাঁরা জলের মত অর্থব্যয় ক'রেন, অনেক রসিকপ্রবর লালবাতিও জ্বালেন।

তোমরা স্বরাজখণ্ডে, অনাথাশ্রমে কিছু টাকা দান ক'রতে পারো ? একটা বালিকাবিদ্যালয় বা বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারো ? চোখের ওপর সহস্র সহস্র নারী সমাজের অত্যাচারে পেটের দায়ে পাপ ব্যবসা করছে তাদের জন্যে এমন কোনও কার্য্যশালা খুলতে পারো যাতে তারা অর্থকরী কাজ শিক্ষা ক'রে সাবলম্বিনী হ'য়ে পাপ ব্যবসা ত্যাগ করে ?

না, কিছু পার না তোমরা। তোমরা কপর্দকহীন ভিখারিণী, গৃহকর্ত্তার অনুগ্রহে প্রতিপালিকা পশু বিশেষ। দাসী হ'য়ে জন্মেছ আজীবন দাসত্বের বোঝাই বহন করবে।

বল, "না, কখনই তা করব না। পরিবর্তনশীল জগতে চিরদিন কারুর সমান যায় না।"

"যে পর্যন্ত্য কোন জাতি তাহাদের পরিবর্ত্তন না করে সে পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন করেন না।"

(কোরআন, সুরহ্‌বাদ।)

কেন আমরা চিরকাল দাসত্বের বোঝা বহন ক'রবো সমাজের আদেশে ? দুর্ব্বৃত্ত সমাজকে উপহাস ক'রে ভেঙে ফেল তার হাতে-গড়া লৌহনিগড়।

আর ঘুমিও না, চেয়ে দেখ আকাশের নীলিমায় লেখা রয়েছে, "কর্ম্ম ও শান্তি" পাখীর কাকলীতে শোনা যাচ্ছে, মুক্তির মাভৈঃ বাণী ! সুতরাং জাগো।

করবার অনেক কাজ আছে আমাদের, কিন্তু আমরা সুশিক্ষিতা নই, আত্মনির্ভরশীলা নই, স্বাবলম্বিনী ও স্বাধীন নই, আমাদের দ্বারা কি কাজ হ'তে পারে ? ফরাসী দেশের একজন কাউন্টেস বলেছেন :—

"হাতে যখন তোমার একটা পয়সা নাই তখন তোমার মনে স্বাধীনতা আসবে কিরূপে ?"

ঠিক কথা। আর্থিক স্বাধীনতা যাদের নাই তারা আবার কি কাজ করবে !

তাই ব'লে কি চুপ করে ব'সে থাকবে ? না তা করলে চলবে না ; জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে, পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার ক'রেও অর্জন করতে হবে।

পুরুষের কাছে চাইলেও পাবে না, দেবার ক্ষমতাও নেই তাদের, সে আমি আগেই বলেছি। আর দেবেই বা কোথা থেকে, তাদের যেমন শিক্ষা অর্থাৎ রাজপুরুষদের কাছে যেমন সম্মান স্বাধীকার তারা পাচ্ছে সেই রকমই দেবে তো। আহা ! ওরাই দয়ার পাত্র কিছু বলো না বেচারাদিগকে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে আমার বিশ্বজোড়া বোনরা ! তোমাদের এই নগণ্যা বোনের সবিনয় অনুরোধ রক্ষা করো, অন্যায় অধর্ম্মরূপ সমাজে সংহারিণী মূর্ত্তিতে একবার প্রকাশ হও দলিতা ফনিণীগণ। ভগিনী বাণীর আহ্বানে অশনি গর্জ্জনে সাড়া দাও আমার বিদ্যুল্লতা ভগিনীগণ !

*ধূমকেতু*, ২১শে আশ্বিন ১৩২৯

## আমাদের দাবী

উচিত কথায় আহম্মক রুষ্ট ; বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে, সেই ভয়ে অনেকে উচিত কথা বলতে ইতস্ততঃ করে ; আমি বলি, বিচ্ছেদ হ'লো তো ব'য়েই গেল। উচিত কথায় যে বন্ধু রুষ্ট হয়, ঘৃণার সহিত আমি প্রত্যাখ্যান করি তার বন্ধুত্বকে। তাতে ক্ষতি হয় হোক কিছু দুঃখ নেই, অন্তর দেবতার কাছে তো লজ্জিত হবো না সেই আমার যথেষ্ট।

উচিত ও সত্য কথার ফলে মদ্দা মেয়ে, জ্যাঠা মেয়ে জেনানার জয় ইত্যাদি নূতন নূতন কথা শুনতে পাচ্ছি। তাই ব'লে কি সত্য কথা ব'লবো না ? নিশ্চয়ই ব'লবো। এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অত্যাচারী নর-পীড়কদের দ্বারা নির্য্যাতিত হ'য়ে আসছি, এর কারণ কি ? প্রতিকার না ক'রলে অত্যাচার বাড়বে বই কমবে

না। প্রতিকারের চেষ্টা যে কেউ করেননি—তা নয়, তবে পচা-মড়া-খেকো কুকুর কি স্বভাব পরিবর্তন ক'রতে পারে ?

যুগে যুগে কত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, কত সমাজ-সংস্কারক জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। প্রতিকার তাঁরা ক'রেছিলেন কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। যাঁদের আবির্ভাবে মুক্তি ও শান্তির মলয় মারুত প্রবাহিত হ'য়ে শরীর মন স্নিগ্ধ করেছিল তাঁদের তিরোভাবে সেই মলয় সমীরই ভীষণ সাইক্লোনে পরিণত হ'য়ে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছিল।

পয়গম্বরদের যুগের ইতিহাসে শুনা যায়, যখন মানুষ নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, তখনই এক একজন পয়গম্বর অবতীর্ণ হ'য়ে তাহাদের ন্যায় ধর্ম্ম পথে পরিচালিত ক'রেছেন।

আরববাসিগণ যখন কন্যা হত্যা করা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগনিত করেছিল, তখন হজরত মহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবন ফাতেমা-ময় ক'রে দেখিয়েছিলেন কন্যা কিরূপ আদরণীয়া।

এইটুকু ক'রেই সন্তুষ্ট হননি, আইন দ্বারা পুত্র কন্যা সমান ক'রে গেছেন। কন্যা স্বামীগৃহে যাবে ব'লে বৈষয়িক ব্যাপারে একটু কম বেশী যথা এক পুত্র পিতার যতটা সম্পত্তি পাবে দুই কন্যায় ততটা পাবে। ইচ্ছা ক'রলে পিতা ত্যাজ্জপুত্র ক'রতে পারবে কিন্তু ত্যাজ্জকন্যা ক'রতে পারবে না।

বিদ্যা বা জ্ঞানার্জন করা নর-নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ; এস্থলে পুত্র কন্যায় ভেদাভেদ নাই।

ইহা সত্ত্বেও তাঁর নরাধম শিষ্যেরা পুত্রকে ভবপরের কাণ্ডারী এবং কন্যাকে আবর্জ্জনাস্বরূপ মনে করে।

পুত্র যথা সর্ব্বস্বের অধিকারী—কন্যা তথা পিতৃসম্পত্তির কপর্দ্দকে বঞ্চিতা।

পুত্রকে শিক্ষা দিতে অজস্র অর্থব্যয় করা হয়, কন্যাকে শিক্ষা দিতে মনেই থাকে না। যদিই বা কোন কর্ত্তব্যপরায়ন পিতা বড় বেশী করেন তো পাখীপড়ানর মত একটু কোরান পড়িয়ে কর্ত্তব্য পালন করার আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পিতা মাতা বুক ফুলিয়ে বলেন "মেয়ে খতম-কোরআন" কিন্তু স্বয়ং "খতম কোরআন"-এর একটা শব্দের, একটা অক্ষরের মানে বোঝেন না।

পুত্র যখন উকিল, এটর্নী, জজ হ'য়ে তেতলার ওপর চারতলা ওঠায়, তালুকের ওপর পরগনার মালিক হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সঙ্গে রাজদত্ত আরও কয়েকটা অক্ষর সংযুক্ত ক'রে সুখ সম্মানের উচ্চ শিখরে আনন্দে বিচরণ করে, তখন কন্যা জ্ঞানহীনা, মূর্খ, অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিতা হ'য়ে নিরানন্দ দাসীর জীবন যাপন করে।

অধিকাংশ স্বামী প্রেমেও বঞ্চিতা। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর পিতা হৃদয়বান সচ্চরিত্র লোকের পরিবর্ত্তে একটা মদপ্য-বেশ্যাসক্ত লম্পটের বা একটা ক্রুর হৃদয়হীন শয়তানের হাতে সঁপে দিয়েছে।

একটা বাঁধা গৎ শিখে রেখেছে, "মেয়ে বিয়ের যে খরচ হয় তাতেই সর্ব্বস্বান্ত

হ'য়ে যাই, আবার পয়সা খরচ ক'রে শিক্ষা দিই কোথা থেকে ; বিয়েয় যা দিই তাতেই ওর পাওনার বেশী হ'য়ে যায়।"

হৃদয়হীন, মূর্খ! মেয়ের বিয়ের খরচ ক'রে কার উপকার করো? দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলো গয়নায় জড়পুত্তলিকা গৃহসজ্জার উপকরণ ক'রে তোমারই মত একটা হৃদয়হীনের ড্রয়িংরুম সাজিয়ে দিয়েছ।

বিবাহ অর্থাৎ সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠা, তার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, তা দিয়ে যদি মানুষের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে, তাহলে বুঝতাম বিয়ে দিয়েছ। সারাটা জীবন তুষানলে দগ্ধ হবার জন্য হাত পা বেঁধে, অবোধ বালিকাকে অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দিয়ে পোড়ামুখে প্রচার ক'রছ, "মেয়ে বিয়ের দশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছি।" দূর নির্লজ্জ, হতভাগা!

একটা বিষয়ে কিন্তু হতভাগারা বড় গুরুভক্ত। কোন্ বিষয় জান? জীবনের উষাকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিত্য নূতন পত্নী গ্রহণ করা বিষয়ে।

তখন এমন মুচকে হেসে বলে "সত্তর বছর পর্য্যন্ত বিয়ে করা হজরতের আদেশ"। একথা সত্যি ব'লেই মনে হয় কারণ, তিনি তো জানতেন যে, বিশ্বস্রষ্টা উহাদিগকে কুকুরবৃত্তি দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন, আমরণ ও ঘৃণিত বৃত্তি ওরা ত্যাগ করতে পারবে না। সুতরাং অনেক ভেবে চিন্তে উপর আদালতের রায়ই তিনি বহাল রেখে গেছেন।

উহাদের গঠিত সমাজ, উহাদের মনগড়া নিত্যনূতন ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদিগকে তিল তিল ধ্বংস ক'রছে। যতক্ষণ না বিদ্রোহী হয়ে আমরা ওদের ভুল বুঝিয়ে দেবো, ততক্ষণ ওরা নিজেদের দুষ্কর্মের মাত্রা অনুভব ক'রতে পারবে না।

জ্ঞান হেন অমূল্য যত্নে বঞ্চিত করে ওরা আমাদের সর্ব্বনাশ করছে।

প্রায়ই ওরা আমাদিগকে দূর হয়ে যেতে বলে। বারবার উহা জেনেও কেন আমরা দূর হয়ে যাইনি, সে কথাও কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে।

সাহিত্য চূড়ামণি স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ডাক্তার লুতফর রহমান সাহেব বড় চমৎকার ভাষায় বলেছেন, "পুরুষ যেন নারীকে দূর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার কিছু না থাকে, তার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। পুরুষ যদি সত্যিই নারীকে দূর করিয়া দেয়, তবে যেন তাহাকে চোখে সব অন্ধকার দেখিতে না হয়। নারী দূর হইয়া যাইতে পারে না বলিয়া কত ব্যথা, কত অসত্য সে সহিয়া থাকে।"

কি চমৎকার সত্য কথা! মরণ আছে বলেই জীবনের আদর, নতুবা জীবনের মূল্যই থাকতো না। ওরা ভালরূপে জানে যে, দূর হয়ে যেতে আমরা পারবো না। সেই জন্য জোর গলায় দূর হয়ে যেতে বলে। যদি আমরা দূর হয়ে যেতে পারতাম, যাবার জায়গা থাকতো তাহ'লে কখনই ওরা মুখেই আনতো না ও কথা।

সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত বিনা রক্তপাতে ভাইকে যারা সূচ্যগ্রভূমী ছেড়ে দেয় না, তারা আমাদিগকে দেবে প্রাপ্য অধিকার!

"তীক্ষ্ণ সূচী মুখাগ্রেতে
ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে
নাহি দিব আমি।"

ভগিনীগণ! "কোহীনূরের মূল্য পাঁচ জুতি" পাঁচ জুতি মেরে কেড়ে নিই এস আমাদের প্রাপ্য অধিকার।

আর আমাদেরও সম্পূর্ণ ভুল। অধিকার চাই কার কাছে, না পুরুষদের কাছে। যাদের নিজেরই কোনও বিষয়ে অধিকার নেই, কাঙালদের প্রবৃত্তি নিয়ে যারা বড় হতে চাইছে, গোলামীর নাগ-পাশে শত রকমে আপনাদিগকে বেঁধে জীবনের আদর্শকে যারা ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক'রে ফেলেছে, আত্মা পর্য্যন্ত যাদের গোলাম হ'য়ে গিয়েছে তারাই দেবে আমাদিগকে অধিকার? মুক্তিদান ক'রবে তারা আমাদিগকে? পাগল না কি?

পোড়া দেশের দশাননরা দেবে আমাদিগকে সম্মান?

প্রকাশ্য রাজসভায় যারা পূজনীয় নারীকে উলঙ্গিনী ক'রেছিল, কারবালার মহাপ্রান্তরে জগতপুজ্যা শোকাতুরা মহিলাগণকে মস্তকাবরণহীনা (ওড়নাহীনা) করেছিল, মাতৃজাতিকে যারা রক্ত লোলুপা বাঘিনী বলতে কুণ্ঠিত হয় নাই (বর্ত্তমান সময়ে নারীর অপমান কহতব্য নয়) তারাই দেবে তোমাদিগকে সম্মান! মানুষের শ্রদ্ধা যে পায়না, সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। তাই আজ যুগে যুগের পুঞ্জিভূত অপমান, শুধু বাঘিনী নয়, ফণিনীও ক'রেছে আমাদিগকে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমানকারীদের হৃদয়ের রক্ত পান ক'রে শরম বেদনার উপশম ক'রবো, দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদগার ক'রে, দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জ্জরিত ক'রে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলবো।

*ধূমকেতু*, ২রা আশ্বিন ১৩২৯

## তথ্যসূত্র

১. প্রবন্ধ 'ভুল ভাঙ্গা'। মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরীর 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৩-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

২. সিদ্দিকা জামান ঢাকার ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের সহকারী গ্রন্থাগারিক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের স্ত্রী।

৩. নজরুলের ঐ দীর্ঘ কবিতাটি শুরু হয় এইভাবে :

মোহর্‌রমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরী,
কেন কারবালা-মাতম্ উঠিল এখনি আমায় ঘেরি?

# ছোটগল্পকার এম. ফাতেমা খানম
## ১৮৯৪-১৯৫৭

মমলুকুল ফাতেমা খানমের মৃত্যুর সাত বছর পর, ১৯৬৪ সালে, তাঁর সাতটি গল্প নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা থেকে। সংকলনের নাম দেওয়া হয় *সপ্তর্ষি*। প্রধানত যাঁর উদ্যোগে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সেলিনা বাহার চৌধুরী ছিলেন একাধারে 'বুলবুল' পরিবার এবং ফাতেমা খানমের উত্তরাধিকারী।[১] সেলিনা বাহারের বাবা হবীবুল্লাহ্ বাহার এবং পিসি শামসুন নাহার মাহমুদের যৌথ প্রচেষ্টায় *বুলবুল* পত্রিকা এবং প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। আর, ফাতেমা খানম ছিলেন তাঁর মা, আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর আপন মাসি, সেই সূত্রে তিনি ছিলেন সেলিনা বাহারের 'নানু' বা দিদা।

এই নানুর জন্যে সেলিনা বাহারের (বিয়ের পর 'জামান') মনে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল ; কলেজের টিফিনের পয়সা জমিয়ে রাখতেন তিনি, একদিন নানুর গল্প-সংকলন প্রকাশিত হবে বলে। কোথাও একটু খেদও জমেছিল যেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি তার খানিক আভাস দিয়েছিলেন—বুলবুল থেকে কতজনের বই বেরিয়েছিল, কেবল ফাতেমা খানমের বইটাই বেরুতে এত সময় লেগে গেল। 'পরিবেশ ও পরিচয় না থাকলে কখনো গুণের পরিচিতি ঘটে না। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও শামসুননাহার মাহমুদের জীবনে সে পরিবেশ ও পরিচিতির অভাব ঘটেনি। অভাব ঘটেছিল ফাতেমা খানমের জীবনে'—*সপ্তর্ষি*-র মুখবন্ধে সেলিনা বাহার চৌধুরী স্পষ্ট করে এই কথা বলেছেন।

শুরু থেকেই কি 'পরিবেশ' আর 'পরিচিতির' অভাব ছিল ফাতেমা খানমের জীবনে? না বোধহয়। তবে বাল্যকালেই এমনভাবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল, যে সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল তাঁর প্রতিকূলতার সঙ্গে চলা, চলতে-না-পারার দ্বন্দ্ব। সেটা ঘটেছিল ১৯০৬ নাগাদ, যখন বারো বছরের ফাতেমা খানমের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি পীরের পরিবারে। তার আগে পর্যন্ত ফাতেমা খানম লেখাপড়া, খেলাধুলো, ঘুরে বেড়ানর মধ্যে দিব্যি বড় হচ্ছিলেন।

১৮৯৪ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমার তছবিডাঙা গ্রামে ফাতেমা খানমের জন্ম হয়। বাবা রইসউদ্দীন আহমেদ ছিলেন রেলওয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর, চাকরিসূত্রে তাঁকে বাংলা বিহারের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। ছেলেবেলায় ফাতেমা খানমও বাবার সঙ্গে এ জায়গা থেকে সে জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইস্কুলে যাওয়া হয়নি যদিও, তবু বাড়িতেই নানা ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে মেধার চর্চা শুরু

হয়েছিল। রইসউদ্দীন আহমেদ স্ত্রী আখতারুন্নেসার জন্যে বাড়িতে মেম এনে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, মেয়ে ফাতেমাকে তিনি ব্রিচেস্ পরে ঘোড়ায় চড়তেও শিখিয়েছিলেন। বোধ করি তিনি বেশ স্বাধীনচেতা, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। একবার নাকি প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব তাঁর উপর পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করেছিলেন। এমন একজন মানুষ কেন যে মেয়ের বারো বছর হতে না হতেই মানিকগঞ্জের গড়পোতা গ্রামের পীর আবদুল গণির ছেলে আবদুর রহমানের সঙ্গে ফাতেমা খানমের বিয়ে দিয়ে দিলেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সেলিনা বাহার জামানও এই নিয়ে আক্ষেপ করছিলেন।

যে কারণেই রইসউদ্দীন এমন কাজ করে থাকুন না কেন, এ কথা সত্যি যে এই সময় থেকেই ফাতেমা খানমের জীবন নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। ফাতেমা খানমের স্বামী পেশায় ডাক্তার ছিলেন। 'শ্বশুরকুল শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। গল্পের বই হাতে দেখলেই গঞ্জনার অবধি থাকতো না। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিম পড়তেন। . . . অনেক সময় বিদ্রূপের ভয়ে তিনি উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে জলচৌকিতে বসে এক হাঁটুর ওপর খাতা রেখে অন্য হাঁটুর আড়ালে সেটাকে ঢেকে পেনসিলের সাহায্যে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর গল্পের মুসাবিদা করতেন। তাঁর প্রথম বয়সের পাণ্ডুলিপি সবই পেনসিলে লেখা।'[২]

বিয়ের কয়েক বছর পর তাঁর শ্বশুরের মৃত্যু হয়, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন নামে এবং ফাতেমা খানম স্বামীসহ আলাদা বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু স্বামীও যখন শ্বশুরের মতন পীরপ্রথার দিকে ঝুঁকে পড়ে ডাক্তারি ছেড়ে দিলেন, একদিকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অন্যদিকে স্বামীর সঙ্গে মন ও মতের অমিল, ফাতেমা খানম তখন ১৯২০ সালে ছেলেদের সঙ্গে করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আগা নবাব দেউড়ি স্কুল-এ শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। কয়েক মাস পর ফাতেমা খানমকে পোস্তা গার্লস স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ১৯২৬ পর্যন্ত চাকরি করেন। এরপর ১৯২৭-এ তিনি কলকাতার মুসলিম ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন, কিন্তু সেখানকার 'গর্বিতা হেডমিসট্রেসের' সঙ্গে বনিবনা হলো না বলে ঐ বছরেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে যোগদান করেন।[৩] ১৯২১ সালে (১৩২৮ বঃ) যশোর থেকে প্রকাশিত *ধ্রুবতারা* সাপ্তাহিক পত্রিকায় ফাতেমা খানমের প্রথম ছোটগল্প 'শেষ অনুরোধ' প্রকাশিত হয় ; পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন লেখিকার দূর সম্পর্কের দেবর, ডাঃ নবুল ওহাব।

ফাতেমা খানমের এই কর্মময় জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়ে যখন তিনি ১৯৩০ সাল নাগাদ গলস্টোন রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় ধীরে ধীরে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায় এবং জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশটা বছর তাঁর ঐরকম কর্মশক্তিহীন অবস্থায় কাটে। ফাতেমা খানমের

লেখিকাজীবনও প্রকৃতপক্ষে ঐ একটা দশকেরই—'শেষ অনুরোধ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, শেষ প্রবন্ধ 'তরুণের দায়িত্ব' ১৩৩৭-এ, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র বার্ষিক *শিখা*-য়। মাঝের সময়টাতে তাঁর গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার *মানসী ও মর্ম্মবাণী*, *মাতৃমন্দির* এবং *সওগাত* পত্রিকায়, ঢাকার *মাসিক সঞ্চয়*, *আল-ফারুখ* এবং *শিখা*-য়, রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত *যুগের আলো*-তে।

১৯২০ সালে ফাতেমা খানম যখন ছেলেদের নিয়ে একলা ঢাকায় চলে আসেন, সেই একই সময়ে তাঁর ছোট বোন কানিজ ফাতেমা হঠাৎ মারা যান। সেই বোনের মেয়ে আনোয়ারা (খুকি)-র তখন মাত্র দু বছর বয়স। আনোয়ারাকে ফাতেমা খানম নিজের সন্তানের মতন বড় করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর কাছেই তিনি রয়ে গিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ ও লেখক হবীবুল্লাহ্ বাহারের সঙ্গে আনোয়ারার বিয়ে হয়েছিল। ফাতেমা খানমের মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম থেকে সাহিত্যিক আবুল ফজল আনোয়ারা বাহারকে লিখেছিলেন, '. . . তোমার যা ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। তিনি না হলে তুমি তুমি হতে পারতে না, তোমার সমস্ত জীবন তাঁর হাতে গড়া বললে খুব কমই বলা হয়। . . . তিনি ছিলেন বলেই তুমি নির্বিঘ্নে লেখাপড়া ও চাকুরী করতে পেরেছো। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে তোমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাঁর সমস্ত সাধ-স্বপ্ন তোমাকে ঘিরেই দানা বেঁধেছিল।'[৪]

ফাতেমা খানমের সংগ্রাম-সংঘাত, 'সাধ-স্বপ্নে'র সন্ধান যত না তাঁর গল্প থেকে পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি জানা যায় তাঁর রোজকার পৃথিবীর দিকে একটু খেয়াল করে তাকালে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা গল্পেরই চরিত্র, গল্প বলার জন্যেই যেন তাদের গড়া। কিন্তু বোনঝি আনোয়ারা, নাতনি সেলিনা, আবুল ফজল, লেখক দিদারুল আলম, দেবর নূরুল মোমেন—যাঁরা তাঁর জগতের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় মানুষ ফাতেমা খানমকে।

*সপ্তর্ষি*-র নারী চরিত্রদের কাউকেই বোধ করি ফাতেমা খানম ঠিক তাঁর নিজের আদলে গড়তে চাননি। তারা সমাজ-নির্দিষ্ট পথে চলাচল করে, যে পথ স্বামী বা প্রেমিকের ভালবাসার ছায়ায় ঢাকা। যখনই একটু ছায়া সরে যায়, তখনই সেই মেয়েরা ব্যথায় কাতর হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পের নারীরা চামেলির মতন দৃঢ়চেতা হলেও, শেষ পর্যন্ত তারা নমনীয় নারী, খানিকটা যেন পুরুষমুখাপেক্ষী। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে ফাতেমা খানম আদৌ সহজে মুষড়ে পড়ার মানুষ ছিলেন না। তাঁর মধ্যে লড়াই করার একটা দারুণ ক্ষমতা ছিল। ফলে অসুন্দরকে তিনি সুন্দর করে তুলতে পারতেন। বিশের দশকের সেই নিরন্তর সংগ্রামের সময়, তাঁর ৮৮ নম্বর উর্দু রোডের সংসারে অভাব হয়ত ছিল, তবু তরুণ লেখক-বন্ধুদের আপ্যায়ন করার উপকরণ জোগাড় করতে তাঁর কখনও অসুবিধে হতো না।[৫] নিজে স্কুল কলেজে যাননি, কিন্তু খুকির (আনোয়ারা) জন্য 'বুড়ো বয়সে' কোচিং ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, পেন্টিং পর্যন্ত শিখতে শুরু করেছিলেন। নয়ত, তাঁর মনে হয়েছিল, 'সমাজের তাড়নায় তাকে শেখাবার আর উপায় করতে পারবো না।'[৬]

মনে মনে কি ফাতেমা খানম তাঁর গল্পের নারীদের মতনই একটা নিটোল, সুখী সংসার-জীবন আকাঙ্ক্ষা করতেন ? এ প্রশ্ন মনে জাগে, কিন্তু কোনও সদুত্তর মেলে না। তার কারণ, একদিকে যেমন ছিল তাঁর ছোটগল্পের মনগড়া জগৎ, অন্যদিকে বেগম রোকেয়া, ফজিলতুন নেসার মতন সাহসী, স্বাধীন নারীসত্তাদের প্রতি তাঁর মনে এক গভীর আবেগ ছিল। রোকেয়ার তিনি জীবনী লিখতে চেয়েছিলেন।[৭] আর ফজিলতুন নেসাকে একবার নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার সাধ ছিল ফাতেমা খানমের মনে।[৮] আনোয়ারা, আনোয়ারার মেয়ে সেলিনা—এঁদের মধ্যে তিনি হয়ত তাঁর নিজের স্বপ্নের সফলতা দেখতে পেতেন। একদিন সেলিনা বাহার কলেজ থেকে ফিরেছেন। তাঁর নানু তখন বেশ অসুস্থ। তবু তারই মধ্যে পেন্সিলের কাঁপা কাঁপা আঁচড়ে ফাতেমা খানম লিখেছিলেন :

প্রভাত সূর্য উদিল হের ললিত উজল রাগে
আঁধার যা কিছু চমকিত হয়ে সভয়ে বিদায় মাগে।[৯]

*সওগাত* সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবকে ফাতেমা খানম একবার লিখেছিলেন, 'আমার জীবনে এমন কোন অসাধারণতা নেই যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখার প্রয়োজন আছে. . .।' ফাতেমা খানমের জীবনযাপনের এই যে অনুচ্চকিত ভাব, এখানেই তাঁর অ-সাধারণতা। নয়ত তরুণ সাহিত্যিক দিদারুল আলমের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় তিনি এমনভাবে অস্ফুটে প্রকাশ করতে পারতেন না। সম্পর্কিত দেবর নূরুল মোমেনের সঙ্গে তাঁর 'ইন্দ্রনাথ-অন্নদাদিদির' সম্পর্কটিও ছিল বিরল, অ-সাধারণ। একবার নূরুল মোমেনকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, 'বাস্তবিক তোমার সঙ্গে যে ক'দিন গল্প করেছি মনে হয়েছে যেন সংসারের বাইরের ছেলেবেলার সেই হাল্কা লঘু মন নিয়ে খেলাঘরের মাঝখানে এসে ঢুকলুম।'

ফাতেমা খানমের ভাষায়, গল্প বলার ধরনে শরৎচন্দ্র, কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই প্রভাবের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করতেন।[১০] তাই বলে কি ঐ দুই মহীরূহের ছায়ায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন তিনি ? না বোধহয়। আর তার কারণ সম্ভবত নারী হিসেবে, মুসলমান সমাজের মানুষ হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান। সামান্য ডিটেলের কাজেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেন : 'দ্বিপ্রহরের নিঝুম রৌদ্রে সেই ক্ষুদ্র কক্ষে বই পড়িয়া, লেস বুনিয়া, ফুল তুলিয়া হেলেন অতি কষ্টে দীর্ঘ দিনগুলি দুই হস্তে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত। কেহ কলকাতা যাইবে শুনিলেই সে তাহার সহিত সেলিমের জন্য খাঁটি ঘি, খেজুরে গুড়, নেসেস্তার হালুয়া, মোরব্বা ইত্যাদির পুঁটলি বাঁধা আরম্ভ করিয়া দিত।'[১১]

আবুল ফজল বলেছিলেন, 'লেখিকা ফাতেমা খানম হয়ত খুব বড় ছিলেন না।'

কথাটা ঠিকই। কিন্তু তাঁর যুগের বিচারে, তাঁর পরিবেশের বিচারে, সমসাময়িক গল্প লেখিকাদের পাশে তাঁর স্থানও কি হতে পারত না? সীতা, শান্তা, শৈলবালার সঙ্গে সঙ্গে কি ফাতেমা খানমের নামটাও মনে আসতে পারত না?

ম.ভ.
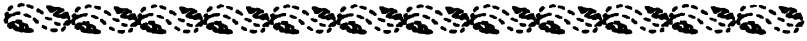
# চামেলী

আশৈশব পুরুষ-সঙ্গপ্রিয়, পুরুষবেশী চামেলী একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। পাড়ার লোক বলাবলি করিল, "একে তো রাঁধুনী মামার পেটে জন্ম, তাতে করে মির্জাপুরের গুণ্ডা ছেলেদের সঙ্গ, ও কোনদিন পর্দার আড়ালে থাকতে পারে?"

ছোট বিবি রা করিলেন না। আঘাত তাঁহার মর্মস্থলে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। গর্ভে তিনি ধারণ করেন নাই, কিন্তু গর্ভিনীর মতোই ছোট এতটুকু চামেলীকে মানুষ করিয়াছিলেন।

ছোট সাহেব কলিকাতার প্রায় প্রতি গলিতেই দিন কয়েক বৃথা মোটর দৌড়াইয়া বেড়াইলেন। কালের দুর্বার চক্রপেষণে ঋতুর পর ঋতু পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। চামেলীকে সকলে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এক হাতে একটা দশ টাকার নোট আর এক হাতে বেলুন এবং বাঁশের বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সলমু আসিয়া বলিল, "মা, চামেলী তোমাকে দশটা টাকা দিলে।"

"কোথায় কে চামেলী? যা, শীগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আয়।"

"চলে গেছে যে, মা।"

"দূর হতভাগা ছেলে, বাঁশী পেয়ে ভুলে গেলি, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি নে?"

"এল না তো। ঐ পটলদের বাড়ীর গলি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।"

"কিছু বললে না তোকে?"

"হুঁ বললে তো! টাকা নিয়ে মাকে দিয়ে আয়—আজ মাইনে পেয়েছি।"

মালেক চামেলীর বাল্যবন্ধু। চামেলীর সঙ্গে বিড়ি টানে, তাস পেটে, অনর্থক চেঁচামেচি করিয়া আড্ডা দেয়। পাড়ার আরো অনেক বয়াটে ছেলেও জুটিয়া পড়ে।

রাস্তায় ঢোল পিটিয়া গেল : আড়ার একজন মওলানার ওয়াজের মহ্‌ফেল।

চামেলীর দল বলিল, "আজ ওয়াজ শুন্‌তে হবে।"

কোরাণের একটা "আয়েত" আওড়াইয়া মওলানা অর্থ করিলেন, "ইসলামের বিশ্বাসভ্রষ্ট বিপথগামীকে পথে ফিরাইয়া আনা সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব।" মালেকের সতৃষ্ণ

দৃষ্টি বারবার পার্শ্বোপবিষ্টা চামেলীর মাথা হইতে পায়ের তলাবধি ঘুরিয়া গেল।

এই পথ-ভ্রষ্ট, পাঞ্জাবী-আঁটা, কোঁচা-দোলানো চামেলীকে সে আবার পবিত্র নির্মল ইসলামের বিরাট বক্ষে টানিয়া জড়াইয়া ধরিবেই ধরিবে।

আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেল। চামেলী নিরুদ্দেশ। মালেক ম্যাডান কোম্পানির ফিল্ম্-অপারেটার। চলচ্চিত্রের এক একটী দুঃসাহসী নারী-মূর্তি তার চোখে ফুটিয়া ওঠে, ঠিক যেন জীবন্ত চামেলী। মওলানার বক্তৃতা তাহার কর্ণরন্ধ্রে কামান দাগিয়া দেয়।

চাঁপা তালাবের একটা মোড়ে চামেলী কাগজের বাক্সের দোকান খুলিয়াছে, ছোট দুই তিনটী ছোকরা সাগরেদ লইয়া।

মালেক মুখ হইতে জ্বলন্ত বিড়িটা চামেলীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "চামেলী, আপিসে কাজ কবে ছাড়লি ?"

"ক—বে, পনের টাকা মাইনের দপ্তরীগিরি করে সাহেবের ধম্কি শোনে কোন্ শালা রে! এক দেখ্ না দোকান খুলেছি, স্বাধীন ব্যবসা করে আছি, মাসে বিশ-ত্রিশটা টাকাও পাচ্ছি।"

"ওঃ, তাই বুঝি দার্জিলিং গেছিলি, অর্ডার আনতে ?"

"হুঁ, শুধু দার্জিলিং ? দিল্লি, লাহোর, সিলোন, কত যায়গায় গেলুম, এই একবছরে।"

মালেক মুখখান একবার খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, "কতদিন আর এমন করে থাকবি, চামেলী, এবার একটা বিয়ে কর না ভাই।"

দুই পাটী দাঁতের গোড়াশুদ্ধ বাহির করিয়া চামেলী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে রে ?"

"ধর না কেন আমাকেই।"

রুষ্টভাবে চামেলী জবাব দিল, "বিয়ে করতে যাব তোকে! কেন ? কোন্ দুঃখে, আমি বুঝি মর্দ নই! ফের যদি ওকথা বলবি, তো জুতাশুদ্ধ পা তোর নসীবে ছুঁড়ে মারব।"

মালেক নিরাশ হইয়া ফিরিল। নকল খোলসটাকেই চামেলী সারা অঙ্গে আঁটিয়া, জড়াইয়া বাঁধিয়াছে। টানিয়া খোলা সহজ নয়।

"আম্মা, ও আম্মা!"

ছোট বিবি ফিরিয়া চাহিলেন। চামেলী আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা পুটুলি, তাহাতে দুইটা ফুলকপি, এক সের খাসির গোশ্ত, একটা মস্ত রুই মাছের মাথা। অনেক দিন মার হাতের রান্না খায় নাই, আজ খাইবে।

"চামেলী এলি রে, কি দোষে আমাকে ছেড়ে গেছিস, বাছা ?"

ছেলেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল, "চামেলী বু, আর যাসনে ভাই লক্ষ্মীটি।"

এ যেন বন্দীর কঠিন লৌহ-নিগড়ের ঝন্ ঝন্ শব্দ। সম্মুখে অসীম স্নেহ-মণ্ডিত মাতৃমূর্তি। চামেলী সভয়ে ফিরিয়া চলিল, একবার মাত্র সেই মহিমময়ী নারীমূর্তির চরণ স্পর্শ করিয়া।

"চামেলী, একটু দাঁড়া, খেয়ে যা।"

চামেলী শুনিল না। নিমিষে হ্যারিসন রোডের বিপুল মনুষ্য-তরঙ্গের তলায় তলাইয়া গেল।

তিন সপ্তাহের পর চামেলী চোখ মেলিয়া চাহিল। দৃষ্টিতে তার জীবন্ত ভাব আজই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। সুসময়ের বন্ধুরা সকলেই আপন নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে। শুধু মালেক তাহার দারুণ রোগশয্যায় অহর্নিশি বসিয়া, মৃত্যুর সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল।

আরো দুই মাস পর চামেলী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে। সকালে সে নিজেই বাজার করিল। রান্না করিল। মালেক খাইতে বসিলে আজ আর সে ভাল জিনিষটা কাড়িয়া খাইল না। পেয়ালার বাছা বাছা মাছ-গোশতের টুকরা দিয়া তাহার প্লেট পূর্ণ করিয়া দিল।

খাইতে খাইতে মালেক বলিল, "তুই আর রাঁধিস নে, চামেলী! আবার অসুখ-টসুখ করে নিলে মুশকিলে পড়ব।"

চামেলীর সাড়া নাই, সে যেন চামেলী নয়, আর কেহ। আহার-শেষে মালেকের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা চামেলী ফেলিয়া দিল, খাইল না।

মালেক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ফেলে দিলি যে চামেলী?"

"ও আর খাব না।"

রাত্রে ঘরে ঢুকিয়া মালেক চমকিয়া উঠিল। চামেলী—তার আজন্মের পুরুষ বেশ ছাড়িয়া—নারীর সাজে সাজিয়াছে। অতি সাধের টেরিকাটা সিঁথির উপর শাড়ীর আঁচল টানিয়া দিয়াছে। মাথায়, গলায়, হাতে ফুলের অলঙ্কার। যেন বিবাহ-বাসরে ব্রীড়ানত বধূ।

"চামেলী, তুই যে আজ মেয়েছেলের কাপড় পরেছিস? বাঃ, কি চমৎকার! এম্‌নি ক'রেই রোজ রোজ পরবি চামেলী? বল্ ভাই, আর কখনো ব্যাটাছেলের কাপড় পরবি না?"

অপাঙ্গে মধুর তীব্র দৃষ্টি হানিয়া চামেলী উত্তর দিল, "তুমি কি তাই হলে সুখী হও?"

বাহিরের নিবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া মালেক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, "হুঁ!"

*মাসিক সঞ্চয়,* মাঘ ১৩৩৬

# সাগর-সংযোগ

একটা হালফ্যাশনের ফুল-ফল-বৃক্ষের কেয়ারীযুক্ত শুভ্র সুন্দর বাংলোর দ্বারে দাঁড়াইয়া মুখুজ্যে মহাশয় গলার সমস্ত জোর ঝাড়িয়া ডাকিতেছিলেন—"হালিম ভায়া ! ও হালিম ভায়া ! একবার দোরটা খুলে দাও হে !"

রাত্রি তখন বারোটা। রেলওয়ে কর্মচারীদের সকল বাসাতেই নীরব সুপ্তির স্তব্ধ ছায়া নিবিড় হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল ভাগ্যানুগ্রহে সেদিন যাহাদের 'নাইট ডিউটি'র পালা, তাহারাই তখনও বিনিদ্র চোখে ট্রেন বিদায় করিয়া বাসার দিকে ছুটিতেছিলেন। অদূরগামী চলন্ত ট্রেনের ধুপধাপ, হুসহাস, ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ প্রকৃতি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছিল।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া মুখুজ্যে মহাশয় সবলে কপাটে করাঘাত করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটি তরুণী নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বার মুক্ত হইল। সদ্য নিদ্রোত্থিত সুন্দর যুবা হালিম সাহেব লণ্ঠন হস্তে দেখা দিলেন। অল্পদিন হয় ইনি সাব-ইঞ্জিনীয়ার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ষ্টেশনে সকলের নিকটই ইনি হালিম সাহেব বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয়ের জন্য অন্য নিয়ম ছিল। তিনি ছিলেন হালিম সাহেবের শ্বশুরের গ্রামের লোক। বয়সেও তাঁহার শ্বশুরের অনেক বড়। হালিম সাহেবের স্ত্রী ও শ্যালক-শ্যালিকাগণ তাঁহাকে 'ঠাকুরদা' বলিয়া ডাকিত। মুখুজ্যে মহাশয় নিজে একদিন সাগ্রহে এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং হালিম সাহেবেরও তিনি ঠাকুরদাই ছিলেন।

লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া, হালিম বলিলেন, "ঠাকুরদা যে ! এত রাত্রে ?"

"বেশ ভায়া, সে কথা কাল তখন হবে। এখন তোমার জন্য এই যে একটি ঝি জোগাড় করে এনেছি ; নিয়ে যাও।"

বিস্মিত হালিম লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে তরুণীর দিকে চাহিলেন। কি সুন্দর সেই শুভ্র লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি ! উজ্জ্বল আলোকপাতে তরুণীর শান্ত কোমল যৌবনদীপ্ত মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল। যে ঝি হইতে আসিয়াছে, সে যত বড় সুন্দরই হউক, অবগুণ্ঠনে সৌন্দর্য লুকাইবার ব্যর্থ প্রয়াস তাহার জন্য অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। তাহা বুঝিয়াই তরুণী অবগুণ্ঠন ললাট অবধি তুলিয়া দিয়াছিল। হালিম সাহেব চকিতে লণ্ঠন নামাইয়া রাখিলেন ; বহু দিনের রুদ্ধ স্মৃতির দ্বার খুলিয়া কে যেন সবল হস্তে তাঁহার সমগ্র বক্ষ নাড়িয়া দিয়া গেল। দুই হস্তে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে তিনি কহিলেন, "এত রাত্রে একে কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলেন, ঠাকুর্দা ?"

ঠাকুরদা তাঁহার কাঁচাপাকা কেশে ছাওয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "আর ভায়া, এ বুড়ো বয়সে কি এসব কুড়িয়ে পাওয়ার ভাগ্যি হয় ? তোমার ঠান্‌দিকে দেখতে গিয়েছিলুম, তিনি তোমার রান্না খাওয়ার কষ্ট শুনে একে জোগাড় করে দিলেন।"

শুষ্ক হাসিয়া হালিম সাহেব কহিলেন, "ঠান্‌দিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু এই যে. . ."

"ইয়ং লেডী! কেমন, ভায়া?"

"তাইতো ঠাকুরদা?"

"ভয় কি হে ভায়া, তুমি যে জিতেন্দ্রিয়। মনটি তোমার সর্বদা নীচু থেকে শত ফিট উঁচোয় তোলা।"

"কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এড়িয়ে চলাও তো কঠিন, ঠাকুরদা?"

ঠাকুরদা লণ্ঠনের আলোক ঘুরাইয়া যুবতীর মুখের উপর ফেলিলেন। এতগুলি অসঙ্গত বিদ্রূপলোচনার উত্তপ্ত তাপে তাহার ফুল্লশ্রী সহসা ঝলসিয়া গিয়াছিল। ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া তরুণী নতমস্তক আরো নত করিয়া লইল।

কৃত্রিম ক্রোধে দাঁত খিঁচাইয়া ঠাকুরদা কহিলেন, "সিলি ম্যান! তোমার তো ভারী সাহস হে! হালিম ভায়া, পেটের দায়ে ঝি হতে এসেছে বলে, তুমি একজন ভদ্রঘরের মেয়ের সম্বন্ধে যা-তা বকে যাচ্ছ। ও যদি আমার জাত হত, তাহলে কি আর তোমায় গছাতে আসি? এতক্ষণ মাথায় তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিতুম।"

অপ্রতিভ হালিম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "আচ্ছা, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না? আমার বাসায় তো মেয়েছেলে নেই, একা থাকতে ওঁর অসুবিধে হতে পারে।"

হাত নাড়িয়া ঝড় তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঠাকুরদা কহিলেন, "এই যে ভায়া, এত শীগ্‌গীর ডবল প্রমোশন দিয়ে ফেলেছ? এত চন্দ্রবিন্দু বেশী খরচ কোরো না হে, ও তোমার দাসী হতে এসেছে।" তারপর তিনি তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি সুড় সুড় করে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড় তো দিদি! এ ডেঁপো ছোঁড়াকে তর্কে হারানো যাবে না।"

কিন্তু তরুণী নড়িল না। নিশ্চল জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মহা বিরক্ত হইয়া ঠাকুরদা কহিলেন, "কি মুস্কিল! এই দুপুর রাত্রে এমন সুন্দর মেয়েটাকে শেয়াল-কুকুরের জিম্মায় রেখে যাব নাকি হে ভায়া? ঘরে যেতে বল না ওকে।"

চিন্তাচ্ছন্ন মলিন মুখে চাহিয়া হালিম সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, এসো তবে ভেতরে।" লণ্ঠন তুলিয়া লইয়া তিনি সরিয়া গেলেন। তরুণী ধীর পদে ভিতরে প্রবেশ করিল। বাহিরে ঠাকুরদা হাঁকিয়া কহিলেন, "ভেবে না হে ভায়া! এ বুড়ো বামুনকে চিনবে তখন, যখন এই সতী লক্ষ্মী মেয়েটির ছোঁওয়া পেয়ে তোমার মাটির মন সোনা হয়ে উঠবে।"

হালিম সাহেব ততক্ষণ শয্যায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন।

রাতে গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত পাইয়াও হালিম সেদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। এদিক ওদিক ঘুরিয়া অফিসের "ডাক" দেখিলেন। দুই একটি জরুরি কাজের তাগিদ ও কেরাণীর কাগজের তাড়ায় দস্তখত করিয়া তিনি যখন বাংলোয় ফিরিলেন তখন নূতন ঝিয়ের বাসি কাজ সারা হইয়া গিয়াছে। গৃহদ্বারে পা রাখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বাংলোটি আজ যেন নবজীবন লাভ করিয়া বিমল আনন্দে

হাসিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তিনি একটির পর একটি কক্ষ পার হইতেছিলেন। ড্রইং রুম ও পড়িবার ঘর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। রাইটিং টেবিল, ব্র্যাকেট, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি সবগুলি জিনিষের উপরই এই তরুণী একটা সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। দুখানি সুরুচিমার্জিত নিপুণ হস্তের সযত্ন স্পর্শের সাক্ষ্য যেন সমস্ত জিনিষগুলির গায়ে সগর্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথার নীচে দুইখানি হাত রাখিয়া হালিম সাহেব সটান সোজা সোফার উপর শুইয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার অর্ন্তদৃষ্টির সম্মুখে একা নিঃসঙ্গ জীবনের নীরস দৃশ্য অতি শুষ্ক বীভৎসাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। যাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষার গৌরবে এতকাল তিনি এড়াইয়া চলিয়াছেন, আজ তাহাকেই পাইবার জন্য হৃদয়ের কোন দূরপ্রান্তে একটা লুব্ধ বাসনার ক্ষীণ তৃষ্ণা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ হয়ত এইরূপ স্তব্ধভাবেই কাটিয়া যাইত, কিন্তু সহসা বিহারী বালক ভৃত্যের আহ্বানে চমক ভাঙিয়া গেল।

"নাস্তা তৈয়ার হো গিয়া, হুজুর।"

"তৈয়ার হো গিয়া ?" স্বপ্ন ভাঙিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আহারের কামরায়, টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া, তরুণী বিস্কিটে জেলি মাখাইতেছিল। হালিম চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। চা, বিস্কিট, পনির, পরাটা, হালুয়া, কোপ্তা, এমন সলিকা-সমন্বিত সভ্যতার সহিত রক্ষিত হইয়াছিল যে, দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। এক-বৎসর যাবৎ এই খোট্টা চাকরটিকে প্রাণপণে শিখাইয়াও তিনি তাঁহার মনোমত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

নাস্তা করিতে বসিয়া তিনি খুসিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ে সব্ বাবুর্চিনে বানায়া ?" সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "নেই হুজুর, মায়িজী নে বানায়া।"

বিস্ময়ে হালিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়িজী কোন্ ?"

তরুণী ছায়ার মতো ধীর পদসঞ্চারে চলিয়া যাইতেছিল ; তাহাকে নির্দেশ করিয়া খুসিয়া কহিল, "ইয়ে মায়িজী।"

ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "মায়িজী কহ্নে কিস্নে বাতায়া ?"

ভীতকণ্ঠে খুসিয়া কহিল, "হুজুর, মুখুস ঠাকুর নে সুবেরে আকে হামকো আউর বারোরচিকো ইয়ে বাত কহ্ দিয়া।"

চট করিয়া এক রাশ রক্ত হালিমের মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল। যেন আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, "একি অত্যাচার ! ঠাকুরদা আমায় পাগল করে ছাড়বে দেখ্ছি।"

তখন সূর্যদেব দিকচক্রবালের শেষ প্রান্তে সান্ধ্য শয্যা রচিয়া লইতেছিলেন। "ড্রইংরুমে" আরাম-কেদারায় শুইয়া মুখের উপর বই খুলিয়া হালিম সাহেব নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিলেন। পেছন হইতে ঘরে ঢুকিয়া তরুণী কহিল, "উঠুন, অসময়ে পড়তে নেই, সন্ধ্যে হয়ে এল।"

প্রীতিতরল দৃষ্টিতে আজ তিনি প্রথম তরুণীর দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "উঠবো উঠবোই ভাবছিলুম।" তারপর কি একটা বলি বলি করিয়াও বলা হইল না।

মৃদু মধুর হাসিয়া তরুণী কহিল, "কিছু বলবেন?"

একটু থামিয়া হালিম সাহেব কহিলেন, "হ্যাঁ, অবসর-অভাবে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলা হয় নাই। কি নাম আপনার? জানতে দোষ আছে কি?"

হাসিয়া তরুণী কহিল, "যে ঝি-গিরি করতে এসেছে, তার নাম জান্‌তে কি দোষ থাক্‌তে পারে? কিন্তু দয়া করে আপনি আমায় "আপনি" সম্বোধন করবেন না।"

একটু অপ্রতিভভাবে হালিম কহিলেন, "বেশ, কি নাম তোমার?"

নামের ভিতরে বংশ-পরিচয়ের আভাষ পাইবার আশাই যে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, তরুণী তাহা বুঝিল। তাই আসল নাম গোপন করিয়া ঘুরাইয়া বলিল, "আমার নাম পরী।" একটা দুষ্ট হাসি পরীর ওষ্ঠে নিমেষে নৃত্য করিয়া মিশিয়া গেল। আর কোন কথা হইল না, বইখানা পরীর হস্তে দিয়া হালিম উঠিয়া পড়িলেন।

অফিসের কেরাণী হইতে "ট্রলিম্যানরা" পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিল, আজকাল তাহাদের সঙ্গে সাহেব যেন সর্বদাই উদাস, অন্যমনস্ক, অথচ ধীর, নম্র, ক্ষমাশীল হইয়া পড়িয়াছেন। ষ্টেশনের 'বাবু'রা এ ভাবটির সহিত আরো একটি নূতন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। হালিম সাহেবের কৃশ কান্তি ক্রমশঃ হৃষ্ট পুষ্ট সুঠাম হইয়া উঠিতেছে।

একদিন ঠাকুরদা হাসিয়া কহিলেন, "কি হে ভায়া! বুড়ো বামুনকে চিন্‌তে পেরেছ?"

হালিম সাহেব হাসিয়াই উত্তর করিলেন, "একটু একটু।" তারপর কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠান্‌দি যে মেয়েটি পাঠিয়েছেন, সে কি সত্যি ঝি?"

ঠাকুরদা উচ্চশব্দে হাসিয়া কহিলেন, "তা নয়তো আর কি হে, ভায়া?" একটু গম্ভীর হইয়া পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু সে ঝি হলেও ভদ্রঘরের মেয়ে। সর্বদা এ কথাটা মনে রেখো ভায়া।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া হালিম যেন কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, ঠাকুরদা বিষম কাজের অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

সেদিন জমিদার-ভবনে নৃত্য ও সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি প্রায় একটায় তথা হইতে ফিরিয়া হালিম দেখিলেন, পরীর শয়নকক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছে। নিশ্চয় সে জাগিয়া আছে। কৌতূহল-পরবশ হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া তিনি দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া জানালার ফাঁকে দেখিলেন, সত্যই পরী তখনও জাগিয়া তাহার উপাধানের উপরে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্রের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া আছে। ঈষদ্ধাস্যে পরীর রক্ত-ওষ্ঠ উদ্ভাসিত।

অৰ্দ্ধ মুক্ত কপাট ঠেলিয়া হালিম ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

"একি ! তুমি ইংরাজী কাগজ পড়তে পার, পরী ?"

ত্রস্তে কাগজ ফেলিয়া দাঁড়াইয়া পরী বলিল, "কই না, কি সুন্দর ছবি দিয়েছে, তাই দেখছিলুম।"

হাসিয়া হালিম কহিলেন, "ও কৈফিয়ত তো আমি মঞ্জুর করব না, পরী ? আজকের কাগজে একটা সংবাদ আছে। একজন ইহুদী নারী তাঁর পীড়িত স্বামীর নিকট "বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব" বলে সন্ধ্যার সময় বাইরে যান। কিন্তু যখন সমস্ত রাত আর ফিরলেন না, তখন তাঁর স্বামী সন্ধান নিয়ে জানলেন যে, কোন একজন লোকের সঙ্গে তাঁর গত রাত্রে বিবাহ হয়ে গেছে। সংবাদের সম্পাদক বেশ রসিকতার সঙ্গেই টিপ্পনি কেটে গেছেন, যা পড়ে হাসি চেপে রাখা দায়। আমি দেখেছি, ঠিক সে জায়গাটিতে তোমার চোখ ছিল ; আর তুমি হাসছিলে।"

হাসিয়া মাথা নাড়িয়া পরী কহিল, "ভুল বুঝেছেন আপনি, ঠান্‌দির কাছে ছোটবেলা একটু একটু বাংলা শিখেছিলুম। আপনি বোধহয় প্রবাদ শুনেছেন, আমাদের বিক্রমপুরের জোলাদেরও অক্ষর-পরিচয় আছে। তবে তেমন ভাল জানলে, বা ইংরাজী জানলে তো কোন একটা মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হতে পারতুম। আপনার এখানে ঝি হতে কেন আসব ?"

কথার শেষ পংক্তিটি হালিমের প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এও এক সমস্যা। যাক, কিন্তু এতগুলো চেয়ার থাকতে তোমার ঘরে কেন একখানা রাখ না পরী ?"

"কি দরকার বলুন ? আপনি তো আর এসে বসবেন না। আচ্ছা চলুন আপনার বসবার ঘরে ; আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।"

যাইতে যাইতে হালিম কহিলেন, "আমি ছাড়া আর কারো কি চেয়ারে বস্‌তে নেই পরী ? একটা টেবিল, দুখানা চেয়ার তোমার ঘরে এনে রেখ ; আমি তোমায় একটু একটু ইংরাজী পড়াব ?"

একি অপ্রত্যাশিত আশার অভিব্যক্তি ! অযাচিত করুণার আশ্বাস ! পরী নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

গায়ের কোটটা ব্র্যাকেটে ঝুলাইয়া রাখিয়া হালিম ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন। পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পরী কহিল, "দিন, আমি জুতা মোজা খুলে দি।"

টাই-পিনে অঙ্গুলি চাপিয়া হালিম কহিলেন, "না—না তুমি কেন ? খুসিয়াকে ডাকি।"

নতমুখে ফিতা খুলিতে খুলিতে পরী কহিল, "সেও চাকর, আমিও চাকর, খুললে দোষ কি বলুন !"

টাইটা চেয়ারের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া হালিম ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিলেন। একটু পরে চোখ মেলিয়া কহিলেন, "কিন্তু খুসিয়া তো মাইনে নিচ্ছে, তুমি তো নিচ্ছ না পরী ?"

"আপনি তো দিচ্ছেন না ? ভয় হয়, পাছে মাইনে চাইলে তাড়িয়ে দেন। তাই নিই না।"

গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে হালিম কহিলেন, "তাড়াতে যদি পারতুম পরী ?" একটু থামিয়া কি ভাবিয়া আবার বলিলেন, "কত নেবে তুমি ?"

"যত দেবেন আপনি।"

"এ মাস থেকে আমার যত টাকা পয়সা সব তুমি রাখ পরী। নিত্য বাজার খরচের ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না!"

"আমি যদি চুরি করি ?"

"কর তোমার যা খুসি ?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরী কহিল, "আচ্ছা, বেশ। বলুন তো, নেমন্তন্যে কি খেয়ে এলেন ?"

ধা করিয়া উঠিয়া বসিয়া হালিম কহিলেন, "কিছু খাইনি তো পরী, কিন্তু ওকথা তোমায় বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম।"

পুলক-স্পন্দিত মধুর হাস্যে পরী কহিল, "স্কুল-কলেজে আপনার স্মরণশক্তির খুব সুনাম ছিল কিন্তু।"

হালিম বিস্মিত হইলেন। মুহূর্তকাল নির্বাকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা ছিল বোধহয়, কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?"

"গণনা করে। যাক সে কথা, খেলেন না কেন, বলুন তো ?"

হালিম আবার মুদিত চোখে শুইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "বড়লোকদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে খেতে রাত বারোটা-একটা হয়, তাতে তাঁরা আহার্য জিনিষের চেয়ে, মদ ব্র্যান্ডির জোগাড়টাই অনেক বেশী করেন ; বিশেষতঃ নাচের মজলিসে ওটার বিষম আয়োজন হয়। সে কি বীভৎস কাণ্ড, দেখলে মানুষ মাত্রই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই পালিয়ে এলুম।"

শুনিতে শুনিতে পরীর লাবণ্যস্ফুরিত মুখখানি অপরিমিত শ্রদ্ধায় রক্তিম হইয়া উঠিল। স্ত্রী-বন্ধনহীন, অপূর্ব সংযমশীল এই তরুণ যুবার চরণতলে তাহার সমগ্র হৃদয় ভক্তির পুষ্পাঞ্জলির মতো লুটাইয়া পড়িল।

নিদ্রা-বিজড়িত, অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে চাহিয়া হালিম কহিলেন, "আশ্চর্য! ঠাকুরদা কিন্তু বুড়ো বয়সেও ওসব সঙ্গ পেলে মেতে ওঠেন।"

সে কথায় কান না দিয়া, অতি সাবধানে অতি ত্রস্তে পরী তাহার মাথাটি হালিমের পায়ে ঠেকাইয়া উঠিয়া কহিল, "না খেয়ে ঘুমুতে পারবেন না কিন্তু। আমি আধ ঘণ্টার ভেতরে আপনার খাবার জোগাড় করে আনছি, আপনি ঘড়ির পানে চেয়ে থাকুন।

সহসা কিসের প্রবল ধাক্কা খাইয়া তাহার তন্দ্রার নেশা ছুটিয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না—না, কিছু করতে হবে না, পরী। একটু হালুয়া থাকে তো তাই নিয়ে এস।"

"তাই নিয়ে আসছি, আপনি খাবার কামরায় যান।"

আধ ঘণ্টার ভিতরে, চার পাঁচ প্রকারের ব্যঞ্জনসহ, যখন সজ্জিত অন্নের খাঞ্চা লইয়া পরী ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার পূর্বের সে মূর্তি আর ছিল না। হৃদয়ে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা থামিয়া গেছে। সেখানে এখন শুধু স্নেহ, প্রীতি, প্রেমের উৎস নীরবে বহিয়া যাইতেছে। তাই সেই তরুণ যৌবনদীপ্ত চঞ্চল সৌন্দর্যময়ী নারী মূর্তিটিকে শান্ত, সৌম্য, সেবাপরায়ণা, অপূর্ব নারীত্বের পবিত্র মহিমায় মহিমময়ী দেবীর মতো দেখাইতেছিল। চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হালিম মুগ্ধ বিহ্বল চোখে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "আমি তো খাব না পরী। আধ ঘণ্টার দু মিনিট বেশী হয়ে গেছে।" হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঠিক দু মিনিট দশ সেকেন্ড।"

খাঞ্চা নামাইয়া রাখিয়া পরী কহিল, "সেটা তো আমার রাঁধার দোষে নয়, বাড়ার দোষে।"

সে কথা যেন শুনিতেই পান নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া হালিম নিশ্চিন্ত আরামে মুদিত চোখে পড়িয়া রহিলেন। একটু সরিয়া আসিয়া চেয়ার খানা সবলে ঝাঁকিয়া দিয়া পরী কহিল, "খাওয়া ফেলে চোখ বুঁজে ভাবছেন কি ? অপরাধের কি শাস্তি দিতে হবে আমাকে।"

"না, ভাবছি অনর্থক তুমি অত কষ্ট করছিলে ?"

"আর আপনি খুব আরামে ছিলেন ?"

"না, কিন্তু বে-আরামও বেশী নয়, কারণ তোমার মতো দুটো উনুন জ্বেলে, অনর্থক দোজখের তাপ সইতে হয় নি !"

"কিন্তু জঠরের তাপ সইতে হয়েছে নিশ্চয়ই ?" তারপর একটু বিরক্তিভরে পরী বলিল, "নিন—হয়েছে, এখন উঠুন, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বুঝি।"

অগত্যা তাঁহাকে উঠিতে হইল। আহারশেষে পানের খিলি হাতে লইয়া তিনি যখন শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শীতের প্রভাতের কনকনে বাতাস কাঁপাইয়া আজানের পবিত্র মধুর শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। পরী কহিল, "আর শুয়ে কাজ নেই। আজ শুক্রবার, নামাজ পড়ুন।"

"নামাজ ! ও কাজটা তো আমি কখনও করি নাই, পরী।"

"কেন ? বিশ্বাস হয় না বুঝি ?"

"নিশ্চয় ! নইলে জাহান্নামে যেতে হবে যে !"

"তবে আসুন ! পড়ুন।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হালিম কহিলেন, "অদ্ভুত আদেশ ! বোধহয় ভুলেও গেছি।"

স্নিগ্ধ হাসিয়া পরী কহিল, "আদেশ নয়। মিনতি, প্রার্থনা। আসুন, ভুলে গেলে আমি মনে করিয়ে দেব।"

পরীর আশ্চর্য আধিপত্যের প্রভাব হালিমের সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গিয়াছিল। তাহার একটি অনুরোধও তিনি এড়াইতে পারিলেন না।

সপ্তাহব্যাপী 'টুর' হইতে মুক্তি পাইয়া দশটার ট্রেনে হালিম সাহেব বাসায় ফিরিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে সমস্ত অস্থি-শিরার সংযোগ-স্থল যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর আহার সারিয়া তিনি সদ্যাগত একখানা সংবাদপত্র হস্তে শুইয়া পড়িয়াছেন। পার্শ্বে বসিয়া পরী ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে। তাহার প্রফুল্ল মুখখানা আজ নিবিড় চিন্তায় আচ্ছন্ন। উদাস অন্যমনস্কভাবে সে হালিমের শ্রান্তি-কালিমা-যুক্ত মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিল।

হালিম সাহেব সংবাদপত্রের সবগুলি বড় বড় অক্ষরে দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। পরী কহিল, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন এইবার।"

"কিন্তু ঘুম তো কিছুতেই পাচ্ছে না পরী ? তুমি বোধহয় পাখা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ?"

সলজ্জ নম্র দৃষ্টি তুলিয়া পরী কহিল, "সারা রাত বাতাস করলেও ক্লান্ত হব না। কিন্তু অমন করে কাগজের দিকে চেয়ে চেয়ে আপনার ক্লান্তি বাড়বে ছাড়া কমবে না।"

"থাক, পড়ব না। তোমার গল্প শুনব, কেমন পরী ? অনেকদিন শুনিনি।"

পরী উত্তর করিল না। অন্তরে অন্তরে আহত হইয়া নীরবে দৃষ্টি নত করিল।

"তুমি রাগ করেছ পরী ?"

পরী তবু কথা কহিল না, শুধু মুখ তুলিল। বোধ হইল যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, "একটা বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ?"

"কর।"

"সত্য উত্তর দেবেন ?"

"যদি সে বিষয় আমার জানা থাকে, নিশ্চয় সত্যই উত্তর দেব।"

"নিশ্চয় জানা আছে।" বলিতে বলিতে পরী উঠিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া হালিম সাহেবের দুইখানি পা কোলে তুলিয়া লইল। একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "এইবার বলুন, সত্য বলবেন ?"

হালিম সাহেব চকিতে চোখ বন্ধ করিলেন। তাঁহার পায়ের তলা হইতে মেরু গ্রন্থির শেষ প্রান্তাবধি সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দু মাস তিনি পরীর সংসর্গ ভোগ করিতেছিলেন। সারা রাত্রি পরীর গল্প শুনিয়াছেন। পরী তাঁহার জুতা মোজা খুলিয়া দিয়াছে, পরাইয়া দিয়াছে, তবু যেন অন্তরে অনেকদূর ব্যবধান রাখিয়াছে। মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছে, তবু যেন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ছোঁওয়া লাগার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিয়াছে। আজ এ কি অসম্ভাবিত অভিনব নৈকট্য ! পরীর বক্ষ সংলগ্ন তাঁহার পায়ের অগ্রভাগে পরীর দ্রুত হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল। কণ্ঠস্বর প্রাণপণে স্বাভাবিক রাখিয়া তিনি কহিলেন, "তোমাকে ছুঁয়েই বলছি পরী, যতটা জানি, সমস্তই সত্য বল্‌ব।"

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া পরী বলিল, "আপনি বিয়ে করেছেন ?"

চোখ মেলিয়া হাসিয়া হালিম সাহেব বলিলেন, "এই বিষয় ? বাঙালীর ছেলে কখনও পঁচিশ বৎসর বয়সেও বিয়ে না করে থাকে ?"

"আপনার স্ত্রী আছেন ?"

খানিক ভাবিয়া হালিম কহিলেন, "খুব সম্ভব আছে।"

'আশ্চর্য! আপনি কি খোঁজ রাখেন না ?"

হালিমের মুখভাব পরিবর্তিত হইল। অন্যমনস্কের মত বলিলেন, "হ্যাঁ—না, কিন্তু তোমার সে কথা শুনে কি হবে, পরী ?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া পরী বলিল, "আমার মনিব, যিনি মানুষ হয়েও চরিত্রবলে দেবতা, তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হয় না কি ?"

"হয়। কিন্তু মনে কর সে মরেই গেছে।"

হাসিয়া মাথা নাড়িয়া পরী বলিল, "না—না জ্যান্ত মানুষকে মরা শুধু পুরুষেই ভাবতে পারে ; কারণ অবিচারে তারা স্ত্রী পরিত্যাগও করতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমরা পারি না।"

হালিম সাহেব শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "তোমায় সমস্ত বলব বলে বোধহয় প্রতিশ্রুত হয়েছি, নয় পরী ?"

প্রীতিকোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া পরী কহিল, "হয়েছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন বোধহয় ?"

"না, শোন। অনেকদিনের কথা ; আমার বয়স তখন বারো। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন গরীব। সৈয়দ বংশের ছেলে। বংশমর্যাদায় অনেক বড়। শ্বশুর ছিলেন বড়লোক। বংশমর্যাদায় অনেক ছোট। দুজনাই পাশাপাশি গ্রামের লোক। স্কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রতি বৎসর আমিই পেতুম। বোধহয় সেই লোভেই শ্বশুর তাঁর মেয়ে নইম খানম-এর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন। আমার স্ত্রী তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের। শেষ পর্যন্ত পড়ার খরচ চালাবেন প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাবা বিবাহে সম্মতি দেন। তিন বছর তিনি আমার খরচ চালিয়েছিলেন। আমি যখন আই এস-সি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি তখন থেকেই তিনি আমার খরচ ক্রমে বন্ধ করেন। কিন্তু আমি এনট্রান্সে জেনারেল বৃত্তি পেয়েছিলুম। একজন দূর সম্পর্কের মামাও কিছু সাহায্য করতেন ; এমনি করে খরচ চলে গেল। পরীক্ষা দিয়ে এবারও জেনারেল বৃত্তি পেলুম। বাবা তখন আমায় শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন। তুমি বোধহয় জান না, সেখানে খরচ অনেক বেশী। এই সময় মামাও খরচ বন্ধ করলেন। বৃত্তির টাকায় কিছুতেই আর চলছিল না। বাবা তখন অনেক কষ্টে আমার স্ত্রীকে এনে, তার গহনাগুলি বিক্রি করে, সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিলেন। আর তা থেকেই প্রতি মাসে আমার খরচ দিতে থাকলেন! আমার স্ত্রী আমাদের বাড়ী সেইবার প্রথম এসেছিল। ছোট ছিল বলে তাকে, শ্বশুর আসতে দিতেন না। বোধহয় সেই রাগে বাবাও আমায় সেখানে যেতে দিতেন না। যাক্, ক্রমে আমার শ্বশুরের কানে গহনা বিক্রয়ের কথা যায় ; এবং তিনি এসে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যান। আমি এই সমস্ত

কিছুই জানতুম না। শ্বশুর আমার বাবাকে অনেক অকথ্য ভাষায় পত্র লেখেন, বাবা তবু কিছুদিন পরে আবার আমার স্ত্রীকে আনতে যান। কিন্তু শ্বশুর তাকে ছেড়ে দিলেন না। অধিকন্তু অভদ্রের মতো বাবাকে যথেষ্ট অপমান করে দিলেন। আমি তখন শিবপুর, বাবা পত্রে আমায় সমস্ত বিষয় জানালেন। কলেজ বন্ধ হলে আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে আনতে গেলুম। তখন শ্বশুর রাজশাহী বদলী হয়ে এসেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, যা লোকে চাকরের সঙ্গেও করে না। একটিবার তিনি আমার স্ত্রীকে দেখতেও দিলেন না। আমি তাকে কেবল বিয়ের সময়ই দেখেছিলুম। তুমি বুঝতেই পারছ, কত বড় অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল। এক বৎসর পর ব্যাঙ্কের টাকা ফুরিয়ে গেল, অতি কষ্টে একটা চাকুরীও পেলুম। সে আজ সাত বছরের কথা। বাবা-মা সকলেই অনেক চেষ্টা করেছিলেন, যাতে আমি আবার বিবাহ করি। কিন্তু বিবাহে আমার বড়ই বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। আমি কিছুতেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলুম না। মা এখন জান্নাতে। তিনি মৃত্যুশয্যায় আমায় অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন, যেন জীবনে শ্বশুর বা তাঁর মেয়ের নাম আমি মুখেও না আনি। এক বছর হয়, বাবাও মা'র অনুসরণ করেছেন। তিনিও ঠিক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন।"

কথা শেষ হইল। হালিম সাহেব হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। পরী সমস্তই জানিত। কেবল হালিম সাহেব তাঁহার শ্বশুর ও স্ত্রী সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাহাদের ব্যবহার তিনি অতিরঞ্জনবিহীন সত্যে স্বীকার করেন কিনা, তাহা জানিবার জন্যই পরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পরী দেখিল, তিনি একটিও মিথ্যা বলিলেন না। বরং অনেকটা গুরুত্ব লঘু করিয়াই বর্ণনা করিলেন। সে শ্রদ্ধা-বিগলিত চিত্তে সরিয়া আসিয়া পাখা করিতে করিতে পুনরায় কহিল, "আপনি তাহলে আবার বিয়ে করবেন?"

"না।"

"তবে তাকেই গ্রহণ করবেন?"

"না।"

মুহূর্তে পরীর মুখ মরার মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া মাথার আঁচল টানিতে টানিতে সে বলিল, "দোষগুণ বিচার না করে স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি সঙ্গত হয়েছে আপনার? আপনি তো একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান করেছেন।"

"জানি না। আমি কোনও বিধানও করিনি, শুধু বাবা-মা'র আদেশ পালন করে যাচ্ছি।"

"কিন্তু সেইটাই কি উচিৎ কর্তব্য? আপনার স্ত্রী হয়ত আপনার মার্জনার আশায় সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকবে।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হালিম কহিলেন, "সম্ভব নয়। সে তাহলে আমার সঙ্গে আসত, অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করত।"

একটু চুপ থাকিয়া পরী বলিল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন?"

"করবো।"

"আমি যা বলব, শুনবেন ?"

"শুনবো।"

"আমি আপনার শ্বশুরের গ্রামেরই মেয়ে।"

"জানি।"

"আমার মা আপনার শ্বশুর বাড়ীই আছেন ?"

বিস্মিত স্বরে হালিম বলিলেন, "সত্যি !"

"সত্যি ! তারপর আমার বয়স যখন দশ বছর, তখন থেকেই আমাকে আপনার শ্বাশুড়ী রাখেন, প্রধানতঃ আপনার স্ত্রীর সখীত্বের জন্য।"

পরীর একখানা হাত সহসা চাপিয়া ধরিয়া সোৎসাহে হালিম বলিলেন, "তুমি তাকে দেখেছ, তাহলে ?"

"খুব দেখেছি, যখন আমিই তার সখী ছিলুম।"

"সে কখনও আমায় মনে করে ?"

পরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "নিশিদিন। এমন একটি মুহূর্তও নেই বোধহয় যে, সে আপনার ছবি দেখা ও আপনার চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু মনে করে।"

হালিম সাহেব পরীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। উন্মাদ-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাকিয়া গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সহিত "উঃ" বলিয়া পাশ ফিরিলেন। পরীর বক্ষ ছিঁড়িয়া অসহ্য বেদনার বাষ্প সবলে নির্গত হইতে চাহিতেছিল ; চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তবু সে প্রাণপণে থামাইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু হালিম সাহেব আর একটি কথাও কহিলেন না। একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

পরী আলো নিভাইয়া দিল। আজ তাহার নিজের ঘরে যাইতে পা মোটেই উঠিতেছিল না। সে অন্ধকার মেঝের মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ এরূপে কাটিল জানি না। ড্রইংরুমে দেয়াল ঘড়িতে কি একটা বাজিলে হালিম সাহেব নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিয়া ডাকিলেন, "পরী, আলোটা জ্বাল দেখি !"

পরী ত্রস্তে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। তাহার মুক্ত কেশগুচ্ছ অশ্রুজলে প্রায় ভিজিয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুটি আয়ত সুন্দর চোখ রক্তজবার মত লাল হইয়াছিল। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে হালিম বলিলেন, "তুমি কাঁদছিলে পরী ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন কাঁদছিলে ?"

অভিমান-অশ্রু জড়িত কণ্ঠে পরী কহিল, "আপনি কেন আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলেন না ?"

"তুমি তো আর কিছু বললে না, পরী ?"

"এখন বলব ?"

ঘাড় নাড়িয়া তিনি সম্মতি জানাইলেন।

"আপনার স্ত্রীকে কি সত্যই আর গ্রহণ করবেন না ?"

"কি করে করব, বল ? বাবা মা যখন এত করে বলে গেছেন ?"

"কিন্তু তাঁরা তো স্বাভাবিক জ্ঞানে বলেন নি ? রাগে অসহ্য হয়েই বলেছেন মাত্র। রাগের বশীভূত হয়ে স্ত্রী পরিত্যাগ করা তো শাস্ত্রসিদ্ধ নয় ? বরং মহা পাপ।"

"জানি।"

"ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কারুর স্ত্রী ত্যাগ করিয়ে দিলে, তাও শাস্ত্রসম্মত নয়।"

"তাও জানি।"

"তবে ? আপনার এ স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি অধর্ম হচ্ছে না ?"

"উপায় নেই পরী ! সে তো আসবে না ?"

"নিশ্চয় আসবে !"

"তুমি জান, তার বাপ কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক ?"

"জানি। কিন্তু আমি এও বিশ্বাস করি, সতীর স্বামী-সন্দর্শনে স্বয়ং খোদা সহায় হন।"

হালিম সাহেব নিরুত্তরে পরীর পুণ্য তেজোদ্দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরী বলিয়া গেল, "ধরুন, আপনার স্ত্রী বাপকে না জানিয়া গোপনেও তো আসতে পারে।"

চিন্তা করিতে করিতে হালিম বলিলেন, "হতে পারে না, অসম্ভব।"

"হতে পারে, খুব সম্ভব। ঠানদির সাহায্যে ঠাকুরদার সঙ্গে সে গোপনে আসতে পারে !"

উত্তেজনার বেগে হালিম উঠিয়া বসিলেন, "সত্যি যদি সে তার বাপ-মা ফেলে শুধু আমার জন্য অমন করে পালিয়ে আসে, তবে আমার যতই অধর্ম হোক, পরকালে খোদা আমার জন্য যত বড় শাস্তির বিধান করুন, আমি নিশ্চয় তাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করব, পরী।"

প্রবল ভূকম্পনের ন্যায় পরীর সারা বক্ষ ভিতরে ভিতরে কাঁপিতেছিল। অতি কষ্টে সামলাইয়া সে বলিল, "মনে করুন, আপনার স্ত্রী তাই এসেছে, আপনার বাড়ীতেই আছে।"

বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া অধীর আগ্রহে হালিম কহিলেন, "কই সে ? কোথায় সে ?"

পরীর অবশ দেহ শয্যার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। হালিমের দুই পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে কহিল, "আমিই সেই হতভাগিনী ! আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রী।" মুহূর্তে তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

মিনিট দশেক পরে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত পরী চাহিয়া দেখিল, তাহার লুণ্ঠিত মস্তক সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া হালিম সাহেব বাতাস করিতেছেন ; আর তাঁহার নেত্রবিগলিত তপ্ত অশ্রু ধারায় পরীর বক্ষ-বাস ভিজিয়া যাইতেছে।

*যুগের আলো*, শ্রাবণ ১৩৩৩

## দিদারুলের সাহিত্য-প্রতিভা[১২]

দিদারুল আলমকে দেখেছিলুম জীবনে একদিন। কিন্তু সেই একটি দিন আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রেঙ্গুনে প্রকাশিত "সম্মিলনী" ও "যুগের আলো" পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিল দিদারুল আলম। এই যুগের আলোতে লেখা দেওয়া নিয়েই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এ নিয়ে সে আমায় দু একখানা চিঠিও লিখেছে। তার সেই সরল শিশুর মত মধুর মাতৃ-সম্বোধন জীবনের শেষ অবধি ভুলতে পারব কিনা জানি না।

নিশা শেষে শিশু-সূর্যের রক্তরাঙ্গা রশ্মি রেখার মত বাংলা-সাহিত্যাকাশের এক প্রান্তে সবেমাত্র ফুটে উঠছিল এই তরুণ সাহিত্যিক। এর ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত 'ফয়ার দেশে' উপন্যাসে গল্পে ও প্রবন্ধে একটি শান্ত প্রতিভার শুভ্র আলো কেবলমাত্র স্ফুটনোম্মুখ হয়ে উঠেছিল।

চিরসংযত নির্বিকার শুদ্ধ ঋষি বালকের মত অবিচলিত চিত্ত ছিল এই দিদারুল আলম। এর হৃদয়ের একটা মস্তবড় সৌন্দর্য ছিল হিন্দু-মুসলমান মিলনের অদম্য আকাঙ্খা। এর সঙ্গে অন্য কোন প্রবীন ত নয়ই, তরুণ সম্পাদকেরও তুলনা হয় কিনা জানি না। কারণ সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ রাঙা হয়ে উঠেছিল। এবং সেই রক্তারক্তির বিচিত্র ভীষণ চিত্র, বাংলার প্রতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রসমূহের বক্ষে, জ্বলন্ত অগ্নি-রেখায় চিত্রিত হয়ে, নারীহৃদয়ের শান্ত নির্বিকার সুকোমল মাতৃত্ব পর্যন্ত মাধুর্য নিশ্চিহ্নে দগ্ধ করে তুলছিল। ঠিক সেই সময়ে শুধু একমাত্র এই তরুণ সম্পাদকেরই কচিবুকের একাগ্র মিলন কামনা, তার পত্রিকাপৃষ্ঠে, শান্ত শ্যামলিমার স্নিগ্ধ মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। কারুর বিরুদ্ধে এতটুকু নিন্দা, এতটুকু অভিযোগ সে করেনি। অন্ধ গোঁড়ামিমত্ত নিরর্থক কলহপ্রিয় এই দুটি জাতিকে, দৃঢ় অনবছিন্ন বন্ধনে বাঁধার আশায় সে শুধু অক্লান্ত আগ্রহে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। তার অন্তরের শুভ্র শুচিতা, তার হৃদয়ের অসীম উদারতা বাস্তবিক সে-সময়ে অনেককেই বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আজ আর সে এ জগতে নাই। তার শোকাকুলা জননী আর স্নেহবিহ্বল সহোদরগণ, তার প্রিয় জন্মভূমি, তার আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত সাহিত্য-সাধনা, কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তার নবস্ফুট জীবন-পুষ্পের প্রতিদলে যে সুমিষ্ট সৌরভ হ'য়ে উঠেছিল, বসন্ত সমীরণে তা মিশবার সময় পায়নি। আমরণ প্রাণপণ করে বাংলা সাহিত্য-বীণায় সে যে-তার বেঁধে ছিল, তাতে সুরের ঝঙ্কার তোলা হয়নি। সব অসমাপ্ত সমস্ত অসম্পূর্ণ রেখে, আজ অকস্মাৎ তার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। নিষ্ঠুর আজরাইল অতি অকালে এই মহামূল্য রত্নটিকে লুটে নিয়ে তার এবং বিশ্বের মাঝখানে চিরদিনের তরে দুর্লঙ্ঘ্য আড়াল সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। সে আজ অতীত-লোকে। শুধু তার উজ্জ্বল স্মৃতি শিখা, তার অসমাপ্ত কর্তব্যের ব্যাকুল প্রতীক্ষা, তার জননীর, তার আত্মীয় স্বজনের, তার অসংখ্য বন্ধুবর্গের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি বা দু' দিনের নয়, চিরদিনের জন্যই বজ্রদাহন প্রজ্জ্বলিত করে রাখবে।

*মাসিক সঞ্চয়,* ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৬

# ফাতেমা খানম

## আংশিক

### আবুল ফজল

গত পহেলা জুলাই (১৯৫৭) সুদীর্ঘ রোগভোগের পর প্রায় চৌষট্টি বৎসর বয়সে ফাতেমা খানম মারা গেছেন।

আজকের পাঠক পাঠিকাদের কাছে ফাতেমা খানম সম্পূর্ণ অপরিচিতা অজানা—বলা যায় সাহিত্যের আসরে অজ্ঞাতকুলশীলা। এখনকার লেখক লেখিকাদের অনেকে জন্মাবার আগেই ফাতেমা খানমের সাহিত্যিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। প্রধান কারণ, দীর্ঘ একটানা—একরকম জীবনব্যাপী দুরারোগ্য ব্যাধি। গৌণ কারণ বোধ করি দারিদ্র্য।

ত্রিশ একত্রিশ বছর আগে 'তরুণ পত্র' নামে ঢাকা থেকে একটি ক্ষুদ্র কলেবর ও স্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে অবশ্য নাম ছিল ফজলুল করিম মল্লিক নামে এক নব দীক্ষিতের। কিন্তু পত্রিকাটির প্রকৃত পরিচালক ও প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মরহুম আবুল হোসেন সাহেব এবং তাতে থাকতো এক মলাট থেকে অন্য মলাট পর্যন্ত স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে তাঁরই লেখা।

১৯২৫-২৬ এর কথা। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তখন থেকেই আমাদের কারো কারো মনে সাহিত্যের নেশা লেগেছিল। সেই নেশায় এবং প্রথম যৌবনের অমিত উৎসাহে সাহিত্য ব্যাপারে আমরা তখন প্রায় অদম্য—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বিনীত বল্লেও চলে। নূতন পত্রিকা বের হলে ত কথাই নেই—পত্রিকা আফিস, সম্পাদকের আস্তানা আর যাঁরা লিখতেন তাঁদের প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির সর্বত্র আমরা প্রায় চষে বেড়াতাম। 'তরুণ পত্রে'র পিছনে আমি যে ভাবে হন্যে হয়ে উঠেছিলাম তাতেই বোধ করি কর্তৃপক্ষ আমার এক কাঁচা ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ লেখা একেবারে মুখপাতেই ছেপেছিলেন—এমন কি সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নাম পর্যন্ত কভারের ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল একদিন। এ অবস্থায় তখনকার দিনে যে কোন 'হবুর' মুহূর্তে 'গবু' হয়ে যাওয়ারই কথা। আমিও প্রায় তাই হয়ে গেলাম। পা মাটিতে থাকলেও উড়তে লাগলাম হাওয়ায় হাওয়ায়। মনের এই উড়ন্ত অবস্থায় 'তরুণ পত্রে'র জন্য লেখা সংগ্রহ করতে গিয়েই ফাতেমা খানমকে আমি আবিষ্কার করি এবং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ ও এক রকম রক্ত-সম্পর্কহীন আত্মীয়তায় পরিণত হওয়ার পেছনে হয়ত আরো একটি বড় কারণ ছিল এবং যার আবেদন ছিল ব্যাপকতর। মুসলিম হলের সেই ছাত্র জীবন থেকেই আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু গল্প লিখতে গিয়ে দেখলাম আমার নিজের সমাজকেই আমি জানিনা, বিশেষ করে সমাজের ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবন। নিজের ও আত্মীয় স্বজনের গুটিকয়েক পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার স্বল্প পুঁজি নিয়ে ত গল্প উপন্যাস লেখা চলতে পারে না। তাই অবরোধের চীনের পাঁচিলে ফুটো করার জন্য আমরা কয়জন তরুণ প্রায় দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠলাম। আমি ত সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্দান্ত প্রবন্ধই লিখে

বসলাম 'পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' এই পীলে-চমকানো নাম দিয়ে এবং মুসলিম হলের 'সাহিত্য বিভাগের' সভায় তা সাড়ম্বরে পড়াও হল একদিন।

প্রবন্ধটি শুনে প্রগতি-পন্থীরা সুখী হলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন-পন্থীরা মনে করলেন, মুসলিম হলের প্রহ্লাদকূলে আমি এক দৈত্য বিশেষ। তার উপর হলের তখনকার সেরা ছাত্র মিঃ নাজিরউদ্দীনকে সম্পাদক করে আমরা Anti Purdah league নামে এক সমিতিও দাঁড় করালাম। অবরোধের বিরুদ্ধে এই ভাবে আমরা প্রকাশ্যেই মারণাস্ত্র ছুঁড়তে লাগলাম। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ফজিলতুন্নেসা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মুসলমান ছাত্রী ছিলেন না—তিনিই ছিলেন তখন আমাদের সবে ধন নীলমণি। আজ যাঁদের কলরবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও অধ্যয়ন-কক্ষ মুখরিত তাঁরা হয়ত ভাবতেও পারেন না, তাঁদেরকে কলকণ্ঠ করে তোলার জন্য একদিন আমরা কি ভাবে একটু একটু করে পথ রচনা করেছিলাম। এই বিষয়ে ফজিলতুন্নেসার দান অসাধারণ ও ঐতিহাসিক।

আমার উক্ত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলিম অন্তঃপুরকে আমরা জানতে পারছি না বলেই আমাদের দ্বারা সাহিত্য তথা সার্থক গল্প উপন্যাস লেখা হচ্ছে না। অতএব, অপরিচিত মুসলিম অন্তঃপুরের পরিচয় লাভের জন্য আমরা মা, মাসি, খালা, দিদি, বুবু, আপা, যেখানে এবং যার বেলায় যা খাটে তা ডেকে ঢু' মারতে লাগলাম যত্রতত্র। ফাতেমা খানম গোপনে লেখেন এবং লেখকদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও দুর্বলতা অপরিমিত, এই গুপ্ত রহস্য আমি আগেই জেনে নিয়েছি। কাজেই মাতৃ-স্নেহের পথে তাঁর জীবনে ও অন্তরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হল না।

প্রথম যখন আমি ফাতেমা খানমকে দেখি তখন সাদা ধবধবে ছিল তাঁর রং এবং দেহ গঠন ছিল সুঠাম। পরে অবশ্য দীর্ঘ রোগ ভোগের ফলে তাঁর এই চেহারা কিছুই ছিল না। আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে থেকেই ফাতেমা খানম কিছু কিছু লিখতেন, কিন্তু কোন লেখাই বোধকরি ছাপবার সুযোগ ঘটেনি তখনো। সেই যুগেও মেয়েরা সবাই যে অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন তা নয়, কিন্তু লেখার যাঁদের অভ্যাস ছিল তাঁদের খাতাটি কিন্তু পুরোপুরিই অসূর্যম্পশ্যা ছিল। তাঁদের আপন জনেরাও এই খাতা দেখতে পেত না। এই খাতা গা ঢাকা দিয়ে থাকত ট্রাঙ্কের অতল তলায় অথবা কোন ড্রয়ারের অন্ধকার গুহায়। বের হত নিশীথ রাতে অথবা ভর দুপুরে, যখন সারা বাড়িতে নেমে আসত নিঝুম নিস্তব্ধতা। তাঁদের ভীরু মনের প্রতিফলন হ'ত তাঁদের লেখাতেও।

আমার আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত ফাতেমা খানমের লেখার খাতাটিও এই ভাবে গোপনতার অবগুণ্ঠনের আড়ালেই আত্মগোপন করেছিল। আমিই সেই অবগুণ্ঠন মোচন করে তাঁর কিছু কিছু লেখা লোকচক্ষের সামনে ছাপার অক্ষরের আলোয় মেলে ধরি।

তখন ঢাকার ৮৮ নম্বর উর্দু রোডে তিনি থাকতেন। সম্ভবতঃ বাড়ীটি তাঁর

পৈত্রিক। বৃদ্ধা মা, দুই পুত্র, এক ভাই আর মাতৃহীন এক ভাগিনা ও ভাগনী—এই নিয়েই তাঁর তখনকার পারিবারিক জীবন। তাঁর স্বামীকে কখনো দেখিনি এবং স্বামীর সম্বন্ধে তাঁকে কখনো উল্লেখ করতেও শুনিনি। হয়ত এই বিষয়ে তাঁর মনে কিছু দুঃখ ছিল—যা তিনি একাই বহন করতেন। হা-হুতাশ করতে তাঁকে আমি দেখিনি। তাঁদের বাড়ীর লাগোয়া একটি বালিকা স্কুল ছিল। খুব সম্ভব তাতেই তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন, এবং মনে হয় প্রধানতঃ তাঁর উপার্জনেই সংসার চলত। কিন্তু বাড়ির মানুষগুলোকে, বিশেষ করে কর্ত্রী ফাতেমা খানমকে আমি কখনো অপরিচ্ছন্ন দেখিনি। অসংখ্যবার আমি ওখানে খেয়েছি, নাস্তা করেছি। কখনো কখনো সবান্ধব রীতিমত ভুরিভোজন করেই ফিরতাম। ভুরিভোজনের প্রতি তখন আমাদের লোভ যে কতখানি ছিল তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই পাঠক তা আন্দাজ করতে পারবেন। মুসলিম হলে তখন আমরা 'Eating Club' বলে একটি ক্লাব করেছিলাম। এই ক্লাবে খাওয়া, নিছক খাওয়া, নির্ভেজাল খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হত না। শুধু খাওয়ার জন্য যে একটি ক্লাব চলতে পারে এবং চলা উচিত এই অভিনব আবিষ্কারের সমস্ত প্রশংসা পূর্ব পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মিঃ আবদুল হকেরই প্রাপ্য। বলাবাহুল্য এই ক্লাবের তিনিই ছিলেন একাধারে প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও সভাপতি। আমরা শুধু ভোক্তা সভ্য।

মুসলমান সমাজে যাঁরাই এক-আধটু সাহিত্য করেছেন তাঁদের প্রতি ফাতেমা খানমের একটা অদম্য স্নেহ ছিল। মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে এই জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি নিজে স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু ঘরে বসে বাংলা, উর্দ্দু ও চলনসই ইংরেজি তিনি শিখেছিলেন। আলাপ আলোচনায় ও চিঠি পত্রে তিনি সময় সময় যে সব ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতেন তাতে এতটুকু ভুল কোনদিন চোখে পড়েনি। উর্দ্দু বেশ ভাল জানতেন—সহজে বলতে ও লিখতে পারতেন। মেয়েদের লেখা পড়ার সম্বন্ধে এত বেশী তাঁর আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর ছেলেদের লেখা পড়া সম্বন্ধে যত না চিন্তা করতেন তার অনেক বেশী ভাবতেন নিজের মাতৃহারা ভাগ্নিটির লেখাপড়ার কথা। এই ভাগ্নিটিই বেগম আনোয়ারা চৌধুরী বি.এ., বি.টি.। আনোয়ারার সমস্ত লেখাপড়ার মূলেই ফাতেমা খানম। আনোয়ারার লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠার কিছুটা পরিচয় রয়েছে তাঁর ৫/১০/২৮ তারিখে লেখা এক পোষ্ট কার্ডের নিম্নলিখিত অংশে ঃ "আমি বুড়ো বয়সে পেন্‌টিং শিখছি আবার কোচিং ক্লাশে-ও ভর্তি হয়েছি। তাই সময় বড় কম। খুকির (আনওয়ারার) জন্যই এসব কর্তে হচ্ছে আমাকে নতুবা সমাজের তাড়নায় তাকে শেখাবার আর উপায় করতে পারব না।" (এই সময় তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন।)

কলকাতার সাখওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী, মুসলিম বঙ্গের নারী জাগরণের অগ্রনায়িকা মিসেস রোকেয়া সাখ্‌ওয়াৎ হোসেনের তিনি সহকর্মিনী ছিলেন এবং বেগম রোকেয়াও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বেগম রোকেয়ার অবদান সম্বন্ধে

ফাতেমা খানম কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে তার কিছুটা পরিচয় রয়েছে। কলকাতার ৪৩ নম্বর মির্জাপুর থেকে, খুব সম্ভব ১৯২৭ ইংরেজিতে (খুব সম্ভব বলছি এই কারণে যে চিঠিখানিতে কোন তারিখ নেই, তবে তার অব্যবহিত পূর্বে লেখা চিঠিখানির তারিখ হচ্ছে ৪/৩/২৭) আমাকে লেখেন ". . . আমি প্রথম যে পোষ্ট পেয়ে এসেছিলাম সেটা ছেড়ে দিয়েছি। সে স্কুলের এংলো-ইন্ডিয়ান গর্বিতা হেড্‌মিষ্ট্রেসের সঙ্গে আমার বনলো না। ঢাকা যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু মিসেস আর এস্ হোসেন কিছুতেই ছাড়লেন না। তাঁর স্কুলে জবরদস্তি রেখে দিলেন। তাই এখানেই আছি। মিসেস্ এম, রহমানের মেয়েটি তাঁর কাছে রয়েছে। . . . 'নিখিল বঙ্গ' মহিলা সমিতিতে মিসেস্ আর এস্ হোসেন বক্তৃতা দেবেন। এ সমিতিতে আমারও যেতে ইচ্ছা। পরে এ সম্বন্ধে লিখব। অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজের নারী জাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করছেন সমস্ত ভারতে তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারছেন না। তাঁর স্কুলে তফসির সহ কোরান পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, পার্শী, হোম নার্সিং, ফাষ্ট-এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহে শিক্ষা করছে কিন্তু বাঙালীরা এদিকে ফিরেও চাচ্ছে না। ১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটি বাঙালী। এখন বুঝতে পার বাংলার কি অবস্থা!"

১৪/৭/৩২ ইংরাজিতে ফাতেমা খানম আমাকে যে চিঠি লেখেন তাতে আমাদের সাহিত্য জগতের একটি রহস্যময় খবরের ইংগিত আছে। সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ও নজরুল জীবনের উপকরণ সংগ্রাহকদের পক্ষে এই ইংগিতটি কৌতূহলোদ্দীপক।

"স্নেহাস্পদেষু, ঢাকা থেকে এসে তোমার আর কোন চিঠি পাইনি! আশা করি ভাল আছ। জাহানারার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী এবং সুগায়িকা। বয়স ১৮ এর উপর হবে। . . . তার বই খানা (স্কুলের মেয়ে) সম্পর্কে জনরব শুনলাম সেটা নাকি কাজি (নজরুল ইসলাম) সাহেবের লেখা, নাম জাহানারার। সত্যমিথ্যা জানি না। শুধু এমনি একটি জনরব। কবি সুফিয়া এন হোসেন সাহেবার (বর্তমানে বেগম সুফিয়া কামাল) বাড়ির একটি মেয়ের মুখে শুনলুম, কাজী সাহেবের একটি প্রিয় ছাত্রী জাহানারা। তিনিই একে গান শিখিয়েছেন।"

৫/১০/২৮ তারিখে তিনি তাঁদের ঢাকা উর্দু রোডের বাড়ী থেকে কলকাতার ঠিকানায় আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লেখেন।

'সওগাতে' আমার লেখা জীবনে দেব না বলেই আশা করি। বিশেষতঃ আমার লেখা পত্রিকায় দেওয়ার যোগ্য হয়নি, সুতরাং এজন্য মাথাব্যথাও নেই। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটা কি তুমি চেয়েছিলে? দেয়নি তারা?"

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে ফাতেমা খানম একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তা সে যুগের 'সওগাতে' দিয়েছিলেন ছাপতে। কিন্তু কি কারণে জানিনা তা 'সওগাতে' ছাপা হয়নি। সেই কারণেই বোধ করি তিনি 'সওগাতে'র উপর কিছুটা বিরক্ত

হয়েছিলেন। এতকাল পরে কিছুতেই মনে করতে পারছি না লেখাটা 'সওগাত' আফিস থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম কিনা এবং শেষ পর্যন্ত লেখাটার কি গতি হল তাও মনে করতে পারছি না।

আমাকে লেখা তাঁর শেষ চিঠির তারিখ হচ্ছে ৩/৫/৩৬ ইংরাজি। লিখেছেন ঢাকার ৪১ নং হরনাথ ঘোষ রোড থেকে। তখন তিনি ভয়ানক ভাবে অসুস্থ। হাতের লেখা বিকৃত হয়ে গেছে—অক্ষরগুলি বেঁকে গেছে। চিঠিখানির অক্ষর দেখলেই বুঝা যায় লেখার সময় তাঁর হাত ভয়ানক ভাবে কাঁপছিল। সেই চিঠি দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। আশ্চর্য এর পরেও তিনি দীর্ঘ একুশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি ভাল কখনো হননি। এই সুদীর্ঘকাল নানা ঘটনা স্রোতে তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখাই হয়নি—পত্রবিনিময়-ও ঘটেনি।

আগেই বলেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে ফজিলতুন্নেসাই ছিলেন আমাদের সবে ধন নীলমণি। অবরোধের বেড়া ডিঙিয়ে উচ্চ শিক্ষার পথে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন আমাদের সামনে প্রগতির প্রতীক স্বরূপ। ফাতেমা খানম-ও তাই মনে করতেন এবং তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন। একদিন ত আমাকে বলে বসলেন—'আমি একবার ফজিলতুন্নেসাকে দেখতে ও নিজের হাতে খাওয়াতে চাই। তুমি তাঁকে দাওয়াৎ করে এসো।'

ফজিলতুন্নেসা তখন থাকতেন ঢাকা জেনারেল পোষ্টাফিসের খ্রীষ্টান মিশনারীদের এক হোষ্টেলে। বহু দূরাতিক্রম্য বাধা ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। দাওয়াৎ করলাম—তিনি দাওয়াৎ কবুল-ও করলেন। শুনে ফাতেমা খানম ত খাওয়ার রাজসূয় যজ্ঞ শুরু করে দিলেন। কিন্তু কি এক অনিবার্য কারণে ফজিলতুন্নেসা শেষ মুহূর্তে আসতে পারেন নি। সেদিন আশাভঙ্গের যে বেদনা তাঁর চেহারায় দেখেছিলাম তা আমি বহুদিন ভুলতে পারিনি। যাই হোক, সেই রাজসূয় যজ্ঞের যতসব চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের যথারীতি সদ্ব্যবহার আমরাই করেছিলাম সেদিন।

আমার মত আমার বন্ধু উদীয়মান সাহিত্যিক দিদারুল আলমকে-ও ফাতেমা খানম অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দিদারুল মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর থাইসিসে মারা যান। শুনে ফাতেমা খানম অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। কবি আব্দুল কাদিরের উদ্যোগে ঢাকার সেই যুগের "মাসিক সঞ্চয়" পত্রিকার একটি বিশেষ দিদারুল-সংখ্যা বের হয়। তাতে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, কাজী আব্দুল ওদুদ, শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ, জসীম উদ্দিন, নঈম উদ্দিন, সূফি মোতাহার হোসেন, নাজিবুল ইসলাম, হাবীব উল্লাহ বাহার ইত্যাদি অনেকের লেখাই স্থান পেয়েছিল। তখন ফাতেমা খানম যা লিখেছিলেন তাতে তরুণ সাহিত্যব্রতীর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহই যে শুধু প্রকাশ পেয়েছে তা নয়—ফাতেমা খানম যে কত উৎকৃষ্ট গদ্য লিখতে পারতেন এই রচনাটি তারই একটি নিদর্শন। . . .

প্রায় ত্রিশবছর আগে 'মাতৃ মন্দির' নামক মাসিক পত্রে ফাতেমা খানমের

'মোসলেম মহিলার চিঠি' নামে একটি লেখা বেরিয়ে ছিল। তাতেও তাঁর অসাধারণ ভাষা-শক্তি, গভীর ধর্ম-বোধ ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে। সেই চিঠিতে তিনি পর্দা সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তারও কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"আমি আমার বিবেক নিয়োজিত পর্দাই মানি। এ পর্দা দৈনিক কাজকর্ম্মের অন্তরায় হয় না। এ পর্দা নয়, একটা অদৃষ্ট শক্তির অবরোধ নেশা। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এটাকে জগতে সর্বযুগে সর্ববিঘ্নের মাঝখানে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আমার যেন মনে হয়, এই একটিমাত্র বিশ্বাসই নারীকে প্রকৃত নারীত্বের মহিমায় দেবী করে রাখে। তাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। ভক্তি হয় এবং মাতৃজাতির পায়ের কাছে, মাথা যেন আপনা হতেই নত হয়ে পড়ে। এ জিনিষটি বাদ দিয়ে নারী উচ্চ শিক্ষিতা হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। পুরুষের পার্শ্বে তার প্রতি কার্য্যে সাহায্য করতে পারে হয়ত বা শাহ্ সেকেন্দরের মত দিগ্বিজয়ীনী আখ্যাও পেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত নারীত্বের সত্ত্বা থেকে সে বঞ্চিতা হয়। আমার এও বিশ্বাস, ইউরোপ ও আমেরিকার নারী সমাজ আজ পৃথিবীকে একটা নূতন রকমের স্বর্গভূমি করে তুলতে পারত যদি না তারা নারীত্বের বলি দিয়ে পুরুষত্বের অভিনয় করত। নারীর পাশে নারীত্বকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। এবং এই জাগিয়ে রাখার জন্য পর্দাকে একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না। কেবল পর্দার পারিপার্শ্বিক কালিমাটুকু পরিষ্কার করতে হবে।"

. . . সাগর সংযোগ ও আশ্রয় নামক গল্পে আমাদের পারিবারিক জীবনের পরিচিত চিত্র-তার সুখ বিচ্ছেদ ও মিলনের হাসি অশ্রুময় কাহিনী অতি সহজ সরল ও অলঙ্কার বিহীন ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন, রূপ দিয়েছেন। গল্পে ফাতেমা খানম কোথাও দুঃসাহসের পরিচয় দেননি ও করেননি অনধিকার চর্চা। যে জীবনকে তিনি জানতেন, যে জীবনের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ছিল, সেই জীবনেরই ছবি তিনি এঁকেছেন—তাঁর গল্প তাঁরই চেনা মানুষের নক্সা। হয়ত জানা ঘটনারই চিত্ররূপ।

লেখিকা ফাতেমা খানম হয়ত খুব বড় ছিলেন না। সেই বিচারের উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক লেখা তিনি রেখে যেতে পারেন নি। তার কারণ সূচনায় আমি বর্ণনা করেছি। ফলে তাঁর লেখার পরিমাণ স্বল্প ও পরিমিত। কিন্তু মানুষ হিসেবে ফাতেমা খানম অসাধারণ ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয় যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই মানুষ ফাতেমা খানমের ঔদার্যে, মহত্বে ও শালীন আত্মমর্যাদাবোধে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। নানা দৈব দুর্বিপাক ও জীবনের কঠিনতম আঘাতও তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধকে এতটুকু খর্ব করতে পারেনি।

*সমকাল*, ১৯৫৭

## তথ্যসূত্র

১. সেলিনা বাহার জামান (বিয়ের আগে চৌধুরী) লেখিকা, নজরুল গবেষক। বুলবুল প্রকাশনা সংস্থার দায়িত্ব এখন তাঁরই হাতে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা বিষয়ে অদম্য উৎসাহ তাঁর ; ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগ থেকে অবসরগ্রহণের পর এখন তিনি লেখালেখি, সম্পাদনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর রচিত/সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে *স্মৃতিসুধায়,* (ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯১) এবং *নজরুল পাণ্ডুলিপি,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

২. সেলিনা চৌধুরী, 'প্রকাশিকার নিবেদন', *সপ্তর্ষি,* (ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪)

৩. দ্র. সিদ্দিকা মাহমুদা, *এম ফাতেমা খানম : ১৮৯৪-১৯৫৭,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ১৫, আবুল ফজলকে লেখা চিঠির অংশ।

৪. উদ্ধৃত, সিদ্দিকা মাহমুদা, উপরোক্ত, পৃ. ৩৫

৫. আবুল ফজল, 'ফাতেমা খানম', (*সমকাল,* পৌষ-মাঘ ১৯৫৭)। দ্র. এই সংকলন, পৃ. ৮৬

৬. আবুল ফজল, 'পরিচিতি', *সপ্তর্ষি,* পূর্বোক্ত

৭. এ প্রসঙ্গে ফাতেমা খানমকে বেগম রোকেয়া একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '. . . আপনি আমার জীবনের ইতিহাস চাহিয়াছিলেন—আমার জীবন ? অতি নগণ্য—"কুকুরের কাজ নাই দৌড় ছাড়া হাঁটা নাই"—আমি সেই নিষ্কর্ম্মা কুকুর। তাই আপনার সে চিঠির উত্তরে আমার ইতিহাস পাঠাই নাই।' (৯ ডিসেম্বর ১৯২৬)।
সাহিত্যিক আবুল ফজলও ১৬.৭.২৬ তারিখে একটি চিঠিতে বন্ধু দিদারুল আলমকে লিখেছিলেন যে ফাতেমা খানম 'মিসেস আর. এস. হোসেনের কাছে তাঁর জীবনী লেখার অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন।' (দ্র. সিদ্দিকা মাহমুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬)

৮. আবুল ফজল, 'ফাতেমা খানম', পূর্বোক্ত। দ্র. এই সংকলন, পৃ. ৮৮

৯. উদ্ধৃত, সিদ্দিকা মাহমুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১০. সেলিনা চৌধুরী *সপ্তর্ষি* গল্পসংকলনের 'প্রকাশিকার নিবেদন'-এ লিখেছেন, '[ফাতেমা খানমের কাছে] আরও শুনেছি : "রবীন্দ্র-শরৎ আমার সাহিত্যমনের অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছেন।. . . নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই আমার রচনাভঙ্গিতে এঁদের প্রভাব বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নয়।" '

১১. 'মাতৃহারা', *সপ্তর্ষি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১২. সাহিত্যিক দিদারুল আলম রেঙ্গুন থেকে *যুগের আলো* পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন ১৯২৩ সালে। তিনি চট্টগ্রামের সাহিত্যিক আবুল ফজলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আবুল ফজলের সূত্রেই দিদারুল আলমের সঙ্গে ফাতেমা খানমের যোগাযোগ হয় এবং *যুগের আলো* পত্রিকায় তাঁর দুটি গল্প ছাপা হয়, ১৯২৬-এ। ১৯২৯-এ দিদারুলের অকাল মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে ফাতেমা খানম এই লেখাটি লিখেছিলেন। দিদারুলের ছোট ভাই ওহীদুল আলম লিখেছেন 'তিনি [ফাতেমা খানম] দিদারকে বড় স্নেহ করতেন এবং তাঁর ঢাকার বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে যে খানা খেয়েছিলেন তার যথেষ্ট তারিফ করেছিলেন।' উদ্ধৃত, সিদ্দিকা মাহমুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৭

## ঔপন্যাসিক নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
### ১৮৯৪-১৯৭৫

'বই লিখিতে আমারও বড় সাধ হয়, কিন্তু অসম্ভব ভাবিয়া সাহসে কুলায় না।' ছোট বোন ফাতেমাকে একবার মনের এই কথাটা বলে ফেলেছিলেন নূরন্নেছা খাতুন। আঠার বছর বয়সে বিয়ে হবার পর তিনি তখন বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। এসে দেখেন ফাতেমার লেখা কয়েকটি 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গদ্য', এবং তা দেখে খুব বিস্মিত হন। বোন সেদিন দিদিকে অভয় দিয়েছিল : 'অসম্ভব কেন হ'বে ? চেষ্টা করলে সকলই সম্ভব হয়। সেজবুবু তুমি চেষ্টা করে দেখ, নিশ্চয়ই বই লিখতে পারবে।'[১]

নূরন্নেছা খাতুনের জীবনে এই 'চেষ্টা'র একটা মস্ত বড় ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। তিনি সারাজীবন নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। এবং সফলও হয়েছেন। কিন্তু 'চেষ্টা' যেখানে একটি সচেতন পদক্ষেপ, 'সাধ' সেখানে সহজাত, স্বাভাবিক। কবে থেকে এই 'সাধ' জেগেছিল নূরন্নেছার মনে, যে তিনি কিছু লিখবেন ? মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলমান ঘরের একটি মেয়ে কেমন করে বই লেখার স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল ? এই সব প্রশ্নের কোনো যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় কেবল।

১৮৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার শাহপুর (ভিন্নমতে সাহাপুর) গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর শাহ তাহেরের বংশোদ্ভূত খোন্দকার পরিবারে নূরন্নেছা জন্মগ্রহণ করেন, বাবা খোন্দকার হাবিবুস সোবহান, মা সাদিকাতুন্নেসা। তিন ভাই, লেখালেখির অভ্যাস তাঁদেরও কারও কারও ছিল ; এক ভাই ছিলেন সাংবাদিক, চট্টগ্রামে থাকতেন ; আর একজন খোন্দকার রকিবুস সুলতান, তাঁর দুটি কবিতার বই ছাপা হয়েছিল।[২] বোন ফাতেমার সাহিত্যচর্চার কথা তো নূরন্নেছা নিজেই তাঁর 'স্বপ্নদৃষ্টা' উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লিখে গেছেন।

নূরন্নেছা খাতুনের ওপর যেটুকু লেখাপত্র পাওয়া যায়, তার থেকে জানি যে তাঁর মাতামহ সৈয়দ সিয়াদৎ হোসায়েনের কাছে তিনি কিছুটা ফারসি শিখেছিলেন। একথা 'ভাগ্যচক্র' উপন্যাসের সূচনায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নূরন্নেছা স্মরণ করেছেন।[৩] সেকালে 'প্রাচীন ভদ্রবংশীয় মোসলমান' পরিবারে মেয়েরা কতটুকুই বা লেখাপড়া শিখতে পারতেন ! সামান্য আরবি, ফারসি, বাংলা, কোরানপাঠ—ব্যাস। ঐ অবধিই। তারপর কিছু শিখতে হলে 'সাধ' আর 'চেষ্টা' দুইয়েরই প্রয়োজন হতো। 'জীবনে কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদ' পাননি নূরন্নেছা। এই 'আস্বাদ' শব্দটিতে

তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ধরে রেখেছেন। 'কখনও কোন শিক্ষকের নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামান্য ক, ব, ঠ শিখিয়া দু'চারিখানি বই হাতে করিয়াছি মাত্র।'[৪]

বাড়িতে ছিল অবরোধের কড়াকড়ি। 'কঠিন পর্দ্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে ও মস্তকোপরি চন্দ্রতারকা খচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই।'[৫]

এই কঠিন পর্দা খানিকটা শিথিল হল ১৯২১ সালে, শ্রীরামপুর নিবাসী আইনজীবী কাজী গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে নূরন্নেছার বিয়ের পর। নূরন্নেছার তখন ১৮ বছর। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে গোলাম মোহাম্মদকে বেশ একজন রোম্যান্টিক মানুষ বলা যায়। সাহিত্য রসিক, উদারমনা, ভ্রমণ বিলাসী। '১৩১৯ সাল হইতে আমিও জেলের কোমরের হাঁড়ির ন্যায় তাহার [স্বামীর] পশ্চাৎ পশ্চাৎ এদেশ ও ওদেশ যাইতে আরম্ভ করিলাম। এবং তজ্জন্যই কঠিন (Strict) পর্দ্দা ক্রমশই আপনা আপনিই একটু শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া আসিল।'[৬] স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানর এই অভিজ্ঞতাই হয়ত নূরন্নেছাকে তাঁর লেখিকা হবার সাধ পূরনের দিকে এগিয়ে দেয়। ১৯২৩ সালে নূরন্নেছার প্রথম উপন্যাস 'স্বপ্নদৃষ্টা' প্রকাশিত হয়।[৭]

১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসের এক সকালে নূরন্নেছার ছোট মেয়ে খালেদা মনজুর-এ-খুদার দ্বিতীয় সন্তান শামা কাদের ঢাকার ধানমণ্ডিতে তাঁর বাচ্চাদের স্কুলের অফিসঘরে বসে 'নানু'র কথা বলছিলেন। তাঁর নানা, নানু, আম্মা—সবার কথা। শামা নূরন্নেছাকে যতটুকু দেখেছেন, তার থেকে মা, মাসি, মামাদের কাছে শুনেছেন অনেক বেশি! আর সেই শোনা থেকে তাঁর মনেও দিদিমার সাহিত্যিক জীবনে দাদামশাইয়ের অবদানের একটা ছবি স্পষ্ট আঁকা হয়ে রয়েছে। 'শেষ পর্যন্ত নানুর কাজ সার্থকতা লাভ করেছিল আমার নানার কারণে। নানু লিখতেন একা একা। কিন্তু সেই সব পাণ্ডুলিপি জড়ো করে বই ছাপানো, গ্রন্থাবলী ছাপানো, সে যুগে এটা তো একটা যে সে ব্যাপার ছিল না!'

স্বামীর অবদানের কথা নূরন্নেছা নিজেও বলে গেছেন। 'জানকী বাঈ' উপন্যাসের নিবেদনে তিনি লিখেছেন : 'স্বামীন! . . . আপনার পরিশ্রম ও প্রকৃত সাহায্য ব্যতীত আমি কোন মতেই এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে কৃতকার্য্য হইতাম না ; তজ্জন্য আপনার নিকট আমি চিরঋণী।'[৮]

কথাশিল্পী নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর লেখিকা জীবন ছিল খুব স্বল্প মেয়াদের, মাত্র ছ বছরের। কিন্তু এই ছ বছর যেন কেটেছে ঝড়ের বেগে, কাজের পর কাজ করে, লেখার পর লেখা লিখে। আর সেই কাজ ও লেখার স্বীকৃতিও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। ১৯২৩-এ প্রথম উপন্যাস নূরন্নেছার। ১৯২৯ সালে শেষ বড় গল্প 'নিয়তি' প্রকাশিত হয়। 'স্বপ্নদৃষ্টা' এবং 'নিয়তির' মাঝখানে তিনি 'আত্মদান' নামে একটি উপন্যাস লেখেন, 'জানকী বাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব' নামে একটি ঐতিহাসিক

উপন্যাস, 'ভাগ্যচক্র' এবং 'বিধিলিপি' নামে দুটি বড় গল্প। শোষোক্তটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। এই সব কটি লেখা নিয়ে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ (১৯২৯) সালে। তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য নূরন্নেছাকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি। এবং নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি প্রদান করে। ১৩৩১ সালে তিনি মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনে 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনান এবং সম্মেলনের সভাপতি, নাটোরের মহারাজা শ্রী জগদীন্দ্রনাথ রায়, তাঁর দারুণ প্রশংসা করেন। ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সঙ্ঘের সভায় সভানেত্রী হয়ে তিনি একটি ভাষণ দেন, যা সে বছর *সওগাত* পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশভাগের পর ঢাকার বাংলা একাডেমী তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচন করে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে একাধিক বৃত্তি এবং পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ লেখিকা সঙ্ঘের তরফ থেকে।

এতখানি প্রতিষ্ঠা, এত সফলতা খুব কম লেখক লেখিকাই তাঁদের জীবদ্দশায় পেয়ে থাকেন। অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে নূরন্নেছা কেবলমাত্র ঐ ছটি বছর সক্রিয় ছিলেন। কেন ? আর কিছু লিখলেন না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর মেলে না তাঁর জীবনীগ্রন্থ অথবা গ্রন্থাবলীর ভূমিকা থেকে। তাঁর নিজের লেখা থেকেও এর উত্তর পাই না আমরা।

শামা কাদেরের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। শামা তাঁর লেখিকা নানুকে দেখেননি, ঘরোয়া দিদিমাকে দেখেছেন। একলা মানুষের সংসারে কখনও তিনি রোদ্দুরে বসে খবরের কাগজ পড়তেন, কখনও উঠোনে পোষা মুর্গিগুলোকে দানা দিতেন। তখন শামা নিজেই দশ বারো বছরের কিশোরী। 'নানুকে মনে করলে আমার মনে পড়ে তাঁর পুতুলখেলার মত একটা ছোট্ট রান্নঘর, ছোট ছোট বাসন, তাতে একজনের রান্না। আমরা গেলে আবার জোর তদ্বির করে আর একটু রান্না বসানো। খুব একটা contentment ছিল ওঁর। একটা সুখীভাব।'

এই যে আর লিখলেন না, লিখতে পারলেন না, তার জন্য কোন খেদ ছিল মনে ? শামার মনে হয় না তাঁর নানুর মনে কোন হতাশা ছিল। 'আমি ঠিক exactly বলতে পারি না, তবে এমন তো হতে পারে যে তাঁর লেখিকা হবার একটা স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন সফল হবার পর তিনি থেমে গিয়েছিলেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে একটা কাজে সফল হয়েছিলেন। তারপর হয়ত আরও একটা কাজে অগ্রসর হতে আর পারেননি। চানও নি হয়ত।'

চার মেয়ে, দুই ছেলে নিয়ে বড় সংসার পেতেছিলেন নূরন্নেছা এবং তাঁর স্বামী। শ্রীরামপুরে বাড়ি ছিল ওঁদের। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন ছেলেমেয়েরা সবে একে একে সাবলম্বী হয়ে উঠছে, তখন তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হল অন্য দেশে— পাকিস্তানে। শামা জানেন তাঁর মা দিদিমার মনের সেই ব্যথার কথা। 'এত দিনের অস্তিত্ব ছেড়ে চলে আসা—এই যে নানুর জীবনে একটা মস্ত পটপরিবর্তন, হতে পারে

এজন্যও তিনি আর কখনও লিখতে পারেন নি।' ১৯৪৭-এ পাকিস্তানে চলে এসে ঢাকার কমলাপুরে বসবাস শুরু করেন, বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'উপকূল'। তারপর ১৯৬৩-তে স্বামী মারা যাবার পর জীবনের বাকি বছরগুলো একা একা কাটিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বাড়িতে।

নূরন্নেছার পরিবারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হবার ঘটনাটি সত্যিই ইতিহাসের এক নির্ম্মম পরিহাস। নূরন্নেছার লেখা পড়ে মনে হয়েছে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্পর্শকাতর দিকগুলির বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। এমন কিছু তিনি লিখতে চাননি যাতে তাঁর প্রতিবেশী সমাজ আঘাত পায়। কখনও কখনও কোনও গল্প লেখার সময় তাঁর মনে হয়েছে, এ গল্প কেউ ভুল বুঝবে না তো? যেমন 'বিধিলিপি' এবং 'জানকী বাঈ'। 'জানকী বাঈ'-এর সূচনায় তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের সেনাপতিই অধীনস্থ সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনকল্পে বিপক্ষ সেনা ও সময় সময় অপর পক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সর্ব্বতোভাবে হেয় ও হীনবীর্য্য প্রতিপন্ন' করে থাকেন। অতএব 'এই সমুদয় উক্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সঙ্কীর্ণচিত্ততার ভাব গ্রহণ না করিয়া আশা করি সকল সম্প্রদায়ের সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিজ নিজ উদারতার পরিচয় দিবেন।'[৯]

নূরন্নেছা বোধহয় সব ধরনের দ্বন্দ্বই এড়িয়ে চলতে চাইতেন। তাঁর লেখায় তাই তৎকালীন মূলধারার লেখকদের প্রভাব যতখানি লক্ষ করা যায়, রোকেয়া বা মিসেস এম. রহমানের মতন সমসাময়িক লেখিকাদের আগুনের আঁচ ততখানি পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর লেখায় আখতার মহল সৈয়দা খাতুন বা ফাতেমা খানমের মতন ঘরের ভিতরের ছবিও পাওয়া যায় না। তাঁর গল্পের বিষয় তাই সুপরিচিত, লেখার ভঙ্গিটিও। এই জন্যই কি রোকেয়া এবং মিসেস এম. রহমান কোনভাবেই তাঁদের নিজেদের জগতে নূরন্নেছাকে স্থান দিতে চাননি? কারণ, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্রোহের আগুন ছিল না?[১০]

এ সবই অনুমানের বিষয়। তবে, শেষ পর্যন্ত নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীকে একজন ঘরোয়া শিল্পী হিসেবে দেখাটাই যথাযথ হবে। একজন নারী যার 'সাধ' ছিল লেখিকা হবার, আর 'সাধ' ছিল যে তাঁর ছেলেমেয়েরাও লেখালেখি করবে। নূরন্নেছার ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই-ই লেখেন। বড় দুই মেয়ে কামরুন্নেছা এবং বদরুন্নেছার গল্প ও ডিটেকটিভ উপন্যাস *সওগাত*-এ ছাপা হয়েছিল।[১১] এখনও নিয়মিত লিখে চলেছেন ছোট মেয়ে খালেদা, শামা কাদেরের মা। শামাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনিও লেখেন কি না। উত্তরে শামা হেসে বলেছিলেন, 'এই একটু আধটু। আমার একটা উত্তরাধিকার আছে তো!'

ম.ভ.

# বিধিলিপি

## (অদৃষ্ট)

(সমাজের ডাকের প্রত্যুত্তরে)

## অনুকর্ষণ

'বিধিলিপির' শেষাংশে পুরীর মন্দিরাভ্যন্তরীণ যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, বা তথাকার সারদীয় উৎসবের সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ আছে, তাহার কোন অংশই কাল্পনিক নহে। ইহা প্রকৃত ও আমার স্বজ্ঞান-প্রসূত।

উপন্যাসের এই বাস্তব অংশ, কোন সমাজের পদ্ধতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশে লিখিত হয় নাই, এই টুকু আমার নিবেদন। ইতি

নিবেদিতা
গ্রন্থকর্ত্রী

## প্রথম তরঙ্গ

উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী-হিন্দু-যুবকদের মধ্যে, আজ কাল অনেকেরই বিধবা বিবাহটা সমাজের ভিতর প্রচলন ক'রবার দিকে খুবই ঝোক ; বিশেষতঃ সহর অঞ্চলের লোকে, সেই সাবেক বিদ্যাসাগরী চাপাপড়া বিষয়টা খুঁচিয়ে তো'লবার জন্যে ; আর তার সঙ্গে অমুক জজ এই বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়ে ত' সমাজে বেশ চলে গেলেন, ক'ল্‌কাতার পাশেই অমুক লাহিড়ী, তা'র বিধবা ভাইঝির আবার বিবাহ দিয়ে ক'দিন বইত না তাদের বারেন্দ্র সমাজে রহিত ছিল ! তাদের ত' এখন যেমন কার তেম্‌নি সবই চল্‌চে ! ইত্যাদি নজির দেখিয়ে অন্ততঃ অল্পবয়স্কা বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রচলন ক'রবার জন্যে প্রায়ই উস্‌ খুস্‌ ক'রে থাকেন।

বিশঘরার রায় বাবুরা সাবেক বনেদি জমিদার বংশ। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ সদাশিব গুহ, লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে ক'লকাতায় কি একটা কোম্পানির চাকরি করে' অনেক টাকা রোজগার করেন ও সহরে কিছু জমি, এবং দেশে প্রকাণ্ড জমিদারি ক'রে যান। তিনিই সেই ইংরেজ রাজত্বের গোড়ায়, ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কি একটা উপকার করে, কোম্পানির কাছ থেকে, সেই সময়ের খুব মানের 'রায়' খেতাব পেয়ে ছিলেন।

রায় বাবুদের এই জমিদারি এখন তিন অংশ হ'য়ে গিয়েছে। ছোট বাড়ীর রাম নারায়ণ রায়ের অংশ সকলের চেয়ে ছোট হ'লেও তিনি, পিতার একমাত্র পুত্র বলে', পৃথক পৃথক ভাবে ধত্তে গেলে, তাঁ'রই আয় সক্কলকার চেয়ে এখন বেশিতে দাঁড়িয়েছে। রাম নারায়ণ রায়ের একমাত্র সন্তান হরি নারায়ণ। রায় বংশের মধ্যে হরি নারায়ণ ছেলেটী সকলের চেয়ে শ্রীমান ও ফিট্‌ গৌর বর্ণের ছিল ব'লে, ছোট

বেলা থেকে তাকে সকলে 'সাহেব বাবু' বলে' ডাকত। আমরাও এঁকে বেশির ভাগ 'সাহেব' বলেই উল্লেখ ক'রব।

কল্কাতার বাড়ীতে থেকে বিদ্যাভ্যাস ক'রবার সময়, সাহেব বাবুর সঙ্গে তার যে কয়জন সঙ্গী জুঠে'ছিল, তা'দের সকলেই উদার নৈতিক দলের শিক্ষিত যুবক। তা'র এই কয়েক জন সঙ্গিকে নিয়ে সাহেব বাবু 'আর্য্য-বিধবা-বিবাহ সঙ্ঘ' নাম দিয়ে একটা ছোট মজ্লিস গড়ে তুলে ছিল। এই সঙ্ঘের সকলেরই প্রধান চেষ্টা ছিল— তা'দের নিজের নিজের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু অল্পবয়স্কা বিধবাদের মধ্যে পুনঃ-বিবাহটা যে কোন রকমে হ'ক চালিয়ে দেওয়া, আর এই সভার সকল সভ্যই অবিবাহিত ছিল।

কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই প্রধান উৎসাহী সাহেব বাবুর প্রাণে বড়ই আঘাত লা'গল, যখন সে দে'খতে পেল যে—তা'র অধিকাংশ বন্ধুই তা'দের নিজ নিজ কর্ত্তা পক্ষের তাড়নায় সঙ্ঘ পরিত্যাগ ক'রে, ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল! অগত্যা বড়ই দুঃখ সয়ে সাহেব বাবুকে তা'র এই আজন্ম-পোষিত উদ্যম পরিত্যাগ কত্তে হ'ল।

## দ্বিতীয় তরঙ্গ

হরি নারায়ণ গুহ রায় ওরফে সাহেব বাবু, সতের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তা'দের গ্রামেই থাক্ত। রায বাবুদের দেবত্তর সম্পত্তির আয়ে প্রতিষ্ঠিত তা'দের নিজেদের বিশঘরা-হাই-স্কুল থেকেই সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর কলেজে প'ড়বার জন্যে কল্কাতায় গিয়েছিল।

বিশঘবার পার্শ্ববর্ত্তী রাধাবল্লভপুর গ্রামের পূর্ব্বপাড়ার এক ঘর দরিদ্র কুলীন কায়স্থ বাস কর্ত্তেন। এই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন হরেকৃষ্ণ ঘোষ। হরেকৃষ্ণের পরিবারের মধ্যে, তাঁর স্ত্রী বিমলা ও একমাত্র কন্যা আশালতা, এবং তাঁ'র এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা পিশী শিবানী দাসী।

শিবানীর শ্বশুরালয় ও সাহেব বাবুর মাতার পিত্রালয়, একই গ্রামে ছিল · আর এই দুই পরিবারের মধ্যে একটু আত্মীয়তাও ছিল। শিবানী সাহেবের মাতার সম্পর্কে খুড়ী হ'তেন। হরি নারায়ণের শৈশবাবস্থায় শিবানী, এই জমিদার পুত্রটীকে তা'র মাতামহের বাড়ীতে অনেক বার দেখেছিলেন। সেই সময় এই টুক্ টুকে ছেলেটীর সদা-হাসি মুখ যেই দেখ্ত, একবার এ'কে কোলে না নিয়ে সে থাক্তে পা'রত না। পুত্রকন্যাবিহীনা শিবানী, প্রায়ই ছেলেটীকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেলা দিতেন ও তিনিই নাতি সুবাদে ঠাট্টা ক'রে ছেলেটীর নাম 'সাহেব' রেখে ছিলেন।

এদিকে সাহেব বাবুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিবানীও বিগত-স্বামী হ'লেন। ক্রমে এই নিঃসন্তান বিধবার শ্বশুর বাড়ীর জাতিদের সঙ্গে মনে অমিল হ'তে থাকায় শিবানী, রাধাবল্লভপুরে এসে তাঁর এই দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে আশ্রয়

নিলেন। পরে তাঁর যা' কিছু নগদ টাকা কড়ি ছিল ও গহনা পত্র, সমস্ত হরেকৃষ্ণের হাতে দিয়ে, তাঁরি পোষ্য হ'য়ে রইলেন।

ঘোষেদের বাড়ীর অনতিদূর দিয়ে স্রোতস্বিনী সরস্বতী নদী, এঁকে বেঁকে প্রবাহিতা ছিল। তের বছরের বালক হরি নারায়ণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই ভাল লা'গত বলে সে মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে এই নদীর ধারে, চাকর সঙ্গে নিয়ে বৈকালে বেড়া'তে আ'সত।

একদিন বিকেলে পুরাতন ভৃত্য অমুল্য সর্দ্দারের সঙ্গে সরস্বতীর ধারে বেড়া'তে বেড়া'তে হরিনারায়ণ দে'খতে পেলে—যেন একটু দূরে কলসী ক'রে জল নিয়ে তার মায়ের কাকিমা শিবানীর মত একটা স্ত্রীলোক, নদী থেকে ওপরে উঠে আস্‌ছে ; আর তার পেছনে পেছনে ছ'সাত বছরের একটী গৌর বর্ণের ছোট মেয়ে, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো দোলা'তে দোলা'তে স্ত্রীলোকটীর হাত ধরে' ধরে' আস্‌চে। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটিকে দেখে সাহেব বাবুর ছোট বেলার দিদ্‌মার কথা মনে পড়ে গেল। তখন তাঁকে ভাল ক'রে দে'খবার জন্যে বালক, একটু এগিয়ে গেল ও উভয়ে উভয়কে চিন্তে পেরে দু'জনেরই প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

শিবানীই প্রথমে বালককে তাঁর আদরের দেওয়া নাম 'সাহেব বাবু' ব'লে সম্বোধন কল্লেন ও তাকে তার মাতার এবং অপরাপর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। এই সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টির কোন লোক পাশে দাঁড়িয়ে থা'কলে বোধ করি দেখ্‌তে পেত যে—হরিনারায়ণ শিবানীর প্রশ্নগুলোর ওপর ওপর যথাযথ উত্তর দিতে থা'কলেও, তার চক্ষু দু'টি নিস্পন্দ হ'য়ে ঐ ছোট মেয়েটির দিকেই চেয়ে ছিল। সে দুটো যেন বালিকার হাড়্‌ হদ্দের খবর নেবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে, তার পানে তাকিয়ে রয়েছিল।

কাকীমাও কথা ব'লতে ব'লতে জমিদার পুত্রের অবস্থা দেখে' হঠাৎ বিদ্রুপচ্ছলে বলে উঠ্‌লেন—'কি দাদু ? আশাকে বিয়ে ক'রবার ইচ্ছে হচ্চে ? তা' আমি মাকে বলে আশালতার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়াব ; কেমন ? বেশ টুকটুকে বৌ হবে ?'

'আশালতার সঙ্গে বিয়ে', এই কথাটা যেন হরিনারায়ণের কাণের ভিতর ঢুকে, সুমধুর ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠ'ল। তার মূর্চ্ছনা, অনেকক্ষণ ধরে এই অল্পবয়স্ক বালককে বিভোর ক'রে রা'খল। সে মনে মনে ভা'বলে লা'গল—বিয়ে, তা' হয় ত' খুব ভালই হয়।

এমন সময় হঠাৎ একটা দুরন্ত হাওয়া ওঠায় ও তার সঙ্গে ছিটে ফোঁটা বিষ্টি প'ড়তে থাকায়, সাহেব বাবুকে শিবানীর সঙ্গে দ্রুতপদে এসে, অগত্যা হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতেই খানিকক্ষণের জন্যে আশ্রয় নিতে হ'ল। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী বিমলা, এই সময় অনেক জেদ ক'রে বালককে ঘরের তৈরি দুটো রশোগোল্লা ও একটু জল খাওয়া'তে পেরে যেন ধন্য হয়ে গেলেন।

তারপর হরিনারায়ণ চ'লে যা'বার সময় শিবানী, তার সঙ্গে সঙ্গে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত এসে, বালকের থুৎনিটা ধ'রে আদর ক'রে—'দাদু এদিকে যখন বেড়া'তে আ'সবে, আমাদের বাড়ীতে এক একবার এসো' বলে, অমুল্য সর্দ্দার পাইকের সঙ্গে

তাকে বিদায় করে দিলেন। বালক যখন জল খাবার খাচ্চিল সেই সময়, বৃদ্ধ অমুল্য মুড়ির সঙ্গে খানকয়েক বাতাসা পেয়ে, তার বাকি দাঁত কয়টীর সাহায্যে তাড়াতাড়ি চিবিয়েও সবগুলো ফুরুতে না পেরে অগত্যা, বাকিগুলো তাকে কোঁচড়ে ক'রে নিয়ে উঠে প'ড়তে হয়েছিল।

এই ঘটনার পর থেকে হরিনারায়ণ, প্রায় প্রত্যহই বিকেলে হরেকৃষ্ণদের বাড়ীর কাছে, ঐ নদীর ধারে বেড়া'তে আস্‌ত ; আর ঐ বাড়িটীর পাশ দিয়ে যা'বার আ'সবার সময় তাদের মেয়েটীকে দে'খবার আশায় নিয়তই ঐ দিকে চোক ফিরিয়ে ফিরিয়ে চাইতে চাইতে যে'ত। দু'এক দিন আশালতাকে দেখে হরিনারায়ণ, তার ঠাকু'মা কোথায় জিজ্ঞাসাও করেছিল।

এই রকমে কয়েক দিন দে'খতে দে'খতে, আশালতাকে বিবাহ ক'রবার ইচ্ছে তা'র মনটাকে বেশ ক'রে দখল করে ব'সতে লা'গল।

## তৃতীয় তরঙ্গ

আশালতার বয়স এখন এই এগার বৎসর। হরিনারায়ণ তাহার গ্রাম্য হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে। তা'দের টেষ্ট পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে, আর দিন কত পড়েই তা'কে ক'লকাতায় গিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হ'বে! বাড়ী সুদ্ধু সকলেই আজকাল বল্‌ছে,—এই দুটো মাস সাহেব বাবুর দস্তুর মত মেহনৎ ক'রে পড়া দরকার। হরিনারায়ণকে প্রায়ই দে'খতে পাওয়া যে'ত, কেতাব নিয়ে বসে আছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণে যেন তা'র একটা উদাস উদাস ভাব। ছেলের ঐ ভাবটা মায়ের চোখেই সব চেয়ে বেশী ঠেক্‌তে লা'গল। মা তখন ভেতরকার সন্ধান নিয়ে যা'ন্তে পাল্লেন যে—পুত্র নদীর ধারে সকালে বিকেলে বে'ড়াতে গিয়ে, প্রায়ই রাধাবল্লভপুরের পূব পাড়ার ঘোষেদের বাড়ী গিয়ে বসে।

এই সময় একদিন বৃদ্ধা শিবানী দাসী, রায়বাবুদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। রায়-গৃহিণী তার বাপের দেশের কাকিমাকে দেখে তাঁকে বেশ যত্ন ক'রে বসা'লেন ; তারপর দু'জনে অনেক কথাবার্ত্তা হ'তে লা'গল। এর মধ্যে কাকিমা অবসর বুঝে একবার রায়গৃহিণীকে সম্বোধন করে বল্লেন—

'দেখ মা, একটা অনুরোধ ধ'রবার জন্যে আমি তোমার বাড়ীতে এলাম। আমার ভাইপো হরেকৃষ্ণ ঘোষকে জামাইবাবু বেশ চেনেন। তার অবস্থা ভাল নয়, আর বয়সও হ'য়েছে। এই দ্বিতীয় পক্ষের সংসার ক'রে ভগবান, হরেকৃষ্ণের ঘরে একটী কন্যা দিয়েছেন। মেয়েটীর এই এগার পার হয় হয়। হরেকৃষ্ণের মেয়েটী দেখ্‌তে যেন লক্ষ্মীর প্রতিমাখানি। মা লক্ষ্মীর কৃপায় মা তোমাদের কিছুরই অভাব নেই। যদি জামাইবাবুকে রাজী ক'রে আমার নাতির সঙ্গে আশালতার বিয়েটা দিয়ে দিতে পার মা, তা' হ'লে ঐ গরীবকে একটা মস্ত দায় থেকে উদ্ধার করা হয়। বৌমার আমার বড়ই ইচ্ছে যে আমাদের সাহেব বাবুকে জামাইবাবু ব'লে ডাক্‌তে পান। আমার নাতি নদীর

ধারে মাঝে মাঝে বেড়া'তে গিয়ে থাকে ও দু'একবার আশাকে আমার সঙ্গে জলের ঘাটে দেখেছে। যদি বল মা, তা' একবার তাকে এনে আমি তোমাকে দেখা'তে পারি।'

অগাধ ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী জমিদার পত্নী, তা'র এক মাত্র পুত্রের সহিত কাঙ্গাল হরেকৃষ্ণ ঘোষের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব শুনে, যেন একটু মুখ বিকৃতি ক'রলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাম্‌লে নিয়ে ব'ললেন—

'কাকিমা তোমার ব'লবার আগেই আমি ঐ সম্বন্ধে অনেকটা আভাষ পেয়েছি। তুমি শুধু নদীর ঘাটে দে'খবার কথা ব'লচ কেন ! হরি যে মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে বসে তা'ও আমি শুনেছি ; আর ওর এই পাসের সময় ঐ দিকে মন্‌টা গিয়ে ওর পড়ার বিলক্ষণ ক্ষতি হচ্চে বলে আমি, ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে কল্‌কেতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দোব বলে কত্তাকে ব'লব মনে ক'রে আছি। তা' তুমি যখন কথাটা পা'ড়লে তখন সব ভেঙ্গেই বলি—কত্তা, কল্‌কেতার কে একজন খুব বড় লোকের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দোবার ঠিক করচেন। আর এক কথা দেখ ও যেমন ঘরের ছেলে সেই রকম ঘর থেকে একটা মেয়ে আনাই কি ভাল দেখায় না ?'

শেষের কথাটা শুনে, বৃদ্ধা পিতৃ-কুল-কৌলীন্যাভিমানিনী শিবানীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগ্‌লো। তিনি বু'ঝলেন,--দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ ; নতুবা হরেকৃষ্ণ কুলে মানে বা বংশে, কিছুতেই এই কাঞ্চনকৌলীন্য গর্ব্বিতা জমিদার পত্নীর চেয়ে খাট নয়। কল্‌কাতার বড় লোক, যা'দের কুলের ঠিক নেই ; যা'রা তা'দের তিন পুরুষ আগেকার পিতৃপুরুষের নাম বল্‌তে অক্ষম, সেই হ'ল এখন ওদের বড় ঘর।

'তা' আচ্ছা মা, তবে আসি' বলে শিবানী যখন উঠে প'ড়লেন, সেই সময় জমিদার গৃহিণী তাঁর হাতটী ধরে জোর ক'রে বসিয়ে—'না, একটু জল খেয়ে যেতে হ'বে কাকিমা' ব'লে, একটা ছোট রেকাবে গোটাকয়েক ফল, আর একটায় ঘরের তৈরী খান কয়েক গরম লুচি ও তা'রি পাশে গোটাকয়েক সন্দেশ এনে, ঝিকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দিতে হুকুম কল্লেন।

শিবানী অনিচ্ছার সঙ্গে ঐ রেকাব খানার ওপর হাত নাড়াচাড়া কচ্চেন দেখে হরিনারায়ণের মা, বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে বলে উঠ্‌লেন—'আচ্ছা কাকিমা আমি ওনাকে বলে' যা'তে হরেকৃষ্ণ ঘোষের মেয়ের একটা ভাল যায়গায় শিগ্‌গির বিয়ে হয় তা'র চেষ্টা কত্তে ব'লব ; এতে দু'পয়সা খরচ কত্তে হয় তা' আমরা কত্তে রাজি আছি।'

ছেলে, আশালতাদের বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে বসে দাঁড়ায়, এই কথা শোনা ইস্তক পাছে ছেলের মন বিগ্‌ড়ে যায় ব'লে, জমিদার পত্নীর প্রাণে আগে থেকেই একটু ভয় হয়েছিল। তার পর মেয়ে খুব সুন্দরী শুনে, তাঁর চিন্তাটা মনে আরও বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। আর এই জন্যেই যা'তে শীঘ্র শীঘ্র মেয়েটার অপর কোথায়ও বিয়ে হয়ে যায়, জমিদার গৃহিণীর সেই চেষ্টা ; নতুবা তাঁর ছেলের কল্‌কাতায় কোথায়ও বিয়ের কথা হয় নি', বা বড় লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দেবেন একথা, রামনারায়ণ রায়ের মুখে কখন প্রকাশও পায় নি'। এটা বরং গৃহিণীর নিজেরই মনের ইচ্ছা।

## চতুর্থ তরঙ্গ

হরিনারায়ণের পরীক্ষার ফলাফল বা'র হ'বার আগেই, বৈশাখ মাস প'ড়তেই জমিদার বাবুর চেষ্টায়, দরিদ্র হরেকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা আশালতা দাসির, এক অবস্থাপন্ন প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিবাহ হ'য়ে গেল। পাত্র বনিয়াদি ঘরানার, অবস্থা খুবই সচ্ছল, দোষের মধ্যে এক যে—পাত্র দোজ পক্ষের, বয়সটা পাত্রীর অনুপাতে বেয়াড়া অসামঞ্জস্য ; হঠাৎ দে'খলে বর কনে মনে না হ'য়ে, যেন নাতনীকে তা'র ঠাকুরদা' শ্বশুর বাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্চেন বলেই অনুমান হয়। তার ওপর বরটির আগের তরফের দু'টি বয়স্থ পুত্র বর্ত্তমান।

আশালতা বিয়ের পর, একগা' সোণার গহনা প'রে, তার উপচক্ষুধারী বৃদ্ধস্বামী গোপীজন-বল্লভ-পুদরেণু পালিত, ওরফে পদ পালিত ম'শায়ের ঘর কর্ত্তে গেল। কিন্তু বিধাতা যা'র ওপর বিমুখ, তার ভাল আর কি ক'রে হ'বে! বৈধব্য আশালতার বিধিলিপি, সে লেখা, মু'ছবার নয়। মাস আটেকের মধ্যেই গ্রামে বিশুচিকা রোগ দেখা দিয়ে, দু'তিনটে গ্রাস ক'রবার পরই বহু আত্মীয় অনাত্মীয়ের—'তোমার অবৈধব্য হউক' আশীর্ব্বাদ অগ্রাহ্য ক'রে, আশার আশার গোড়ায় কুঠারাঘাত ক'রল ও তার স্বামীটিকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে গেল। পদ পালিত মহাশয়ের দেহ ত্যাগের পর থেকে, স্বপত্নী পুত্র ও পুত্র বধুদের দিন নেই রাত নেই খিট্ খিট্ সহ্য ক'রতে না পেরে বিবাহের পর, বছর ফি'রতে না ফি'রতে আশাকে, বিধবা সাজে আবার পিত্রালয়ে ফিরে আসতে হ'ল। তবে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক থেকে, ছেলে দুটোকে ধ'রে, এই সহায়হীনা বিধবাকে তার নিজের স্ত্রীধন অলঙ্কার ছাড়াও, মেয়ে ব্যাপারে খাটিয়ে খুটিয়ে বেশ সচ্ছলভাবে জাবজ্জীবন একটা পেট চল্‌তে পারে এরকম নগদ কিছু টাকা দিয়ে, আশালতাকে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেন।

আশা শ্বশুরালয় থেকে যখন ফিরে এল, তখন তা'র পিতা হরেকৃষ্ণ ঘোষ জ্বর ও তার সঙ্গে কাশিতে ভুগ্‌ছিলেন। কন্যার অবস্থা দেখে তাঁর পীড়া যেন আর বেড়ে গেল। দু'মাস পরে জ্বর ত্যাগ হ'ল বটে, কিন্তু খুক্‌খুকে কাশিটা তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। এই অবস্থায় কব্‌রাজেরা প্রথমতঃ এইটিকে ক্ষয় রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ অনুমান ক'রলেন ও সেই মত ঔষধের ব্যবস্থাও কত্তে লা'গলেন। যাহ'ক শেষে হরে কৃষ্ণের ব্যায়রামটা দুরন্ত হাঁপ কাশিতে এসে দাঁড়া'ল।

হরেকৃষ্ণ ঘোষ পূর্ণ দু'টি বৎসর হাঁপ রোগে কষ্ট পেয়ে, খুব ভুগে ভুগে শেষে, একদিন স্ত্রী ও স্নেহের কন্যাকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের শেষের ঠাঁই খুজে নিলেন।

এই সময় অভিমানিনী রায় গৃহিণী একদিন কি মনে ক'রে পাল্‌কি আরোহণে পুব পাড়ায় এই ঘোষদের বাড়ী বেড়া'তে এসেছিলেন। আশা যখন তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে টিপ্ ক'রে প্রণাম কল্লে তখন জমিদার-পত্নী তা'র কপালটি ধরে তা'কে তুলে, তা'র থুৎনিটিতে হাত দিয়ে সেই হাতে একটি চুমো খেলেন। তারপর আশার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে, একবার আপ্‌না আপ্‌নি তাঁর মনে সেই সময় উদয় হ'ল—

সাহেব আমার বোধ করি এই বিয়ে হ'ল না বলেই আর বিয়ে কত্তেই চাইচে না! আহা! কি সুন্দরী মেয়ে! যদি আমি সেই সময় এঁকে বৌ কত্তুম, তাহলে ভালই কত্তুম। অনর্থক ছেলেটাকে মনে কষ্ট দিলুম।

তারপর রায় গৃহিণী সরস্বতী নদীতে স্নান করে ফিরে আ'সবার সময় আবার হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে পাল্‌কি নামাতে বল্‌লেন। এবার বৃদ্ধ শিবানী কিছুতেই তাঁকে একটু জল না খাইয়ে ছা'ড়বেন না জিদ ধরে ব'সলেন ও সঙ্গে সঙ্গে আশালতা, এক গেলাস জল ও একটা কাঁশার ডিসে করে একটু হালুয়া এনে দিয়ে, চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা বাধ্য হ'য়ে সাহেব বাবুর মাতাকে, চিম্‌টি কেটে একটু মোহনভোগ তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে জল খেতে হ'ল। তারপর চলে আ'সবার সময় তিনি শিবানীকে বলে এলেন—'কাকিমা, সময় সময় আমাদের বাড়ীতে যেও, আর আশালতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও, আমি পাল্‌কি বেহারা পাঠিয়ে দোব। আহা! মেয়েটী যতদূর হ'তে হয় ঠাণ্ডা!

## পঞ্চম তরঙ্গ

জমিদার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করায়, ঘোষেদের সঙ্গে জমিদার গৃহিণীর ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লা'গল। ইতিমধ্যে হঠাৎ-জ্বর-বিকার রোগে তিন দিনের দিন রামনারায়ণ রায় গতজীবিত হ'লেন। টেলিগ্রামে পিতার বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে, তৃতীয় দিনে সকালে হরিনারায়ণ, ক'লকাতা থেকে পিতাকে দে'খতে এসে পৌঁছুল। কিন্তু ৩/৪ ঘন্টার বেশী পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হ'ল না। মুমুর্ষু সময় পিতা পুত্রকে কাছে ডেকে এই শেষ উপদেশ দিয়ে গেলেন যে—'বাবা বিয়ে ক'রে সংসারী হ'য়ো, আমার পিতৃ পুরুষের নাম রক্ষা করো।'

রাম নারায়ণের প্রাণবায়ূ বেরুবার একটু আগে, শিবানী আশালতাকে সঙ্গে নিয়ে, পাল্‌কি, ক'রে জমিদার বাড়ীতে এসেছিলেন। সেই সময় হরিনারায়ণের সঙ্গে আশার চোখাচোখি হয়েছিল। হরি, হঠাৎ বিধবা সাজে আশালতাকে দেখে প্রথমতঃ এই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ষোড়শ বর্ষীয় বিধবাটীকে দেখে ঠিক চিন্‌তে পারে নি। তারপর আশার থুৎনির মাঝের, সেই আরও যেন তা'র সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের ক্ষুদ্র টোল্‌টী দেখে, তা'কে চিনে ফেল্‌তে তা'র দেরি হ'ল না।

এই সঙ্গে হরিনারায়ণের সমস্ত পুরাতন কথা মনে জেগে উ'ঠল। তার অতি যত্নের 'আর্য্য বিধবা বিবাহসঙ্ঘ', সভ্যাভাবে যে সমিতি তিনি অনেক চেষ্টা ক'রে গড়ে তুলেও অনিচ্ছার সঙ্গে শেষে বিচ্ছিন্ন কত্তে বাধ্য হ'য়েছিলেন, সেই সব কথা এক সঙ্গে তার প্রাণে উদয় হ'তে লা'গল ও তার মন অস্থির করে তু'ল্‌লে। এদিকে পিতাও মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সব নিয়ে সাহেব বাবু, সে সময় প্রাণে এক অদ্ভুত রকমের অশান্তি অনুভব কত্তে লা'গল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিনারায়ণের চক্ষের উপর তার পিতার চক্ষু চিরদিনের তরে বন্ধ হ'য়ে গেল। হরি তখন দেখিল ও বুঝিল যে—

যমের পক্ষপাত নাই, তার কাছে উচ্চ-নীচ ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-নির্ধন সব সমান।

সাহেব বাবু ধূতির খুঁটে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সদরে চলে গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জমিদার রাম নারায়ণ রায়ের ঊৰ্দ্ধদৈহিক কাৰ্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেল। তারপর বত্রিস তেত্রিসটা দিন কখন দেশে কখনও ক'লকাতায় থেকে, পিতার সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে সাহেব বাবু, মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাদের কল্‌কাতার বাড়ীতে চলে গেল।

পুত্র বিদায় হ'বার পর থেকে গৃহিণীর মন, ক্রমশঃ আরও খারাপ হ'তে লা'গল। দুদিন একদিন পরেই তিনি কাকিমা শিবানীকে ও তাঁর সঙ্গে আশালতাকে তাঁদের বাড়ীতে আ'নাতে লা'গলেন। আশার অতি সৎপ্রকৃতি, ধীর স্বভাব ও তাঁহার প্রতি আন্তরিক যত্নে জমিদার গৃহিণী, এই সময় আশালতার একান্ত অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

কিছুদিন পরে হরিনারায়ণের মাতার মন ক্রমশঃ বড়ই খারাপ হ'য়ে পড়ায় তিনি, শিবানী ও আশালতাকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষোত্তম তীর্থে গিয়ে সেখানে সমুদ্রতীরে বাস ক'রবার ও জগন্নাথ দর্শনে দেহমন পবিত্র ক'রবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে, পুত্রকে বাড়ী আসবার জন্যে পত্র লি'খলেন। হরি নারায়ণের কলেজেও এই সময় পূজোর বন্ধ হ'বার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। হরি বাড়ী এসে তার মা, শিবানী ও আশাকে নিয়ে, এবং সঙ্গে একজন বামুন, দুইটি দাসী, আর পুরাতন ভৃত্য অমুল্য সর্দারকে নিয়ে, সকলে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন।

পুরীতে পোঁছে স্বর্গদ্বারে সমুদ্র তীরে তাঁরা একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিলেন। হরি নারায়ণের মা, রেল হ'বার পূর্ব্বে একবার স্বামীর সঙ্গে উৎকল দেশের এই ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিলেন। তখন সাহেব বাবু খুব ছোট ছিল, তা'র সে সব কথা এখন কিছু মনেও নেই। তা' ছাড়া তা'দের সঙ্গিনীদের মধ্যে আর কেহ কখনও সমুদ্র দর্শন করেন নাই।

প্রথমতঃ আধ মাইল দূর থেকে সাগরের গর্জন, তা'দের কাণে দূরের কামানের ভীষণ শব্দের মত ঠেক্‌তে লা'গল। তারপর বঙ্গোপসাগরের নীল জলের সমতল উপরিভাগটা, হরি নারায়ণও আশালতার চোখে যেন দূরের একখন্ড প্রকান্ড নবদুর্ব্বাদল সুশোভিত হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র ব'লে অনুমিত হ'ল। ক্রমে নিকটে এসে পড়ে', সমুদ্র তীরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমমুখে স্বর্গদ্বারের দিকে যা'বার সময়, তা'দের বাম দিকে ফেনপুঞ্জ সুশোভিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ মালার অদ্ভুত নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খল মুক্ত সহস্র উন্মত্ত দানবের গর্জনের মত উর্ম্মিমালা সঙ্কুল ক্ষুব্ধ বঙ্গসাগরের ধরাতল বিকম্পনকারী গভীর হুঙ্কারধ্বনি,যুবক যুবতীর প্রাণে ত্রাস সম্বলিত আনন্দ ধারা ঢেলে দিতে লাগ্‌ল।

বাসায় পৌঁছে একটু বিশ্রামের পর সাহেব বাবু, সমুদ্র-স্নান কৰ্ত্তে বেরুলেন, তিনি সক্কলকার আগেই কোমরে গামছা বেধে, মালকোচা মেরে স্নানে না'বলেন। হরি নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তা'র মা, কাকিমা ও আশাকে সঙ্গে নিয়ে একটু তফাতে

গিয়ে জলে না'ববার যোগাড় কত্তে লা'গলেন। তিনি দু'এক পা করে খানিকটা নেবেও গেলেন ; কিন্তু সেই দূরের উন্মত্ত ঢেউগুলোর মিনিটে মিনিটে ভীষণ প্রকৃতিতে এগিয়ে আসা দেখে, আশা বা কাকিমা কোন মতেই সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে না'বতে রাজি হ'লেন না। তাঁরা সেই একটু নোনা জল মাথায় ছুঁইয়ে, গাম্ছা ভিজিয়ে নিয়ে কোন মতে গা'টা ধোয়া মোছার মাঝামাঝি একটা রকম করে নিতে লা'গলেন। এই সঙ্গে আশালতা, কৌতূহল চরিতার্থ ক'রবার জন্যে, এক একবার প্রত্যাবর্ত্তিত তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জমাট্ বালির উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে, আবার নূতন তরঙ্গ আ'সবার অঙ্গ ভঙ্গী দেখে তার আগে আগে দ্রুতপদে পালা'তে লাগল। এই রকম করে কাক নাওয়া গোছল করে, সকলে তখন বাসায় ফিরে এসে সে বেলাটার মত বিশ্রাম ক'রলেন।

বৈকালে ঠাকুর দে'খতে যা'বার পালা। গড়ুর স্তম্ভটীকে পেছনে করে, সিংহদ্বার পার হয়ে লম্বা লম্বা সিড়ি ভেঙে, মন্দিরে উঠ্বার পথের ডান হাতে হচ্ছে আনন্দ বাজার। এই বাজারেই জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিক্রি হয়। কেবল হিন্দুর পোষাক—নগ্ন পায়ে, পুরুষের একটা গাম্ছা কাঁদে ধুতি পরা ও স্ত্রীলোকের গায়ে একটা সাড়ী জড়ান থাক্‌লেই হ'ল। মোট কথায়—তুমি হ্যাট্ কোট পরা বা আচ্কান গায়ে তুর্কি টুপি মাথায় দেওয়া না হ'লেই আর কোন ফ্যাসাদ নেই। তারপর তোমার ইচ্ছে মত ঐ হাড়ি ভরা ভাত বা দাল তরকারী থেকে হাতে ক'রে খানিক্টা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে, তা'র আস্বাদনটা নিয়ে, আবার সেটা সেই হাড়িতেই রেখে দাও। এ' হচ্ছে জগন্নাথ দেবের মহা প্রসাদ, এতে এঁটো বা শক্ড়ির কোন বিচার নেই। তা' না থাক ; কিন্তু হরি নারায়ণ যখন প্রথমেই ঐ বাজারে ঢুকে দে'খল যে—একজন কুচ্কুচে কাল, শরীরের রক্তদুষ্টির জন্যে ঠোঁট, কাণের ডগ্ আর নাক এবং হাত পায়ের আঙ্গুল ও ভ্রু দু'টো ফোলা ফোলা বিকট চেহারার লোক, ঐ রকম ক'রে তরকারী ও দাল, হাতে করে তুলে নিয়ে নিজের মুখে দিয়ে, আবার সেই হাঁড়িতেই বা তার ভাঙ্গা টুক্‌রোর ওপর রেখে যাচ্ছে ; তখন হরি নারায়ণের মনে এই ব্যাপার দেখে, দারুণ এক বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হ'ল। হরি মনে মনে ভা'বল—এই লোকটার ত' গলিত কুষ্ঠ হবার পূর্ব্বাবস্থা ; এর ছোঁয়া বা এঁটো জিনিষ খাওয়া আর বিষ খাওয়া একই কথা। মা' আমার, ঠাকুরের 'পেসাদ' নিয়ে যে'তে এসেছেন ; তা' আমি এ মহাপ্রসাদ কিছুতেই নিতে দোব না। এতে আমার অধর্ম্ম হয় হ'ক।

## ষষ্ঠ তরঙ্গ

আনন্দ বাজার থেকে হরিনারায়ণের মাতা আশালতাকে সঙ্গে নিয়ে ক্রমশঃ শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'তে লা'গলেন। মন্দিরের সিঁড়িতে পা দেবার আগে, সাহেব বাবু একবার মন্দিরে সাবেক বৌদ্ধ প্যাটার্নের নির্ম্মিত উচু চুড়োটা ভাল করে দেখ্বার ইচ্ছেয় ওপর দিকে চাইতেই, উলঙ্গ উলঙ্গিনী মূর্ত্তিগুলো যেন বিভৎস ক্রিয়ার রত, এই ভাবে উর্দ্ধে মন্দির চুড়ায় অর্দ্ধপথে সাজান রয়েছে দেখে, তিনি অবাক্ হ'য়ে

খানিক ক্ষণ ধ'রে তা'ই দে'খতে লা'গলেন। হরিনারায়ণকে এই ভাবে চেয়ে থাক্তে দেখে আশালতা, ওপর দিকে একবার চেয়েই, বাধ্য হয়ে সেই যে চোখ নিচু ক'রে নিল, আর সে ওপর দিকে চাইতেই পা'রল না। মাতা এই সময়ে পুত্রের অবস্থা বুঝে, কাকিমা ও আশাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে শ্রীমন্দিরের ভেতর গিয়ে, যেখানে রত্নদেবীর ওপরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সৌষ্ঠবান্বিত কাষ্ঠের মূর্ত্তি তিনটি বসান আছে সেই খানে গিয়ে প্রথমতঃ একটা থামের পার্শ্বে দাঁড়ালেন।

এদিকে মন্দির-বাহিরে হরিনারায়ণ, চাতালে দাঁড়িয়ে কলির জাগ্রত দেবতা, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীজগৎ নাথের পবিত্র মন্দিরের গায়ে রক্ষিত এই সমস্ত কুরুচি ও নক্কার জনক বিভৎস মূর্ত্তি গুলো দেখে, রাগে অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়তে লাগল ; তার আর শ্রীমন্দিরের মধ্যে গিয়ে জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে হ'ল না।

এর আগে সাহেব বাবু, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রী শ্রী৺ শ্রীকৃষ্ণের দোল ও রাশ লীলার ব্যাপার ভেবেই মধ্যে মধ্যে মনে ক্ষুণ্ণ হ'তেন। এখন তার সঙ্গে জগতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু তীর্থ শ্রীশ্রী৺ শ্রীজগন্নাথের ধর্ম্ম মন্দিরের গায়ে এই অশ্লীলতা ও লাম্পট্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক জঘন্য কর্ম্মে উপগত মনুষ্য মূর্ত্তি গুলি দেখে ঘৃণায় অধোবদন হ'য়ে ভা'বতে লা'গলেন—মাতা পুত্রে, শ্বশুর পুত্র বধুতে একত্রে শ্রীভগবানের পূজা দিতে এসে, ভগবান দর্শন লাভের পূর্ব্বে, ভগবানের পার্শ্বচর গুলোর এই ক্রিয়া কলাপ দেখে, তা'দের মনে পবিত্র ভাবের উদয় হওয়াটা'ই খুব বেশী সম্ভব দেখছি। আবার আমাদেরই শাস্ত্রকারেরা না বলে' থাকেন—এক সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার পরমেশ্বরের ধারণা আমাদের মানবের এই ক্ষুদ্র মনোমধ্যে স্থান সঙ্কুলান হ'তে পারে না বলে, তাঁর এক একটি গুণ নিয়ে এই সাকার মূর্ত্তি পূজার প্রচার। তবে মনটা যখন এতই সঙ্কীর্ণ, তখন আবার তা'র মধ্যে এই সব জড়ি জক্কড় গুলো ঢুকিয়ে, সে বেচারাকে অনর্থক ভারাক্রান্ত ক'রবার ও সঙ্গে সঙ্গে বৃথা একটা ঘেন্নার ভাব টেনে আনবার চেষ্টা ক'রবারি বা দরকার কি ?

ইতিপূর্ব্বে মোস্‌লেম্ স্বর্গের 'হুর' নিয়ে সাহেব বাবুর এক দিন, তাঁর একজন মোসলমান কলেজে বন্ধুর সঙ্গে খুব তর্ক হ'য়েছিল ; সেই কথাটা মনে হ'য়ে তিনি এই সময় আপনা আপনি বড়ই লজ্জিত হ'লেন ও মনে মনে বল্‌তে লা'গলেন,— আমাদের ঈশ্বরের অবতার সশরীরী দেবতা গুলো এই নরলোকে থেকে, রাশি রাশি নারী নিয়ে এত জঘন্য কীর্ত্তি করেও যখন আমাদের পূজার্হ, আর তা'দের সেই প্রকাশ্যতঃ অপকর্ম্ম গুলোকে ধর্ম্মের ভয়ে আমরা বাধ্য হ'য়ে সদানুষ্ঠান বা ঠাকুরের 'লীলা' বলে মনে করে থাকি ; তখন মোস্‌লেম স্বর্গের অশরীরী 'হুর' বেচারিরাই বা এত কি দোষ করে' ফেল্লে ?

রায় গৃহিণী জগন্নাথ দর্শনের পর বেরিয়ে এসেই পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর দেখে, শ্রীমন্দিরের ওপর থেকে একটা, আনন্দ বাজারের আছোঁয়া খিচুড়ি, বলরাম-ভোগের হাঁড়ি কিনে, পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফি'রলেন।

সে রাত্রি সমস্ত রাত্তিরটাই, ঐ সমস্ত উলঙ্গ উলঙ্গনীর বিভৎস ক্রিয়ার রত মূর্ত্তি

গুলোর চিন্তা, সাহেব বাবুর মনটাকে একেবারে বিদ্রোহ ক'রে তু'লল। পরদিন ছিল, বিজয়া দশমীর দিন। বিকেলে হরিনারায়ণ একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে, মা ও আশালতাকে নিয়ে মন্দিরের সাম্নে বেড়া'তে গেলেন। সমুদ্রের জলে স্নান করে সেদিন শিবানীর একটু জ্বর বোধ হওয়ায়, তিনি আর তা'দের সঙ্গে গেলেন না।

সিংদ্বারের সাম্নে গিয়ে তাঁরা দে'খলেন যে—মন্দিরের সাম্নের রাস্তার বরাবর এক একটা ছোট ছোট বাঁশের মাচা তৈরী করা রয়েছে। তাঁরা যখন এই সব দেখে দেখে ও তার সঙ্গে সিংয়ের ও হাড়ের তৈরী ছড়ি খেল্না পরীক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় কর্ণ বধিরকারী প্রকাণ্ডাকার ঝাঁঝের শব্দ সহ বাজ্না বাদ্যি সঙ্গে নিয়ে, কেউবা একটা মাতালের মুখে একটা কুকুরে প্রস্রাব করে দিচ্চে, কেহ একটা লম্পট একটী বারবিলাসিনীকে অর্দ্ধোলঙ্গিনী অবস্থায় টানাটানি কচ্চে, এই রকমের মাটির তৈরী নানা মূর্ত্তি মাথায় ক'রে ; আবার কেহবা একটা ফিরিঙ্গি, একটা শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্চে, এই রকমের একটা কিছু নিয়ে, আমোদ কত্তে কত্তে এসে, এক একটা মাচার ওপর ঐ এক একটা বসা'তে লাগল। তারপর সেই গুলোকে প্রণাম ও গড় ক'রবার ধুম তখন দেখে কে'। অবশ্য দু' একটা মাচার ওপর ক্ষুদ্রায়তনের দুর্গা প্রতিমা রেখেও দু' একজন তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখা'তে লা'গল। এই সময় হরি নারায়ণ রায় দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন যে,—কুকুর, লম্পট ও সাহেব মেমের প্রতি তা'দের শ্রদ্ধাটী, কোন অংশে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির চেয়ে হীন নয়।

সাহেব বাবু তখন তাঁর সনাতন আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী উৎকল দেশের ভ্রাতা দেরকে, ঐ হ্যাট্-কোটধারী ও কুকুর মাতালের মূর্ত্তি গুলোকে ঠাকুর দেবতা জ্ঞানে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম্ করতে দেখে, নিরাকার পরমেশ্বর বেচারীকে তেত্রিশ কোটী ভাগে বখ্রা করে' সাকারে এনে স্তবস্তুতি করার ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। আর ঐ পৌত্তলিকতা যে ক্রমে মানুষকে ধর্ম্মান্ধ করে', কি করে' ঈশ্বর বৈরিতার শেষ স্তরে এনে পৌঁছে দেয়, তা'ও তিনি এই উড়েদের ব্যবহারের ভিতর দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে দেখ'তে পেলেন। তিনি ভা'বতে লা'গলেন—এই নিরাকার নির্ব্বিকার জগৎব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাটিকে অনর্থক কেন টুক্রো টুক্রো করে, কখন লম্পট, কখন গাঁজাখোর সাজে, আবার কখনওবা তাকে উলঙ্গিনী ক'রে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে সাত সতের রকম সাজিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াই ! এ'তে কি ভগবানের গুণ কীর্ত্তণ হয়, না এ'কে তাঁর স্তবস্তুতি বাড়ান বলে ! বরং তাঁর ধারণা হ'তে থা'কল যে—এই সব চাক্ষুস উদাহরণ গুলো কুলোকের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ও বৃদ্ধির সহায়তাই ক'রে থাকে।

## সপ্তম তরঙ্গ

এই কয়দিন নিয়ত আশালতার সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে ও আশার মধুর স্বভাব, তার সঙ্গে তা'র অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দিবারাত্র চোখের সাম্নে দেখে, সাহেব বাবুর মন ক্রমশঃই তার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হ'তে লাগল। বিয়ে করব না বলে' হরি নারায়ণ

যে এতকাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন ; আর তার মা যে অনেক অনুরোধ করে বা, তা'র স্বর্গীয় পিতার শেষ অনুরোধ রক্ষা করা তার অবশ্য কর্ত্তব্য বলে' অনেক করে বুঝিয়েও পুত্রের মন একটুও টলা'তে পারেন নি' ; এখন সেই হরি নারায়ণের প্রতিজ্ঞা ক্রমেই যেন শিথিল হ'য়ে প'ড়তে লাগল। একটু ফাঁক পেলেই হরি নারায়ণ, এখন আড়ে আড়ে আশালতার দিকে দেখেন বা চেয়ে থাকেন ; আবার অপর কারুর, এমন কি আশার চক্ষুও সে দিকে ফি'রলেই তাড়াতাড়ি যেন কত অপরাধীর মত চোক্ ফিরিয়ে নেন্ ; আর সেই সঙ্গে কতই যেন গুরুতর অপরাধ করেছেন মনে করে, ভা'বতে ভা'বতে তাঁ'র সদা-প্রফুল্ল মুখ ক্রমে বিমর্ষ হ'য়ে ওঠে। এই রকমে দু'চার দিনের ভেতরেই হরি নারায়ণ বেশ বু'ঝতে পা'রলেন যে—আশালতাও একটু অবসর পেলে যেন ঠিক্ তাঁ'রি মত তাঁর দিকে আড়ে আড়ে চায় ও আশার চক্ষু যেন সর্ব্বদাই তাঁকে খুঁজে বেড়ায়।

ভালবাসা আল্লাহ্‌তায়ালার দান, এই প্রেম একটা মস্ত পবিত্র জিনিস, তুমি একান্ত মনে শুধু মানুষকে কেন, কোন জীব জন্তুকে পর্য্যন্ত ভালবাস, সে তার প্রতিদান তোমায় দেবেই দেবে। তোমার ভালবাসা বিনা তারের রেডিও ফোনের মত, তার হৃদয় যন্ত্রে গিয়ে বা'জবেই বা'জ্‌বে। সাহেব বাবু পবিত্রভাবে আশালতাকে ভালবেসেছিলেন, এটা তাঁর পবিত্রতামিশ্রিত ঈশ্বরদত্ত প্রেম ; কাজেই নীরবে আশার প্রাণ শিঘ্রই তাঁ'র দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তখন হরিনারায়ণের চির আয়াসের 'আর্য্য-বিধবা বিবাহ সঙ্ঘের' সমস্ত আলোচ্য বিষয়গুলো বোধ করি তাঁর চোখের সাম্নে এসে আবার ভেসে ভেসে বেড়া'তে লা'গল। হরি নারায়ণ এইবার বাল-বিধবা আশালতাকে বিবাহ ক'রবার অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লেন।

এদিকে আশা বিধবা হ'য়ে অবধি, চির বৈধব্য ভিন্ন অন্য কোন রকমের তার প্রাণে কখনও উদয়ও হয় নি'। সে যে কবে তার স্বামীর এতটুকু ভালবাসা সামান্য কটা দিনের জন্য পেয়েছিল, আর তার প্রতিদান দিবার একটু চেষ্টাও করেছিল, তাই মাত্র তার ক্ষুদ্র হৃদয় খানিতে পোষণ ক'রত ও সেই ভেবে, সময় সময় প্রাণে একটু সান্ত্বনা মিশান আনন্দ উপভোগও সে ক'রত। আশা তাদের এখানকার অভিভাবক এই সাহেব বাবুকে প্রথম থেকেই খুবই ভালবা'সত। কিন্তু সে ভালবাসা এত দিন ছিল, যেমন জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি কনিষ্ঠার ভক্তি মিশান অনুরাগ! কিন্তু সে এখন নিজেই ভেবে ঠিক ক'ত্তে পা'রত না যে, তা'র মন তার অজ্ঞাতসারে, তা'র ভক্তি প্রীতির আধার, তার সেই সাহেবদা'কে যেন আরও নিজের কত্তে চায় কেন! এখন এই নূতন চিন্তা ও আসক্তির স্থান যেন আর আশালতার ক্ষুদ্র প্রাণে সঙ্কুলান হয় না, সে এই রকম অনুভব কত্তে লা'গল। তা'র সাহেবদা'র প্রতি তার এই উপ্‌ছে প'ড়বার মত নূতন ধরণের অনুরাগটীকে সে, জোর ক'রে তার প্রাণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রা'খতে গিয়ে, যেন সে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হ'য়ে যা'বার উপক্রম হচ্চে অনুভব ক'রত ; আর এত্‌থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'বার কোন উপায়ও কিন্তু সে খুঁজে পেত না। এই রকম সময় কখনও কখনও দু' এক ফোটা উত্তপ্ত অশ্রু তার

চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, তবে তাকে যেন একটু সান্ত্বনা দিত।

আজকাল সাহেব বাবু তাঁর মাকে নিয়ে আর ঠাকুরবাড়ীর দিকে বড় একটা যেতেন না। সেই প্রথম দিন যাওয়ার পর থেকে, তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে যাওয়া এককালীন ত্যাগ করেছেন। সেই কুরুচি উদ্দীপক মূর্ত্তিগুলো যখনি তাঁর মনে হ'ত, সমস্ত ঠাকুর বাড়ীটার ওপর যেন তাঁর প্রাণে একটা বিজাতীয় ঘৃণা সঞ্চার ক'রে দিত।

আশালতার শরীরটা খারাপ বোধ হওয়ায়, আজ সে আর তার দিদিমাদের সঙ্গে বৈকালে ঠাকুর দর্শনে গেল না। সন্ধ্যার একটু আগে হরি নারায়ণ আশার পাশে এসে দাঁড়িয়ে—সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা ক'রলে আশা, তার মাথাটা ধরে আছে ও গায়ে হাতে খুব বেদনা, উত্তর দিতে দিতে ধড়্মড়িয়ে উঠে ব'সল। তখন হরি নারায়ণ তার কপালটায় হাত দিয়ে, তত গরম নাই দেখে—চল, সমুদ্রের ধারে বেড়া'তে যাবে ?' বলায়, আশা সম্মতিসূচক ঘাড় না'ড়লে। তার পর দু' জনে বেলাভূমির ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পায়চারি করে বেড়া'তে লা'গল।

সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আ'সতে না আ'সতে কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদ, হেসে তার এক রাশ তরল রজতের কুলকুচি, দুষ্টামি করে তা'র দিকে ছুড়ে ফেলায়, বেচারি ছুচিবাইগ্রস্থা সন্ধ্যা, জড় সড় হ'য়ে ডিঙ্গি মা'রতে মা'রতে সরে প'ড়ল। তখন নিশাপতি ফাঁকের ঘর পেয়ে খোলা সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে দস্তুর মত কেলি আরম্ভ করে দিলেন। যুবক যুবতী চাঁদের সেই জলকেলি দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে পায়চারি ক'রে বেড়া'বার পর, শারিরীক অসুস্থতার জন্যে আশা প্রথমেই এক জায়গায় বালির ওপর বসে প'ড়ল। কাজেই হরি নারায়ণও তখন তার পাশে ব'সতে বাধ্য হ'ল। দু'জনে খানিক ক্ষণ ধরে নিস্তব্ধ হয়ে' বসে রইল। এই সময় সাগরের ঢেউ ভা'ঙ্গবার দ্রম্ দ্রুম্ ধ্বনি, তার মাঝে মাঝে ওপরে ওঠা ভাঙ্গা ছোট ছোট ঢেউয়ের জলগুলোর আবার নিচেয় নেবে যা'বার সর্ সর্ শব্দের ভেতর, যুবক যুবতীর মধ্যে মধ্যে নিক্ষিপ্ত দু' একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের অস্পষ্টে শব্দ, কোথায় মিলিয়ে যেতে লা'গল।

খানিকক্ষণ এই রকম বসে থা'কবার পর, হঠাৎ হরিনারায়ণ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা যুবতীর হাতখানি লঘু স্পর্শে আবেগ ভরে ধরে' ফেলে, একটু কম্পিত স্বরে—'আশা, আর কত দিন আমাকে এ' যন্ত্রণা—' এই পর্য্যন্ত বলে, তিনি যেন আর একটী কথাও মুখে উচ্চারণ কত্তে পাল্লেন না। তখন কেবল আশালতার ক্ষুদ্র হাতখানি টেনে নিয়ে, ক্রমে আস্তে আস্তে ওপরে তু'লতে তু'লতে খপ্ করে একবার নিজের ওষ্ঠাধরে ছোঁয়া'লেন। আশা তখন লজ্জায় ডা'ন হাত দিয়ে তা'র ঘোম্টা আর একটু সামনের দিকে টেনে, সুড় সুড় ক'রে হরিনারায়ণের হাত থেকে নিজের একটু একটু ঘামে ভেজা হাতখানা সরিয়ে নিয়ে, মৃদু স্বরে বল্লে—

'সাহেব দা' বাড়ী চলুন, রাত হ'য়ে যাচ্চে।'

পথে দু'জনার মধ্যে আর একটা কথাও হ'ল না। বাসায় যখন তাঁরা এসে পৌছুলেন, সেদিন তখনও রায় গৃহিণী ঠাকুর দেখে ফিরে আসেননি'। আশা তখন

একটু যেন আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠ্ল—'আজ বোধ হয় দিদ্মারা আরতি দেখে তবে ফি'রবেন।' সম্পর্কে বাপের পিসী হ'লেও আশা, শিবানী দাসিকে ঠাকুর মা না বলে দিদি মা ব'লত।

বাসায় আসার পর থেকে আশালতার শরীর ক্রমশঃ অধিক খারাপ বোধ হ'তে লা'গল। রাত্তিরটা মাথার বেদনায় আশার খুব কষ্টের সঙ্গেই কাট্ল। শেষ রাত্তিরে, তার গায়ের উত্তাপ খুব বেশী ও মাথার বেদনার ক্রমশঃ আধিক্য দেখে শিবানী, সাহেব বাবুকে একবার এসে দে'খতে বল্লেন।

হরিনারায়ণ রায় ঘরে পড়ে ও কল্‌কাতার বাসার আশে পাশে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করে, ঐ ঔষধ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অনেকটা বুৎপত্তি জন্মে ছিল। তিনি প্রথমে এসেই একোনাইটের ব্যবস্থা করলেন! পরদিন সকালে আশার পৃষ্ঠের ও মেরুদণ্ডের অতিশয় বেদনা শুনে ও তার লাল জবা ফুলের মত চক্ষু দেখে, বেলেডোনা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে এটা বসন্তের পূর্ব্ব লক্ষণ বলে ধারণা হ'ল। যা'হ'ক সামান্য এটা ওটা দেবার পর, তৃতীয় দিনে আশালতার গাত্রে 'মায়ের অনুগ্রহ' ফুটে বেরিয়ে প'ড়ল। তারপর সাত দিনের মধ্যে পান-বসন্তের স্ফোটক,—তার স্নেহময়ী মাতার এই নিগ্রহগুলো—শুকিয়ে গিয়ে আশালতা বেশ সেরে উঠ্ল।

এই কয়দিনের মধ্যে আশা অনেকবার—'সাহেব দা, আমার কাছে আপনি বেশি আ'সবেন না ; এ' সংক্রামক রোগ, বেশি মেশামিশি ভাল নয়—' বলে, হরিনারায়ণকে তার কাছে আ'সতে নিষেধ করে ছিল। কিন্তু আশাকে একা পেলেই হরিনারায়ণও এমন দু'তিন বার বলে ছিলেন—'দেখ আশা, তুমি যে আমাকে তোমার থেকে একটা আলাদা জিনিষ ভাব, এতে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। আমার জীবন সঙ্গিনী হ'তে তোমার কি এতই আপত্তি ?'

## পরিশিষ্ট

পুরী থেকে হরিনারায়ণ রায় সকলকে নিয়ে, তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে চলে এলেন। এই সময় তাঁর আগেকার কয়েকজন বন্ধু ও তাঁর আরও জন কয়েক যুবক বন্ধু মিলে পুনর্ব্বার পূর্ণউদ্দমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ক'রবার চেষ্টায়, একটা সমিতি সংস্থাপন করবার জন্যে সকলে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এবার সমিতির কাজও বেশ দ্রুত চ'লতে লা'গল। এদের চেষ্টায় অনেকগুলি বিধবারও গতি হয়ে গেল ; তবে পথ প্রদর্শক হ'লেন আমাদের নব জমিদার বাবু হরিনারায়ণ গুহ রায়, সর্ব্বপ্রথমে বিশিষ্ট জন মণ্ডলীর সমক্ষে, বৈদিক প্রথানুসারে শ্রীমতী আশালতা দাসীর পাণিগ্রহণ করে'।

# বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ

## সভানেত্রীর অভিভাষণ

মাননীয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ও ভগিনীবৃন্দ—আপনারা আমার মত একজন অতি তুচ্ছ ব্যক্তিকে আপনাদের মহিলা-সভার সভানেত্রী পদে বরণ ক'রে আমার প্রতি যে মহৎ সম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্চি। এই গৌরবময় পদমর্য্যাদার যে একটু দাবী ক'রতে পারি, এমন যোগ্যতা আমাতে নাই তা' আমি বেশ জানি। আমার বিদ্যার পরিচয় আমার "স্বপ্নদৃষ্টার" গোড়ায় আপনারা অনেকটা পেয়েছেন, তবুও আজ যে আমি এখানে কিছু করবার জন্য দাঁড়িয়েছি, এটা আমার নিজের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার ব'লে মনে হ'চ্চে। আমার এই দুঃসাহসিকতা দেখে আমি নিজেই অবাক্ হচ্চি ; আর আমার মত একজন নগণ্যা রমণীর এই সভায় কিছু বল্তে যাওয়া যে কতদূর ধৃষ্টতা ও লজ্জায় বিষয়, তা' বোধহয় আমার চেয়ে আর কেউ বেশী অনুভব কর্‌তে পার্‌চেনা না। যাকে উপেক্ষা করা যায় না তাকে বরণ করেই নিতে হয়। আপনাদের স্নেহের আহ্বানকেও তাই মাথায় ক'রেছি।

আমরা হচ্চি পর্দানসীনা মোসলেম-রমণী। সাহিত্য আমাদের পুরুষদেরই একটু দাড়াবার স্থান মেলে না, তা' আমরাত' কোন্ দূরে পড়ে আছি।

দূর, চিরদিনই দূর থাকে না। সাধনায় তা নিকট হ'য়ে আসেই আসে। আওতায় পড়ে পঙ্গু হয়ে যা' হ'ক করে শুধু বেঁচে থাক্‌লে আমাদের আর চ'লবে না। আলোকের দিকে মাথা তুলে বাতাসের দিকে শাখা মেলে, আমাদের এখন গজিয়ে উঠ্‌তেই হবে। বিধি-নিষেধের নানা বাধায়, নানা কালের ধর্ম্মেও পরিবেশের আবশ্যকে, যে পথটাকে আটক ক'রে রেখেছিল—এখন বর্ত্তমানের দিকে চেয়ে, সেই বাধাগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, সাম্‌নে এগিয়ে যাওয়াটাই আমাদের পরম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বল থাক্‌লে তা' পারা যায়, সেটাকে নিজের মনের মধ্যেই পেতে হয়, ভিক্ষায় তা' মেলে না। এখন নিজের নিজের চেষ্টায়, বিদ্যা ও জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতির ভিতর দিয়ে, অশেষ বাধা বিঘ্ন মাড়িয়ে, নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে যাওয়াই হচ্চে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেকে হয়ত মনে ক'রবেন—তবে কি আমরা লেখাপড়া শিখে, এখন থেকে সমাজের উন্নতির জন্যে রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ ক'রে বেড়াব, না অধুনাতন নারী Franchise এর আলো পেয়ে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনে পুরুষ সেজে আফিসের দ্বারে গিয়ে ঢু মা'রব ? না, এই উদ্ভাবনীয় উপদেশ দিবার জন্যে, আজ আমি আপনাদের কাছে আসি নাই। বরং আমার মনে হয়, শিক্ষা যে অর্থের জন্য নয়, এই কথাই আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে নিয়ে আমাদের কাজে না'ম্‌তে হ'বে ; আর সেই নামাটাই সফল হ'বে। এমন একটা ধারাকে আমাদের ধ'রতে হ'বে—যাতে করে আমাদের কার্য্য-পন্থার সুরাহা হয়। এই ক'রলেই আমরা আশানুরূপ ফল পা'ব।

তারপর স্ত্রী শিক্ষা,—এটা নিশ্চয়ই আজকাল আমাদের অপরিহার্য্য জিনিষের

মধ্যে হ'য়ে প'ড়েছে। আর এইটী আমাদের রুগ্ন সমাজে নাই বল্লেই চলে। তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন সকল রকমে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েচে। এই দুর্ব্বলতায় আমরা এত নিম্নস্তরে নেমে চ'লেছি যে, ভাবতে গেলে ভবিষ্যৎ জীবনগুলো সেখানকার অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

এক কথায় বলি, বিদূষী নারীর গর্ভজাত সন্তান মূর্খ হতে পারে না। তার মা তাকে অশিক্ষিত রাখতে স্বতঃই নারাজ—এইটে হ'চ্ছে মানুষের ধর্ম্ম। তারপর দেখুন বাড়ীর মধ্যে একটী মেয়ে কোন রকমে খানিকটা লেখাপড়া শিখ্তে পারলে, শিক্ষার শুভ-সংক্রামক রোগটা খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রথমে বাড়ীতে, এবং পাড়ার মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ শিক্ষিতা মাতার গর্ভের পুত্র কিছুতেই অশিক্ষিত হ'বে না, এই ভাবটী আমাদের ভিতর দৃঢ়ীভূত ক'রতে পারলে আমাদের উন্নতি অনিবার্য্য।

এই জায়গায় আমি আমার নিজের সম্বন্ধে একটা উদাহরণ আপনাদের কাছে না দিয়ে থাক্তে পারলাম না। আমার এই ছোট ১৫ মাসের ছেলেটী যে সময় আমার পেটে ছিল, সেই সময় সাদা কাগজে কালির আঁচড় টান্বার চেষ্টাটা আমার খুব বেশী রকমের হ'য়েছিল। আমি আমার "অদৃষ্ট" বইখানা ঐ সময় লিখ্তে থাকি ; তাতে আমি এখন বেশ বুঝতে পার্চি যে—সেই কারণেই আমার এই ছেলে, ছ'মাসের পর থেকে অপর সমস্ত খেল্না ছেড়ে, দোয়াত কলম ও কেতাব সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। বই সামনে পেলে' সে নিজের মনে বইয়ের পাতা উল্‌টে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় ক'রে কত কি বল্‌তে থাকবে। আবার শত সুন্দর সুন্দর রংবেরংয়ের খেলনা ওর সাম্‌নে রেখে দাও, ছেলে সবগুলো ঠেলে রেখে, সেই তফাতে-রাখা কালো দোয়াত ও ভাঙ্গা কলমটী নেবার জন্যে ব্যস্ত হবে ও না দিলে কেঁদে হাট ক'রবে। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মনের বৃত্তি সন্তানে স্বতঃই সংক্রামিত হ'য়ে থাকে।

আমি এখন আমার স্বজাতীয়া ভগ্নিদের লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নেবার জন্যে আহ্বান কর্‌ছি না। আমার ব'লবার উদ্দেশ্য এইটুকু যে—তাঁরা যেন একেবারে মূর্খ হ'য়ে না থাকেন। সংসারের কাজকর্ম্মের ও পর্দ্দার ভিতর থেকে যতটুকু শিক্ষা ক'রতে পারেন, সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তা'হলে তাঁরা তখন আপনা আপনিই নিজেদের সন্তানগুলো যাতে শিক্ষায় উন্নতিলাভ কর্ত্তে পারে, সেই দিকে সর্ব্বদা নজর রাখবেন। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত হ'লেই বাস্। ভাল বীজ বুন্‌তে পার্‌লে, তার অঙ্কুরও ভাল।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে দেখ্তে পাবেন যে—আমাদের স্বজাতি বা পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল যে তরবারি হস্তে দেশ জয় করে বেড়িয়েছেন, শুধু তা' নয়। তাঁরা ধর্ম্মপ্রচার আর রাজ্য বিস্তার ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ না ক'রলে, আজ ইউরোপকে সভ্যতার চরম সীমায় দাঁড়াতে হয়ত' দেখতে পেতাম না। তাঁরাই ত' বিভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মন্থন ক'রে, তার সারাংশ গ্রহণে, এই সুনির্ম্মল আলোক পৃথিবীময় ছড়িয়ে গিয়েছেন। তমসাচ্ছন্ন ইউরোপখণ্ডকে জ্ঞান-বিদ্যার উজ্জ্বল রশ্মি প্রদর্শন করেছিলেন ত প্রথমে তাঁরা। আর আজ সেই মহাসুসভ্য মহা উন্নত জাতির বংশধর বা ধর্ম্মাবলম্বী আমরা, দিনরাত আয়েসের কোলে শুয়ে

থেকে, সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য পালনে পরাম্মুখ হ'য়ে, এখন প্রতিবাসীদের দ্বারা সকল রকমে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হচ্চি। আর তাদের বিষয়বৈভবের পানে ফেল্ ফেল্ ক'রে চেয়ে থাক্‌চি। বিশ্বের কষ্টি পাথরে শুধু আমরা মেকির দরটাই ক'ষ্‌তে শিখে বসে আছি।

যাঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, তাঁদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেন, সে'ত খুব ভাল কথা। আর তাঁদের মেয়েরা যদি আবার স্বামী, পিতা বা ভ্রাতার সঙ্গে, অবসর মত মধ্যে মধ্যে একটু এদেশ ওদেশ বেড়াতে পারেন, সেটা আমার বিবেচনায় তাঁদের পক্ষে খুবই মঙ্গলের হয়। দেশ ভ্রমণে অনেকগুলো উপকার এক সঙ্গে হাসেল্ হয়। একত মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হয়ে, তজ্জনিত শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে' ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কিছু কিছু হৃদয়ে ধারণা ক'রতে অভ্যাস ক'রে ঐশী জ্ঞান সঞ্চয়ে প্রাণে অনাবিল আনন্দ অনুভূত হ'য়ে থাকে। কিন্তু এই কাজে আমি আমার ভগিনীগণকে যথাসাধ্য পর্দ্দারক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি ; যেন যুগপ্রভাবে ইহা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়।

এখন দেখ্‌চি আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতা দূর ক'রতে হ'লে, আমাদেরই কোমর বেঁধে নাম্‌তে হ'বে। আমরা একটা স্ত্রী-শিক্ষা-মণ্ডলী গড়ে না তুল্‌লে, আমাদের সমাজের পুরুষদের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গবে না। আজ যেমন এই মহিলা সমিতির একটী অধিবেশন আমরা এখানে কল্লাম, এই রকমের মিটিং প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক'রতে পাল্লে, সমাজের ক্রন্দনের বদলে হাসির রোল আপ্‌না আপনি আমাদের কাণে এসে ঝঙ্কার দেবে ; আমাদের আশা বৃক্ষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুল-ফলে শোভিত হবে।

আমাদের সমাজে অর্থের যে খুবই অসদ্ভাব, এটা আমরা জানি। তা' বলে ত মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চ'লবে না। টাকা ত' আর ছপ্পর ফুঁড়ে হাতে এসে পৌঁছুবে না ! এর জন্যে দস্তুর মত চেষ্টা কর'তে হ'বে। মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হ'বে। অর্থোপার্জ্জনকারী বিদ্যাচর্চ্চা সবে ত' বছর ত্রিশেক থেকে আমাদের সমাজের মধ্যে ঢুকেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিশ্বের সভায় দাঁড়াতে হ'লে, এর চেয়ে অনেক বেশী দিনের তপস্যার প্রয়োজন। সেই দিকে কোমর বেঁধে না লেগে, অনিবার্য্য পরাজয়ে মণ্ডিত মন নিয়ে, একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বেকার ব'সে থাকাটা কি আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বাতুলতা নয় ? পরের দাসত্ব করা ছাড়া আর কি অর্থোপার্জ্জনের পথ নেই ? ভবিষ্যতে দাসবৃত্তি ক'রবার দিকে চোখ রেখে, আজকাল ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করাই ঝক্‌মারি।

এই যেমন দর্জ্জির কাজ ইত্যাদি শিল্প, ঘৃণার্হ মনে ক'রে এক কালে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি, আজ সেই গুলো গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে শিক্ষিত হিন্দু যুবক বৈজ্ঞানিক ধারায় তার কি উন্নতিই না দেখাচ্চে। কাটা কাপড়ের একটা ভাল দোকানে আজ পয়সার ছড়াছড়ি। সাবেক কাল আর এখন নেই, এখন সকল জাতের মেয়ে

পুরুষই জামা দিয়ে গা ঢাক্‌তে চায় ; কিন্তু জামার কারবার এখন দুর্ভাগা মোসলমানদের ছেড়ে গিয়ে হিন্দুর দিকেই ঢলে পড়েছে। উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুরা আজ কোন ব্যবসা ক'রতেই পরাঙ্মুখ নন ; আমাদের যুবকদের দোকানের গদিতে বস্‌তে লজ্জা হয়। তাঁরা চাতক পক্ষিটির মত চাকরির পানেই আছেন চেয়ে। দুনিয়ায় যে তাদের অনেকদিন বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হ'বে, এ খেয়াল তাদের একদম নেই।

তারপর নামাজ—এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে কোন উপদেশ দিতে চাই না, বা দিবার উপযুক্তা ব'লে নিজেকে মনেও করি না। আমি শুধু এই পর্য্যন্ত বল্‌তে চাই যে—পাঁচ অক্ত নামাজে পুণ্য সঞ্চয় ছাড়া, স্বাস্থ্যোন্নতির দিক দিয়েও, আমরা কম উপকার পাই না। প্রথমতঃ দিনের ভিতর পাঁচ বার মুখ-হাত-পা প্রক্ষালনে যে কতদূর দৈহিক তৃপ্তি সাধন হয়, তা' কোন মোস্‌লেম রমণী বা পুরুষকে বলে দিতে হবে না। আবার এই অজু করার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই মনে পবিত্রতা এসে উদয় হয়। তারপর নামাজের ওঠা-বসাতে শারীরিক জড়তা নষ্ট হ'য়ে, নামাজের পরই প্রাণে স্ফূর্ত্তি ও কোথা থেকে অনাবিল আনন্দ এসে, যেন দেহে নূতন প্রাণের সঞ্চার ক'রে দেয়। এই রকমে একটু তলিয়ে দেখ্‌তে গেলে, আমাদের প্রত্যেক ধর্ম্মকাজের সঙ্গেই যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তা' বেশ বুঝতে পারা যায়।

আমরা বাঙালী মোস্‌লেম-রমণী। গত পূর্ব্ব বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের মুন্‌সীগঞ্জের অধিবেশনে আমার "বঙ্গ সাহিত্যে মোসল্‌মান" প্রবন্ধে আমি অনেকবার উল্লেখ করেছি যে—আমরা বাঙ্গ'লী, এ কথা ব'লে আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়াটা কোন রকমেই আমাদের হীনতা প্রকাশক নয়। এক দিকে দেখ্‌তে গেলে বাঙ্গালী মোসলমানের জিহ্বার জড়তা আস্‌তেই পারে না। তবে আমাদের সন্তানদের মধ্যে যা' কিছু দেখা যায়, সে গুলোর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী তা'দের মা আর বাপ। আর এর জন্যে যদি কোন শাস্তির বিধান হ'তে পারে, তা' হ'লে সেটা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য তাদের মাকে আর বাপকে।

আরবের লোকে তাদের ভাষায় চ, ট, ড, ড়, বা প অক্ষরগুলো পায় না, আর ইরাণীরাও ট, ড, ড় উচ্চারণ কর্ত্তে পারে না। ইংরাজদের মুখে যেমন ত বা দ'র উচ্চারণ আসে না, ফরাসীরা আবার তেমনি ট আর ড বল্‌তে অক্ষম। এমন কি এই ভারতের মধ্যেই বাঙ্গালার বাইরে যাঁরা উর্দ্দূ, মারাটি বা তেলেগু ভাষায় কথা বলেন, তাঁরা সাধ্য মত চেষ্টা করে শি'খলেও কিছুতেই আমাদের মত বাংলা ব'লতে পারবেনা।

অপরদিকে জাতীয়তার টানে বাঙ্গালী মোসল্‌মান আরবী বা ফার্‌সী একটু চেষ্টা ক'রলেই, ঠিক আরব-পারশ্যের লোকের মত উচ্চারণ কর্ত্তে পারবে। আবার ইংরাজীরও বিলাতী উচ্চারণ তার মুখে আট্‌কাবে না।

জিম, জাল, জে, যদ, যোয় এর বিভিন্ন উচ্চারণ, আর গায়েন থেকে গাব্ এর প্রভেদ, মোস্‌লেম ভিন্ন অপর জাতের মুখ দিয়ে কিছুতেই স্পষ্ট বেরুবে না। তা'রা জাল থেকে জে, ও যোয় এর আর আলেফ থেকে আয়েন এর উচ্চারণ কোন মতেই

পৃথক্ ক'রতে পা'রবে না। তারপর নাভি দেশ থেকে যে হুত্তি ও মুখ গহ্বর থেকে আউঅজ্ বেরোয়, বা তালুরও নিম্নদেশ থেকে যে বড় কাপ কোরেশাৎ আর দাঁত ও জিভের সাহায্যে যে ছোট কাপ্ কালেমান্ উচ্চারিত হয়, এর পার্থক্য করা অনেক কষ্টসাপেক্ষ। ইংরাজীতে এই জায়গায় যে H ও K বলে দুটো অক্ষর আছে, তাদের বাসস্থান খুঁজ্তে গেলে জিহ্বার গোড়া পর্য্যন্ত ও এগুতে হ'বে না।

বাঙ্গালা ত' আমাদের মাতৃভাষা, এর উচ্চারণ ত' আমাদের ছেলে মেয়েদের ভালমত হবারই কথা। কিন্তু পাশের বাড়ীর একটী হিন্দু ছেলেকে আজন্ম সংশোধন করে দিতে থাক্লেও, সে কোনমতে তার সমপাঠি মোসল্মান বালকের আরবী নামের প্রথম অংশ আবদুল' টুকু ছাড়া বাকী আর শুদ্ধ করে ব'লতে পারবে না ও ঐ ধ'রতে গেলে প্রায় আকারওকারবিহীন শব্দটা ভিন্ন, আরবীর কঠিন উচ্চারণ বা তশ্দিদযুক্ত কাহহার বা ওহ্হাব তার জিহ্বার কাছে ঘেঁষতেও দিতে পারবে না সে। অথচ একটা অল্প বয়স্ক মোসল্মান ছাত্র বা ছাত্রী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা দৃষ্টদ্যুম্নের নাম অতি সহজে উচ্চারণ করে যাবে। কিন্তু এই বাঙ্গালী মোস্লেম বালক বালিকাদের উপর খোদাতাআলার এ' বিষয়ে অসীম অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, আমি বল্তে চাই যে—সম্পূর্ণ তাদের মায়ের দোষে যখন তাদের মাতৃভাষা পর্য্যন্ত তাদের মুখে বিকৃত হ'য়ে উচ্চারিত হয়, তখন কি এটা একটা মস্ত পরিতাপের বিষয় নয় ?

এই মহিলা সভায় আমাদের জাতীয় একতা সম্বন্ধে সামান্য একটু বলা, বোধ করি নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। খোদায় পাক কোর্আন মুজিদে বলেছে—

ইন্নামাল মোমেনুনা এখ্ওয়াতুন অর্থাৎ সকল মোমেন পরস্পর ভ্রাতা ব্যতীত অপর কেহ নহে। এই মহা পবিত্র বাণীর উদ্দেশ্যই মোস্লেমগণকে ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা। তা' আধুনিক আচরণ আমাদের, ঠিক তার বিপরীত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বেষ হিংসা আর ঝগ্ড়া বিবাদ আমাদের সমাজের কি পুরুষ কি নারী এদের ভিতর যত বেশী, এত আর পৃথিবীতে কোন জাতের মধ্যে নেই। ভাই ভা'য়ের, ব'ন ব'নের উন্নতির হিংসায় জ্'লে ম'রতে এ জাতের মত আর ক'াকেও দেখ্তে পাওয়া যায় না। মানীর মানের লাঘব সাধন কর্ত্তে পাল্লে, যেন মন আমাদের আহ্লাদে নাচ্তে থাকে। তারপর পাড়ায় দশ ঘর লোক থাকলে, তার মধ্যে অন্ততঃ চা'রটে দল ত' পাবেনই।

একতাই যে এককালে জাতির সর্ব্বপ্রধান সম্বল ছিল ; আর যে ভ্রাতৃত্বের বলে বলীয়ান হ'য়ে ঐতিহাসিক যুগে এস্লাম কি অসাধ্যই না সাধন ক'রে, জগতকে মুগ্ধ ক'রে গিয়েছে ; আজ সেই পবিত্র ভ্রাতৃভাব হারিয়ে তাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নেই।

একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, আপনারা যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু'কথা বলবার জন্যে এই সভা করে, আমাকে ডেকেছেন, সেই প্রসঙ্গে আমার আর একটু ব'লবার আছে। লেখাপড়া শেখা'বার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই ছেলেমেয়েদেরকে আমাদের এই উপদেশ দিতে হ'বে যে,—তারা যেন মিথ্যা কথাটাকে গোড়া থেকে অন্তরের সঙ্গে

ঘৃণা ক'রতে শেখে। তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে—মিথ্যে থেকেই সকল রকমের পাপ কাজের উৎপত্তি আর তারা যেন জীবনে মিথ্যা কথা না বলে।

*সওগাত*, মাঘ ১৩৩৩

## তথ্যসূত্র

১. উৎসর্গপত্র, 'স্বপ্নদৃষ্টা' উপন্যাস, *নূরন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী সংস্করণ, ১৯৭০)
২. রশীদ আল ফারুকী, *নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২০
৩. উৎসর্গপত্র, 'ভাগ্যচক্র' উপন্যাস, *নূরন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী*, পূর্বোক্ত
৪. নিবেদন, 'স্বপ্নদৃষ্টা', পূর্বোক্ত
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. 'স্বপ্নদৃষ্টা' উপন্যাসটি আশ্বিন ১৩৩০-এ 'নূরকুটীর', শ্রীরামপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।
৮. কৃতজ্ঞতা স্বীকার, 'জানকী বাঈ' উপন্যাস, *নূরন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী*, পূর্বোক্ত
৯. 'অনুনয়', ঐ
১০. *সওগাত* পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরীর 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে পত্রিকার পাতায় বেশ কয়েক সংখ্যা ধরে বাদ প্রতিবাদ চলে। তাতে রোকেয়া এবং মিসেস এম. রহমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিক্রমপুরীর লেখার প্রতিবাদে তাঁরা যা লিখেছিলেন তার মূল কথা ছিল, দয়া করে নূরন্নেছার সঙ্গে আমাদের নাম উচ্চারণ করবেন না। (*সওগাত*, ভাদ্র-কার্তিক ১৩৩৩)
১১. কামরুন্নেছা খাতুন (পান্না বেগম)-এর ডিটেকটিভ উপনাস 'গাঙ্গুলী মশায়ের সংসার' *নূরন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী*-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রশীদ আল ফারুকী নূরন্নেছার জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁর মেজ মেয়ে বদরুন্নিসা খাতুনও লেখিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। "সওগাতে" তাঁর "রেখা" নামে একটি গল্প ছাপা হয়।' (রশীদ আল ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২) আমরা *সওগাত* পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৬ সংখ্যায় 'রেখা' নামে একটি গল্প দেখেছি, লেখিকার নাম কামরুন্নেসা খাতুন। সঙ্গে লেখিকার একটি ছবিও ছাপা হয়েছিল।

# আখতার মহল সৈয়দা খাতুনের অন্তঃপুরের চিত্র
## ১৯০১-১৯২৮

প্রবাসী পত্রিকার পৌষ ১৩৭৯ সংখ্যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'মুসলমান লেখক-লেখিকা' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে জ্যোতির্ময়ী দেবী দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছিলেন যে কাজী ইমদাদুল হক, মীর মশাররফ হোসেন, রেজাউল করিম, কাজী আবদুল ওদুদ, বেগম রোকেয়া, শামসুন নাহার, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ মুজতবা আলী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মনসুরউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসিমউদ্দীন—বাঙালি মুসলমান সমাজের কতজনের লেখাই তো তিনি কত ভালবেসে পড়েছেন, 'কিন্তু ইসলামী সমাজের অন্তঃপুরের চিত্র, ইতিহাস, তাঁদের মোগল পাঠান সমাজের জীবনচিত্র, তাদের গৃহ-সমাজের ছোট ছোট চিত্র, সুখ দুঃখের কাহিনী, আঘাত-সংঘাতের কথা-কাহিনী পাওয়া হয়নি।'

বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরের ছবি, গৃহ-সমাজের ছোট ছোট চিত্র আঁকার মানুষ যে সেকালে একেবারে কেউ ছিলেন না, তেমন কিন্তু নয়। অন্তঃপুরের ছবি সচরাচর মেয়েদের কলমে যেভাবে ফুটে ওঠে, তেমনটা পুরুষ-শিল্পীদের ক্ষেত্রে হয় না। এ কথা হিন্দু মুসলমান, বাঙালি অবাঙালি, সবার ক্ষেত্রেই সত্যি। মুসলমান সমাজে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তেমন লেখিকা এক-আধজন ছিলেন বৈকি, কিন্তু তাঁরা বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছেন। বোধ করি এই জন্যেই জ্যোতির্ময়ী দেবী হেন লেখিকা—যাঁর পড়াশুনোর ব্যাপ্তি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার তুলনায় অনেক বড় ছিল—তিনিও আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, অথবা পরবর্তীকালের উমরতুল ফজলের (জন্ম ১৯২২) মতন লেখিকাদের খবর জানতে পারেননি।

আখতার মহল সৈয়দা খাতুনকে নিয়ে আজ যে সামান্য চর্চা করা সম্ভব হচ্ছে তাও নেহাতই এক আশ্চর্য সমাপতনের জেরে। ফরিদপুর জেলার সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে আখতার মহল লেখাপড়া শিখেছিলেন বাড়িতে। বাড়িতে ওঁদের সত্যিকারের শিল্পসাহিত্যচর্চার পরিবেশ ছিল, যদিও বাড়ির মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাবার কোনও প্রশ্ন উঠত না সেই বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে। চোদ্দ বছর বয়সে ফরিদপুর থেকে আখতার মহল স্থানান্তরিত হন সুদূর নোয়াখালিতে—১৯১৩ সালে নোয়াখালি জেলার সাবের খান এস্টেটের মোতাওয়াল্লী আলহাজ্ব সেরাজুল হক খানসাহেবের প্রথম পুত্র মকবুলুল খানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আখতার মহলের ক্ষেত্রে এই বিয়ে ছিল নির্বাসনেরই নামান্তর। নিজের বাড়ির লেখাপড়া, গানবাজনার পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সামন্ততান্ত্রিক একটি পরিবেশ ছিল তাঁর

শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে মেয়ে-বৌদের লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা বিশেষ উৎসাহ পেত না। তবু তারই মধ্যে লিখতেন আখতার মহল। তাঁর বড় ছেলে, এফ. এম. খানের এখনও মনে পড়ে মা কেমন করে রাতের বেলায় ছেলেদের ঘরে এসে মাদুরে শুয়ে শুয়ে পড়তেন, লিখতেন। তারপর হয়ত সেই লেখাগুলো তুলে সরিয়ে রাখতেন কোথাও, যত্ন করে। ১৯২৪-২৫-এর কোনও এক সময়ে নজরুল ইসলাম নোয়াখালিতে এসেছিলেন, আর জমিদারবাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছিল। ঘরের বৌ তো লেখালেখি করে, তাই তাকে দিয়ে একটা মানপত্র লেখানো হয়েছিল। আখতার মহল লিখেছিলেন :

বঙ্গবাগ বুলবুল
আমাদের নজরুল
আমাদের ছেলে সে যে
আমাদের ভাই গো
বিশাল ভারতে তাঁর
তুলনা যে নাই গো।
এনেছি নয়ন নীর,
লও তাই বঙ্গবীর,
লও ভক্তি লও শ্রদ্ধা
ফুল্ল নেত্রে চাই গো।
এক মার দু' সন্তান
হিন্দু আর মুসলমান,
আয় সবে ছুটে আয়
প্রণমী কমল পায়।

এই মানপত্রটি নজরুলকে খুবই বিস্মিত করে। তিনি জানতে চান যে, কবিতাটি যার লেখা, তার আর কোনও লেখা আছে কি না। আখতার মহলের এতদিনকার লেখা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে।[১]

নজরুল ইসলামের উৎসাহে এবং উদ্যোগেই আখতার মহল সৈয়দা খাতুনের দুটি উপন্যাস, 'নিয়ন্ত্রিতা' এবং 'মরণ বরণ', প্রকাশিত হয় যথাক্রমে *নওরোজ* এবং *সওগাত* পত্রিকায়।[২] আবার, নজরুলের জন্যেই আখতার মহলের অনেক লেখা হারিয়েও যায়, ঐ বাউণ্ডুলে কবির অসাবধানতায়।[৩]

কী লিখতেন আখতার মহল? কেমন লিখতেন? 'নিয়ন্ত্রিতা' উপন্যাস (এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সাহিত্যিক-সমালোচক আবুল ফজল বলেছিলেন : 'লেখিকা যে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মুসলমান পাঠকের পরিচিত, তাঁহাদেরই চতুর্দ্দিকের প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ-প্রাঙ্গন, নায়ক-নায়িকা তাঁহাদেরই অতি পরিচিত মানব মানবী।'[৪] আখতার মহলের মধ্যে একজন সার্থক কথাশিল্পী

হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তা তাঁর দুটি উপন্যাস [হয়ত বড় গল্পই বলা উচিত] পড়লেই বোঝা যায়। মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যে লেখিকার মৃত্যু হয়, তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আর কিই বা বলা যায় ?

তাঁর শিল্প তো পরিণত হবার সময়টুকুই পায় নি! আবুল ফজল লিখেছিলেন : 'লেখাটি [নিয়ন্ত্রিতা] গল্প নয়, অন্ততঃ পড়িয়া মনে হয় না—আগাগোড়া একটি বেদনাময় জীবনের ইতিহাস, বড় করুণ মর্ম্মন্তুদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।'[৫]

আখতার মহল সৈয়দা খাতুন কি নিজের জীবন-জগৎ থেকেই তাঁর গল্প, গল্পের চরিত্রদের গড়ে তুলেছিলেন ? 'নিয়ন্ত্রিতা'র আয়শা, 'মরণ বরণ'-এর হাসেনারা—তাঁর গল্পের মেয়েরা সবাই বড় অসুখী। আখতার মহল নিজেও কি জীবনে এমনই অসুখী ছিলেন ? এতদিন পরে এমন সব প্রশ্ন তোলাটাই হয়ত অবান্তর। তবু কৌতূহল থেকেই যায়।

ঢাকার ইডেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বর্তমানে 'সপ্তগ্রাম' বেসরকারি সমাজসেবী সংস্থার কর্ণধার রোকেয়া রহমান কবীরের আপন পিসি ছিলেন আখতার মহল। 'ছোটফুফু'কে মনে পড়ে না রোকেয়া কবীরের, তবে তাঁর সম্পর্কে শোনা গল্পগুলি তাঁর স্মৃতিতে রয়ে গেছে। পিসি সম্পর্কে মায়ের একটাই কথা ছিল। 'আম্মা বলতেন তোরা ঠিক ঐ কুট্টি—কুট্টি না কচি, কী যেন নাম ছিল ছোটফুফুর—ঠিক ওর মতন হয়েছিস। শুধু নাটক আর নভেল, নাটক আর নভেল!' দু বছরের বড় দাদা মুজিবর রহমান ছিলেন প্রথম ব্যাচের বাঙালি মুসলমান আই. সি. এস.-দের অন্যতম। পিঠোপিঠি ভাই বোনের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। দাদার বাড়ি ছিল আখতার মহলের আশ্রয়। আর তার জন্য ভুগতে হতো মুজিবর রহমানের স্ত্রী, রোকেয়া রহমান কবীরের আম্মাকে। ভাবীসাহেবের ওপর ছেলেপিলেদের ছেড়ে দিয়ে আখতার মহল দাদার বাড়িতে এসে মনের আনন্দে 'নাটক-নভেল' পড়তেন, আর পাতার পর পাতা কী যেন লিখতেন। কুট্টির কথা বলতে গিয়ে রোকেয়া রহমানের মা বলতেন, 'খালি খালি কাগজ আনো, আর লেখো। কে যে ছাপবে, তার কোনও ঠিক নেই—।' আবার কখনও মেয়েদের এও বলতেন, 'কুট্টিটা তো তাও লিখত। তোমরা সেটাও করো না!'

আবুল ফজলের কথার সূত্র ধরেই রোকেয়া রহমান কবীরকে জিজ্ঞেস করি, 'ওঁর মনে কি কোনও কষ্ট ছিল ? আপনি শুনেছেন সে কথা ?'

'খুব কষ্ট ছিল। She was very unhappy. ফরিদপুরে আমাদের বাড়ি ছিল অন্য রকম, আব্বা, চাচা সবাই বই পড়ত, বাঁশি বাজাত, গান গাইত। আমার দাদাও [ঠাকুরদা] খুব ভাল বাঁশি বাজাতেন। And he was a Farsi scholar. অনেক বই ছিল বাড়িতে। আব্বার প্রিয় বোন ছিল ছোটফুফু। সেই বাড়ি থেকে কোথায় কোন নোয়াখালিতে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল। কেন ? কারণ, কবে না কি কে কাকে কথা দিয়ে রেখেছিল যে অমুকের মেয়ের সঙ্গে তমুকের ছেলের বিয়ে হবে। Can you imagine? বিচ্ছিরি feudal একটা বাড়ি, পড়াশুনোর পরিবেশ নেই, সেখানে পাঠিয়ে

দিল। আমি তো যতদূর জানি স্বামীর সঙ্গেও খুব একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আমাদের বাবার বাড়িটা তো একটা পুরোপুরি professional family ছিল।' আখতার মহলের গল্পের অনেক পুরুষ চরিত্রই নানান পেশায় নিযুক্ত, যেমনটা তিনি তাঁর বাপের বাড়িতে দেখেছিলেন। মেয়েরা বই পড়ে, লেখে, গান শোনে। আর তার জন্যে তাদের অনেক গঞ্জনাও শুনতে হয়।

প্রবন্ধ, ছড়া, গানের ব্যবহার আখতার মহলের লেখার একটা বৈশিষ্ট্য। কথায় কথায় গান উঠে আসে: 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কালো [কালা], কালো হবে অঙ্গ',[৬] অথবা 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে/ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো'।[৭] অন্দরমহলের ভাষায় তাঁর গল্পের মেয়েরা কথা বলে। 'কালো কাজলের মাটি, তার তরে ছ'মাস হাঁটি/ধলা ধুত্‌রার ফুল/তার নেই এক কড়া মূল।'[৮] রোকেয়া রহমান কবীরের মনে পড়ে, 'আব্বা গান গাইত। রবীন্দ্রসঙ্গীত, ডি এল রায়, নজরুলের গান। চাঁদনি রাতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইত। আর আমাদের বাড়িতে অনেক রেকর্ড ছিল। ছোটচাচা তো কী সুন্দর বাঁশি বাজাত। ছোটচাচা খুব অল্প বয়সে মারা যায়। আব্বাও। মনে হয় ওঁদের বাড়িতে সবার আয়ু একটু কমই ছিল।'

তাই বলে আঠাশ বছরে মৃত্যু—তাকে তো কেবল স্বল্পায়ু বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আখতার মহলের বড় ছেলের মনে আছে মায়ের সেই কালাজ্বর হবার কথা। রোকেয়া রহমান কবীর বলছিলেন, 'Such a pity—তার কদিন বাদেই কী যেন ব্রহ্মচারী তার ঐ ওষুধটা বেরুল।' আখতার মহলের 'মরণ বরণ' উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর পর *সওগাত* পত্রিকায় ছাপা হয়। উপন্যাসটি সম্পর্কে সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেব লিখেছিলেন, 'এরূপ অল্প পরিসরে যে এরূপ সুন্দর উপন্যাস রচিত হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।'[৯]

'নিয়ন্ত্রিতা' এবং 'মরণ বরণ' দুটি উপন্যাসেই প্রেমের কথা খুব অনায়াসে, অকপটে বলা হয়েছে। অনেক সময় সে প্রেম, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা শরীরী বর্ণনায় প্রকাশ পায়। নায়ক নায়িকাদের কারও হয়ত 'নীল চোখ', কারও 'কালো শরীর'। কখনও লেখিকার মনে হয়, 'পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে স্থির বক্ষে যে ঢেউ ওঠে, প্রথম প্রিয় স্পর্শে আশা-ভয়-লাজ সঙ্কোচ বিজড়িত বালিকাহৃদয়ে গোপন উচ্ছ্বাস তাহার চেয়ে কম না বেশি?'[১০] নেহাত বালিকাই ছিলেন আখতার মহল যখন তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর আয়শা, লায়লী, হাসেনারারাও বালিকা। গল্পে এই বালিকাহৃদয়গুলিতে কারও প্রতি হয়ত অনুরাগ জাগে, যার জন্য জাগে সেই মানুষটিকে হয়ত কিছুতেই পাওয়া যায় না, হয়ত সেই বালিকাই তখন বিবাহিতা। তবু বার বার সামাজিক, সাংসারিক অনুশাসনকে তুচ্ছ করে আখতার মহলের চরিত্ররা ভালবাসায় বাঁধা পড়ে যায়। এমন কোনও ঘটনা কি লেখিকার জীবনেও ঘটেছিল?

রোকেয়া রহমান কবীর বলেন, 'আমার জানা নেই। তেমন হলে আম্মা নিশ্চয় জানত। আমাদের তো কখনও কিছু বলেনি। তবে, you never know—।'

শুধুমাত্র একজন রোম্যান্টিক লেখিকা হিসেবেই নয়, আখতার মহল সৈয়দা

খাতুনকে আমরা একজন সমাজ-সচেতন লেখিকা হিসেবেও পেয়েছি তাঁর *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, 'বিবাহ এবং বর্জ্জন (তালাক) অশিক্ষিত মোসলেম সমাজের নিত্য অভিনিত ছেলেখেলা।' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)

ম.ভ.

# নিয়ন্ত্রিতা

১

"আশা"

"মরু"

"একেবারে চুপ চাপ!"

আয়শা উত্তর করিল না। মরিয়মও ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "না! এত কবিত্ব আমার ভাল লাগে না বাপু! সুন্দর রাত্রি—হাসি গল্প আমোদে কাটিয়ে দেব—তা নয়, নীরবে চাঁদের দিকে চেয়ে থাক, এ কেমন আমোদ গো!" বলিয়াই মরিয়ম গান ধরিল,—

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে
চাঁদের আলো!"

আয়শা তথাপি কথা কহিল না। মরু রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

নির্ম্মল জ্যোৎস্নার মধ্যে তেমনি নির্ম্মল আনন্দোজ্জ্বল অন্তর লইয়া মুগ্ধা কিশোরী সেই আনন্দ-রাজ্যের দিকে অনিমেষে চাহিয়া ছিল। দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, নিরাশা নাই, দুনিয়া-ভরা শুধু আশা—শুধু আনন্দ—শুধু হাসি। রমজান-পূর্ণিমার পূণ্য-হাসিতে আকাশ পৃথিবী ভাসিতেছিল। নারিকেল গাছের পাতার মুকুটে যেন হীরক জ্বলিতেছিল, দূর গ্রামগুলি মৌন জ্যোৎস্নালোকে যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া মনে হইতেছিল, সামনের দীঘিটীতে হাজার শ্বেত-পদ্মের সোপান বাহিয়া চন্দ্র যেন আজ অবগাহনে নামিয়াছে। আপনহারা পিকের উন্মনা গানে আর নিশীথের পুষ্প-সৌরভে আয়শার মুগ্ধ হৃদয়ে ঘন শিহরণ জাগিতেছিল। মূর্চ্ছিতা ধরার মুখে এ কি স্বপ্নময় হাসি!

কি চাই? কি চাই? হৃদয় তার কি চায়? এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা কোথায়? কিন্তু কিশোর বুকে এ কিসের অভাব! আকাশ জুড়িয়া কাহার কালো চোখের বিস্মৃতপ্রায় অস্পষ্ট ছবি তাহার বুকের মধ্যে জাগিতেছিল। কিসের সে ছবি? কবে কোথায় দেখিয়াছিল কিছুই মনে নাই। সত্যই কখনো দেখিয়াছিল, না শুধুই কল্পনা তাও সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বুঝি ওই দূরের গ্রামগুলির মতই সে ছবি অস্পষ্ট স্বপ্নময়।

"রাখ্ হতভাগী! তোর হাওয়া খাওয়া বের করছি আইবুড়ো ধাড়ি! দিন দিন বুড়ো হচ্ছেন, না, ধাঙ্গা হচ্ছেন। আমরা সারা বাড়ী খুঁজে হয়রাণ। এত রাত্রে মেয়ে গেল কোথা! ও আল্লাহ্! ছাদে এসে নিশ্চিন্তি ব'সে আছেন!

"আহা! থাক্ ভাবি! ওকে কিছু বল্‌বেন না। ও হচ্ছে মস্ত একজন কবি, আহার নিদ্রা ছেড়ে রাত তিনটে পর্য্যন্ত বসে কবিতা লেখে। হাঃ হাঃ হাঃ!"

"ঝাঁটা মার কবিত্বে; হ্যাঁ মরু! ওকে ছাদে একলা রেখে তুই শুলি গিয়ে কোন্ আক্কেলে?"

কুণ্ঠিত স্বরে মরিয়ম বলিল, "আমি কি জানি ও এতক্ষণ থাকবে? ভাবলাম খানিক পরে আপনিই এসে শুয়ে পড়বে ও।"

"নে চল্! চল্! বেহায়া মেয়ে! লাজ নেই—শরম নেই, যেন কি!"

আয়শা মরমে মরিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত, সে কি? এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? যখন হোশ হইল, দেখিল বড় ভগ্নী আমেনা, আমেনার ননদ, তার সই মরিয়ম, আমেনার দেবর শহীদ তার খোঁজে ছাদে আসিয়াছে।

রোজার 'সেহেরী' (শেষ রাত্রির আহার্য্য) খাইতে উঠিয়া আমেনা যখন দেখিল, আয়শা ঘরে নাই তখন তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বনাশ! বিবাহযোগ্যা মেয়ে কোথায় গেল? তাহাকে ছাদে পাইয়া এক দিকে যেমন তাহার বুকের পাথর নামিয়া গেল, আবার তেমনই রাগও হইল। হতভাগী কি চিন্তাতেই ফেলিয়াছিল!

আয়শার ছাদে যাওয়া সেই দিন হইতে বন্ধ হইল।

## ২

পাংশার ডাক-বাংলা আজ কোলাহলপূর্ণ। বালক-বালিকার উচ্চ হাস্যে চাকর-বাকরের ছুটা-ছুটিতে স্থানটী শর-গরম। সাব-ডিপুটী রফিকল হক্ সাহেব সপরিবারে যশোর যাইবেন। একটী বন্ধুর নিমন্ত্রণে, পাংশা হইয়া যাইতেছেন। বন্ধুর বাড়ী ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে। সেখান হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া ট্রেন ফেল করেন। আর ফিরিয়া না গিয়া ডাক-বাংলাতেই রহিয়া গেলেন।

একটী ত্রয়োদশী কিশোরী নিজেকে এই গোলমাল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের বিদায়-রাগে তখন আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। তাহার শেষ-চুম্বনের সোনালী আলোয় দুনিয়ার বুক ছাইয়া গিয়াছে। আয়শা জানালায় বসিয়াছিল—কাহার দুইখানি স্নেহ-বাহু কণ্ঠে জড়াইয়া গেল। "কেন বোন্! কেন কাঁদছিস্ আশা?" শেষটায় আমেনার গলা ভার হইয়া আসিতে আয়শা চকিত হইল। কখন্ আসিয়াছে আপা* সে ত দেখে নাই! ছি ছি! কি ভাবলেন আপা!

---

* 'আপা' তুর্কী শব্দ! পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জায়গায় বড় ভগ্নীকে বুবু বা দিদির পরিবর্ত্তে 'আপা' বলিয়া ডাকা হয়।

কিন্তু বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল। যে অশ্রু সে এতক্ষণ চাপিয়া ছিল, আমেনার স্নেহে তাহা বক্ষ ভাসাইয়া দিল। দুই ভগ্নী অনেকক্ষণ কাঁদিল।

সন্ধ্যার পর যখন ডাক-বাংলার চারিধারে একটী লোক ছিল না, তখন স্বামী-স্ত্রীতে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। অষ্টমীর চন্দ্র-কিরণে তখন পৃথিবী হাসিতেছিল। সম্মুখস্থ দীঘিতে অনেকগুলি শেওলা ফুল ফুটিয়া অনিমেষে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। মৃদু ঢেউয়ে বুকে তাদের কম্পন জাগিতেছিল—পতির প্রথম স্পর্শে লজ্জিতা নব বধুর মত। আমেনার উজ্জ্বল গৌর মুখে জ্যোছনা পড়িয়া ফুটন্ত গোলাবকেও পরাস্ত করিতেছিল। ভ্রমরের মত কালো দুইটী আঁখি বর্ষার মেদুর মেঘের মতই সজল।

"কেন আমিন? কেন প্রিয়তমে?"

স্বামীর বাহুপাশে বন্দিনী আমেনার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। রফিক আবার বলিল, "আমার সুধামুখে মেঘের ছায়া কেন আমিন?" তবু আমেনার মুখে কথা ফুটিল না। গোলাপ তখন রক্তজবায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রফিক পুনরায় বলিলেন, "বলবে না কি ভাবছ?"

মৃদুস্বরে অমেনা বলিল, "কি ভাববো?"

"সত্যি ব'লছ; কিছু ভাবছ না?"

"ভাবছি আয়শার কথা!"

"ওঃ! তা কি ক'রবে ভেবে বল?"

"সত্যিই কি এই ওর অদৃষ্ট!"

"হ'তে পারে! নইলে বাপ—যিনি মাতৃহারা সন্তানকে বুকে ক'রে মানুষ করেছেন, তাঁর এ খেয়াল হবে কেন? তুমি আমি ভেবে কি ক'রব?"

"তবে কি আয়শার মরণ নীরবেই চেয়ে দেখব?"

"যথাশক্তি চেষ্টা ক'রব বই কি? না পারি, চেয়ে দেখতেই হবে।"

"ওগো ও কথা ব'লো না—ব'লো না, আমি যে ওকে বুকের রক্তে মানুষ করেছি। মা যে ওকে এক বছরেরটী রেখে চলে গেছেন। ওকে 'বনবাস' দিয়ে বুক আমার ফেটে যাবে না?"

"ব'ল্লাম ত আমিন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা ক'রব প্রাণপণেই। ফিরাতে পারব বই কি? না পারলে আর কি ক'রবে বল? খোদার ইচ্ছা!"

যার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত অশ্রুপাত, সেই আয়শার চোখেও ঘুম নেই। অভাগিনী বালিকা পাশের কামরার জানালার ধারে পাটী বিছাইয়া শুইয়া আছে। সেও চুরি-করিয়া-পড়া ভ্রাতার চিঠির কথাই ভাবিতেছিল—যাহাতে তাহার বিবাহ-সংবাদ লেখা আছে। কি পাপে এ শাস্তি তার তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না। কি 'গোনাহ্' সে করিয়াছে জীবনে মনে ত পড়ে না। তবে কেন? কেন খোদা? রক্ষা কর আমায় হে খোদা? খোদা! খোদা! তুমি আমায় রক্ষা কর হে রহিম! বালিকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খোদাকে ডাকিল। তাহার বুকের ভার অনেক লাঘব হইল,

নিষ্পাপ সরল মনে বিশ্বাস জন্মিল, খোদা নিশ্চয়ই তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সে দেখিতে লাগিল একে একে আকাশের নীল প্রাঙ্গণ হইতে শিশু-তারকার দল ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। অসীম নীল-প্রাঙ্গণে শুধু একটী তারা জাগিয়া রহিল। সে বুঝি রাত্রীর প্রহরী।

৩

যশোরের খ্যাতনামা উকিল আব্‌দুল লতীফ সাহেবকে অনেকেই চিনেন। দুইটী কন্যা তিনটী পুত্র রাখিয়া যেদিন তাঁহার সুন্দরী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বেহেশ্‌ত্‌ চলিয়া যান, সেদিন অত বড় উচ্চশিক্ষিত এম-এ, বি-এল, উকিল সাহেব শিশু কন্যাটী বক্ষে চাপিয়া বালকের মতই কাঁদিয়াছিলেন।

ফাতেমা বিবির শেষ-কার্য্য সমাধা করিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পত্নীর শোক ভুলিবার জন্য লতীফ সাহেব ন্যায় অন্যায় সকল সুখই খুঁজিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া আমেনা বিবাহিতা, শফিকল আলমও বিবাহিত। সে সকলের বড়। নূরল আলম, জানে আলম নবম ও পঞ্চম বর্ষীয়, আয়শা মাত্র এক বৎসরের।

হিতৈষী বন্ধুরা ও কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার দল যখন উকিল সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে আবার সংসারী হইতে হইল। স্ত্রী-বিয়োগের দুই বৎসর পর আবার তিনি বিবাহ করিলেন।

আয়শা নিশ্চিন্তে কাকিমার স্নেহে শাসনে বড় হইতে লাগিল। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে হাসিয়া কাঁদিয়া দীর্ঘ নয় বৎসর অতীতে মিশিয়া গেল। ইহার মধ্যে কত ফুল, ফুটিল, কত ফুল ঝরিল, কত মুকুল কোরকে শুকাইল। সন্তান-হীনা পুত্র-মুখ চুম্বন করিল। পুত্রবতীর অঙ্কশূন্য হইল। নয় বসন্তের সবুজ শোভায় বসুমতীর বক্ষ পূর্ণ হইল, আবার নয় নিদাঘে তাহা অঙ্গারে পরিণত হইল।

রফিকল হক চাকরী পাইয়া পরিবার লইয়া গেলেন। আমেনা এখন পুত্র-কন্যাবতী। শফিকল আলম সপরিবারে এলাহাবাদ—সেখানকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নূরল আলম এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। জানে আলম এন্ট্রান্স দিবে এবার। দশম বর্ষীয়া আয়শা বিমাতার কাছেই থাকে, মাতৃরুপিণী কাকি-মা জান্নাতে স্বামী সন্দর্শনে চলিয়া গিয়াছেন।

বিমাতার স্নেহ অনেকেরই আকাশ-কুসুম। আয়শার ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংসারে বাক্য-বাণ-বিক্ষতা মাতৃহীনা বালিকাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ ছিল না। সঙ্গিনী ছিল অবিরল অশ্রুধারা,আর ছিন্ন পাঠ্য-পুস্তকখানি। ছোট বইখানির উপর গ্রাম-দুর্লভ অত্যধিক অনুরাগ প্রকাশের ফলে সকলের কাছেই তাহাকে উপহসিত হইতে হইত।

তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে মর্ম্মভেদ হইলেও সে চুপ করিয়াই থাকিত, বিদ্রুপ-কারীরা তাহার

সঙ্কল্প অটল দেখিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিল যে, বাংলা শিখবার যার এত আগ্রহ পরিণামে সে একটী ডাকসাইটে 'অসৎ' না হ'য়ে যায় না।

কিন্তু নির্লজ্জা, গোঁয়ার মেয়েটীর পাঠে কিছুমাত্র অবহেলা দেখা গেল না। সে নিয়মিত সুলতান ভাইয়ের কাছে গিয়া ধন্না দিত এবং তেমনি মিনতি করিয়া বলিত "ও ভাই, তোমারা পায়ে পড়ি এই ছত্তরটা ব'লে দাও!"

৪

রফিক সাহেব রাজশাহীর সাব-ডেপুটী, বাড়ী শাজাদপুর। সেখানে তাঁহার দুই বোন, এক ভাই ও মা থাকেন। একটী বোনের বাপ থাকিতেই বিয়ে হয়। ছোট বোন মরিয়মকে পাত্রস্থ করিতে তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। যথারীতি সমারোহে নবীন উকিল হায়দর আলীর সঙ্গে মরিয়ম বানুর বিবাহ হইয়া গেল। আয়শাকে আমেনা পূর্ব্বেই আনাইয়াছিল। বিবাহের সময় তাহার পিতা ও ভ্রাতৃগণও আসিয়াছিল। লতীফ সাহেব যাওয়ার সময় আয়শাকে লইয়া যাইতেই চাহিয়াছিলেন। আমেনা পিতাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আশু এখন থাক বাবা আমি রাজশাহী যাওয়ার সময় যশোর হ'য়ে যাব, তখন ওকে নিয়ে যাব।" লতিফ সাহেব ছেলেদের লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

মাসেক হইতে চলিল, এক দিন দুই ভগ্নী আমেনার শয়ন-গৃহে বসিয়া কথা কহিতেছিল। আমেনা বলিল, "আশু! তোর এখানে মন কেমন করে—না?"

আশু হাসি মুখে বলিল, "না আপা! আমার একটুও মন কেমন করে না। বেশ ত খেলে বেড়াই—কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, তুমি ত বকোও না কখনো।"

ভাল কথা, "হা রে,! মা তোকে খুব বকেন?"

"মা যে আমাকে বকেন, তাতে আমার বেশী দুঃখ হয় না, কষ্ট হয় আমার তখনি যখন মা আমায় প'ড়তে দিতে চান না, আর একটু বাংলা পড়ি ব'লে সবাই মিলে যখন আকথা-কুকথা বলে—শেষটায় আয়শার স্বর জড়াইয়া আসিল।

"বাবা কি বলেন?"

"বাবা ত সব জানেন না, তবে পড়তে উৎসাহ দেন খুব। এবার রাঙা-ভাই আমায় কি সুন্দর বই দিয়ে পাঠিয়েছে আপা, সেই সব বই আন্‌লে দেখতে। সুন্দর সুন্দর গল্পের বই!" আয়শার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমেনা ভগ্নীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিল, "তবে আর কি, তুমি নির্ভয়ে প'ড়ো। হ্যাঁ আশা! তোর রাঙা-ভাইয়ের কথা মনে আছে?'

"না! তিনি এখন কোথায় আপা?'

"কলিকাতায়।"

সহসা জুতার শব্দে দুই বোন মাথার কাপড় টানিয়া দিল। তিনখানা পত্র হস্তে রফিক ঘরে ঢুকিয়া দুইখানা পত্নীর হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়!"

আশু চলিয়া যাইতেছিল, পত্র দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কোথাকার চিঠি আপা !" আমেনা পত্র খুলিয়া মনে মনে পড়িল।

৯ই জ্যৈষ্ঠ
যশোর

"আমেনা !

দোয়া নিও আমার। নবীপুরের জমিদার আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়েছিলেন, আয়শাকে চান পুত্র-বধু করতে। তাঁরা খুব ধনী, প্রকান্ড বাড়ী তাঁদের। চারদিকে বাগান ফুলের, ফলের। কলকাতায়ও তাদের একটী বাড়ী আছে। খুব বড় ষ্টেট। জমিদার সাহেবের এক ছেলে, এক মেয়ে। পিতার পর ছেলেই অধিকাংশের মালিক। জমিদার সাহেবের পত্নী স্বয়ং আমার সাম্‌নে এসেছিলেন। আয়শার জন্য আমার সামনে এসেছিলেন, "আহা মা-হারা বাছা !" ছেলের বউয়ের জন্য যে সব জড়োয়া গয়না তৈরী করেছেন—আমায় সব দেখালেন। আমি অনেক বিবেচনা করে সম্মতি দিয়েছি। তাঁরা খুব তাগাদা করাতে সামনের আষাঢ় মাসের ৫ই তারিখে দিন স্থির করেছি—তোমাদের জানাবার সময় পাইনি। তোমরা এই সপ্তাহেই চলে এস। আশা খুব সুখে থাকবে মা। তোমরা ভেবো না। ইতি—

শুভার্থী
আব্‌দুল লতীফ

অন্য খানি নূর আলমের—

আপা !

বাবা আশুকে বিয়ে—না বলিদান দিতে চান। কিন্তু দোহাই তোমাদের তোমরা ওকে জ্যান্ত আগুনে ফেলতে দিও না আপা ; আমি সে ছেলে চিনি, প্রাণপণ চেষ্টায় তার পিতা তাকে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন। এখন সে সর্ব্বদা মদ ও বেশ্যায় ডুবিয়া থাকে। মস্তিষ্কও কিছু বিকৃত আছে—চিররুগ্ন। বাপ-মা অনেক চেষ্টা ক'রেও এ পর্য্যন্ত বিয়ে দিতে পারেন নি। আব্বাকে সরল লোক পেয়ে এমন ক'রে ভুলিয়েছে। তাদের বাড়ীঘর ও গয়না দেখে বাবা ভেবেছেন, আশাকে রাজরাণী করছি। আমি বাধা দিতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছি। তোমার পায়ে পড়ি আশাকে বাঁচাও আপা ! তুমি ও দুলা-ভাই কিছুতেই সম্মতি দিও না ! যদি একান্ত নাই পারো বাবাকে নিরস্ত করতে অকম্পিত হাতে আশার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিও। ইতি—

স্নেহের নূরু

পত্র পড়িয়া আমেনার মুখ পান্ডুবর্ণ হইয়া গেল। আয়শা ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে আপা !"

আমেনা ব্যাকুল চোখে আয়শার দিকে চাহিল ; আয়শা আবার কহিল, "কি আপা ! যশোরের সব ভাল আছে ?"

"আছে ! তুই মার কাছে যা !"

আয়শা অস্থির মনে প্রস্থান করিল। আমেনা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন উপায় !"

"উপায় খোদা ! আমারও ত এক খানে জরুরী নিমন্ত্রণ ছিল। হোসেনের বিয়ে, চল পাংশা হ'য়েই যশোর যাই।"

"আমি কেন পাংশা যাব ?"

"তোমারও যে নিমন্ত্রণ—না না সত্যি ! তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছে। না গেলে রাগ ক'রবে। চল কালই যাই।"

"আমার আশুকে রক্ষা ক'রবে ত ?"

"পাগল ! চেষ্টা ক'রব নিশ্চয়।"

"তুমি চেষ্টা ক'রলেই যথেষ্ট হবে। তোমার অসাধ্য কি আছে ?"

"তুমি তোমার স্বামীকে কি ভাব বল দেখি—রুমের সুলতান ? না দিল্লীর সম্রাট ? না পীর-পয়গম্বর ?"

"তারও ওপরে।"

পর দিন সকলেই তাহারা রওয়ানা হইল।

৫

যশোর পৌঁছিয়া আমেনারা দেখিল, বিশেষ কেহ আসে নাই, শফিক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছে। নূরুও পিতাকে নিজের অসম্মতি জানাইয়াছে। এই সব কারণে উকিল সাহেব খুবই বিরক্ত হইয়াছেন। মেয়েটীর যে সুখের কল্পনা তিনি করিয়াছেন, পাগল অল্পবুদ্ধি হতভাগারা কেন তাতে এরূপ বাধা দিতেছে,তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

পিতাকে রাগান্বিত দেখিয়া আমেনাও কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। ম্লানমুখী আয়শা একাকিনী বসিয়া নিজের অভাবনীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। সহসা আমেনা ডাকিল, "আশু দেখে যা !" ভগ্নীর আহ্বানে আয়শা উঠিয়া পাশের কামরায় ঢুকিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিয়াই আয়শা সবিস্ময়ে দেখিল চেয়ারে এক জন অপরিচিত যুবক। কি দৃপ্ত প্রফুল্ল আঁখি দু'টী ! অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করে সে আঁখির বিজলীচ্ছটা ! বিশাল ললাট অধিকারীর অতুল প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। রক্তিম অধরোষ্ঠ আনন্দের চিরআবাস ! সুবঙ্কিম কৃষ্ণ ভ্রূযুগল ফুল-ধনুকেও পরাস্ত করে নাই কি !

স্তম্ভিতা পাষাণ-প্রতিমা আয়শার অনিমেষ আঁখি পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ আশু !"

সে বীণা-ঝঙ্কারে চমকিতা আয়শার চোখ দুইটী নত হইয়া পড়িল। আমেনা হাসিয়া বলিল, "রাঙা-ভাইকে চিন্ছিস্ নে আশা!"

রাঙা-ভাই! আনোয়ার হোসেন! এই তিনি—এত সুন্দর!!!

আয়শা নত হইয়া সালাম করিতে গেল। যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ?"

আয়শা অস্ফুটে 'আছি' বলিয়া চৌকীর পাশে বসিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু দুইটী যুবকের মুখে কখন ন্যস্ত হইল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। চারি চোখের মিলনে চমকিয়া সে চোখ নত করিল। আনোয়ার হোসেনের সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। লজ্জিতা আয়শা ধীরে উঠিয়া পাশের কামরায় গিয়া বসিল।

আমেনা বলিল, "বাবা ত ৫ই আষাঢ় দিন ঠিক ক'রেছেন। কারো অনুরোধ শুনছেন না, কি যে আছে ওর কপালে আল্লাহ্ জানেন।"

"মামা সাহেবের এ খেয়াল কেন হ'ল বুঝতে পারছি নে।"

"আশু জমিদারের বউ হবে। সর্ব্বাঙ্গে সোণার গয়না প'রবে। এই আর কি!"

"জমিদারী আর গয়নাতেই কি মানুষ সুখী হয়?"

"বাবাকে সে কথা কে বলে বলুন?"

"মামী আম্মা কিছু বলেন না? তাঁরই ত বলা উচিত।"

আমেনা উত্তর না করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। অন্যান্য কথার পর আনোয়ার হোসেন আমেনার মার ঘরে আসিলেন। তিনি কুশল প্রশ্ন করিয়া বসিতে বলিয়া জল-খাবার খাইতে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আনোয়ার হোসেন উঠিয়া বৈঠকখানায় গেলেন।

আমেনা বলিল, "আশা, বাবার ঘড়িটী দেখে আয় ত, পারলে নিয়েই আয়!" আয়শা মায়ের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, যদি—যদি সে যাদুকর সেখানে থাকে! মা ডাকিলেন, "কি চাও? এস না ঘরে।"

আশু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপা ঘড়িটী চাইছেন।" আশুর মা ঘড়ি তুলিয়া সামনে উপবিষ্টা ফুল-জাকে বলিলেন, "রৌশনের মাকে দিয়ে আয়।"

আয়শা বিমাতার ঘরে বসিল। দুইখানি পিরিচে বিস্কুট, কেক ইত্যাদি দেখিয়া বলিল, "এ গুলি কার মা?"

"আনারকে খেতে দিয়েছিলাম, একটু মুখে দিয়ে উঠে গিয়েছে। খাও না তুমি।"

আয়শার হাসি পাইল এবং মনে মনে ভাবিল,—তার প্রসাদ! আমাকেই খেতে বলো হ'চ্ছে! সে একবার খাদ্যদ্রব্যগুলির দিকে চাহিল, মনে হইল বিধাতার শুভ ইচ্ছার চিহ্ন-স্বরূপ তাহাকে এগুলি খাইতে বলা হইতেছে। এগুলি তাহারই প্রাপ্য। ভক্তির সঙ্গে সে গুলি তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল।

৬

আয়শা পিতাকে বাতাস করিতেছিল। কাহার পায়ের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিল। বংশীসুরমুগ্ধা হরিণীর মত ব্যাকুল চক্ষু দুইটী দরজার দিকে ফিরিল। কাহার পায়ের শব্দ এ! একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আনোয়ার আসিয়া দাঁড়াইলেন। টেলিগ্রাম খুলিতে খুলিতে লতীফ সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "আনার। নাকি আজই যাবে?"

"হ্যাঁ মামা!"

"আশার বিয়েতে আস্‌বে না?"

"বোধ হয় পারব না মামা!"

প্রতিপদক্ষেপে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তরুণীর হৃদয়ের তারে তারে আঘাত করিয়া যুবক চলিয়া গেলেন।

গভীর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আয়শা জানালায় বসিয়াছিল! তাহার হৃদয়েও আজ অমনি অন্ধকার সেখানে একটী আশার তারাও ফুটে নাই। আজ রাত্রে আনোয়ার বাড়ী যাইবে। তা যাক না! তিনি বিবাহিত। আয়শার মনোভাব জানিলে তিনি হয় ত ঘৃণায় থুথু ফেলিবেন। এদিকে পিতা ত কাহারো কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। সর্ব্বনাশের দিন ত ঘনাইয়া আসিল ৫ই আষাঢ়! আর মাত্র ১৫ দিন!

রক্ষা কর রক্ষা কর হে আমার খোদা! হে সর্ব্বশক্তিমান! তুচ্ছ একটী বালিকাকে তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না! মা! মাগো! অভাগীরে কেন রেখে গেলে মা! আজ যে তাকে রক্ষা ক'রবার কেউ নাই মা—কেউ নাই! অতলে তাহাকে ডুবিতেই হইবে! তবে কেন খোদা, জাহান্নাম যার চিরবাসস্থান তাকে এ স্বর্গের ছবি কেন দেখাইলে? নরক-যাতনা বুঝাইবার জন্যই কি আঁধারের স্বরূপ বুঝিতেই কি বিজলী-চমক!

আনোয়ার হোসেন! কি মধুর নাম। নাঃ, আমি এ চিন্তা ছাড়ব না—ছাড়তে পারব না। করুন তিনি ঘৃণা! আমি মনে মনে তাকে ভালবেসেই সুখী হব! কক্‌খোনো না, কক্‌খোনো আমি অন্য বিয়ে ক'রব না!

মূর্খ নির্ব্বোধ বালিকা ত্রস্তে উঠিয়া কোর্‌-আন শরীফ নামাইল এবং মাথার উপর রাখিয়া বলিল, "হে খোদা তুমি সাক্ষী, হে অসীম আকাশ! অসীম সৃষ্টি! তোমরা সাক্ষী! আনোয়ার হোসেন ছাড়া আমি আর কাউকে স্বামী ব'লব না। ব'লব না!

হায়! জ্ঞানহারা নারী! আজ যে মহাপাপ করিলি সারা জীবনেও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইবে!

প্রাতে নূরু ডাকিল, "কিরে আশু! এখনো শুয়ে আছিস?"

আয়শা চোক বুজিয়া পড়িয়া ছিল। ভ্রাতার ডাকে উঠিয়া বসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমেনার গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইল।

নূরু কহিল, "তোর চোখ মুখ লাল হ'য়েছে কেন রে?" আয়শা সভয়ে বলিল, "ঘুমিয়েছি অনেক তাই।"

নূরু আমেনার দিকে ফিরিয়া বলিল, "শোন আপা কাল রাত্রে ভাইএর সঙ্গে

আমার কি তুমুল তর্ক! তিনি বললেন,—মেয়েদের লেখাপড়া করা উচিত। আমি বলি উচিত নয়; তুমি কি বল আপা!"

আমেনা উত্তর দিল না; সে কি ভাবিতেছিল।

আয়শা সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি চলে গেছেন মেজভাই।"

"গেছে না? এতক্ষণ বাড়ি গিয়ে বউয়ে সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।"

আয়শা আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভ্রাতার ডাকেও সাড়া দিল না। আমেনা বলিল "ওর শরীর ভাল নয়। ওকে আর ডাকিস নে।"

৭

আয়শার যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল; কেহই ঠেকাইতে পারিল না। আমেনার চোখের জল, নূরল আলমের আকূল মিনতি 'ছেলে-মানুষী'র আখ্যায় উড়িয়া গেল। তিরস্কৃতা আমেনা যখন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিল,—"বাবা! আশা ত কেঁদেই খুন হ'চ্ছে—ওর এ বিয়েতে সম্মতি নেই", তখন উচ্চ হাস্যের সহিত উত্তর পাইল,—"বিয়ের আগে সকল মেয়েই অমন কাঁদে মা! কিন্তু বিয়ের পর রাজ-রাণী আয়শাকে শ্বশুর-বাড়ী হইতে সাধিয়া আনা অসাধ্য হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাহ-সভায় রফিক সাহেব ও আলম শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া বরকর্ত্তার মুখে যখন শুনিলেন,—"শুনলাম, মেয়েই নাকি অসম্মত! আপনার ভাইয়ের জন্যই নাকি মেয়ে পাগল! তা বাপু সভার মধ্যে কি এ-সব কথা তুলতে আছে! বাধ্য ক'রলেন আপনারা! আমার ছেলেটা এই রকম ব'লেই এ-সব শুনেও মেয়েটা গ্রহণ করছি। বিশেষ, সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।" তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে তাঁহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, পায়ের জুতা খুলিয়া দুর্ম্মুখ অসভ্যকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া দেন। আয়শার মৃত্যু-কামনা করিয়া তাঁহারা উভয়ে সভা ত্যাগ করিলেন। লতিফ সাহেব অনুপস্থিত থাকাতে উক্তিটী শুনিতে পাইলেন না।

আয়শার শেষ সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, খোদা তাহাকে রক্ষা করিবেনই। আর যদি কিছু একটা হইয়াই যায়, সে হয় ত মরিয়া যাইবে। কিন্তু খোদা তাঁহার স্বহস্তলিপি মুছিলেন না। হাকিম টলিলেও হুকুম টলিল না। আর বালিকার বুকের ভিতর প্রলয়ের ঝটিকা বহিলেও বস্তুতঃ তাহা একেবারে ফাটিয়া গেল না—মাতা বসুন্ধরাও দ্বিধা বিভক্ত হইল না! শেষ আশা রহিল যে, সে জবাব দিবে না। কিন্তু তাহার অসম্মতিতেও বিবাহ আটকাইল না। ঢাক-ঢোল-সানাই-এর উচ্চ শব্দে বালিকার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল। আমেনার হাহাকারে তাহার স্বর্গস্থা মাতা বুঝি বিচলিত হইলেন।

যখন মুর্চ্ছিতা-প্রায় আয়শাকে ধরাধরি করিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহার চোখে সারা দুনিয়া ধূমপিণ্ডের মত ঘুরিতেছিল।

বধূবেশী আয়শা শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া ছিল। স্বামী ওমর আলী হুকুমের

স্বরে বলিলেন,—"উঠে এস !" বউ উঠিল না। দুই তিন বার ডাকিয়াও যখন বউ-এর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন স্বামী ওমর আলীর স্বামীত্বে আঘাত লাগিল। সুতরাং ধৈর্য্যরক্ষা কঠিন হইল। স্ত্রীকে অশ্লীল গালি দিয়া বলিল,—"তোর . . . বুঝি নিষেধ ক'রেছে আমার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে !" অবাধ্য স্ত্রী তখনো স্বামীর আদেশ পালনের কোনই লক্ষণ দেখাইল না। তখন ওমর নিকটে গিয়া বধূর ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, বধূ দন্তে অধর চাপিয়া অশ্রুরোধের বৃথা চেষ্টা করিতেছে—অবিরল অশ্রুধারে বক্ষের বসন ভিজিয়া যাইতেছে !

"তবে রে অসতী ! হারামজাদী ! আমার সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে কান্না !"

স্বামীর তীব্র পদাঘাতে বধূ পালঙ্ক হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল ! গৃহের চারিধারে যাহারা আড়ি পাতিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। একজন ছুটিয়া গিয়া আমেনা ও লতিফ সাহেবকে সংবাদ দিল আমেনা বক্ষ চাপিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, লতিফ সাহেব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিলেন। গৃহিণী হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ ! কি করেন ? জামাইকে মারবেন নাকি ? লোকে হাসবে যে ! মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—তার স্বামী তাকে মারুক কাটুক, যা ইচ্ছে তাই করুক। আপনার তাতে কথা কইবার কি অধিকার ? তারা ত সেধে আসেন নি !" আনায়বদ্ধ সিংহের মত লতিফ সাহেব বসিয়া পড়িলেন।

পর দিন আয়শার শ্বশুরের সাম্‌নে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ওমর এখনো ছেলে-মানুষ ! সে আজ যে অন্যায় ক'রেছে, আর কখনো সেরুপ ক'রবে না। আমি আপনার মেয়ের সুখ-দুঃখের জন্যে দায়ী রইলাম।"

সন্ধ্যার সময় জমিদার আব্‌দুস্‌ সাত্তার পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া নবীপুর রওয়ানা হইলেন। বিদায়-কালে বিষাদ-প্রতিমা অশ্রুমুখী সবাইয়ের কাছে বিদায় লইয়া পিতৃপদে প্রবৃত্তা হইল।

পিতা আশিস্‌ করিলেন,—"রাজরাণী হও মা !"

আমেনা বোনটীকে বক্ষে চাপিয়া কাঁদিল। ভগিনীর বক্ষে বক্ষ মিশাইয়া আয়শা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রণতা ভগিনীর পানের চাহিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে নূরু বলিল,—"তোর মুখ যেন আর না দেখি আয়শা !"

নিজে কাঁদিয়া সবাইকে কাঁদাইয়া আয়শা চলিয়া গেল। তখন গোধূলির স্বর্ণ-আলো নিঃশব্দে চলিয়া গিয়েছে—কখন্‌ রাত্রির মমতাময়ী অন্ধকার পথ-ঘাট সব ছাইয়া ফেলিয়াছে।

৮

নবীপুরের প্রকান্ড জমিদার-বাড়ী বধূবরণ করিবার জন্য যেন সুসজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জমিদারভগ্নী করিমা বিবি ম্লান মুখে পুত্রকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা বড় খাটছিস্‌, কিছু খেয়ে নে !" এই বলিয়া খাবার দিয়া ম্লান মুখেই বাহির হইয়া গেল।

এই বাড়ীর মধ্যে আজ একমাত্র তাঁহার বুকেই ব্যথা বাজিতেছে—চোখের সম্মুখে এক মাতৃ-হারা অসহায়া বালিকার ছবি ভাসিতেছে! কোন্ অভাগীর আজ সকল-সুখের সমাধি! মূর্খ মাতাল স্বামী! রাক্ষসী-রূপিণী শ্বাশুড়ী! আজ তের বৎসর যাবৎ বিবাহ হইয়া তিনি ত এই ভ্রাতৃ-জায়ার সেবাই করিয়া আসিয়াছেন—অসহ খাটনী খাটিয়া সবল শরীর কঙ্কালে পরিণত করিয়াও তিনি তাঁহার মন পান নাই। শুধু পুত্রটীর পানে চাহিয়া মা'র সব দুঃখ জল হইয়া যাইত! কিন্তু হায়, আজ আবার কোন্ দুঃখিনী মরিতে আসিতেছে রে!

"পাল্‌কী এসেছে—পাল্‌কী এসেছে!"

চারি দিকে সহসা তুমুল শব্দ উঠিল। "মা! বউ ত এল, তুমি কি ক'রছ ব'সে?" বলিতে বলিতে পুত্র থামিয়া গেল। করুণাময়ী জননীর সজল নয়নের দিকে চাহিয়া পুত্র বলিল,—"ছিঃ মা! যাদের মেয়ে তাদের চেয়ে তোমার বেশী লাগে নাকি? মাসি-মাই [মামীমা] বা কি ভাববেন? ছিঃ, যাও বউ নামাও গে!"

"আহা বাবা! মাতৃহারা—মাতৃহারা! মা থাকলে কখনো দিত না রে, কখনো দিত না! ভাই-বোনেরা ত চায় নি। তবুও তারা শুধু ছেলেই দেখেছে, শ্বাশুড়ীর পরিচয় এখনো পায় নি!"

"ওসব থাক—থাক মা! তুমি যাও!" করিমা ধীরে ধীরে বধূ-বরণ-স্থলে গেলেন।

"ও ফুফু-আম্মা! ফুফু-আম্মা! বউ কি সুন্দর! দেখে যাও ও মেজ ভাই!" সুফিয়া আনন্দে অধীর হইয়া চেঁচাইতে ছিল।

মা ধমক দিয়া বলিলেন,—"থাক আর চেঁচাতে হবে না! ফুফু-আম্মার এখন বুক চড়্‌চড়্ ক'রছে। ঢের ঢের মানুষ দেখিছি এমন হিংসুটে মানুষ কখনো দেখিনি। না হয় একটু লোক-দেখানো খুশীই করতিস। মুখে যেন ঝাঁটা মার্‌ছে।" করিমা কিছু বলিতেন না, আজও বলিলেন না। নীরবে গিয়া বধূর পাশে বসিয়া ঘোমটা তুলিলেন। পুত্রকে বউ দেখাইতে ডাকিবেন ভাবিয়া চোখ তুলিলেন, দেখিলেন যেন সারা বিশ্বের বেদনা বধূর দুই চক্ষে জমা হইয়াছে, পুত্র আব্‌দুল কাদের নিমেষ-হারা হইয়া চাহিয়া আছে বধূর পানে!

৯

"মরু! আমার মরু! ওগো মরুময়ী!"

স্বামীর দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া স্ত্রী বলিলেন,—"কি?"

"কি ভাবছ?"

"ভাব্‌ছি, যার পায়ের কাঁটা তুলতে জীবন দিতে পারি, তার জীবন মরুময় ক'রলাম!"

"হেঁয়ালী ছেড়ে বাংলায় বল!"

"তোমার আশা-ভরা জীবন আমি আঁধার ক'রেছিলাম !"

"কিসে ?"

"আমার কালো রূপের মেঘছায়ায় !"

"বটে ! তা এখন কি ক'রতে চাও !"

"এখন আমি মরতে চাই, তা হ'লে তুমি হাসেনাকে বিয়ে ক'রতে পারবে !"

"কেন ! ম'রতে হবে কেন। দুই সতীনে সংসার ক'রতে পারবে না !"

"পারব ! আমি খুব পারব। জীবনপাত ক'রতে পারব প্রিয়তম ! কিন্তু তারা যে সতীনের ঘরে দেবে না !"

"তাই তোমার মরা দরকার, কিন্তু আমি যদি বলি, কালোর স্নিগ্ধ আলোই ভাল লেগেছে আমার ! তা যাক, এখন সই-এর পত্র পাও নি কত দিন বল দেখি !"

"অনেক দিন ! আহা ! অভাগিনী আয়শা !"

"দুর্ভাগিনী বটে। শুধু স্বামী-ভাগ্যে নহে ! শাশুড়ী ননদেরও সে বিষদৃষ্টি লাভ ক'রেছে !"

"তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?"

"আমার বন্ধু আব্‌দুল কাদের লিখেছে। সে বার এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে। তোমার সখীর দেবর। সে যা লিখ্‌ছে, তাতে মনে হয়, তোমার সখীর শাশুড়ী একটী রাক্ষসী-বিশেষ ! ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চাকরীতে বেরিয়েছে ; চাকরী পেয়েছেও—এই ময়মনসিং এ কোন সওদাগরী অফিসে সে এখন কেরাণী। বোধ হয় শীঘ্রই বউ আনবে। যাক আমার কাছারীর সময় হ'য়ে এল। নাইতে যাই। সন্ধান ক'রতে চেষ্টা ক'রব—লোকটা কোথায় থাকে !"

আয়শার বিবাহের দুই মাস পূর্ব্বে মরিয়মের বিবাহ হয়। মরু আয়শার ননদ। বিবাহ করিয়া হায়দর প্রথমে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বউটী ছিল কালো ! কিন্তু অল্প দিনেই কালো মেয়ের হৃদয়ের আলোতে সে কালো ছায়া দূর হইল। এখন এ কালো নহিলে তাহার এক দিনও চলে না। প্রেমিকা-সেবিকা-পত্নী তাঁহার অপূর্ব্ব সম্পদ ! তবে একে কালো বউ, তাহাতে দুই বৎসরে সে দুইটী মেয়ের মা এবং বিয়ে বৎসরই পর পর শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাওয়াতে আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে খুব সুলক্ষণা বলিত না। মরু ভাবিত সে মরিলে তাঁহার স্বামী হয় ত একটী সুন্দরী সুলক্ষণা বউ আনিয়া ইহার চেয়ে সুখী হইতেন, সুতরাং সে মরণ কামনা করিত। তবে মাঝে মাঝে মেয়ে দুইটীর মুখের দিকে চাহিয়া মরিতে ভয় হইত।

হাসিনা ছিল তাহার চাচা-শ্বশুরের মেয়ে—সুন্দরী শিক্ষিতা। হায়দর শত মুখে তাহার প্রশংসা করে। সে যখন তাঁহাদের বাসায় বেড়াইতে আসে, হায়দর তাহার সঙ্গে গল্পে যেন মাতোয়ারা হয়। মরু ভাবে,—হাসনু কি ভাগ্যবতী ! মরু ভাবে, স্বামী হয় ত হাসিনাকে চায় ! শুধু আমারই জন্যে তিনি অসুখী !

এবার সে সত্যই মরণের পথে চলিল !

১০

আজ দীর্ঘ দুই বৎসর আয়শা শ্বশুর-ঘর করিতেছে কিন্তু স্নেহ অর্জ্জন করিতে পারে নাই কাহারো ! স্বামী পাগল, সে সময়ে খুবই আদর করিত, আবার সময়ে মারিতও। কিন্তু শ্বাশুড়ীর বিষ-দৃষ্টি লাভ করেছে অনেক কারণে। প্রথমতঃ বউ-এর সঙ্গে মনোমত যৌতুক আসে নাই। সেই কারণে বউ প্রথমে তাহার বিরাগভাজন হইল। অপ্রিয়জনের দোষ দেখা যায় সহজেই, সুতরাং বধূও শীঘ্রই দুশ্চরিত্রা আখ্যা পাইল। দ্বিতীয় কারণ ছেলে ছিল অবাধ্য—মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত। পিতা এক কথা বলিলে তাঁহাকে দশ কথা শুনাইতে পুত্র কুণ্ঠিত হইত না ! জমিদার সাহেব ও তাঁহার পত্নী আশা করিয়াছিলেন, বউ আসিয়া তাঁহাদের ছেলেকে একদম পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। সেই আশাতেই জমিদার সাহেব এত আগ্রহে ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন ; কিন্তু বধূ আসা সত্ত্বেও ছেলের কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া যখন বিফলমনোরথ হইলেন তখন বউ হইল অনাবশ্যক বোঝা।

জমিদার সাহেবের সাংসারিক জীবন ছিল একটু অদ্ভুত—উল্টা হাওয়ার। তাঁহার অন্তর ছিল বেশ কোমল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীটী ছিলেন কঠোরহৃদয়া ! তিনি ছিলেন দাতা, স্ত্রী ছিলেন কৃপণ। তবে একথা সত্য যে, স্ত্রীটী কৃপণ হইলেও সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী। তাঁহার বংশের সকলেই অধঃপাতে গিয়াছে, কেবল স্ত্রীর কঠোরতায় তিনি এখনো দাঁড়াইয়া আছেন। বিপুল, সংসারের কাজ জমিদার-পত্নী পরীবানু নিজ হাতে করিতেন। ধান চাল ডাল তরকারী কিছুই তাঁহারা কিনিতেন না। সবই তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন। দুইটী চাকরাণী শুধু ধান ও মটর মুশুরী ইত্যাদির কাজেই থাকিত।

বধূ নীরবেই সমগ্র গৃহ-কার্য্য করিত। তাহাতে তাহার ক্লান্তি ছিল না। শ্বাশুড়ী যখন বধূর চরিত্র সমালোচনায় বসিয়া বলিতেন,—"এমন চামারের মেয়েও ঘরে এনেছি বোন, সঙ্গে একটা পয়সাও আনে নি। বাপ-মা আর ঘরে রাখতে না পেরেই তাড়াতাড়ি পার ক'রে দিয়ে বেঁচে গিয়েছে ! তবে কি ক'রব, খায় ত দু'বেলা ! এত বড় মাগীকে বসিয়ে ভাত দেওয়া ত যায় না, কাজেই কাজ-কর্ম্ম করাই।" প্রতিবেশীরাও মনে মনে বলিল,—"নইলে এমন ছেলের কাছে মেয়ে দেয় কেউ !" এখনো আয়শা আপন মনেই যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করিয়া যাইত ! সকাল ছ'টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বিরাম তাহার ছিল না। সে তাহাতে কষ্ট বোধ করিত না, কারণ তাহাতেই সে ভাল থাকিত—নিজেকে ভুলিবার অবসর হইত। শুধু স্বামী যখন তাহার মদ-সুবাসিত মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া নিকটে আসিত, তখনই তাহার বিদ্রোহী নারী-অন্তর নরকের অতল অন্ধকারে লুকাইতে চাহিত ! ক্ষোভে, ঘৃণায়, অপমানে তাহার দেহ মন জ্বলিয়া অঙ্গার হইত ! কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতই সে অচল থাকিত ! দেহে মনে সে পাষাণ হইয়া যাইত !

চেষ্টায় অসাধ্য সাধন হয়। স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার চেষ্টা করিত সে খুবই। তাহার বিদ্রোহী অন্তরে যাহাই থাক, প্রকাশ্যে সে স্বামীর আদেশই পালন করিতে লাগিল ! কিন্তু পাগলের মন যোগান সহজ নহে, সুতরাং তাহার লাঞ্ছনার আদি অন্ত

ছিল না। জগতে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার ঠাঁই ছিল না কোথাও। পিতৃ-গৃহের নামে তাহার সারা দেহে আগুন ধরিয়া উঠিত ! পিতাই যে তাহাকে এই অনল-সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়াছেন ! শ্বাশুড়ী ননদ স্বামী সকলের সঙ্গই তাহার পক্ষে বিষতুল্য ছিল। সুতরাং সমগ্র জগতের বজ্র-জ্বালা বহন করিয়া সে ছিল নিতান্ত একাকিনী !

১১

বেলা দ্বিপ্রহর। একখানি বই হাতে করিয়া আয়শা শুইয়াছিল, কিন্তু চক্ষু তাহার চলিয়া গিয়াছিল দূর মাঠের দিকে ! মন তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল কোন্ অতীত দিনের ক্লান্তিহীন জীবনের সন্ধানে ! আশাময় ! আলোময় ! কি সুন্দর সে সবুজ জীবন ! সে দিন যে দিকে দুই চক্ষু ফিরাইয়াছিল, সেই দিকেই তরুণ আশার সবুজ আলোয় কি উজ্জ্বলই দেখিয়াছিল দুনিয়া ! তার পর যে দিন তরুণ প্রণয়ের অরুণ আলোকে আকাশ বাতাস তাহাকে এক নূতন অনুভূতি দিল, সে দিন দুনিয়া কি এক গোলাবী নেশায় তাহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছিল ! পাখীর কণ্ঠে সে দিন নূতন ঝঙ্কার উঠিতেছিল। বনের মর্ম্মর, নদীর ঢেউ কোন প্রেমিকা পরীর মর্ম্মগীতি ও হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল। মায়া ! মায়া ! সবই মায়া রে ! সবই মায়া ! মায়াবিনী দুনিয়ার কি নিঠুর খেলা এ ! আজ তো তাহার সব আশা, সব সুখ-শান্তি জ্বলিয়া গিয়া ওই নিদাঘ-তপ্ত মাঠের মতই অসহ উত্তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহা অমনি ধূ-ধূ করিতেছে—যেন তৃণহীন শাহারা !

কে তাহার এ দশা করিল ! কেই বা তাহার বুকে বসিয়া সে স্বপ্নের ছবি আঁকিয়াছিল ; কেই বা সে ছবি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। আজীবন যাহাকে জাহান্নামে বাস করিতে হইবে, তাহার সম্মুখে বেহেশ্‌তের দ্বার খুলিয়া তাহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান করিয়া কে ধরিয়াছিল ! আকাশ-কুসুমের মালা মর্ত্ত্য মানবীর হাতে দিতে গিয়া কে আবার তাহা টানিয়া ছিঁড়িল ! এ নির্ম্মম খেলা কে খেলিলে ! শয়তান ? না শয়তানের সৃষ্টি-কর্ত্তা !

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আয়শা হাতের বইখানির দিকে চাহিল ; পুস্তকোল্লিখিতা নায়িকা রহিমা বিবি তখন কুষ্ঠরোগী স্বামীকে কাঁধে লইয়া দেশে দেশে বিতাড়িত হইয়া একটী জনহীন মাঠে আশ্রয় লইয়াছে এবং স্বামীর খাদ্যের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। আর রুগ্ন আইয়ূব নবী শয়তানের ছলনায় মনে মনে শপথ করিতেছেন,— "ভাল হইলে রহিমাকে এক শো বেত মারিবেন !" বইখানি বক্ষে চাপিয়া আয়শা অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সহসা জুতার শব্দে আয়শা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আব্‌দুল কাদেরকে সঙ্গে লইয়া ওমর আলী ঘরে ঢুকিল। আয়শার হাতে বই দেখিয়া কাদের হাসিয়া বলিল,—"ভাবী দেখছি রীতিমত কলির মেয়ে ! তা এর জন্যে আপনাকে কারো কাছে উপদেশ পেতে হয় না ত ?"

"ঢের" বলিয়া আয়শা উঠিয়া দুই খানা চেয়ার আনিয়া দিল। "থাক—থাক !

বসছি!" বলিয়া কাদের ওমরের হাত ধরিয়া শয্যার পাশেই বসিয়া পড়িল।

"দেখি ওটা কি বই!"

ওমর বলিল,—"এই বই পড়ার জন্যে এত শাসিত হয়, তবু বই ছাড়বে না।"

স্বামীর দিকে অনুনয়ের স্বরে আয়শা বলিল,—"মাফ কর! বড় যখন একা লাগে না প'ড়ে পারি না। আমার যে আর উপায় নেই!"

তাহার শেষ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-ব্যথিত স্বরে কাদের বলিল, "আহা প'ড়তে দেন না ভাই! বই প'ড়লে মানুষ খারাপ হয় না। বরং দশ জনের হর্ষবিষাদের জীবন-গাথা প'ড়ে নিজের জীবনেও একটা অবলম্বন পাওয়া যায়!"

"কিন্তু মা যে বলেন, মেয়ে মানুষের কাজ ঘরের মধ্যে—বেশী বই প'ড়লে মন বাইরে ছুটে যায়!"

"ওটা ভুল ভাই! বরং দৃঢ়তাহীন অশিক্ষিত মনই তুচ্ছ প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, বাইরে সুখ আছে শুনলেই ছুটে যেতে চায়! কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা-সমর্থ শিক্ষিত মন সহজে ভোলে না! 'শূন্য মনই শয়তানের আবাস।' অবসর সময়ে বই পড়া অন্যায় নয় বরং ভাল। কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায় না মোটেই। কি বলেন, ভাবী সাহেবা?" বলিতে বলিতে কাদের সহসা আসিয়া দেখিল, আয়শার উদ্দেশ্যহীন আঁখি দুইটী রৌদ্র-পোড়া শেষ মাঠের উপর দিয়া মনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গিয়াছে!

স্নিগ্ধ-স্বরে কাদের ডাকিল,—"ভাবী"

চমকিতা আয়শা চক্ষু ফিরাইয়া বলিল,—"আমায় কিছু ব'লছেন?"

"হ্যাঁ! আপনারা নাকি কলকাতায় যাচ্ছেন?"

"যাচ্ছি!"

"কেন?"

আয়শা বিরক্ত হইল। সুফিয়ার সঙ্গে কাদেরের বিবাহের কথা চলিয়া আসিতেছে বহু দিন—তাহাদের জন্মবধি। বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাদের সকলকে জানাইয়া দিল যে, সে বিবাহ করিবে না। সকলেই শুনিয়া অবাক হইল। জমিদার-দম্পতি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভগিনীর অংশ তাহাকে ভাগ করিয়া দিয়া জমিদার সাহেব তাহাদের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভগিনী আসিয়া ভ্রাতার পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন। "ভাইজান, আপনি ছাড়া আমার যে কেউ নেই!" জমিদার-গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"কেন গো! তোমার ছেলেই তো এখন 'মস্তলোক'! করিমা বিবি কাঁদিয়া বুঝাইলেন যে, তাহার কোন দোষ নাই।' রূপগুণ সম্পন্না সুফিয়া পুত্র-বধূ হইবে, সে তো সৌভাগ্যের কথা। তবে তিনি চিরদুর্ভাগিনী, নচেৎ যে ছেলে এ জীবনে মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করে নাই—সে অশ্রু উপেক্ষা করিয়া—কেবল সুফিয়াকে নহে—বিবাহই করিতে চায় না। সে আজ দুই বৎসরের কথা। ষোড়শী সুফিয়া এখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া।

সুফিয়ার বিবাহের জন্য কলিকাতা যাইতে হইবে এ সম্বন্ধে কাদেরের সঙ্গে আলোচনা করিতে আয়শার অপমান বোধ হইল!

"যাচ্ছি, কিন্তু আপনার সে কথায় প্রয়োজন ?" আয়শার উক্তি বুঝিয়া কাদের হাসিয়া বলিল,—"অকপটে মনোভাব স্বীকার ক'রলে যদি আপনারা রাগ করেন, তবে আমি লাচার। যে যা চায় না, তাকে সেটা নিতে বাধ্য করা কি ন্যায় কাজ ? স্বভাবের উপর অত্যাচার ক'রলে তার ফল কিছুতেই ভাল হয় না ভাবী। কায়মনোবাক্যে আশিস করি, খোদা সুফিয়াকে সুখী করুন। কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমিও সুখী যব না। দু'টী জীবনকে চরণে পিষে মারা কি মানুষের কাজ ভাবী !"

বিষাদের ক্ষীণ হাসি আয়শার মলিন অধরে না ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল। ন্যায়বান পুরুষ ! যখন নারীর উপব ক্ষুধিত পাশব-বৃত্তির চরিতার্থের জন্য অত্যাচারের শত বাহু বিস্তার কর—অসহায়ার সাধ, আশা দুই পায়ে পিষিয়া ফেলো, তখন তোমার এ ন্যায় কোথায় থাকে ?

নিজের বেলা তোমরা মূর্ত্তিমান ন্যায়-অবতার !

আয়শাকে নীরব দেখিয়া কাদের বলিল,—"কি ভাবছেন ?"

"কিছু নয় ! কেন সুফিয়া ত বেশ সুন্দরী, আপনার অসুখী হবার তো কারণ খুঁজে পাচ্ছি নে !"

"দুনিয়াতে সব্‌টার কারণ কি বোঝা যায়। আমার কাছে সুফিয়ার সৌন্দর্য্যও মলিন বোধ হইতে পারে—আপনি কি বুঝিবেন।"

"বুঝি গো বুঝি, কোন সুন্দরী মন ভুলিয়েছে ! তাই শিক্ষিতা রূপসী এখন রূপহীনা ! জানতে বড় সাধ যায়, সে অসামান্যা রূপসী কে ?"

"কিন্তু আয়শা অসামান্যা রূপসী হ'লেও জগন্মাতা। মায়ের রূপের আলোচনা সন্তানের মুখে শোভা পায় না।"

"থাক, পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছা নেই। কাল একবার এ গরীবের কুঁড়ে ঘরে পদধূলি দিতে হবে। আমি এখন মামি-আম্মাকে ব'লতে যাই।"

"কুঁড়ে ঘর ত নয় অট্টালিকা ! এ গরীবদের যা' আপনাদেরও তাই। মধ্যে পাঁচির উঠবার আগে ত এক বাড়ী ছিল, ও বিনয়টুকু না দেখালেও চল্‌ত। তা যাক, পদধূলি দেওয়ার উপলক্ষটা কি বলুন ত ?"

ওমর এতক্ষণ পরে কথা কহিল। "জান না, ওর যে চাকরী হ'য়েছে।"

"তাই নাকি ? কোথায় হ'ল ? কবে হ'ল ?"

ওমর বলিল,—"ময়মনসিং-এ। পয়লা জুন হাজির হবে।"

"বেশ ! বেশ ! দুই ভাই একখানেই থাকা হবে। কিন্তু ভাই-এর ঘরে এসে খালি মুখে যাবেন ? কিছু মিষ্টি মুখ করুন।"

আয়শা এক গ্লাস সরবৎ ও কিছু মোরব্বা আনিয়া দিল। কাদের আয়শার হাত হইতে সরবৎ লইতে হাত বাড়াইল। আয়শা চকিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া গ্লাসটী কাদেরের সম্মুখেই চৌকিতে রাখিল দেখিয়া কাদের হাসিয়া বলিল'—"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কালো, কালো হবে অঙ্গ !"

১২

নির্ম্মল আকাশে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতে ছিল, সে স্বর্গালোকে দুনিয়া স্বর্গময়ী সাজিয়াছিল। কর্ম্ম-ক্লান্ত কাদের সারাদিন নিমন্ত্রিতদের আদর অভ্যর্থনান্তর-তাহাদের খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বিদায় করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ যেন এই নিশ্বাসটুকু লইবার অবসরও হয় নাই তাহার।

ও বাড়ী হইতে শুধু সুফিয়ার মা আসিয়াছে—আয়শাকে এত করিয়া বলা সত্ত্বেও সে আসিতে পারিবে না বলিয়াছে। সুফিয়া একা থাকিবে—ও একটা ওজর! একই বাড়ী—মাঝে একটা বেড়া মাত্র। আর সুফিয়া আসি্‌লেই বা কি এমন ধানের গোলায় আগুন লাগিত।

অপমানে তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। আয়শা আসে নাই—না আসুক! তাহার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

আয়শা তাহার কে? ভ্রাতৃবধূ? আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া সে সভয়ে চক্ষু ফিরাইল। ও কোন্ মায়াবিনী!—তাহার অরক্ষিত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানকার নির্ম্মলতা পবিত্রতা—সরলতা দুই পায়ে পিসিয়া রাজ-রাণীর মহিমায় বসিয়াছে ও কোন্ রাক্ষসী? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটী অজানা বালিকার দুঃখ তাহার করুণহৃদয়া মায়ের বুকে করুণার ঢেউ উঠিয়াছিল—সে ঢেউ তার হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। তাই ব্যথিতহৃদয় লইয়া সে নূতন বউ দেখিতে গিয়াছিল। সে বিষাদ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। তাহার পর কত দিন সেই লাঞ্ছিত ম্লান মুখের ছবি তাহার চোখে অহেতুক অশ্রু বহাইয়াছে। সে অশ্রু-স্রোতে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সব ভাসিয়া গিয়াছে। কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে পশু হইতে দেয় নাই। হইলে এত দিন সে হয়তো অধঃপাতে যাইত। আয়শার সদাম্লান মুখের দিকে চাহিয়া অনেক সময় পাগল হইয়া যাইত। সে সময় নিজেকে সংযত করিতে তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইত। বাড়ীর ও অংশে সে সহজ যাইত না।

বিবাহ সে করিবেনা কখনো। নারী জাতির উন্নতি কল্পে জীবন উৎসর্গ করিবে। ইহাই তাহার ইচ্ছা।

সেই আয়শা—যাহার জন্য সে জীবনের সব সুখ বলি দিয়াছে—সেও সুফিকে বিবাহ করে নাই বলিয়া তার উপরে অভিমান করিল! কি করিবে সে এখন? সুফিকে বিবাহ করিবে কি? অসম্ভব। কাহার কাছে পরামর্শ লইবে সে? আয়শাকে জানাইবে কি? কাদের শিহরিল! সে যে ঘৃণা করিবে!!

ক্লান্ত শরীর ও মন লইয়া কাদের ছাদে উঠিল। নির্ম্মল জ্যোৎস্না মাতা বসুমতীর বক্ষে লুটাইয়া হাসিতেছিল, কাদের থমকিয়া দাঁড়াইল—কে ওই জ্যোৎস্না-স্নাত ছাদের এক পাশে বসিয়া? সঙ্গীতের রূপ ধরিয়া তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস ছড়াইয়া পড়িতেছিল আকাশে বাতাসে! কাদের স্পষ্ট শুনিল,—

"উজ্জ্বল তুমি বিকশিত তুমি জ্যোতির জ্যোতি হে!
সুন্দর তুমি, সুরভিত তুমি বিশ্বের পতি হে!
তুমি রবি শশী কুসুমের হাসি হৃদয়ের প্রেম প্রীতি হে!
এই সৌরজগৎ গাহিছে নিয়ত তোমারি সুষশ গীতি হে—!"

জ্যোৎস্না-বিহ্বলা প্রকৃতি যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছিল,—"সুন্দর তুমি সুবাসিত তুমি বিশ্বের পতি হে!" কাদের ধীরে অগ্রসর হইল—

"কে? তুমি—তুমি আয়শা!"

আনন্দে তাহার স্বর রুদ্ধ হইল। "কে?"

গান বন্ধ হইয়া গেল—গায়িকা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

"আমি ভাবী সাহেবা! বড় সুখী হ'য়েছি আপনাকে দেখে। কখন এসেছেন আপনি?"

"আমি এসেছি সন্ধ্যার সময়। ফুফু-আম্মা নিজে গিয়ে ডেকে আসলেন। যাক আপনি বসুন তবে—আমি যাই।"

"আপনিও একটু বসুন না, খানিক গল্প করি।"

"না ভাই, মা হয়ত খুঁজবেন।"

কাদের ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"একটী কথা বলবার ছিল আপনাকে, খুব সংক্ষেপেই ব'লব—পাঁচটী মিনিট দাঁড়াতে পারবেন?"

আয়শা কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—"কাল আমাদের ওখানে গিয়ে বলতে পারবেন না?"

কাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল,—"সে সুবিধা হবে না।"

আয়শা বসিল। কাদেরের দৃষ্টি তখন চন্দ্রালোকিত অসীমের মাঝে হারাইয়া গিয়াছে।

উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল প্রায় মিনিট পনেরো! সহসা কাদের প্রশ্ন করিল,—"ভালবাসা কি পাপ?" আয়শা বিস্মিত হইল। বলিল—"এ কি প্রশ্ন? না স্বগতোক্তি?" সে উত্তর করিল না, নীরবেই রহিল। কাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আয়শার মুখে ন্যস্ত করিল। বলিল,—"ভালবাসা কি পাপ?"

"আমায় জিজ্ঞেস করছেন?"

"হ্যাঁ!"

আয়শা হাসিয়া বলিল,—"আমি আগেই বুঝেছি—কোন ডাকিনী যেন আমার উচ্চ শিক্ষিত দেবরটীর মাথাটী খেয়েছে। তা বেশ তো, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীকেই ঘরে আনুন না। সে কি দুর্লভ?" ব্যথা-ভরা আঁখি দুইটী তুলিয়া কাদের বলিল,—"ছিঃ ঠাট্টা রাখুন, বিয়ে আমি ক'রব না। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—ভালবাসা কি পাপ? কাদেরের ব্যথিত স্বরে আয়শা হাসি ভুলিল, মর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। বলিল—"পাপ কিনা জানি না, তবে ভুল ভয়ঙ্কর! জীবনটাও ওলোট পালোট ক'রে দিয়ে যায়!"

"অন্যায়ই ত পাপ, ভুল করা কি অন্যায় নয়? যে ভুল জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দেয়—সে ভুল—মহাভুল—নিশ্চয় মহাপাপ!"—দৃঢ়স্বরে আয়শা বলিল—"নিশ্চয় মহাপাপ!" কাদের দেখিল, আয়শার দৃষ্টি দূর শূন্যে লক্ষ্যহীন! প্রত্যেকটী কথা যেন তাহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে বাহির হইতেছে। সে নীরব রহিল! আয়শা ধীরে বলিল,—"যাকে ভালবাসেন তাকেই বিয়ে করুন না কেন? নইলে ফুফু-আম্মা এই বয়সে বড় মনে কষ্ট পাবেন।" সংযত শান্ত স্বরে কাদের বলিল,—"সে বিবাহিতা!"

"বিবাহিতা! বিবাহিতা নারীকে আপনি ভালবাসেন?" তাকে পাবার আশা করেন?"

"পাবার আশা করি না আমি, চিন্তার সুখ ছাড়ব কেন?"

"ছিঃ ছিঃ! শিক্ষিতের মুখে এ কথা! ছি ভাই! আপনার মুখে এ-কথা শুনবার আশা করিনি—!"

"কি শুনবার আশা ক'রেছিলেন?"

"আশা করেছিলুম, আপনি বলবেন,—আমি এই সুন্দরী বালিকাটী চাই—আর আমরা ছুটে গিয়ে সে বাঞ্ছিত গোলাবটী তুলে আনব।"

"মানুষের কয়টী আশা সফল হয় বলুন। আপনার জীবনে কয়টী সাধ পূর্ণ হ'য়েছে?"

"আপনার এ সাধও পূর্ণ হবার নয়, পাগলামী চিন্তা ছেড়ে দিন, বুড়ো মা, জীবনে তিনি অনেক সয়েছেন! একমাত্র আপনিই এখন তার সুখ শান্তি। আপনিও এখন তাকে অসুখী করতে চান? অন্ততঃ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বিয়ে করুন।"

"তার পর।"

"তার পর জীবনের গণা কটা দিন কেটে যাবে।"

"নারী নই ত আমি!"

কাদেরের বিদ্রুপের মৃদু হাসি আয়শাকে আঘাত করিল—সে কঠিন কণ্ঠ যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিল,—"জানি আমি আপনি নারী নন—পরপদাশ্রিতা, পুরুষের চরণপিষ্টা—নিজের সুখশান্তি-আশা-ভরসা পদদলিত হইলেও প্রকাশ-অসমর্থা লাঞ্ছিতা বঙ্গনারী নন আপনি! পাশব শক্তিতে শক্তিমান—আত্মসুখান্বেষী, স্বার্থপর হৃদয় হীন পুরুষ আপনি—আপনাদের আমি খুব চিনি! নিজের স্বার্থের মন্দিরে—শত নরবলি দিতে আপনাদের হাত কাঁপে না! আপন অসুর দেহের শক্তি-বর্দ্ধনার্থ পরের বক্ষ-রক্ত চুষতে পশ্চাৎপদ হন না আপনারা। আর নির্জ্জিত প্রাণীর যাতনা দেখে হাত তালি দিয়ে হাসতেও বাধে না আপনাদের। কিন্তু যাক সে কথা, ফুফু-আম্মার কষ্ট দেখে বলছিলুম, বিয়ে করা উচিত আপনার!"

আয়শার উচ্ছ্বাসময় কথাগুলি কাদের নীরবেই শুনিয়া বলিল,—"আপনি বড় বেশী বল্‌ছেন, হয় ত কেউ আপনার ওপর অত্যাচার করেছে। সবাই সেই রকম নয়। ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই আছে। আলো ও আঁধারেই জগৎ সৃষ্টি। শুধু আলো বা শুধু আঁধার কোথাও নাই—দুনিয়া শুধু শয়তানেরই লীলাভূমি নয়—হজরত

মোহাম্মদেরও জন্মভূমি। আর আপনারা যে এতটা পরাধীন, সেটা পুরুষের অবিচার ত আছেই, আপনাদেরও ভুল। ইস্‌লাম ধর্ম্মে নারীর স্থান খুবই উচ্চে। হজরত নিজের জীবন আয়শায়, ফাতেমা-ময় ক'রে দেখিয়েছেন। পত্নী কত প্রিয়, কন্যা কত স্নেহের, পত্নী ও কন্যাকে তিনি সম্পত্তির অংশ দিয়ে গিয়েছেন। ইস্‌লামী শাস্ত্রে মেয়ের অমতে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে মায়ের স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা, পত্নীর প্রেম, কন্যার ভক্তি হারালে সংসার মরুভূমি হ'বে। তাই তাদের কোমলতা রক্ষার জন্য কঠিন সংসারের কঠোরতা হ'তে বাঁচাতে তাদের জন্য পবিত্র অন্তঃপুর। পুরুষের গৃহলক্ষ্মী মাতা ও কন্যা তারা।"

"তবে ভাই এ রত্ন গলায় পরছেন না কেন ? প্রণয়-পাপে ?"

"না গো না ; প্রণয়-পুণ্যে !—বাস্তবিকই, ভালবাসা পাপ নহে—পুণ্য, প্রেম মানুষকে ব্যর্থ করে না—সার্থক করে। অবাক হ'চ্ছেন ? কিন্তু সত্যই তাই। অযোগ্য আমি এ রত্ন গলায় প'রবার। কিন্তু আমার দেবী—আমার পূজ্যাস্পদাকে আমি পূজা ক'রব, তাকে পূজা ক'রে আমি বিশ্বের নারী জাতিকে পূজা করতে শিখব, সেই পূজায় আমি বিশ্বকে পূজা করব, বিশ্ব তার বাসস্থান ! এবং সেই পূজার আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ! প্রেমের লক্ষ্য অনন্ত মিলন—অনন্ত স্বর্গ ! রসাতল নয়। আমায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট করবেন না ! আমায় ঘৃণা . . ." কাদেরের স্বর রুদ্ধ হইল। আয়শার উদাস আঁখি বহু দূর চলিয়া গিয়াছিল—চাপা দীর্ঘশ্বাস লইয়া সে বলিল,—"যে প্রেম স্বাধীন পুরুষকে উচ্চে তুলে সেই প্রেমই পরাধীনা নারীর ইহ-পরকাল অতলে ডুবায়। মনে করুন সুফিয়া যদি আপনাকে ভালবেসে থাকে, তবে সে কি আপনার মত উক্ত জীবন যাপন ক'রতে পারবে ? পিতা মাতা তাকে বল পূর্ব্বক বিয়ে দেবেন আর দুর্ভাগিণী চিরটা জীবন বুকের ভিতর গরল রেখে মুখে ছলনার হাসি হেসে কাটাবে ! যাক, আপনার প্রেয়সীর নামটী বল্লেন না ? আমি আর বস্‌তে পারছি না। মা হয়ত কত খুঁজছেন !"

"সত্যই শুন্‌তে চান তার নাম ?"

"চাই। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

আয়শার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কাদের বলিল,—"নাম তার আয়শা বেগম !"

## ১৩

বহুকাল পর আয়শা যশোর আসিয়াছে—সুফিয়ার বিবাহ দিতে তাহারা সকলেই কলিকাতা যাইতেছে—অন্য সকলে গিয়াছে—আয়শা স্বামীকে লইয়া যশোর আসিয়াছে। ওমর তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। কথা আছে—সপ্তাহের মধ্যেই নূরু তাহাকে লইয়া যাইবে। আয়শা অসুস্থা—গর্ভবতী। তাহার স্বাভাবিক ম্লান ছবি আরো ম্লান হইয়াছে। সে বসিয়া নূরুর ছেলেটীকে ভাত খাওয়াইতেছিল। অদূরে বসিয়া পিতা মাতা কথা কহিতেছেন। কিসের মৃদু শব্দে আয়শা চোখ তুলিল। দরজায় দাঁড়াইয়া ও কে গো ! কে ?

কে তুমি! স্বপ্ন! বারেক চাহিয়াই আয়শা মুখ নত করিল! 'কে?' শব্দাকৃষ্ট লতীফ সাহেব সেই দিকে ফিরিলেন।

"আমি!—আনোয়ার!" মৃদুল কুণ্ঠিত উত্তর আসিল। "ওঃ! ভাল আছ? কোথা থেকে এলে?"

"কুমিল্লা।"

"বেশ! বেশ! বাড়ী যাবে? ব'সো। ঈদ কবে জান? কাল না পরশু?"

"বাড়ীই যাচ্ছি। ঈদ বোধ হয় পরশু!"

আয়শার লুব্ধ আঁখি আবার উঠিল, কি দেখিল? সামনে উপবিষ্ট পরিপূর্ণ শশধরনিভ যুবকের দুইটী স্নিগ্ধ আঁখি তাহারই অন্তরের সন্ধান চায় কি? কি আছে এ শীর্ণ মুখে! প্রণত-নেত্র দুইটী আবার যখন তুলিল আয়শা, দেখিল শূন্য দরোজা! শূন্য বারান্দা!! কেহ নাই!!! ঝঞ্ঝা-বিকম্পিত বক্ষে আয়শা ভাবিল, আসিয়াছেন যখন আবার দেখা পাইব। ক্রমে দিন গেল সন্ধ্যা আসিল। কিন্তু আয়শার মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে আর বিদ্যুৎ হাসিল না, আনোয়ার হোসেন আর আসিলেন না অন্তঃপুরে! আয়শা চাকরকে জিজ্ঞাসিল? "রাঙা-ভাই এসেছিলেন না রে—"

সে বলিল, "এসেছিলেন আপা! তখনি চলে গেছেন।"

স্তম্ভিতা আয়শার মুখে আর কথা ফুটিল না! কেন? ওগো কেন? কেন এসেছিলেন? সর্পদৃষ্ট পথিকের মত কেনই বা ছুটিয়া পলাইলেন? আমায় দেখেই কি? তাই, কিন্তু কেন? বুঝেছেন কি আমি পিশাচী? কি করে বুঝবেন? তবে এ কি রহস্য? এ কি? ঠিক! ঠিক! নিশ্চয় বুঝেছেন। বুকের ভিতর যে পৈশাচিক চিতা অহর্নিশ জ্বলছে, তার শিখা হয় ত আমার চোখে দেখা দিয়েছিল—তাই পথিক যেমন কাল ভূজঙ্গিনী দেখে ছুটে পালায়, এ বাসায় এসে এই নরকের প্রেতিনীকে দেখে তিনিও তেমনি সভয়ে ছুটে পালিয়েছেন।

হায় নির্ম্মম! হৃদয় শ্মশানে পরিণত করেছি তোমায় ভালবেসে! এই প্রতিদান দিলে এত দিনে তার? অহো ঠিক—ঠিক! উচিৎ বিচার! পিশাচীর যোগ্য দন্ড! খোদার দানে সুখী হইনি! প্রাণপণ চেষ্টাতেও স্বামীর পায় নিজকে বিলীন ক'রতে পারিনি! সর্ব্বোপরি "কোর্-আন-শরীফ" নিয়ে পাগলের খেলা খেলেছি। অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছি! ন্যায়-বিচারক খোদাকে অবিচারী—হৃদয় হীন বলেছি! খোদার প্রিয় সন্তান। ভক্ত-দাস তুমি! আজ এই ঘৃণার ছুরী বুকে হেনে আমার পাপের উচিত শাস্তিই দিলে! কিন্তু ওগো প্রিয়! ওগো-প্রিয়তম! তুমি নিজ হাতে এ দন্ড না দিলেই পারতে! ঘৃণার আসনে দয়াকে বসালে দেবতা আমার! তুমি যে ফেরেশ্‌তারও পূজ্য হ'তে!

অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আকাশ পৃথিবী লুপ্ত হইল। ঘনকৃষ্ণ জলদ-জালে গ্রহ-তারকা ঢাকিয়া ফেলিল। প্রলয়-বায়ূ তান্ডব-নৃত্যে সারা সৃষ্টিটাকে উল্‌টাইয়া মহাসাগরের অতল আঁধারে লুকাইতে চাহিতেছিল। অসীম আকাশে জলদ-মন্দ্রে ধ্বংস-ভেরী বাজিতেছিল। কোন বিরহ-বিধুরার অবিরল অশ্রুধারে বিশ্ব ডুবাইতে

চাহিতেছিল। হৃদয়-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে সৃষ্টি কাঁপিতেছিল।—আর সেই সৃষ্টি-বিপ্লবের মধ্যে তেমনি বিপ্লবভরা আঁধার হৃদয়ে স্তম্ভিতা আয়শা বারান্দায় পথ ধরিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া ছিল।

## ১৪

ময়মনসিংহের একটী ক্ষুদ্র একতলা গৃহে বসিয়া একটী রমণী ফ্রক সেলাই করিতেছিল। গোলাব-কলিকার মতই অনিন্দ্যসুন্দর একটী চার বৎসরের বালিকা মায়ের কাছে বসিয়া বর্ণ-শিক্ষার ক, খ পড়িতেছিল। ছোট্ট মাথায় ছোট্ট ছোট্ট কৃষ্ণ রেশমের মত চুলগুলি বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মুখের উপর পড়িতেছে, চাঁপার মত কচি হাতখানি তাহা সরাইয়া সরাইয়া বিরক্ত হইতেছে। মাতা একবার চড়-চাপড় মারিতেছে আর সেই চম্পক-কলিকার নীল-নলিন-আঁখি হইতে বড় বড় শিশির-মুক্তা পড়িতেছে, বসুধা সাগ্রহে তাহা বক্ষে টানিয়া লইতেছে। অদূরে চাঁপা গাছে চাঁপা ফুল ফুটিয়া চম্পকবরণা সখীটীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। হায় হতভাগিনী! ঝরিয়া-পড়া বেহেশতের গোলাবটীর গায় আঘাত করিতে তোর বুক শতধা হইয়া যায় না!

ক্রমে ৪টা বাজিল। রমণী সেলাই রাখিয়া উঠিল। আসরের নমাজ পড়িয়া স্বামীর নাশ্‌তা তৈরী করিতে বসিল। চার বছরের বালিকা নিপুণা গৃহিণীর মত মায়ের সাহায্য করিতে বসিল।

কলিকাতায় আসিয়া সুফিয়ার বিবাহ হইল—এক জন ইনেস্‌পেক্‌টরের সঙ্গে। কাদের বিবাহ করিল না, কিন্তু কেন যে কাদের তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, বুদ্ধিমতী সুফিয়া তাহা বুঝিল। সে তখন কাল-নাগিনীর মত আয়শার বুকে দংশন করিতে চাহিল।

চঞ্চলমতি ছেলের উপর জমিদার আবদুস্‌ সাত্তার সাহেব অসন্তুষ্ট ছিলেন খুবই। বউ আনিলেন ছেলে ভাল করিতে, দুর্ভাগিনী বউ-এর দ্বারা তাহা হইল না। সুতরাং বউ হইল শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্ষুশূল। আবদুস্‌ সাত্তার ভাবিতেন—তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রাণপণ চেষ্টায় সাজান সংসার জ্বলিয়া যাইবে! বুদ্ধিমতী সুফিয়াকে তিনি প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। ভাবিতেন সুফিয়া যদি ছেলে হইত, তবে তাঁহার নাম থাকিত। কাদেরকেও তিনি খুব স্নেহ করিতেন। সুফিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাহাকে ছেলের মত রাখিবেন, ইহাই্‌ ছিল তাঁহার কামনা। কিন্তু যখন অর্থলোভেও কাদের টলিল না, তখন তিনি অনেক সন্ধানে একটী মতোমত পাত্র পাইলেন এবং তাহার সহিত সুফিয়ার বিবাহ দিয়া তাঁহারা নবীপুর ফিরিয়া আসিলেন। আর সুফিয়া? শৈশবের সহচর, যৌবনের প্রার্থিত—শুধু প্রার্থিত নহে—যাহাকে একান্ত নিজেরই বলিয়া মনে করিত, তাহাকে না পাওয়ায় দুঃখে অভিমানে বুক তাহার পুড়িয়া যাইতেছিল। সুফিয়া যখন বুঝিল আয়শাই তাহার কাল, তখন সে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল। শিক্ষিত স্নেহপরায়ণ স্বামী পাইয়া যদিও অনেক দুঃখ ভুলিল, কিন্তু আয়শার জন্যই যে কাদের তাহাকে অপমান করিল, এ কথা সেও ভুলিল না—তাহার মাও ভুলিল না।

এই সময়ই আয়শার একটী মেয়ে হইল—সে কি সুন্দর ! যেন বেহেশ্‌তের গোলাব মর্ত্ত্যে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সুফিয়ারও একটী মেয়ে হইল। কিন্তু সবাই সমস্বরে আয়শার মেয়েরই প্রশংসা করিত—এ কোন্ শাহাজাদী পাগলের ক্ষুদ্র গৃহে আয়শার মরু-বুকে আশ্রয় লইল ? দারুণ মরু-তাপে এ কুসুম কি অকালে শুকাইয়া যাইবে না ! আশ্চর্য্য, স্বীয় পৌত্রী ও ভ্রাতৃ-কন্যার এই প্রশংসা সুফি ও তাহার মার বুকে শেল-সম বাজিত !

মেয়েটী বুকে পাইয়া আয়শা কিন্তু ধন্য হইল—এই ত স্বর্গ ! জগতের চরম সুখ ! আর কি চাই ? কিছু না ! কিছু না ! আমি ধন্য ! আমি তৃপ্ত ! আর কিছু চাই না খোদা ! আর কিছু চাই না !

স্বামীকে সে কখনো প্রাণ দিয়া সেবা করিতে পারে নাই, কিন্তু সন্তানের পিতাকে সে দেহ-মনে প্রণিপাত করিল। ওমর আলীর সব দোষ, সব ঘৃণা, সব অত্যাচার শিশুর মধুর হাসির স্বর্গোলোকে মধুময় হইয়া গেল। যে স্বামীকে সে অত্যাচারী, মদ্যপ, বেশ্যাদাস বলিয়া ঘৃণা করিত, সেই স্বামীই সন্তানের পিতারূপে তাহার চোখে দেবতা হইল—স্বামীকে সে দেবতা ভাবিয়া কৃতার্থ হইল। তাহার যন্ত্রণাময় দুর্ব্বহ জীবন মাতৃ-স্নেহের স্বর্গীয় আলোকে মাধুর্য্যময় হইল। কিন্তু তাহার এই সুখ সুফিয়া ও তাহার মাতার হইল অসহনীয়। তাহারা বলাবলি করিত,—"পাগলের হ'ল মেয়ে ! ওর গতি কি হবে ! হ'লই বা সুন্দর, ওর রূপের আর মূল্য কি ? ওর স্থান কোথায় ? হ্যাঁ, তবে রূপ আছে, মায়ের কাছে 'ছেনালী'-বিদ্যাও আয়ত্ত ক'রবে !—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও তাই। এ ছাড়া আর কি গতি আছে ওর ! অভিশাপ ! অভিশাপ !"

আয়শা নিজের জীবনের দিকে চাহিল। সত্যই ত ! মেয়েদের জীবন ! অভিশাপ বই আর কি ! দুর্ভাগিনী জননী চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, "হে খোদা ! আমার ছোট গোলবটীকে তুমি সংসারের সব আঘাত হইতে রক্ষা ক'রো দয়াল !" সে প্রাণপণে মেয়েকে সুশিক্ষিত করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল এবং নিজে স্নেহময়ী জননী হইতে কঠোর শিক্ষয়িত্রীর রূপ ধরিল, তাহার ফলে চার বৎসরের শিশু রহিমা বেগম সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইল। কেবল ফুফু ও দাদিরই অপ্রিয় হইল বেশী।

ইনেস্পেক্টর আবদুল গফুর দেখিলেন উত্তম সুযোগ ! শ্যালককে কোনরূপে তাড়াইতে পারিলে সেই স্বর্ব্বস্বের মালিক। শ্যালক চঞ্চলমতি, তাহাকে দূর করিতে কত ক্ষণ ? সে প্রাণপণে শ্বশুরের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল এবং সুফিয়ার কোন্দলে আয়শার গৃহিণীর আসন টলমল করিয়া উঠিল।

জামাই শ্বশুরকে মান্য করিলেও শ্যালককে বাক্যে, ব্যবহারে, অপমানে, অবজ্ঞায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। উদ্ধত প্রকৃতির যুবক পিতাকে বলিয়া যখন প্রতীকার পাইল না, তখন পত্নীকে বলিল,—"চল এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাই !"

আয়শা বলিল,—"কোথায় ?"

"তুমি যশোর যাও। আমি অদৃষ্ট-পরীক্ষায় এক দিকে বেরিয়ে পড়ি।"

"আমি যশোর যাব না।"

বিস্মিত ওমর বলিল,—"কেন ?"

"ইচ্ছা হয় না।"

"তবে কি ক'রবে ?"

"এখানেই থাকি !"

"এখানে ! এখানে থাক্‌লে তোমার রহিমা ম'রে যাবে !"

আয়শা শিহরিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওগো, যাব যাব ! কিন্তু আমায় যশোর যেতে ব'লো না।"

"তবে কোথায় যাবে ?"

"তুমি যেখানে যাও।"

"তুমি তবে এখানেই থাকো। আমি দেখি কোন কাজ পাই কি না।"

ওমর কাজের চেষ্টায় গেল। এমনি দুঃসময়ে আয়শা একটী পুত্র প্রসব করিল। হতভাগিনীর হাহাকারে আকাশ পাতাল কাঁপিয়া উঠিল। আয়শার বেদনায় অথবা নিষ্পাপ শিশুর দুঃখে জানি না, বিধাতার আসন টলিল। ওমর, কাদের ও হায়দারের অক্লান্ত চেষ্টায় ময়মনসিংহে এক সওদাগরের আফিসে কাজ পাইল। বেতন হইল ২৫ টাকা। পূর্ব্বেও সে এই আফিসেই বারো টাকা বেতনে কাজ করিত, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিজেই তাহা ছাড়িয়া গিয়াছিল। সে-সাহেব চলিয়া যাওয়াতে তাহার আবার কাজ জুটিল। সামান্য বেতনে বাসা ভাড়া মিলে না। মরিয়ম তাহাকে দুইটী কামরা ছাড়িয়া দিল। অচিরেই আয়শা পুত্র-কন্যা লইয়া সখীর আশ্রয়ে আসিল।

## ১৫

ফাতেহায়-দোয়াজ-দহম। রাত্রে মৌলুদ শরীফ হইবে—মরিয়ম তাহারই জোগাড় করিতেছে। সহসা বালিকাকণ্ঠের চীৎকারে সে বাহির হইয়া আসিল। "কি রে বুচু ! কাঁদিস কেন মা !" রহিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা মাকে মেরে ফেলেছে !" মরিয়ম আয়শার গৃহপানে ছুটিল, গৃহে হায়দার ছিল—সেও ছুটিল। আয়শা রক্তাক্ত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে। মাথায় দুই তিন জায়গায় জখম হইয়াছে। ওমর ঘরে নাই। মরু ও হায়দার তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল ; অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর অস্ফুট শব্দ হইল,—"মাগো !"

আয়শা চাহিয়া দেখিল—সে বিছানায় শায়িত। বুচু পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে। মরিয়ম বাতাস করিতেছে, হায়দার দাঁড়াইয়া কি করিতে হইবে তাহাই বলিয়া দিতেছে।

"মরু ! সই !"

"কেন সই ?—আমার আলমগীর ?"

"দোলায় ঘুমুচ্ছে।"

"সই ! বুচুর বাবা খেয়েছেন ?"

"হতভাগি ! কালামুখি ! সে খাক, না খাক, তোর কি লো—তুই ত জাহান্নমে যাচ্ছিলি !"

আয়শা হাসিয়া চোখ বুজিল। এম্‌নি সময়ে কাদের ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"কি হয়েছে হায়দার !"

"এই ভাই ! অবস্থা ত দেখছ, আমরাও সঠিক জানি না কি হয়েছে, তবে বুহু বল্‌ছে ওর বাবাই নাকি এই কান্ড ঘটিয়েছে। তুমি সংবাদ পেলে কার কাছে ?"

"আমি এসেছি তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে। তোমাদের ঘর খালি দেখে চাকরের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, এখানে কি দুর্ঘটনা হওয়াতে তোমরা সবাই এখানে এসেছ ; সংবাদ পেয়ে আমিও এলাম।"

কাদেরের মনোভাব জানার পর হইতে আয়শা আর তাহার সম্মুখে যায় নাই। কাদেরও আসে নাই। ময়মনসিংহে আসিয়াও নয়। আজ কাদেরের সম্মুখে এই অপমানে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। সে সবলে উঠিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। কাদের বলিল,—"ঘটনা সম্বন্ধে উনি কি বলেন ?"

আয়শা দীপ্তস্বরে বলিল,—"আমি বলি, আমার কিছুই হয় নি। আপনারা আমায় বিরক্ত ক'রবেন না তোরা যা মবু।"

"তুই ভাল হয়েছিস্‌ ?"

"হ্যাঁ ! তোরা যা !"

"সাবাস্‌ মেয়ে বাপু তুই ! চল গো আমরা যাই তুই রাত্রে যাবি ত আমাদের ওখানে ?"

"চেষ্টা ক'রব।"

সবাই চলিয়া গেলেন। আয়শা রহিমাকে বক্ষে চাপি মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আট মাসের শিশু আলমগীর নিশ্চিন্ত মনে দোলায় ঘুমাইতেছিল।

ফাতেহায়-দোয়াজ-দহম ! বাসায় বাসায় মৌলুদের ধুম উঠিয়াছে। উকিল হায়দার আলী সাহেবের বাসাতেও মিলাদ হইবে। অনেক ভদ্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুঃখী কাঙালকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইতেছে। চাঁদের এগারোই দিন-গত। রাত্রে মিলাদ আরম্ভ হইল—হজরত মোহাম্মদের (দঃ) এই তারিখে জন্ম ও মৃত্যু। এই দিনই পৃথিবীতে তাঁহার আগমন উৎসব। আবার ৬৩ বৎসর পরে ঠিক এই তারিখে তাহার বিদায়-অশ্রু-বর্ষণ। যথারীতি মিলাদ শেষ হইল এবং মিলাদ-শেষে সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন।

মবু আয়শার গলা ধরিয়া বলিল,—"আজ এই ঘরে থাকবি ত !" আয়শা হাসিয়া বলিল,—"না ভাই আবার হয় তো রাগ ক'রবে।"

"কালামুখি ! তোর মুখে হাসিও আসে ! আমরা সবাই উপস্থিত না হ'লে কি হ'ত বল্‌ দেখি !"

"কিছুই হ'ত না। তোমরা গিয়েই গোলমাল ক'রেছ।

"মর্‌ পোড়ামুখি ! লোহুর দরিয়া হ'য়ে যাচ্ছিলি জাহান্নমে !"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আয়শা বলিল,—"লোকে দরিয়ায় ঝাঁপ দেই ত ভাই প্রায়ই—এ পর্য্যন্ত জাহান্নমের পথের সন্ধান পেলাম না ত !"

"তাই নাকি! তা হ'লে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয় হাজার বার?"

এই কথা বলিতে বলিতে কাদেরকে সঙ্গে করিয়া হায়দার গৃহে প্রবেশ করিল। আয়শা উঠিয়া যাইতেছিল, মরু হাত ধরিয়া বলিল,—"কেন গো! এখানে তোমার ভাসুর কে এল?"

আয়শা বসিয়া পড়িল। হায়দার বলিল,—"যশোর যাবেন?"

মুখ তুলিয়া আয়শা বলিল,—"কেন?"

"বলছি এখানে যদি কোন কষ্ট হয়, আপনি ইচ্ছে ক'রলে আমরা আপনাকে যশোর রেখে আস্‌তে পারি, যাবেন?"

"না, আমার কোন কষ্ট নেই এখানে।"

আয়শার চোখের সামনে সকালের দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল, অপমানে তাহার বক্ষ জ্বলিয়া যাইতেছিল। কোন্ অতল অন্ধকারে সে মুখ লুকাইবে গো! ধিক এ ঘৃণা জীবনে—ধিক শত ধিক!! আয়শা চোখ তুলিয়া দেখিল—কাদের স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। দারুণ অপমানে সে তখন জ্বলিয়া মরিতেছিল, তাহার রাগ হইল মরুর উপর—কেন সে তাহাকে দেখিতে গেল,—রাগ করিল নিজের উপর—কেন সে অজ্ঞান হইয়াছিল। রাগ হইতেছিল বিধাতার উপর—কি পাপে তাহার এ দারুণ শাস্তি! কেবল রাগের অযোগ্য—পাগল স্বামী, শিশু রহিমা!

"সত্য বলছেন? কোন কষ্ট নেই আপনার? বলুন আবার! আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছি নে, যে, সত্যই এ কথা আপনার মুখে শুনছি।"

চোখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে আয়শা বলিল,—"হ্যাঁ! আমি সত্যই বলছি আমার কোন কষ্ট নেই। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন,—এই সুখ বজায় রাখিয়া এই স্বামী—এই বুহু ও আলী এদের দুনিয়াতে রেখে যেন আমি মরতে পারি—খোদার দর্গায় এই আমার শেষ ভিক্ষা!"

কাদেরকে দেখাইয়া হায়দার বলিল, "দেখুন ভাবী সাহেবা! এই হতাভাগাটা বিয়ে করে না। ওরে লক্ষ্মীছাড়া! চেয়ে দেখ্-পৃথিবীর কি অপূর্ব্ব সম্পদে বঞ্চিত তুই দুর্ভাগা!"

আয়শা বলিল,—"সত্যি ছোট মিঞা, আপনি বিয়ে না করাতে আমরা খুবই মনঃকষ্টে আছি। মরু! তোরা ভাই ক'নে ঠিক কর্। আমরা ওঁর হাত-পা বেঁধে বিয়ে দেব। দশ চক্রে ভগবান ভূত হন। আর আমাদের সকলের চক্রে ইনি বিয়ে ক'রবেন না!"

"ক্ষমা করুন! অন্য যে কোন আদেশ করবেন মাথা পেতে নেব ভাবী সাহেবা, শুধু এই আদেশটী ক'রবেন না। আপনি যদি পাগল নিয়ে সুখে থাকেন, বিশ্বাস করুন, আমি বিয়ে না ক'রে সুখে আছি।"

আয়শা উঠিয়া দাঁড়াইল—যুক্ত করে বলিল,—"জীবনে কখনো কিছু ভিক্ষা চাই নি আপনার কাছে, ভবিষ্যতে চাব না, আপনি আমার দুর্ব্বহ জীবন আর দুর্ব্বহ

ক'রবেন না। দোহাই আপনার খোদা-রসুলের ! আপনি বিয়ে করুন। ফুফু-আম্মার চোখের পানি না ক'মলে আমার দুঃখও ক'মবে না ! সম্পর্কে আমি আপনার বড়, আমি আজ জোড়-হাত করছি আপনার কাছে। আপনি বিয়ে করুন। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ভিক্ষা আপনার কাছে এই।" তিন জোড়া বিস্মিত চোখের চাহনী হইতে আয়শা দ্রুতপদে নিজেকে আড়াল করিল।

১৬

অভিভাবকের অবিচারে, সংসারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত-হৃদয় অভাগিনী আয়শা যে দিন জীর্ণ বৃক্ষাশ্রিতা লতাটীর মত চঞ্চলমতি অক্ষম স্বামীর দুর্ব্বল হস্ত ধরিয়া কম্পিত বক্ষে স্খলিত চরণে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, সে আজ তিন বৎসরের কথা। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে জীবনে তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ কত ঘটনা ঘটিল। কত পাপ, কত পুণ্য, কত রোদ, কত বৃষ্টি তাহার ক্ষুদ্র মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ রাখিবার অবকাশ আছে কাহার ?

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে শ্বশুর-শাশুড়ীর আহ্বানে সে আবার নবীপুর ফিরিয়া গেল। তাহার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। এবার বুঝি চির-সমাধি ! ঘরণী, গৃহিণী সুফিয়ার সঙ্গে সে বন্ধুর মত মিশিত, সুফিয়াও বিশেষ কিছু বলিল না। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রহিল না। শাশুড়ী ছেলের মমতা না ছাড়িতে পারিলেও বধুকে স্নেহ করিতে পারিল না। আশার কল্পনার আকাশ-কুসুম কল্পনাতেই শুকাইল।

দুর্ব্বল শরীর ওমর আলীর অধিক পরিশ্রম সহিল না। সে শয্যাগত হইল, দীর্ঘ ছয় মাস শয্যাগত থাকার ফলে তাহার চাকরীটী গেল। তিনটী সন্তানের দরিদ্র মাতার শরীরও লৌহবৎ ছিল না। আয়শার শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসার আশা দুরাশা বুঝিয়া আয়শা নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিল।

আয়শা ভাবিত, সে চিরদুঃখিনী, জন্ম-অভিশপ্তা,—বুঝি জগতের ধুমকেতু—মূর্ত্তিমতী অমঙ্গল সে ! সেই হয়ত রাহু-রাক্ষসী রূপে সন্তানদের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ! নহিলে এই সব নিষ্পাপ শিশু—'মাসুম' ফেরেশতা—নির্ম্মল বেহেশতের ফুল—ইহারা কষ্ট পায় কাহার পাপে ? মায়েরই পাপে ! কিন্তু ওগো চির-অদৃশ্য দেবতা ! একটী বার দেখা দাও ; একটী কথা আমার শুনে যাও ! একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও আমায় ! এই সব অবোধ শিশু আমার জঠরে আসিল কোন্ পাপে ? আর আমি ! হা আল্লাহ ! আলেমল গায়েব ! সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ! কোন্ মহাপাপে আমার এ দশা ! সেই যে—সেই মুহূর্ত্তের তরে সৃষ্টির পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পানে একটী বার মাত্র সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম ! বিশ্ববাগানের সৌন্দর্য্য-সুবাসপূর্ণ গোলাবটী তুলিবার দুরাশা হৃদয়ে ধরিয়াছিলাম ! সেই কি আমার মহাপাপ ! ব'লে দাও—ওগো ব'লে দাও ! হে চন্দ্র-সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ! জগন্মোহন ! অসীম সুন্দর ! সেই পাপেই কি আমার এ শাস্তি !

আয়শা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিল, কিন্তু মৃত্যু তাহার হইল না—তাহার যাহা হইল তাহা মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ—কল্পনাতীত—বর্ণনাতীত।

অভিশপ্তা দুঃখিনীকে সুখের মুখ দেখাইয়া বিধাতাও বুঝি অনুতপ্ত হইলেন। তাই সেই ইচ্ছাময়ের কঠোর ইচ্ছায় রহিমা কঠিন রোগাক্রান্ত হইল! অতুল সুন্দর, বেহেশতের মোহাম্মদী বাগানের প্রফুল্ল গোলাব-কলি শাহারার তপ্ত রৌদ্র অথবা অভিশপ্ত মায়ের কলুষিত দেহ-স্পর্শে দিন দিন শুকাইতে লাগিল। অন্ধ মাতা তাহা দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলেও উপায়হীনা প্রতীকারে সামর্থ্য হইল না। অথবা বিধাতার সুকঠোর ইচ্ছাই তাহাকে অন্ধ করিল! কন্যার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে না চাহিয়া হতভাগিনী মাতা কন্যার ভবিষ্যৎ শুভার্থে কঠোর শাসনে তাহাকে লেখা-পড়া ও গৃহকার্য্যে মনোযোগ করাইতে চাহিল। চিরদুঃখে প্রতিপালিতা কোমল প্রকৃতি অল্পভাষিণী শান্তির প্রতিমা পঞ্চম বর্ষীয়া শিশু জীবনের সমস্ত ব্যথা নীরবে সহিয়াছে, কদাচিৎ মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠের মৃদু-স্নেহ বাণী ছাড়া জীবনে সে আর কাহারও স্নেহ পায় নাই। কিন্তু আপন জনের স্নেহ না পাইলেও পরের স্নেহ পাইয়াছিল সে যথেষ্ট। ময়মনসিংহে থাকিতে তাহাদের পাশের বাসার হিন্দু-বধূ আসিয়া দেবী বুহুকে নিজের বাড়ী লইয়া গিয়া নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া সাজাইয়া দিতেন এবং আয়শাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,—"আচ্ছা ভাই। এই পরীর মত মেয়েটীকে কোন্ নির্ব্বোধ বিধি আয়শার মত অকম্মার কোলে দিয়েছেন, বলুন ত? আমরা হ'লে এমন পরীকে পরীই সাজিয়ে রাখতুম।" মরু হাসিয়া বলিত,—"আপনারা বিশ্বাস করেন, যে, এই কাল-পেঁচীর পেটে রহিমা জন্মেছে? ওকে আমরা পরীস্থান থেকে কুড়িয়ে এনেছি, না রে বুহু!" তখন গর্ব্বে মায়ের বুক স্ফীত হইত। ইহার চেয়ে সুখ জগতে আছে কি? সেই রহিমার চিরশান্ত চাঁদ-মুখ যে দিন বেদনায় বিকৃত হইল, পৃথিবীর মত সহনশীলা অতি ক্ষুদ্র শিশু যে দিন সত্যই রোগশয্যায় শায়িত হইল, সে দিন নিরুপায় মাতা দুনিয়া অন্ধকার দেখিল। ধার-কর্জ্জ করিয়া ডাক্তার আনিতে গিয়া দেখিল, গ্রামে ডাক্তার দুর্লভ। অনেক চেষ্টায় ডাক্তার আসিল। শ্বশুর বলিলেন,—"বাছা! ডাক্তার আনলে বটে, কিন্তু নেহাৎ আনাড়ী!" ডাক্তার অবজ্ঞাভরে বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। ভাল হ'য়ে যাবে।" ঔষধ আসিল, ঔষধ হাতে লইয়া মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হতভাগিনী কম্পিত হস্তে ঔষুধ ঢালিয়া দিল। আর শিশু অটল বিশ্বাসে সে ঔষুধ খাইল! মায়ের হাতে কি সুধা ছাড়া আর কিছু উঠে রে!

সারা রাত্রি শিশু পানির জন্য ছট্‌ফট্ করিল। "পানি—মা পানি!" বলিয়া সে কাতর কণ্ঠে পানি চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন,—"পানি দিও না! বুক-ভরা কফ।" মায়ের কলিজা বিদীর্ণ হইয়া গেল! বাছা যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া পানি চাহিতেছে! "বুক জ্ব'লে গেল মা! পানি!" অলক্ষ্যে এক বিন্দু পানি শিশুর ঠোঁট ছুঁইল। আঃ কি তৃপ্তি রে! সে তৃপ্ত চক্ষু দেখিয়া মায়ের কলিজা যে জুড়াইয়া গেল রে!

ধীরে ধীরে একখানি সুকোমল শীর্ণ হাত মায়ের মুখের উপরে পড়িল। চমকিতা মাতা বলিল,—"মা আমার কি চায় রে!" এ কি উত্তর! ক্ষীণ অস্ফুট মুমূর্ষু কণ্ঠস্বরে

যেন অতি দূর হইতে কে বলিল,—"মা! চুমু দে!"

মায়ের চোখের জলে কন্যার হাত ভাসিয়া গেল! তার পর যে দৃশ্য—তাহা মা দূরে থাক পরেরও সহনাতীত! আয়শা শিশুর কাছ হইতে উঠিয়া গিয়া জায়-নমাজে লুটাইয়া পড়িল! অন্তরের অন্তস্তল হইতে শব্দ উঠিল,—"আল্লাহ!"

শহরে অবস্থিত পিতা স্নেহের আকর্ষণে ব্যাকুল হইল! কেন মন এত আকুল হয়! তাহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বাড়ীতে সব ভাল ত? নিশ্চয় ভাল, নইলে সংবাদ আসিত। কিন্তু না! কে টানে আমাকে! কি ক'রে যাব! কেন যাব? না না, যেতে হবেই। কেন জানি না, কিন্তু যেতেই হবে।

ট্রেন আজ এত ধীরে চলে কেন রে! কি ক'রে শীগ্‌গীর যাব। গিয়ে কি দেখব? চালাও ট্রেন, জোরে চালাও! ট্রেনের মধ্যে ওমর আলী অস্থির পদে বেড়াইতেছিল!

"দাও খোদা! আমার সর্ব্বস্বধন ফিরিয়ে দাও! আমার ইহ-পরকালের বিনিময়ে বুহুকে বাঁচাও! আমার আয়ু নিয়ে বুহুর জীবন ভিক্ষা দাও। আমি অন্তিম শয্যায় পড়িয়া দেখি, আমার বাচ্চা দু'টী হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। এই আমার শেষ ভিক্ষা খোদা! এই আমার শেষ ভিক্ষা!"

ওমর বাড়ী প্রবেশ করিতেই আয়শা তাহার পদ-তলে লুটাইয়া পড়িল! "ওগো! তুমি আমায় ক্ষমা কর! তুমি বুহুকে আশীর্ব্বাদ কর। তা হ'লেই বুহু বাঁচবে গো বাঁচবে!"

"মা! মা! মা আমার!" পিতার এই ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর আসিল ক্ষীণ—ক্ষীণতম সুর যেন স্বপ্নের ত্রিদিব গীতি—বাবা! তার পর? তার পর বেহেশতের বুল্‌বুল্‌ বেহেশ্‌তী বাগিচার দিকে উড়িল! ঘরের বাতি নিবিল! সীমাহীন অন্ধকারে দুনিয়া ডুবাইয়া জীবন সূর্য্য অস্ত গেল! প্রলয়-হাহারবে আকাশ পাতাল কাঁপিয়া উঠিল। জমিদার সাহেব ধুলায় লুটাইয়া বালকের মতই কাঁদিলেন। জমিদার-পত্নী পিরী বানু বেগমের বুক-ফাটা ক্রন্দনে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল! অনুতপ্তা পাগলিনী সুফিয়া আলমগীরকে বক্ষে চাপিয়া রহিল! উন্মত্ত পিতা বুঝি সত্যই উন্মত্ত হইল! আর সর্ব্বস্ব-হারা মাতা বুহু-হীন বুহুকে বক্ষে চাপিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাতে বুহু ফিরাইয়া আনিতে চাহিল! দুনিয়ার প্রতি ধুলিকণা হইতে জগতের প্রতি মানবের বক্ষ হইতে যেন একই ধ্বনি উঠিতেছিল! ওরে অনাদৃতা! ফিরে আয়! প্রাণ দিয়া আদর করিব রে ফিরে আয়! ফিরে আয় আদর-ভিখারিণি!

কেবল অটল আসনে বসিয়া অটল হৃদয়ে অটল বিচারক পাপিষ্ঠা আয়শার মহাপাপের মহাদন্ড অটল চোখেই চাহিয়া দেখিল। জীবনে সে এক দিন পবিত্র কোর্‌আন লইয়া ছেলে-খেলা করিয়াছিল, তাই আজ তাহার কোর্‌-আন-পাঠও ব্যর্থ হইল!

১৭

এতদিন পরে একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া নূর আলম গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি এখন কলিকাতার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। পত্নী শিরি বেগম হাতের বই রাখিয়া জিজ্ঞাসিলেন "মুখখানি অত মলিন কেন ?" বিমর্ষ স্বরে স্বামী বলিল "আয়শার খুব অসুখ। টেলীগ্রাম পেলাম !" ছল ছল চোখে শিরি বলিল "সে তো আজ ক মাস হতেই। রহিমা ত তাঁর সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে। তা তাঁরা ডাক্তার কবরেজ দেখাচ্ছে না ?"

"দেখাচ্ছে বই কি ? অনুতপ্ত শ্বশুর খুবই করছে এখন। কিছু হচ্ছে না। ডাক্তার বলছেন হাওয়া পরিবর্তন করতে। বড় ভাই সাহেব লিখ্ছিলেন এলাহাবাদ যেতে। তিনি ত এখন ছুটিতে যশোর আছেন, আমায় লিখ্ছেন আশুকে নিয়ে যশোর যেতে। আমি দুলা মিঞাকে লিখেছিলাম আশুকে নিয়া এখানে আস্তে। তা হলে আমাদের কাল যাওয়া হয় না। কাল যদি ওরা এসে পৌঁছে, পরশু আমরা যশোর রওনা হব।"

"আহা চিরদুঃখিনী ! তোমরা ত ওর সংবাদও নাও না কখনো। কি হৃদয়হীন পুরুষ তোমরা ?"

"সংবাদ যে নেইনা শিরি ! তাকি তুমি বুঝবে ! কত স্নেহের ধন ছিল ও ! বাবা ওর যা কল্লেন ! আমাদের সকলের মিনতি দুপায়ে দল্লে। ও যে পৃথিবীতে বেঁচে আছে এ চিন্তাও ত করিনে আমরা। আমাদের চোখেত ও মৃতই। তবে এই দুঃসময়ে ত মন স্থির রাখতে পারছি না ! যাক কালই হয়ত আস্বে তারা পরশুই আমরা রওনা হব !" ডেপুটি সাহেবের চোখের জল বাধ মানিল না, স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া শিরিও বড় কাঁদিল। অল্প দিন হয় তাহারও একটি ছেলে মারা গেছে। শিশির-সিক্ত গোলাপের মত অশ্রুস্নাত মুখখানি চুম্বন করিয়া নূর আলম বাহিরে গেলেন।

পরদিন স্বামীর সঙ্গে আয়শা আসিল। সকলে একত্রে যশোর রওনা হইল। সেখানে সস্ত্রীক সফিকল আলম ছিল।

১৮

## পিতৃগৃহে

আজ তিনদিন হয় আয়শা পিতৃ গৃহে আসিয়াছে। পিতা ভ্রাতা তাহাকে অসীম স্নেহে সব ভুলাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু আয়শার সে স্নেহ কাঁটার মতই বুকে বিঁধিতেছিল, আহা ! বুহু যে এর কণামাত্রও পায় নাই। বুহুহীন দেহে যত্নের সার্থকতা কোথায় ? মৃতদেহে এ যত্ন বিদ্রুপ বই নয় ! বুহুর যত্নের অভাবেই দেহ ছেড়েছে ! যত্ন সে অনুতপ্ত শাশুড়ী ননদের কাছে খুব পাইয়াছিল ! কিন্তু তাহার ভাঙ্গা-প্রাণ জোড়া লাগে নাই। যে শাশুড়ীর এতটুকু স্নেহে সে ধন্য হইত, যে সুফিয়ার হাত মুখ দেখিলে সুপ্রভাত মনে করিত ! সেই শাশুড়ীর অজস্র যত্নে, সুফিয়ার অকপট বন্ধুত্বে হতভাগিনী বুহুহীন দেহে এতটুকু সাড়া জাগিল না। বুহু সত্যই যেন তার বুহু ছিল না ! সে এখন সত্যই বুহু হীনা।

সেলিমা ও আলমগীর মামা বাড়ী আসিয়া খেলার সাথী পাইল অনেক। আয়শাও প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করিল। দুই ভ্রাতৃবধু শিরি ও রৌশনার বেশ মিল হইল, কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন!

আয়শা বারান্দায় বসিয়া শিশুদের খেলা দেখিতেছিল, সহসা পিয়ন হাঁকিল "চিঠি"। আলমগীর ছুটিয়া গিয়া একখানা পোস্ট কার্ড লইয়া আসিল। লতিফ সাহেবের চিঠি, আয়শা অনিচ্ছা সত্তেও চাহিয়া দেখিল দুইটি লাইন।

"আদাব পর সমাচার এই, বিশেষ কাজ থাকাতে আমি আসিতে পারিতেছি না। খোদার ফজলে বৃহস্পতি বারে নিশ্চয়ই খেদমতে হাজির হইব!

বিনীত
আনোয়ার হোসেন।

পত্র পড়িয়া আয়শার মুখে কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। প্রাণেও কোন সাড়া জাগিল না। এ সেই আনোয়ার! যাহার চরণ ধ্বনিও কানে মধু বর্ষণ করিয়াছিল একদিন। যৌবন কি মায়াময়! কল্পনা কি কুহকিনী!! দুনিয়া কি ছদ্মবেশিনী। বৃহস্পতিবারে সত্যই আনোয়ার হোসেন আসিলেন। তিনি ভাসুর বলিয়া নূরুর বউরা তাঁহাকে দেখা দেয় না। সুতরাং তিনি বাহিরেই রহিলেন।

বহুদিন পর লতিফ সাহেবের গৃহ পুত্র বধুদের সহাস্য ছবিতে শোভাময় ও নাতি পুতিদের কলরবে মুখরিত হইল। লতিফ সাহেব ও তাহার পত্নী উভয়েই তখন শয্যাগত। তাই তিনি ছেলে মেয়েদের একত্র দেখিতে চাহিয়াছেন। আগামী কল্য আমেনাও আসিবে। কিন্তু দুইদিন থাকিয়াই সকলে বিদায় নিবে। আয়শা ত্বরিত হস্তে পিতা মাতার সেবার ভার তুলিয়া লইল। শিরি ও রৌশনা শাশুড়ীর ভগ্ন সংসার গুছাইতে বসিল।

## ১৯
## জীবন সন্ধ্যায়

কাল আমেনা আসিবে, বারান্দায় সকলে বসিয়া সেই আলাপই হইতেছিল। আয়শা বলিল "রাঙা ভাইকে ত দেখলাম না মেজভাই!"

সত্যই আয়শা এ দুইদিনের মধ্যে আনোয়ারকে দেখে নাই। কারণ তিনি বাইরেই থাকিতেন। কি একটা কাজে তিনি এসেছিলেন লতিফ সাহেবের কাজেই। যদিও আয়শার মনে এখন কোনই বিকার নাই, তথাপি সাধ হইয়াছিল একবার দেখিবার! মরণের পূর্ব্বে যদি বিধাতা একবার দেখবার সুযোগ দিলেনই দোষ কি তায়? চোখের দেখাই ত! জীবনের উষায় যাহার আঁখির কিরণে সে বিশ্ব স্বর্ণময় দেখিয়াছিল! যাহাকে হারাইয়াই জগৎ সাহারায় পরিণত হইয়াছে, এই অকাল সন্ধ্যায় বৈশাখী

তুফানে বৃন্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে না হয় ইন্দ্র ধনুর চকিতে একটু দেখিয়া লইবে, পাপ কি তাতে! অলক্ষে দেখিবার সাধই হইয়াছিল; কি ভাবিয়া নূরুকে বলিল "তাঁকে ত দেখলাম না মেজভাই!" সফিকের আহ্বানে আনোয়ার আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। সফিকদেরও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আয়শা চোখ তুলিয়া চাহিল, চারিবক্ষে মিলন হইল। আনোয়ার চোখ ফিরাইলেন, আয়শার বক্ষ উদ্বেলিত হইল তাহার সাহারার মতই চির তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি বার বার সেই বাঞ্ছিত মুখখানির উপর নিপতিত হইল কিন্তু আনোয়ার আর একবারও চোখ তুলিল না। নীরবে আয়শা সেখান হইতে সরিয়া গেল এবং বুকের ঝটিকা নিবারণ করিতে আলমগীরদের খুঁজিল কিন্তু পাইল না। তারা পিতার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে।

কি কথার উত্তরে সফিককে লক্ষ্য করিয়া আনোয়ার বলিলেন—"ধ্যানে অর্দ্ধপতন ত! তোমার এখন সেই অবস্থা!"

এখানে আসিয়া অবধি পত্নীর সঙ্গে বিশেষ আলাপ করতে পারে নাই সফিক, হয়ত সেই জন্যই বলিলেন। সবাই হাসিল। আয়েশা অন্তরাল হইতে সেই অতুল সুন্দর মুখখানির দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরই আনোয়ার হোসেন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আয়েশা ছেলেমেয়ের খেলা দেখিতেছিল এবং মনে মনে গতকল্যকার ব্যাপারের আলোচনা করিয়া নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইতেছিল। আনোয়ার হোসেন তার কে? কেউ নয়। তিনি রহিমুনেসার স্বামী, প্রিয়তম! সর্ব্বস্ব! রাবেয়ার বাবা। আর সে রহিমাদের মা! কই মনে ত তার কোন পাপ কামনা নেই, জীবন তার রহিমাময়। রহিমাদের পিতাই তার সব। স্বামী প্রিয়জনে তা হক না সে অত্যাচারী হোক না সে বুগ্ন, সে যে রহিমার জনক। আনোয়ারের আবার যদি দেখা হয় সে বেশ বোনের মত ব্যবহার করবে। সেলাম করবে, ছিঃ ছিঃ তিনি না ভাই! ভাইয়ের মতই দেখবে তাকে! অকম্পিত বক্ষে তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর কুশল জিজ্ঞাসা করবে। কল্পনার স্বপ্ন যখন কল্পনায়ই বিলীন হইল, তখন আর কেন?

তার চাচাতো ভ্রাতা হাসেমকে যাইতে দেখিয়া আয়েশা তাহাকে ডাকিল। এই ছেলেটি আয়েশার সম বয়সী। আশৈশব তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

"হাসেম!"

"কেন?"

"কোথায় রে উনি!"

"রাঙ্গা ভাই? ওহিদদের বাড়ী গেছেন। ডাকব কি তাঁকে একবার? তিনি যাবেন যে।"

আয়েশা চকিতে মাথা তুলিল; "কবে যাবেন, কোথায় যাবেন, ঢাকা না বাড়ী?"

"বোধ হয় ঢাকাই, ডাকব তাহলে?"

"ডাকিস। কিন্তু তিনি কি আসবেন?"

"কেন আসবেন না ?"

"তিনি যে আমায় ঘৃণা করেন ! মনে পড়ে চার বছর আগের কথা ! কি কাজে যশোর এসে আমায় দেখেই ছুটে পালিয়েছিলেন !"

"দূর পাগল ! কিন্তু আমি বলি আর কেন। আপনি এখন জমিদার বধু ! এ বাড়ীর সকলই দেখছেন আপনাকে কি সম্মান করে। আপাদ মস্তক স্বর্ণালাঙ্কারে আপনি সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন ! আপনার মনোভাব ঘুণ পরিমান কেউ সন্দেহ করলে কি আর মান থাকবে ?"

আয়শার আঁখির জলে বক্ষ ভিজিয়া গেল। আর্ত্তস্বরে সে বলিল !

"কি বুঝ্‌বে তুমি হাসেম আমি যদি দুনিয়ার রানী হতুম। আর সেই রানীত্বের বিনিময়ে যদি আনোয়ার হোসেনের স্ত্রীর দাসীত্ব টুকু পেতুম, তাই যে আমি হাসিমুখে বরণ করে নিতুম রে পাগল ! তাঁর স্ত্রীর সেবার অধিকার পেলেও দিনান্তে তাঁকে একবার তাঁকে দেখতে পেতুম, তাতেই আমার জীবন সার্থক হত, ধন্য হত। যাক সে কথা। তুই একবার বলিস, আশু আপনাকে শেষ সেলাম দিতে চায় ! তাঁর ইচ্ছা হলে আসবেন ইচ্ছা না হলে না আসবেন।"

সন্ধ্যার পর ওমর আলী সারাদিন তাহাকে অন্দরে ডাকা হয়ে নাই কেন' সগর্জ্জনে তার কৈফিয়ত চাহিতেছিল, আর আয়শা সময়ের অভাব জানাইতে ছিল। অনেকক্ষণ তর্কের পর, ওমর যখন পদাঘাতে স্ত্রীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায় তখন মুহূর্তের তরে আয়শার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র ! পরক্ষণেই রহিমার মুমুর্ষ-ছবি তাহার বুকে জাগিয়া উঠিল, এযে রহিমার জনক ! আলমগীর ও সেলিমা যে এখনো তার বুকে ! তারাও ত ইহারই। আয়শা ত্বরিতে উঠিয়া আলমগীরকে বক্ষে তুলিয়া লইল এবং স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল "সত্যই আমি বাবার কাছে ছিলাম সময় পাই নি, আমায় মাফ কর।"

এমনি সময়ে দেউড়ী হইতে সফিক ডাকিয়া কহিল "আশু ! রাঙ্গাভাইকে ডেকেছিলি, তিনি এখন যাচ্ছেন, আসবেন কি ?"—"আসুন ! আসতে বল।" আয়শা মাথার ও গায়ের কাপড় সংযত করিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন তপনের মতই প্রতিভা-দীপ্ত যুবক আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু আজ সে চরণধ্বনি আয়শার মরা প্রাণ জাগাইতে পারিল না। সে নত হইয়া সেলাম করিয়া বলিল "বসুন" স্বামীর দিকে ফিরিয়া তাহাকেও বসিতে বলিল। আনোয়ারও বলিলেন "বসুন দুলামিঞা।" ওমরের কিন্তু তখনো রাগ যায় নাই, সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পাছে ইহাঁরই সম্মুখে অপমান হইতে পায়, ভাবিয়া আয়শাও কিছু বলিল না। আনোয়ার বসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল বহুদিন পর প্রায় বারো বছর ! একযুগ ! নয় ?"

আয়শা মনে মনে বলিল "মোটে একযুগ, আমার কাছে যে সহস্র যুগ মনে হয়।" প্রকাশ্যে বলিল, "হ্যাঃ মধ্যে একবার এসেছিলেন না ? বুবু হওয়ার আগে ?"

"এসেছিলাম ! কিন্তু ছিলাম না বেশীক্ষণ—মিনিট দুই।"

আয়শার কণ্ঠে প্রশ্ন জাগিল—কেন ছিলেন মিনিট দুই ? কি বাধা ছিল থাকবার ? দুই মিনিট থাকতেই কি এসেছিলেন ; তা কি কেউ আসে ? না। তবে ? কেনই বা এসেই অমন ভুজঙ্গভীত পথিকের মত ছুটে পালিয়েছিলেন ? এই ভুজঙ্গিনীকে দেখেই কি ? ঠিক ! ঠিক ! আয়েষার সারাবক্ষ উদ্বেলিত করিয়া সেই ঝটিকা বিক্ষুব্ধা প্রলয়নিশি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে নীরবই রহিল, কোন কথাই অধরের বাহির হইতে দিল না ! শুধু বলিল "রিজিয়া" আপার ছেলেপিলে কি ?"

"চারিটি।"

"আর আপনার—রাবেয়ার ভাইবোন কি ?"

"তুমি কি করে চিন্‌লে রাবেয়াকে ?"

আয়শার মুখে আসিল ইচ্ছা থাকলেই জানা যায়। কিন্তু সে শুধু বলিল—

"হাফেজের কাছে শুনেছি"

"হাফেজের কাছে"

"হ্যাঁ ! ওরা ক ভাই বোন ?"

আনোয়ার বলিল "রাবেয়ার মাত্র দুই বোনই।"

"রাবেয়ার ছোট বোনের নাম কি ?"

মৃদুস্বরে আনোয়ার বলিলেন "রোকেয়া !"

ঈষৎ হাসিয়া সঙ্কোচ জড়িত কণ্ঠে আয়শা বলিল "আপনি নাকি আবার বিয়ে করবেন ?"

"না সে সব কিছু না।" আয়ত কালো চোক দুটি আয়শার মুখের উপর স্থির করিয়া আনোয়ার পুনরায় বলিল, "আমার বিয়েতে কি তুমি খুব নারাজ ?"

আয়শার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ ছুটিল—এক প্রশ্ন ? ইনি অন্তর্য্যামী ? না মন পরীক্ষক ! একবার ইচ্ছা হইল, বলে আমার মতামতের মূল্য কি ? সসঙ্কোচে বলিল "আমার মত দিবার ক্ষমতা কি ?

আনোয়ার শুধু হাসিলেন। সে হাসি কত সুন্দর।

আয়শাদের আজ বেড়াইতে যাবার কথা ছিল। ও বাড়ীর হাবিব গাড়ী লইয়া আসিয়া তাগাদা আরম্ভ করিল। আয়শা বিরক্ত হইল আজ কি বেড়াতে না গেলেই নয় ? এই যে দুর্লভ মুহূর্ত্তটির চিরপ্রার্থিত সময়টুকু ! এ তার গত জীবনে আসে নাই, বাকি জীবনে আসিবে না। সারা জীবনে সে এই একটী মুহূর্ত্ত পাইয়াছে। তাহাতেও এত বিঘ্ন ! রৌশনা আসিয়া বলিল "কই ছোট বিবি ! শিগ্‌গির আয় ভাই !" আনোয়ার উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; আয়শা 'কদমবুছি' করিল। একবার ইচ্ছা হইল আজ থাকিতে বলে, মনে হইল কি অধিকার তার ! হয়ত আনোয়ার বিরক্ত হইবেন। কিন্তু আনোয়ার হোসেনের সেদিন কার্য্যগতিকেই যাওয়া হইল না।

আনোয়ারের পশ্চাতে আয়শাও উঠানে পরিপূর্ণ জোছনা ধারার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এই আলোতে সে একবার তার হৃদয়ালোককে মন ভরিয়া দেখিয়া লইবে। এই ছিল তার সাধ !

নির্ম্মল নীলাকাশে শীতের শশী হাসিতেছিল। মাঘের শেষ। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কুয়াসা মিশিয়া পৃথিবীকে স্বপ্নময়ী করিয়াছিল সেই স্বপ্নালোকে দাঁড়াইয়া আয়শার চোখ ও মন স্বপ্ন দেখিতেছিল। চারিদিকে জ্যোৎস্নার ঢেউ বহিতেছিল, সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া মুর্ত্তিমধ্যে জ্যোৎস্নার মতই যুবক আনোয়ার হোসেন, নীল সমুদ্রের মত তার চোক দুটি আয়শার মুখের উপর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন আর আয়শা সেই নীলসাগরে ডুবিয়া মরিতে চাহিতেছিল। সুন্দর! কত সুন্দর! সুন্দর ওই নীলাকাশ! সুন্দর! ওই সুধাকরের সুধা হাসি! সুন্দর এই প্রথম মলয়। সুন্দর এই জোছনা স্নাত দুনিয়া! আর সব চেয়ে সুন্দর ওই দুটি নীল আঁখি!!

কি আছে ওই নীল অতলে? কি সে রহস্য, কেন উহাতে ডুবিয়া মরিয়া জীবন ধন্য হতে চায়? ওগো ফিরাও! যাদুকর! তোমার ওই নীল আগ্নেয়াস্ত্র। বিশুষ্ক লতাকে দগ্ধ বনভূমিকে মরণ পথের যাত্রীকে আর মারিয়া লাভ কি?

মরণ! এস! এস। আজ এই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে এস বন্ধু! আজই আমি যেতে চাই! ইহার পর আর আমায় দেখাইও না। হে আমার চির প্রিয়তম বন্ধু! এস আজ! এস এখনি! ওই নীল আঁখি দুটির পানে চাহিয়াই আমার চাওয়া শেষ হউক! এই আমার জীবনের শেষ সময় হোক! এস বন্ধু! এস সখা!

স্বপ্ন যাহা, তাহা স্বপ্নই, তেমনি সুন্দর তেমনি মিথ্যা! তেমনি ক্ষণস্থায়ী!

বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্নের সৌন্দর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল! হাবিব বলিল "গাড়ী তৈয়ার! আর কত দেরী?"

আয়শা বেড়াইতে গেল। কিন্তু তাহার আজিকার চিন্তাচ্ছন্ন অবস্থা সকলের চোখেই ধরা পড়িল। সুচতুরা শিরি শুধু মৃদু হাসিল।

## ২০

পরদিন আমেনা আসিল। আয়শা সারাদিন সময় পাইল না। আজ সন্ধ্যায় আনোয়ার হোসেন যাবেন। সমস্ত সঙ্কোচ সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে হাসেমকে বলিল "রাঙ্গা ভাই যেন দেখা করে যায়!" শিরির রক্ত অধরে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল—"দেখিস লো! কাল তো বেহোঁস হয়েছিল। আজ একেবারে হার্ট-ফেল করবি!" আয়শা উত্তর করিল না। আনোয়ার হোসেন আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। নূরু বলিল—"কি বলবি তাড়াতাড়ী বলে নে সময় নেই মোটেই।" এই সময় আয়ষা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহার শরীর অসুস্থ। আনোয়ার তাহার কুশল প্রশ্ন করিলেন। দুই মিনিট তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া আয়শা প্রণত হইয়া বলিল "জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি আমি সকলের কাছেই।"

নূরু বলিল—"পাগলের পাগলামী শুনবেন না রাঙ্গাভাই!" আয়শা সজল নয়ন দুটি বারেক তুলিয়াই নামাইল। ম্লান হাসিয়া আনোয়ার বলিলেন "মক্কা যাওয়ার সময়েও লোকে জন্মের মত বিদায় চেয়ে যায়।" কিন্তু তাহার চাপা দীর্ঘশ্বাস

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুখের হাসিটুকুকে একেবারেই ব্যর্থ করিয়া দিল। সকলের কান এড়াইলেও আয়শার কান ও প্রাণ কিছুই এড়াইল না। আনোয়ার চলিয়া গেলেন।

আয়শা ডাকিয়া বলিল, "ভাবি সাহেবাকে চিঠি লিখতে বলবেন।" দেউড়ী হইতে আনোয়ারের সবিদ্রুপ উষ্ণ হাসি আয়শার মর্ম্মে আঘাত করিয়া আকাশে উঠিল!

* * *

"বিদায়! হে মাতঃ জন্মভূমি! বিদায় মা! বিদায়! মা! বিদায়! চিরতরে বিদায় দাও মা! আর কখনো আস্‌বার ইচ্ছা নেই মা! কাঁদিয়া তোমার কোলে এসেছিলাম আজ কাঁদিয়াই বিদায় নিতেছি মা! হেসে যাওয়ার ভাগ্যও আমার হল না। তোমার জল বায়ুতে এ দেহ তৈরী হয়েছিল। তোমারি ক্ষেতের শস্য নদীর জলে আজ আমি আয়শা। তোমারই ওই নবীন তৃণক্ষেত্রের সবুজ শোভায় এ জীবন আরম্ভ হয়েছিল মা! আজ তাহা নিদাঘ তাপিত তৃণহীন মাঠেই পরিণত হয়েছে মা! যে জীবন তোমার প্রভাত তপনের প্রাণভরা হাসির গোলাপী আলোকের সঙ্গেই হাসিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা সাহারা! গ্রামের পাশ দিয়া ওই যে নদী বহিয়া যাইতেছে, মনে পড়ে আজ, উহারই তীরে তীরে কত আনন্দের খেলা, কত ছুটাছুটি! কারণহীন কত উষ্ণ হাসি, তেমনি অকারণ রোদন! তোমার আকাশে-বাতাসে আজো বুঝি তার প্রতিধ্বনির রেশ আছে মা! আর যে আশার রক্ত রাগে তোমার রক্তিম বাসনা ঊষার মত এ হৃদয়ে অতুল শোভা ছড়িয়েছিল, অকাল জলদের ঘন আঁধারে কে তাহা চিরতরে ঢেকে দিল মা! তোমার সেই লাজ লোহিতা ঊষাকে, বজ্র-বক্ষ কাদম্বিনীতে কে পরিবর্ত্তন করিল মা! এ ক্ষুদ্র বুকের কত উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত সাগরের মতই তোমার পূর্ণিমার হাসির সঙ্গে আজো বুঝি মিশে আছে। আবার কত হৃদয় ফাটা অশ্রুধারা তোমার বর্ষাধারায় মিশে আছে . . .। মা আমার! জননি! জন্মভূমি! কিছুই মনে থাকিবেনা তার? জীব জন্তু কেহ কবে কখনো কি কোন রবে ভুলে অভাগীর নাম কণ্ঠেতে আনিবে না!"

আজ বিদায় দাও! হে স্নেহস্নিগ্ধ নীলাকাশ! জ্বালা-জুড়ানো প্রীতি-পরশ বাতাস! প্রণয়লাজরক্তা ঊষা সখি! অসীম সুন্দর জন্মভূমির পূর্ণচন্দ্র! প্রভাত রবি! তরুলতা! বনমর্ম্মর! জন্মভূমির কোকিল রাণি! আজ বিদায় দাও! বিদায়! বিদায়!! বিদায়!!

মা মৃন্ময়ি! তোমার কোলে কত আয়শা আসিয়াছে—গিয়াছে। আরো কত আসিবে যাইবে। তুমি ত মা সর্ব্বংসহা! তবে তোমার বক্ষে-পুষ্ট এ হৃদয় ফেটে যেতে চায় কেন মা!

আর মা গর্ভধারিনি! জননি! আয়শার বক্ষ জলে ভাসিয়া গেল কত চেষ্টা করলাম একটি বার তোমার গোর দেখতে, পারলাম না মা! পরাধীনা অভাগিনী বঙ্গনারী আমি! উদ্দেশ্যে সালাম লও মা! তোমার গর্ভের কলঙ্ক এ হতভাগিনীকে চির জীবন বিষজ্বালা বক্ষে বহন করিয়া বেড়াইতেই কি গর্ভে ধরেছিলে মা আমার! আর হতভাগিনীর সেই মরণাধিক যাতনা-চক্ষে দেখিতে পারিবেনা বলেই কি অকালে মরণ বরণ করেছে জননি! যে মাটিতে তোমার পূত অঙ্গ মিশে আছে মা সে পবিত্র

ধূলিতে এ দেহ মিশাইতে পারলাম না মা! আমার "রুহু" যে এখানে নেই। যেখানে "রুহু" সেখানেই যেন দেহও থাকে মা! এই দোয়া কর মা! বিদায় দাও মা শস্য শ্যামলা জন্মভূমি! স্নেহশীতলা জননি বিদায়!!

পরদিন সকালেই আয়শা ভ্রাতৃবধু রৌশনারা সহিত এলাহাবাদ যাত্রা করিল।

*নওরোজ*, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

## "নিয়ন্ত্রিতা"

### আংশিক

### আবুল ফজল বি.এ.

অধুনালুপ্ত 'নওরোজে'র পৃষ্ঠায় এ লেখাটী যখন প্রথম পড়ি তখন মনে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল যে, যে-নামের আড়ালে লেখাটী বাহির হইতেছে তাহা নিশ্চয় কোন শক্তিশালী লেখকের ছদ্মনাম। পরে জানিতে পারিলাম ইহার লেখিকা সেলিমা বেগম ওরফে আখতার মহল সৈয়দা খাতুন নাম্নী কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, কিন্তু শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম তিনি আজ পরলোকে।

নিয়ন্ত্রিতা ছোট উপন্যাস, বড় গল্প বলিলেও বলা যাইতে পারে। আধুনিক মুসলমান কথা-সাহিত্যে এই রকম লেখা খুব কম আছে, পড়িয়া মনে হইল মানুষের বেদনার অনুভূতি চিরন্তন, চির-নূতন। পশ্চিমের আলোপথচারী কবির কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. নিয়ন্ত্রিতা আগাগোড়া একটী বেদনার ইতিহাস; কয়েকটী নরনারীর বেদনা-দগ্ধ অন্তরের যে প্রতিচ্ছবি অপূর্ব্ব সাবলীল ও শক্তিমান ভাষা লইয়া ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। এই বেদনার ইতিহাস পাঠককে বিস্মিত করে না, তাহার অন্তর ভাঙিয়া চৌচির করিয়া দিয়া যায়; এই বই শেষ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঙা অন্তর জোড়া লাগে না, তাহাকে গুছাইয়া ঠিক করিয়া লইতে আরও বহু দেরী লাগে। লেখিকা যে পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মুসলমান পাঠকের পরিচিত, তাঁহাদেরই চতুর্দ্দিকের প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহ-প্রাঙ্গন, নায়ক নায়িকা তাঁহাদেরই অতি-পরিচিত মানব মানবী। লেখিকা অশ্রু ছল ছল চোখে যে বেদনার ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; অপরের বেদনা এমন করিয়া নিজের মধ্যে মূর্ত্তি লইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অথচ তাঁহাকে বেদনাময়ী 'নিয়ন্ত্রিতা' ভাবিতে ততোধিক কষ্ট হয়। যাহাই হউক, 'নিয়ন্ত্রিতা' আয়শা মুসলমান সমাজে অসংখ্য, তাহাদের লাঞ্ছিত দুঃখ-বেদনার জীবন লেখিকার ভিতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ইহা খেয়ালী বেদনা না হইয়া, মানুষের জীবনের বেদনা হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাই সাহিত্যের লাভ।

এই লেখাটীর ভাষা শক্তিমান, এত শক্তিমান ভাষা অন্য কোন মুসলমান লেখিকার মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না—বর্ণনা-ভঙ্গী চমৎকার ও বেগবান, ঘটনার পরিকল্পনা সুন্দর গতি-মুখর, পাঠককে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া যাইতে হয় ; আগাগোড়া একটী অপূর্ব্ব intensity আছে। ভাব, কল্পনা, সুষ্ঠু মার্জ্জিত, অস্বাভাবিকতা কোথায়ও নাই। সর্ব্বোপরি লেখাটীর আগাগোড়া একটা গভীর আন্তরিকতা বিদ্যমান। মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের নরনারী যেই রকম, ঘটনা ও চরিত্রগুলিতে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্থানে স্থানে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের যে বিকাশ পাইয়াছে তাহাও বেঠিক হয় নাই।

মুসলমানদের কথা-সাহিত্য সৃষ্টির অনেক অসুবিধা আছে। সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা অবরোধ প্রথা, এই অবরোধ প্রথা বর্ত্তমানে মুসলমানের দ্বারা কথা-সাহিত্যে কোন বড় সৃষ্টি সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। নর নারীর জীবনই কথা-সাহিত্যের ভিত্তি—মুসলমান লেখক লেখিকাদের পক্ষে পরস্পরের জীবন জানিবার কোন উপায় নাই, প্রাচীরের গায়ে আঘাত পাইয়া তাঁহাদের চোখ ফিরিয়া আসে। তাই মুসলমান সাহিত্যে অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার জন্য লেখক নয় সমাজের প্রচলিত রীতিই দায়ী। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে প্রেম বা পূর্ব্বরাগ যদি হইয়া থাকে তাহা আত্মীয় পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন খুড়তুতো, জেঠ্‌তুতো পিসতুতো, মামাতো ইত্যাদি বা অন্য রকম সম্পর্কে ভাই বোনেদের মধ্যে প্রেম বা পূর্ব্বরাগ সম্ভব ; অনেক পরিবারে অবরোধ এত কঠোর যে তাহাও অসম্ভব, আর love at first sight জিনিষটা দুনিয়াতে ক্বচিৎ ঘটে, কাজেই যেই সমস্ত লেখক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মেয়েদের লইয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে প্রেম করান তাহার নাম দুঃসাহসিকতা ছাড়া আর কি দেওয়া যায় ! নিয়ন্ত্রিতার লেখিকা এই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন নাই—তাঁহার plot একই পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কাজেই কোন একটী ঘটনা বা চরিত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। . . .

লেখাটী গল্প নয়, অন্ততঃ পড়িয়া মনে হয় না—আগা গোড়া একটী বেদনাময় জীবনের ইতিহাস ; বড় করুণ মর্ম্মন্তুদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

লেখিকা আজ পরলোকে, সাহিত্যের ক্ষুদ্র পাঠক এ আলোচনায় আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করিল।

*সওগাত*, চৈত্র ১৩৩৫

তথ্যসূত্র

১. দ্র. আফসারুন্নেছা, 'লেখিকা পরিচিতি', *নিয়ন্ত্রিতা*, (ঢাকা : রায়হান বেগম, ১৯৭৯), পৃ. ছ

২. 'নিয়ন্ত্রিতা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সেলিমা বেগম'-এর ছদ্মনামে, ১৩৩৪ সালে, মাসিক *নওরোজ* পত্রিকায়, কবি নজরুল ইসলামের উদ্যোগে। *সওগাত* পত্রিকায় ১৩৩৬ সালে 'মরণ বরণ' উপন্যাসটি যখন ছাপা হয়, তার কিছুদিন আগেই লেখিকার মৃত্যু হয়েছে। এই দ্বিতীয় উপন্যাসটি অবশ্য আখতার মহলের নিজের নামেই ছাপা হয়।
৩. আফসারুন্নেছা, পূর্বোক্ত, পৃ. ছ
৪. আবুল ফজল, 'নিয়ন্ত্রিতা', সওগাত, চৈত্র ১৩৩৫। দ্র. এই সংকলন, পৃ. ১৫৬
৫. ঐ
৬. 'নিয়ন্ত্রিতা' উপন্যাস, ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ, এই সংকলন, পৃ. ১৩৫
৭. ঐ, ১ নম্বর অনুচ্ছেদ, এই সংকলন, পৃ. ১১৯
৮. 'মরণ বরণ', *নিয়ন্ত্রিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩
৯. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫), পৃ. ৬০৪
১০. 'মরণ বরণ', *নিয়ন্ত্রিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

# উচ্চাভিলাষী ফজিলতুন নেসা
## ১৯০৫-১৯৭৫

কেবলমাত্র দুটো প্রবন্ধের ভিত্তিতে একজন লেখিকাকে একটি আলাদা অধ্যায়ে স্থান দেওয়া কেন—পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগাটা আশ্চর্যের নয়। বস্তুত, *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে (১৩৩৪, ১৩৩৬) ফজিলতুন নেসাকে ঠিক 'লেখিকা' বলা যায় কি না, এ নিয়েও সংশয় জাগতে পারে।[১] সম্ভবত, বলা যায় না। ফজিলতুন নেসা প্রবন্ধকার, কবি, গল্পকার—এসব কিছুই ছিলেন না, যদিও তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এই লেখার সূত্রে। লেখার বিষয় : *সওগাত*-এর এক মুক্তমনা নব্যশিক্ষিতা লেখিকার কাছ থেকে যেমন আশা করা যায়, ঠিক তেমনই। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বাংলাভাষা চর্চ্চার গুরুত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের অনেকেই এই স্ত্রীশিক্ষা এবং নিজেদের বাঙালি পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। 'সুশিক্ষিতা জননীর প্রভাব যেমন সমাজকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে নিতে সাহায্য করে, তেমনি অশিক্ষিতা জননীর প্রভাব সমাজকে পিছনের দিকে টেনে রাখে।'[২] ফজিলতুন নেসার এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা তাঁর সমসাময়িক অনেকের লেখায় শুনতে পাই। অথবা '[মুসলিম শিশুদের] ভাল করে বুঝতে হবে যে তাদের মাতৃভূমি আরব, পারস্য, তুরস্ক বা মিসর নয়। . . . তারা ভারতবাসী। জাতীয়ত্ব গড়ে ওঠে সমধর্ম্মের ভিত্তির উপর নয়, সমদেশিকতার ভিত্তির উপর।'[৩] লেখিকার কলমে ধার ছিল, কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর কথায় তেমন কোনও চমক বোধহয় ছিল না।

চমক ছিল অন্যত্র। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক বাঙালি মুসলমান নারীর নিজের হাতে নিজের জীবন গড়ে তোলা—চমক ছিল ফজিলতুন নেসার সেই নির্ভীক পদচারণে। বাঙালি মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম.এ. ফজিলতুন নেসা ১৯২৮ সালে যেদিন *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের অফিসে এসে তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাবার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন, সেদিন নাসিরুদ্দীন সাহেব তাঁর চোখে মুখে এক 'দুঃসাহসী সংকল্পের ছায়া' দেখেছিলেন। ফাজিলতুন নেসা বলেছিলেন, 'কত অপমান সহ্য করে আমি এম.এ. পর্যন্ত পাস করেছি, তা আপনি হয়ত শুনে থাকবেন। . . . আমার সংকল্প ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই।'[৪]

ফজিলতুন নেসার মধ্যে এই সংকল্পের বীজ সম্ভবত তাঁর বাবা বুনে দিয়েছিলেন। আবদুল ওয়াজেদ খান টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া জমিদার বাড়িতে সামান্য চাকরি করতেন। সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে কমল্লী নামদার গ্রামে ১৯০৫ সালে

ফজিলতুন নেসার জন্ম হয়, এবং তাঁর শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কাটে। তখনই মেয়ের তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে নিয়ে যান ঢাকা শহরে। তারপর ঐ সংকল্পের জোরে শহর থেকে আরও বড় শহর, দেশ থেকে বিদেশ, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় দারুণ ভল ফল, বিলেত থেকে ফিরে আসা, বেথুন কলেজে অঙ্কের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান, বেথুনের ভাইস প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হওয়া—ফজিলতুন নেসার জীবনের গল্প সমস্ত ধরনের অসামর্থ ও বাধা পেরিয়ে ক্রমাগত সফল হওয়া একজন নারীর জীবনের গল্প। বিভাগোত্তর বাংলায় ঢাকা শহরের ইডেন কলেজে ফজিলতুন নেসা যখন প্রিন্সিপাল হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন বাঙালি মুসলিম সমাজ 'মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' অনেকখানি উপলব্ধি করতে শিখেছে। এবং ব্যক্তিগত জীবনে ফজিলতুন নেসা 'মুক্তি'র স্বাদও পেয়েছেন।

'আমার মনে হয় যে-বন্দীখানায় মেয়েদিগকে জগতের আলো বাতাসের সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত করে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে—যা মুসলিম নারীর মনের দ্বারে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেটা একবার পুরুষের উপর চাপিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। সংসারে যত কিছু অত্যাচার ও পাপ কাজ হচ্ছে, তার জন্য শুধু নারী দায়ী—সে কথা বোধহয় কেউ বলবে না। তবে কোন কারণে নারী বন্দিনী হয়ে থাকবে ?'[৫]

ফজিলতুন নেসা নিজে যে অন্তত বন্দিনী হয়ে থাকবেন না, এ কথা তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন। বি.এ. পড়তে ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে যান, বেথুনের তিনিই প্রথম মুসলিম ছাত্রী, হস্টেলের একমাত্র মুসলিম বোর্ডার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসেও তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম ছাত্রী। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন লিখেছেন : 'তখন ঢাকা শহরের মুসলমান সমাজের মনোভাব নারীজাতি সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। কোনো মুসলমান মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেদের সাথে একত্রে ক্লাসে বসে লেখাপড়া করবে একথা তাদের কল্পনার অতীত ছিল। ফজিলতুন নেসা যখন বোরকা ছাড়া শাড়ি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তখন তাঁর প্রতি ইটপাটকেলও নিক্ষিপ্ত হতো ; কিন্তু তিনি বিচলিত না হয়ে নিজের কৃতিত্বে স্কলারশিপ পেয়ে এবং কঠোর পরিশ্রম করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।'[৬]

আমাদের মনে হয়েছে যে এই শতাব্দীর প্রথম চার দশকের সময়সীমায় ফজিলতুন নেসাকে হয়তো এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। তার কারণ, যে মূল দুটি বিষয় নিয়ে সেকালের বাঙালি মুসলমান সমাজে বিস্তর বিতর্ক চলছিল—অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষা এবং অবরোধ—ফজিলতুন নেসা সেই দুটি ক্ষেত্রেই, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করে গেছেন।

সহজে বিচলিত হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী, হয়ত প্রয়োজনে কিছুটা হিসেবী এবং আবেগশূন্যও। ফলে নজরুল হেন ব্যক্তিত্বের একনিষ্ঠ প্রেম নিবেদন তাঁকে আপ্লুত করেনি। অসহায় নজরুল তখন গান বেঁধেছিলেন : 'আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি।'[৭] তাঁর প্রতি কাজী মোতাহার হোসেনের প্রীতির আধিক্যকেও তিনি বিশেষ প্রশ্রয় দেননি। ১৯২৭-২৮ সালে তাঁর লক্ষ্য ছিল

স্থির—তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে যেতে হবে। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের একান্ত চেষ্টায় তা সম্ভব হয় এবং ১৯২৮-এ ফাজিলতুন নেসার বিলেত যাত্রা উপলক্ষ্যে নাসিরুদ্দীন সাহেব এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় ভগ্নহৃদয় নজরুল গেয়েছিলেন : 'থেকো না স্বর্গে ভুলে/এ পারের মর্ত্ত্য-কূলে/ভিড়ায়ো সোনার তরী/আবার এই নদীর বাঁকে ॥'[৮]

'স্বর্গ' থেকে ফিরে এসেছিলেন ফজিলতুন নেসা, কিন্তু তখন তিনি মিসেস ফজিলতুন নেসা জোহা, তদানীন্তন ডিরেক্টর অফ এডুকেশন খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ সাহেবের পুত্রবধূ। তাঁর স্বামী শামস-উজ জোহা বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন, সেখানেই উভয়ের পরিচয়, প্রেম। এক্ষেত্রেও ফজিলতুন নেসা নজির সৃষ্টি করলেন নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করে। কিন্তু বিলেত যাত্রার আগেকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিস ফজিলতুন নেসার সঙ্গে বিলেত ফেরত মিসেস ফজিলতুন নেসা জোহার বেশ দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল কি?

সদ্য স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে ফজিলতুন নেসা জোহা ইডেন গার্লস কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হিসাবে যোগদান করেন। স্লিভলেস ব্লাউজ পরা, জনসমক্ষে সিগারেট-মদ খাওয়া মিসেস জোহার ইমেজ ঠিক সাধারণ কলেজ শিক্ষিকার মতো ছিল না। সমাজ তাঁর এই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন 'সোশ্যাল লাইফ' মেনে নিতে পারেনি। তিনি নিজেও ঐ আধা-গ্রাম ঢাকা শহরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তারপর দেশে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের তিনি সপক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে এই নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কিন্তু এর পরই মিসেস জোহার চাকরিটি চলে যায় দুর্নীতির দায়ে। সত্যিই তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন কি না আমরা জানি না, এমনও হতে পারে যে তিনি একটি সময়ের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন।

সেসব প্রসঙ্গ আজ অবান্তর। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ বছর কেটে গেছে। কেউ কেউ এখনও তাঁর নিন্দা করে থাকেন, কেউ আবার তাঁকে মহিমান্বিত করেন। তাঁর এক সময়কার সহকর্মী আখতার ইমাম বলেন, 'কেউ কাউকে কিছু দেয় না, আপন যোগ্যতার বলে আদায় করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে ফজিলতুন নেসা এক অনুধাবনযোগ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'[৯]

আমরা আমাদের কাজের সূত্রে এই একজন মহিলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি যাঁর কাছে সমাজের বিধিনিষেধ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, যিনি নিজের গরজে, নিজের মতন করে, নিজের জীবন পরিচালনা করেছিলেন, বাঁধাধরা ভালমন্দের হিসেবে যাঁকে মাপা যায় না। তাই এই অধ্যায়ে আমরা একজন পথিকৃতের ছবি আঁকতে চেয়েছি—কুড়ির দশকের সেই অনবরুদ্ধ মেধাবী আধুনিকা ফজিলতুন নেসা। একটা সমাজ তো সব সময়ই তার পথিকৃতদের নিয়ে গর্ববোধ করে—একটা হয়ে-ওঠা সমাজ সেই পথিকৃতদের দিয়ে তার ইমেজ গড়ে তোলে। তাই হয়ত নাসিরুদ্দীন সাহেব আশির দশকে পৌঁছে তাঁর *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* লেখার সময় সমস্ত বির্তক এড়িয়ে

গিয়ে লিখেছিলেন: 'ফজিলতুন নেসা এম-এ'—ব্যাস এইটুকুই। এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট।

ম.ভ.
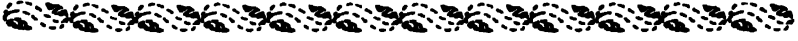
# মুস্‌লিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আজ আমি "আল্‌মামূন" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে আহূত হ'য়েছি। সমাজের উন্নতি কামনায় পুরুষ ও নারীর চিন্তাধারা মিলিত হ'য়ে যে কর্ম্মপ্রেরণা জাগায়, তার চেয়ে একান্ত কল্যাণকর বোধ হয় আর কিছু থাক্‌তে পারে না। এই মিলন সম্ভব হওয়ার পথে প্রথমেই প্রয়োজন—এই দুইটি বিভিন্ন ভাবধারার একটি নিবিড় পরিচয়ের। সুতরাং আপনারা আজ আপনাদের চিন্তাধারার সহিত আমাদের মনের গতির একটু পরিচয় ঘটাবার যে সুযোগ দিয়েছেন, সে-জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ আমার কিছুই নেই; আমার অযোগ্যতার জন্য প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আপনারা প্রবন্ধ হিসাবে আমার কাছে যদি কিছু আশা করে থাকেন, তবে নিরাশ হবেন, সন্দেহ নাই। আমি আজ শুধুই দুই-চারটি অভাব জানাতে এসেছি, যার ফলে ভারতের মুসলমান সমাজ আজ জগতের মাঝে হীন হ'য়ে আছে। এখানে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই। আলোচনাস্থলে মাঝে মাঝে হয়তো অপ্রিয় সত্য কথা আমাকে বাধ্য হ'য়ে বলতে হবে। আশা করি, আপনাদের শিক্ষিত মন সে-গুলি যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারবে। সবদেশে সব কালে এবং সকল সমাজেই তরুণের দল নূতনকে আহ্বান ক'রে আনে; কারণ, গতানুগতিকের মায়া কাটিয়ে অজানা পথে বেরিয়ে পড়বার সাহস শুধু তাদের নবীন সরলচিত্তেই আছে। তারা যখন অভাবটাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ক'রে চোখ মেলে চায়, তখনই সত্যিকারের কাজ হয়। সে-জন্য আমার একান্ত অযোগ্যতা নিয়েও অভাব-অভিযোগ যা-কিছু আছে, তা আমার শক্তি অনুসারে আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই। অভাব যতদিন না ঘুচবে, ততদিন একঘেয়ে হ'লেও বার বার তাই দেখিয়ে নিতে হবে।

শিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শিক্ষা হিসাবে আমাদের দেশ জগতের অন্য সব দেশের তুলনায় কত পিছনে পড়ে রয়েছে। নারীশিক্ষার আয়োজন আবার এরই মধ্যে আরও কত অসম্পূর্ণ! তার মাঝেও আমাদের সম্প্রদায়ে এই অসম্পূর্ণতা অনেক বেশী! তাই আমি আজ বিশেষ করে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটাই মুসলিম তরুণদের সামনে ধরে দিতে চাই। অবরোধের আবরণ থেকে বাইরে এসে জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি পেয়েছি। সেইজন্য আজ স্বভাবতই যে-সব মুসলিম মেয়েরা এই সুযোগ হ'তে বঞ্চিত, তাদের কথাই আমার সব চেয়ে আগে মনে পড়ে।

কত রকম অভাব যে তাদের জীবন ছেয়ে আছে, সেটাই আমি আজ জানাতে চাই ; এবং সেই সঙ্গে এইটুকু জানাতে চাই যে, তাদের জীবনের এত বড় অসম্পূর্ণতা যে শুধু তাদেরই নষ্ট করছে, তা নয় ;—এর ভিতর দিয়ে একটা ধ্বংসোন্মুখ প্রভাব সমাজকে সমগ্রভাবে প্রতিনিয়ত নীচের দিকে টেনে আনছে।

জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলে সমাজের কাজে লাগাবার জন্য দুটি জিনিষের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—শিক্ষা এবং স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বল্‌তে আমি অবশ্য সামাজিক স্বাধীনতার কথাই বল্‌ছি। এ দুটির মধ্যেও প্রথম এবং পরম প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার ; কারণ সত্যশিক্ষা চিন্তার স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে সামাজিক স্বাধীনতার আকাঙ্খাটিকে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। স্বাধীন চিন্তা এবং বিভিন্ন মতবাদের আবহাওয়ায় যারা গঠিত হয়েছে, সমাজের অন্ধ সংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে গণ্ডীর বাইরে এসে আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে সরলভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

Roman Rolland, Bertrand Russell প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সত্যটি প্রচার ক'রতে প্রয়াস পাচ্ছেন যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তিই মানুষের কাম্য। এতদিন সমাজ সর্ব্বত্রই ব্যষ্টিকে সমষ্টির কাছে বলি দিয়ে এসেছে, কিন্তু সে-যুগের অবসান হ'য়ে গেছে। 'সমাজের জন্য সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া অন্যায়'—এটাই নবীন যুগের নূতন বাণী। যে সমাজ-সমষ্টির ভিতর ব্যষ্টিকে যত বেশী ফুটিয়ে তুলতে পারছে, সে-সমাজই সত্যিকার সভ্যতার পথে ততখানি এগিয়ে গেছে। এই ব্যষ্টিটিও কম-বেশী সকল সমাজেই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন আমরা কি দেখ্‌তে পাই ? ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথা, সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকেই এমন ভাবে চেপে দেওয়া হ'য়েছে যে তার অস্তিত্বও বোধহয় কারো মনে পড়ে না। মানব-দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যেমন সমান, সমাজ দেহেও ঠিক সেইরূপ। নারী ও পুরুষ সমাজ-দেহের দুটি অঙ্গ। উভয়ের প্রয়োজনই তুল্য-রূপ। কিন্তু আমাদের সমাজ এই প্রয়োজনীয় অর্দ্ধাংশকে উপেক্ষা ক'রে উন্নত হ'তে—অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা ক'রছে, এর চেয়ে দুঃখের বিষয়—নিরাশার বিষয় আর কি হ'তে পারে ? নারীকে পর্দ্দার অন্তরালে রেখে দেওয়া হ'য়েছে, বাইরের কোন সাড়া তার মনকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। যুগের পর যুগ এমনি ভাবে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু এই জড়তা ঘুচিয়ে সমাজ-দেহকে সুস্থ করবার কোন চেষ্টা হয়নি। আপনাদের মধ্যে সেই প্রয়াস দেখেই আমি আমার কথা কয়টি নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছি।

আমাদের মেয়েদের হ'য়ে তাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ দাবীটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জানাতে চাই—

"—দেবি নাহি, নহি আমি
সামান্যা রমণী ! পূজা করি রাখিবে মাথায়,
সেও আমি নই। অবহেলা করি পুষিয়া

রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি
অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এখন এই দাবী সার্থক করবার, এই জড়তা ঘুচিয়ে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠে দেশের এবং সমাজের কাজে প্রাণমন সঁপে দিতে সমর্থ হবার জন্য নারীর প্রয়োজন—শিক্ষা। শিক্ষা বলতে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কথা বল্‌ছি না। এখন প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যা মানব-মনের সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে মনকে প্রশস্ত ক'রে তোলে, যা নিজের স্বার্থ বলি দিতে অপরিচিত অনাত্মীয়কে আপন করতে শিখিয়ে দেয়, মানুষকে যা ন্যায়-অন্যায় বিচারে ক্ষমতা দেয়। সংক্ষেপে আমাদের কাম্য হচ্ছে—"The harmonious development of all our faculties–mental, physical and moral." সাধারণভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে এই শিক্ষা আপন আপন ক্ষেত্রোপযোগী ভাবে সবারই প্রয়োজন। যথার্থ বলেই মেয়েদের দিক থেকে আজ আমি অভিযোগ করছি যে, কেন তবে ঐ শিক্ষার সুযোগ হ'তে মুস্‌লিম মেয়েরা এত বেশী বঞ্চিত হ'চ্ছে ? একথাও বল্‌তে চাই যে শিক্ষার প্রয়োজন তাদেরই বেশী। কারণ খুঁজতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। 'The hand that rocks the cradle rules the world'—এটা বহুদিনের এবং সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে যেন বিশেষ করে একথাটাই মনে করিয়ে দিতে হয় ! জননীর প্রভাব যে প্রত্যেকটা সন্তানের ভিতর দিয়ে সমাজে অনুভূত হয়, সে কথাতো সবাই জানেন। সুশিক্ষিতা জননীর প্রভাব যেমন সমাজকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে নিতে সাহায্য করে, তেমনি অশিক্ষিতা জননীর প্রভাব সমগ্রভাবে সমাজকে পিছনের দিকে টেনে রাখে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা ক'রে দেখলে এ-সত্যটা আরো পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিরোধ যে দিনে দিনে কিরূপ উগ্র হ'য়ে উঠছে, সে-কথা বোধ হয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্যও অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও একটি আজও পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই। যথার্থ উপায়টি আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই, এই বোধ হয় মূল কারণ। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিরোধ জাগিয়ে রাখবার খুব একটা বড় কারণ নারী-শিক্ষার অভাব। মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাকে বল্‌তে হবে, তাই আমি শুধু একটা দিকই দেখাতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, মুস্‌লিম নারীর অজ্ঞানতা এই বিরোধ জাগিয়ে রাখ্‌তে কতটা সাহায্য করছে।

প্রথমেই একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চাই যে অজ্ঞানতাজনিত অন্ধ গোড়ামীর

প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হ'য়েছে! ৫/৬ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কাঁদ্‌তে কাঁদতে 'মা মা' ব'লে মাকে ডাক্‌ছিল! মা প্রথমে ত সাড়াই দিলেন না। অবশেষে বিরক্ত ভাবে উর্দ্দুতে তিরস্কার করলেন, "মা বল্‌ছিস কেনরে বেয়াদব, আম্মা বল্‌তে পারিস নে?" দেখুন, শিশু মাকে ডাকবে, তাতেও এত সঙ্কীর্ণতা! এই মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে যে-ছেলে বড় হয়ে উঠ্‌বে, সে যখন আপনার শৈশবলব্ধ সংস্কারের বশে নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি ক'রে সমাজে এমন একটা বিশিষ্ট গতির স্রোত বইয়ে দিতে সাহায্য করবে, যা একে অবনতির পথেই টেনে আনবে, তখন দোষ দেওয়া যাবে কাকে? সেই ছেলেকে, না তার মাকে? অথবা সেই কর্ম্মীদের, যারা নারী-শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যতের আশাও নির্ম্মূল করতে ব'সেছে?

আমরা সবাই জানি, জীবনের প্রত্যুষে মানব সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে যে-ধারণা আমাদের মনে আঁকা হ'য়ে যায়, সেটাই অধিকাংশ স্থলে চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হ'য়ে থাকে। শিশুকালে অর্জ্জিত বিশ্বাসের প্রভাব আমাদের জীবনের অনেক স্থলে আমাদের অজ্ঞাতেই কাজ করে। শিশুর শিক্ষা প্রধানতঃ মায়ের কোলে বসেই আরম্ভ হয়। সুতরাং এই শিক্ষাদাত্রী জননীর দায়িত্ব যে কতটা, তা' সহজেই অনুমেয়। শিশুর হৃদয়ে যে-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, ভবিষ্যতে সেইগুলির প্রভাবই তার মতামত, তার কর্ম্ম-প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং এই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে সে যেন অবনত মাতৃভূমির কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে, সে জন্য একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। মুসলিম শিশুদের প্রধানতঃ এই কয়টি শিক্ষা দিতে হবে।

তাদের ভাল ক'রে বুঝাতে হবে যে, তাদের মাতৃভূমি আরব, পারস্য, তুরস্ক বা মিসর নয়। তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, এবং তারা ভারতবাসী! জাতীয়ত্ব গড়ে ওঠে 'সমধর্ম্মে'র ভিত্তির উপর নয়, 'সমদেশিকতা'র ভিত্তির উপর। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপের জাতিসমূহ এবং আমেরিকাবাসী সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে-জন্য ফরাসী দেশীয় কোন খৃষ্টানই আপনাকে জাতিতে জার্ম্মাণ বা ইংরেজ ব'লে পরিচিত করতে প্রয়াসী হবে না। ফ্রান্সের খৃষ্টান ফরাসী, এবং ইংলণ্ডের খৃষ্টান ইংরেজই থাকবে! ধর্ম্ম তাদের জাতীয়তার উপর আস্‌তে পারে না। সেই রকম, ভারতবর্ষের মুসলমান ও ভারতবাসী, অন্য পরিচয়ে তাদের গর্ব্ব করবার কিছুতো নেই-ই, বরং লজ্জার বিষয়ই আছে। তাদের আরও শিখাতে হবে যে, ভারতের যে-প্রদেশে তারা জন্মেছে, তার ভাষাই তাদের মাতৃভাষা, তার পরিচ্ছদই তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ, এবং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ভারতবাসী মাত্রই তার আপনার জন। এই শিক্ষা তাদের বিশেষভাবে পাওয়া দরকার। তাদের এ-কথা জানা চাই যে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম বড় জিনিষ হ'লেও জাতীয় জীবনে সেটা সবচেয়ে বড় বা কাম্য-বস্তু নয়! এটা বুঝাতে হলে চাই—পরমতসহিষ্ণুতা, কিন্তু উদার শিক্ষা ব্যতীত এই জিনিষটা লাভ করা অতি কঠিন। মৌলবী মুজীবর রহমানের ভাষায় মুসলিমদের এই শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন—"You will not bear any ill-will towards the members of the other communities,

I hope, you will never do that. That would be un-Islamic. That you have no untouchability amongst you, that your very religion teaches you universal brother-hood, go to show that it is not at all the desire of Allah that one human being should entertain any hatred towards another."

পরিণত মনুষ্যের চিত্তে এই ভাবটির স্ফূর্তি হওয়ার উপযোগী বীজ শিশুচিত্তে বপন করতে হবে। এই সত্যটি প্রত্যেক সম্প্রদায় হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করে যদি একে সফল করে তুল্‌তে পারেন, তবে বোধহয় সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাপ্তি অতি সহজেই হ'তে পারে।

এখন, একে সফল কর্‌তে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষিত জননীর একান্ত প্রয়োজন। বিখ্যাত ফরাসী-বীর নেপোলিয়ান ব'লেছিলেন, "The hope of France is in her mothers." আমি আজ এই কথাটাকেই একটুখানি পরিবর্ত্তিত করে বল্‌তে চাই,– "The hope of India is in her mothers." দুঃখের সঙ্গে এই কথাটাও ব'ল্‌তে হচ্ছে যে,কথাটার যথার্থ মূল্য আজও ভারতবাসী, এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান-সম্প্রদায় দিতে শেখেনি। সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যপদ-বাচ্য করবেন জননী, অথচ সেই জননীর মনুষ্যত্বই অসম্পূর্ণতার নিম্নতম স্তরে রয়ে গেছে। মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—কোন রকম শিক্ষা দিবার প্রয়াস নাই,—আছে শুধু অন্ধবিশ্বাসের গোড়ামী !

এই ত গেল শিশুচরিত্র গঠনের দিক থেকে জননীরূপিণী নারীর শিক্ষার প্রয়োজনের কথা। কন্যা-রূপে, ভগ্নী রূপেও নারীর যে শিক্ষার কতখানি প্রয়োজন, তাও একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি।

সমাজের কোন পরিবর্ত্তন কর্‌তে গেলেই—তা যতবড় উন্নতির জন্যই হোক না কেন—সমাজের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। আবার সমাজ যতদিন যথার্থভাবে বেঁচে থাকবে, ততদিন তাকে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। কারণ, যার প্রাণ আছে, সে নিশ্চল অবস্থায় থাক্‌তে পারে না। এইজন্য চিরদিনই সমাজের বুকে এমন কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়, যাঁরা এই বিরোধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, পরিবর্ত্তন স্রোতের বাধা ভেঙ্গে দিতে থাকেন। এঁরা যখন বাইরের সংঘাতে ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন হৃদয়ে গৃহে আসেন, তখন তাঁদের এই অবসাদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে চিত্তকে উৎসাহিত ক'রে রাখতে না পারলে তাঁরা যে ভেঙ্গে পড়্‌বেন। তাঁরা তখন কামনা করেন, আন্তরিক সহানুভূতি এবং অদম্য উৎসাহ ; তাঁরা চান তখন ভাবধারার আদান-প্রদান। তাঁদের এই প্রাণের কামনাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে, তাঁদের নিরুৎসাহ চিত্তে আশা জাগিয়ে দিতে, তাঁদের পরিশ্রান্ত মনকে শক্তি দিয়ে সজীব করতে পারে কে ? পত্নীরূপেই হোক, বা দুহিতারূপে বা ভগ্নীরূপেই হোক, এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে শুধুই উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা নারী। তাদের অভাবই আজ সমগ্র সমাজকে কর্ম্মকীর্ত্তিহীন করে রেখেছে।

এ-রকম ভাবে দেশের বা সমাজের যে কোন সমস্যা নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাব যে নারীকে চেপে রেখে পুরুষ একা উঠ্‌তে চেয়েছে, এবং ফলে পঙ্গু সমাজ নিত্য নূতন সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে।

তাই আজ আমি দেশের তরুণদের অনুরোধ ক'রে বল্‌ছি যে, তাঁরা নারীর উন্নতির পথে এই যে শিক্ষার অভাব-জনিত বিরাট বাধা, এটা ভেঙ্গে ফেলে দিতে সাহায্য করুন। প্রয়োজন হবে শুধু সাহস ও উৎসাহের ;—কিন্তু নবীনের মধ্যে তো এর একটিরও অভাব নেই।

নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলবার আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু আর বেশী অগ্রসর হলে আপনাদের শোনবার হয়তো ধৈর্য্য থাকবে না। তাই আজ কবি Tennyson এর কথাতেই আমার বক্তব্য শেষ ক'রে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

"The Woman's cause is Man's; they rise or sink
Together; dwarfed or God-like bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall Man grow?"*

*সওগাত*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

## মুসলিম নারীর মুক্তি*

যাঁরা একটু চোখ খুলে দেখেছেন, তাঁরাই বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান জাতির সম্মুখে অনেকগুলো অসাধারণ সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধান করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নিজের বিচার ও বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ। এ-জন্য আমি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে যে-টুকু ভেবেছি, তাই প্রকাশ কর্‌ছি। আমার কথা যদি কারো মনে আঘাত লাগে, তবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন কারণ আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

"মুসলিম নারীর মুক্তি"—এই "মুক্তি" শব্দটি বল্‌তে এখানে আত্মার মুক্তিই বুঝায়। আত্মার মুক্তি অর্থে স্বাধীন ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সমাজের ও জগতের কাজে নিয়োজিত ক'রে নিজের বিচার ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে চালিত করাই বুঝায়। ধর্ম্মগ্রন্থ এবং সাধু-বাক্য প্রভৃতিকে আমি বিচার-বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক উপায় ব'লেই মনে করি। এ-গুলোর দ্বারা বিচার-বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে গেলে এ'দের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

জগত পরিবর্ত্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহু-কাল সুপ্ত মুস্‌লিম

* এই লেখাটি ঢাকা আল-মামুন ক্লাবে পঠিত হয়েছিল। পরে তা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তা'রা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে ; এবং তা'দের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষভাবে লজ্জিত হ'য়ে পড়ছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হ'য়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না। নারী এতকাল নিজেকে মোহ-আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে—কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী-প্রাণ সেই কুৎসিৎ বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন ক'রে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারীমন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র—শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তা'দের নাই—আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্ম্মভেদী একটা অনুশোচনা, আর সর্ব্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। পাপীর অনুতাপই যেরূপ তার পাপকে আগুণে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ ও খাঁটি করে তোলে, সেইরূপ নারীর এই আত্ম-গ্লানিই তাকে মনুষ্য-পদ-বাচ্য ক'রে তুলবে। এর জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক শিক্ষা। শিক্ষা বল্‌তে কেবল কয়েকটা ডিগ্রীর ছাপ নয়,—যে শিক্ষা মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে, বিবেকবুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও সুচালিত করে, সেই শিক্ষা, যে-শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় রাখবার উপযোগী শক্তি দেয়, সেই শিক্ষা ! মুসলিম-মেয়েদের শিক্ষা—খুব বেশী হ'লে দুই-একটা বাংলা বই পড়া, একটু চিঠি-পত্র লেখা, আর অর্থ না বুঝে তোতা পাখীর মত আরবী পড়া। আরবী পড়া আমি নিষেধ করছিনে—তবে আমার মতে অন্যান্য ভাষার ন্যায় ধর্ম্মভাষাও মানে না বুঝে পড়লে কোনই ফল হয় না।

প্রাইমারী শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রী-সংখ্যা অ-মুসলিম ছাত্রী-সংখ্যার চেয়ে বেশী দেখা যায়, অথচ বল্‌তে গেলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাদের নাম-নিশানাও থাকে না। অনেকে হয়ত মনে করেন, মেয়েদের অত লেখা-পড়ার দরকার কি ? কিন্তু আমার মনে হয়—অন্ততঃ কয়েক জায়গায় যা দেখেছি—এই অল্প শিক্ষাটাই ভয়ঙ্করী হয়ে একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করে। একটু লেখা পড়া জানে এই গুমরটি অনেক সময় অনেকের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। এজন্য বল্‌তে চাই যে, প্রাইমারী শিক্ষা যথেষ্ট শিক্ষা ত নয়ই, বরং অনেক সময় কুফল প্রসব করে। তবে এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, শিক্ষার আরও বহুল প্রচার হ'লে তখন আর এ অহমিকা ভাবটি আস্‌তে পারবে না। এখন ছিটে-ফোঁটা দুই-চার জন মাত্র শিক্ষিতা, এ-জন্য তাঁরা অহঙ্কার প্রকাশ করবার স্থান পাচ্ছেন। যখন সকলেই শিক্ষিতা হবেন, তখন আপনা-আপনি এ বিদ্যার গুমর কেটে যাবে।

মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে না পারলে, এ-সমাজের উন্নতি কোন জন্মেও হ'বে না ? তাই পুরুষের উপর সব কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে বসে থাকলে আর মেয়েদের চল্‌বে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হ'বে। নিজেকে মানুষ ব'লে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হ'বে। ভিক্ষুকের মত কেঁদে, পায়ে ধ'রে চেয়ে, প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মত নিজের ন্যায্য অধিকার জোর

ক'রে আদায় ক'রে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হ'বে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই,—কিন্তু সে-শিক্ষা অর্জ্জন করতে হ'বে।

যে কারা শৃঙ্খল মুসলমান নারীর পায়ে পরিয়ে তা'কে আজ সমস্ত সভ্য জগতের নারীর সামনে দীনা হীনা ক'রে রাখা হয়েছে, সে-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে হবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হ'বে। হয়ত তা'র পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হবে, তবু অপমানের হাত থেকে—লজ্জার হাত থেকে নারী মুক্ত হবে, এই তার জয়-গর্ব্ব। কারা-শৃঙ্খল যে কেবল নারীকেই তা'র ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তা নয় ; সমস্ত মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নারীর উপর সমাজের উন্নতি কতখানি নির্ভর করে, বোধ হয় অনেকেই বুঝতে পারেন। তবু যারা সে উপকার বুঝেও বুঝ্‌তে চায় না—নারীর সেই ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চায় না নারীর উচিত, সেস্থলে তা'দের দেওয়া সম্মান ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা—কারণ তা'রা প্রকৃত সম্মান করতে জানে না, সম্মানের অভিনয় করে মাত্র।

আমার মনে হয়, সে-বন্দীখানায় মেয়েদিগকে জগতের আলো-বাতাসের সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত ক'রে বুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে—যা মুসলিম নারীর মনের দ্বারে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেটা একবার পুরুষের উপর চাপিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। সংসারে যত কিছু অত্যাচার ও পাপ কাজ হচ্ছে, তার জন্য শুধু নারীই দায়ী—সে কথা বোধ হয় কেউ বলবেন না। তবে কোন্ কারণে নারী বন্দিনী হয়ে থাকবে ? থাক্‌লে নারীরও থাকতে হবে, পুরুষেরও থাক্‌তে হবে ; নয়ত সকলেরই সমানভাবে জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার অধিকার ও দাবী আছে।

সতীত্ব যে নারীর একটা মহামূল্য সম্পদ, তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সমস্ত দরজা জানালায় খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ভিতরে অসূর্য্যম্পশ্যা হ'য়ে যে নারী সকলের কাছে সতী বলে পরিচিত হয়, তা'র সে-নামের মূল্য কি ? জগতে বাধা-বিপদ অতিক্রম করে, নানা প্রলোভনের ভিতর থেকেও, যে-নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সেই ত প্রকৃত সতী। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ্‌বার অধিকার দেওয়া হয় নাই ; বরং তা'কে তা'র ন্যায্য অধিকার দেবার কথা আছে ; তা'র নিজের কর্ম্মফল তা'কেই ভুগতে হবে—এ-কথাও আছে। তাই যদি হয়, তবে নারীরও ত সুশিক্ষিতা হয়ে তা'র অধিকার বুঝে নেওয়ার এবং ভালমন্দ বিচার করে তদনুসারে চলবার স্বাধীনতা আদায় ক'রে নেওয়া উচিত।

আজকাল স্কুল-কলেজে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, সেইটেই যে আদর্শ শিক্ষা তা' নয়। তবে ঘরে বসে অন্ধের মত অন্যের দেখান' পথে চলার চেয়ে এ শিক্ষাতে যতটুকু উপকার হ'বে সেটুকুও মন্দের ভাল। শিক্ষা-সমস্যা একটা মস্ত বড় জটিল ব্যাপার ! শিক্ষা-পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত, এ-সম্বন্ধে নানা মুণির নানা মত। সে-সব ছেড়ে দিয়ে আমি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার বিষয় যা ভেবেছি—অন্ততঃ আমার স্থূল-বুদ্ধিতে যা মনে হয়, তা এইরূপ :—

অন্যান্য নারীদের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। যারা প্রথম

অগ্রসর হবে, তা'দের হয়ত অনেকেরই কল্পিত স্বর্গের আশাটি ছেড়ে অগ্রসর হতে হবে। পৃথিবীতে যখন আমরা রয়েছি, তখন একেবারে জড়ের মতন না থেকে, একটু বোধ-শক্তি বিশিষ্ট হয়ে সকলের সঙ্গে সমান তালে চলাই বাঞ্ছনীয়। সমাজকে উন্নত ও সুসভ্য ক'রে তুলতে হ'লে প্রথমেই দরকার—নারী-শিক্ষা। আমার মনে হয়, দিনের পর দিন কেবল রাশি-রাশি বই লিখ্‌লে, আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বক্তৃতা ছাড়লেও কিছু হ'বে না। সত্যিকার কাজ করতে হবে। মুসলিম-মেয়েকে শিক্ষিতা হতে হবে। উচ্চ-শিক্ষা সকলের পক্ষে—বিশেষ ক'রে গরীবদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যে-মেয়েদের পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, সে-সব মেয়েরা যদি সমাজের জন্য, নারী জাতির জন্য, একটু চেষ্টা করেন, তবেই কিছু করতে পারেন। এম্‌নি ক'রে একটি ছোট দল গঠিত হ'লে পরে, তার থেকে মস্ত বড় জিনিষ গড়ে উঠ্‌তে পারবে। একদিনের চেষ্টায় ইডেন স্কুল, বেথুন কলেজ এ-সব তৈয়ার হয়নি। প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষয়িত্রী নিয়ে যা' আরম্ভ হয়েছিল, কালক্রম তা' এত বড়-বড় শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হ'য়েছে। মুসলিম মেয়েরাও যদি কয়েকজন এম্নি ক'রে তৈয়ার হতে পারেন, তবে তাঁরাও কালে দু-চারটি স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেদের ধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী মেয়েদের গড়ে তুলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বেথুন স্কুলের মত তাঁদেরও হয়ত এমন একটা স্কুল হতে পার্ব্বেন, যেখানে ইচ্ছা করলে তাঁরাও, অন্ততঃ অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্যেও বলতে পার্ব্বেন, "এ স্কুলে অ-মুসলিম মেয়েদের নেওয়া হ'বে না।" এমনি করে কাজে লাগ্‌তে পারলে হয়তো ভবিষ্যতে মুসলিম নারীর মুক্তি হতে পারে, নতুবা চিরবন্ধনে চির-অন্ধকারে ডুবে থাক্‌তে হবে আমাদেরকে।

মুসলিম তরুণ ভাইদের কাছে তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে, তাঁ'রা যদি এ বিষয়ে তা'দের বোন্‌দের এগিয়ে আনেন, তবেই মুক্তির আশা। নতুবা শুধু বোনেরাই একলা ধ্বংশ হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মনুষ্যত্ব লুপ্ত হবে। কাজেই তাঁ'দের কাছে মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা প্রার্থনা করছি!

*সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬

## তথ্যসূত্র

১. ফজিলতুন নেসার অবশ্য আরও একটি লেখার সন্ধান আমরা পেয়েছি। ১৯২৮-এ ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সভার জন্য তিনি একটি প্রবন্ধ, 'নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', রচনা করেছিলেন। পরে সেটি ঐ সাহিত্য সমাজের পত্রিকা, *শিখা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্র. সিদ্দিকা মাহমুদা, *ফাতেমা খানম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৮, ১০৭-টীকা ২১)

২. 'মুস্‌লিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', এই সংকলন, পৃ. ১৬৪
৩. ঐ, পৃ. ১৬৫
৪. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, 'মিস ফজিলতুন নেসা এম-এ', *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫), পৃ. ৫৮৫
৫.. 'মুসলিম নারীর মুক্তি', এই সংকলন, পৃ. ১৬৯
৬. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩
৭. আখতার ইমাম, *ফজিলতুন নেসা এবং বাংলাদেশে নারীর উচ্চশিক্ষা ও অগ্রগতি* (বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা), (ঢাকা : রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. ৭
৮. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন,*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯০, ৭৮৬
৯. আখতার ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

# মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
## অবরোধহীন একক নারী
### ১৯০৬-১৯৭৭

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার জন্ম ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, কুষ্টিয়াতে। বাবা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিক পেশায় ছিলেন ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর। তখনকার দিনে একজন শিক্ষাবিদ এবং নারীশিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মা সৈয়দা রাহাতুননেসা ভাল লেখাপড়া জানতেন। নানী আরবি, ফারসি, উর্দু, নাগরি, বাংলা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। অর্থাৎ মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে নারীশিক্ষার চল ছিল। সেই সঙ্গে ছিল অবরোধ-প্রথাও। বলাবাহুল্য, তাঁর মা, নানী লিখতে পড়তে শিখেছিলেন গৃহাভ্যন্তরে। সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী বাল্যবিবাহ এই পরিবারটিতে বলবৎ ছিল। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অবরোধ, বাল্যবিবাহ, এই দুটি প্রথাই ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন। অন্য বোনদের মতো তাঁকেও ছোটবেলায় বিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি এই বিয়ে অস্বীকার করে, বিবাহিত জীবনের বাইরে জীবন-যাপন করেছেন। ১২ বছর বয়সে নানী তাঁকে পর্দায় বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হন।

অন্যদিকে খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মানের পরিবারে লেখা-পডা ও সঙ্গীতচর্চার বিরল আবহ ছিল। ছোটবেলায় *আনোয়ারা* উপন্যাসের রচয়িতা নজিবর রহমান মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার গৃহশিক্ষক ছিলেন।[১] সেসময় মিশন স্কুলে পড়ার ফলে তিনি বিদেশী শিক্ষিকাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে পড়েছিলেন। তারপর তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁকে ঘরবন্দী করা যায়নি। ছোটবেলায় তাঁর যে কাব্যচর্চা, কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল, সেটাও পুরোদমে চলতে থাকে।

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার প্রথম কবিতা ছাপা হয় আনুমানিক ১২ বছর বয়সে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আল-ইসলাম* পত্রিকায়। তারপর বিরামহীন ভাবে তিনি তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, সবার পত্রিকায় লিখে গেছেন। সেই সঙ্গে পাবনা ও কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যসভা, সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁকে দেখা যায়। তখনকার দিনে, পাবনার নারীরা যখন চিকের আড়ালে বসে সভা-সমিতির শ্রোতা হতেন, তখন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সভার মঞ্চে, জনসমক্ষে, অন্যান্য পুরুষ সাহিত্যিকদের পাশের আসনে বসার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

পাবনা থেকে কলকাতায় বছরে এক দুবার তাঁর যাওয়া-আসা লেগেই থাকত। বাবার চিকিৎসা উপলক্ষে টানা কয়েক বছর তিনি কলকাতায় থেকেছেন। তালতলার এক পীরের মুরিদ ছিলেন তিনি এবং সেই পীরের প্রতি ভক্তি জানানর জন্য প্রায়ই কলকাতা যেতেন। এছাড়াও কলকাতায় বসবাসের সময়টিতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের সংস্পর্শে আসেন তিনি। শরৎবাবুর দর্শনার্থীদের তখন 'পাস' লাগলেও কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বিনা পাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। তখনকার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক ও গুণীজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ এবং সাহিত্যালোচনার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। বলাবাহুল্য, বোরকা চাদরে আবৃত না হয়েই তিনি তখন ঘরের বার হতেন। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন তাঁকে এ অবস্থায় প্রথমবার দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, '১৩৩৭ সালে হঠাৎ করে একদিন তিনি ১১নং, ওয়েলেসলী স্ট্রীটে অবস্থিত সওগাত কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। সমাজের সেই অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মুসলিম নারীরা যখন অবরোধের কঠোর প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় এই তরুণীকে দেখলাম আধুনিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে। আশ্চর্যের বিষয় তার মাথার চুলগুলি ছিল "বব" কাটা।'[২] তাঁর এই 'মুক্তভাবে চলাফেরা' করতে পারা সম্পর্কে সাঈদা খানমের (কবির বোনঝি) বক্তব্য হলো, 'জীবনের একটা দিক অপূর্ণ ছিল বলেই হয়ত নানা তাঁর ঐ মেয়েকে কোনও ব্যাপারে বাধা দিতেন না।'

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী সাঈদা খানম নিজেও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। ছোটবেলা থেকে তিনি তাঁর খালা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। এই খালার সান্নিধ্যে সাঈদা খানম বড় হয়েছেন। খালাদের বিবাহিত জীবন এবং কাব্যচর্চা নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'খালাদের আর এক বোনের লেখার প্রতিভা ছিল। ওনার নাম সালেহা খাতুন। দেশভাগের আগে ম্যাট্রিক পাঠ্য বইয়ে তাঁর একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সংসারের চাপে পড়ে সেই খালার কবিতা লেখা আর হয়নি। সাধারণত যা হয়ে থাকে। সংসারের চাপ, শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ। সেই খালারও কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এগার-বারো বছর বয়সে নানা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। একমাত্র মাহমুদা খালাই প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসেন। "এ বিয়ে আমি মানি না।" বিয়েটা টিঁকে গেলে ওনার জীবনটা হয়ত অন্য পাঁচবোনের মতোই হয়ে যেত। নানা নারীশিক্ষার জন্য কাজ করেছেন। আবার নিজের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়েছেন। সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। নানী ছিলেন না, নানা হয়তো ইনসিকিওর বোধ করতেন, মেয়েদের কে দেখবে। মানে ভাল পাত্র পেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়া ভাল—এই আর কি।'

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার বিবাহিত সাংসারিক জীবন ছিল না এবং কোনও ধরনের অর্থকরী কাজেও তিনি জড়িত ছিলেন না। সেজন্য হয়ত কাব্যচর্চা এবং বহুমুখী সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার অখণ্ড সময় তিনি পেয়েছিলেন। শৈশব থেকে ব্যক্তিগত

উদ্যোগে তিনি একজন সমাজসেবক হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজের পরিধি ছিল বাড়িতে। বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলন করা পর্যন্ত। কাব্যচর্চার পাশাপাশি নীরবে নিভৃতে তিনি মানুষের জন্য আমৃত্যু অফুরন্ত কাজ করে গেছেন।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা কিশোর বয়স থেকে পাবনার পৈত্রিক বাড়িতে বাবা ও বড় বোনের সঙ্গে থাকতেন। তার আগে তিনি বাবার কর্মস্থল অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে থেকেছেন। ছোটবেলায় একবার দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বড় হওয়ার পর অসুস্থ বাবার সঙ্গে গেছেন ওয়ালটেয়ার, রাঁচি ও গিরিডিতে। দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে বড় বোনের পরিবারের সঙ্গে (সাঈদা খানমদের পরিবার) থাকতে শুরু করেন। ঢাকায়ও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কাব্যচর্চা ও কল্যাণমূলক কাজের ব্যস্ত জীবন ছিল। ১৯৬৪-তে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আস্তে আস্তে তাঁর বাইরে বেরোনো কমে যেতে থাকে। সে সময় সাঈদা খানম খালার কাছে সাহিত্যসভার আলোচনাসহ বাইরের জগতের খবর বয়ে আনতেন। ১৯৭৭ সলের ২রা মে কবির মৃত্যু হয়।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা কাব্যচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৭ সালে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার', ১৯৭৭ সালে 'একুশের পদক' লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম *পশারিনী* (১৯৩১), *মন ও মৃত্তিকা* (১৯৬০), *অরণ্যের সুর* (১৯৬৩)। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং পাণ্ডুলিপি আকারে, তাঁর বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্প ও প্রবন্ধ রয়েছে।

শ.আ.

## স্বপ্ন

যখন নিশিথে আজ
নিমীলিত আঁখি পাতা
স্বপন আসিল ধীরে
ঘুচাইতে মনো ব্যথা।
বিরহ সে চলে গেল
এলো মিলনের নিশা,
জাগিল নিরাশ প্রাণে
পূর্ণ দুখ পূর্ণ আশা।
বিশ্বের মাধুরী লয়ে
ফুটায়ে সৌন্দর্য্য রাশি,

শিয়রে দাড়াল সখা
মুখেতে মধুর হাসি।
হাসিয়া মধুর স্বরে
যাহাতে হৃদয় ভোলে,
কহিল "কেঁদনা সখি
এসেছি ডেকেছ বলে।"
আনন্দ উল্লাস ভরে
লুটাতে চরণে তার,
ভাঙ্গিল স্বপন মোর
টুটিল মোদের দ্বার।
প্রভাত কিরণ রশ্মি
পড়িল নয়ন কোণে,
কোথা গেলে পিয়তম
হায় নিশা অবশানে
কাঁদিয়া উঠিনু আমি
স্মরণে পড়িল মোর,
স্বপন হয় না সত্য
সে যে শুধু ঘুম মোর।

*আন্নেসা*, মাঘ ১৩২৮ (দারজিলিং)

## মিলন-গীতি

এক মায়ের দুটি ভাই মোরা হিন্দু-মুসলমান,
বিধাতা-বাঞ্ছিত এ মহা প্রীতির বন্ধন।
শ্যামা ধরণীর স্নেহময় কোলে,
এক দেশে দু'য়ে জনম লভিলে,
একই জল-বায়ু প্রাণ ভরে করিয়াছি মোরা পান।
এ দেশের বাণী দোঁহাকার ভাষা,
শিখায়েছে প্রেমে প্রীতি ভালবাসা,
গহনে কাননে দিয়াছে মধুর কাব্য অফুরান,
এক দেশের দুটি ভাই মোরা হিন্দু-মুসলমান।
কুসুমে কিরণে গগনের গায়,
প্রেমের মহিমা উথলিয়া যায়,

নীরব ভাষায় শুধু ক'য়ে যায় এক প্রেম সুমহান।
হিংসার বিষে তাহারে পোড়ালে,
নিঃস্ব তুমি এ বিরাট নিখিলে,
এক দেশে ঠাঁই দুটি ভাই ভাই কিসের ব্যবধান।
এক মায়ের দুটি ভাই মোরা হিন্দু-মুসলমান।

*গুলিস্তাঁ*, শ্রাবণ ১৩৪০

## যামিনীর শেষ যাম

যামিনীর শেষ যাম চামর ঢুলায়
ঘুমাও ঘুমাও তুমি তন্দ্রাহীন আঁখি ;
নিশা চলে যায় কার মধুর আহ্বানে—
কনক কিরণ স্মৃতি নীল নভে আঁকি।
সারা নিশি জাগিয়া যে রচিয়াছ মালা
সে যে শুধু বেদনার তপ্ত অশ্রু ঢালা ;
ক্ষণিকের তরে চল স্বপনের দেশে
মানিক-মুকুতা ঘেরা একান্ত নিরালা।

গাছে গাছে গাহে পাখী কুসুমের মেলী,
গাহে গান তোলে ফুল নাচে পরী-বালা।
ওই শোন দিকে দিকে বাজে তার বাঁশি,
ভুলিবে সকল ব্যথা চল হে উদাসি !

তপ্ত আঁখি পরে তার শীতল পরশ,
দেয় মায়া-নিশীথিনী করুণ সরস ;
ভুলায় বেদনা, ঘুমে ঢুলে আসে চোক,
ভেসে উঠে সম্মুখেতে অপূর্ব্ব আলোক !

তারা দীপ নিবু নিবু গগন-বাসরে,
স্বপন আবেশে হাসে শান্ত নিশীথিনী ;
চরাচর স্তব্ধ-মৌন নৈশ-তন্দ্রাভরে,
ঢুলায় চামর নিশা ঘুমায় মেদিনী।

*গুলিস্তাঁ*, ভাদ্র ১৩৪০

# সাহিত্য ও আর্ট

সাহিত্যক্ষেত্রে আর্ট ও নীতি লইয়া আজকাল বেশ গোলমাল চলিতেছে। কাহারো মতে আর্টের সহিত নীতির সম্বন্ধ নাই, কাহারো মতে আছে, ইহারই সম্বন্ধে ভীরু গৃহ-কোণ হইতে আজ দু'একটী কথা কহিতে চাই। আমরা যদি মনে করি সাহিত্যে আর্ট জিনিষটা কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করার জন্যই তাহা হইতে আমরা ভুল করিব, কারণ নীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা যাহাই করি না কেন, তাহাতে অমঙ্গলের আশা আছে। নীতির অপব্যবহারে সৌন্দর্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কিন্তু নীতির পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্য্য আছে। সৌন্দর্য্যও আপনি সম্পূর্ণ নয়। তাহার গঠনের জন্য তাহাকে ও সৌন্দর্য্য-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নীতির দ্বারাই জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে পারা যায়। আর জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিবার জন্যই নীতির সৃষ্টি। এবং ইহার প্রমাণ নীতিধর্ম্মই সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়াছে। লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায় যে শৃঙ্খলার উপরেই শান্তির ভিত্তি স্থাপিত। এই জন্য আমরা নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া আর্টের রচনা করিতে পারি না। তাই বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে সাহিত্যক্ষেত্র নীতি বাক্য হউক, তাহা হইবে না, হইতে পারেও না। কারণ সাহিত্য বস্তুটা দুজন বা একজনের নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বের, ইহা বিশ্বের ভাবনা চিন্তা, ছোট বড় সুখ দুঃখ সবই। ইহার কোনটাকে বাদ দিলে সাহিত্যের শক্তি কমিয়া যায়, সে পাঠককে পূর্ণ মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু যে গ্রন্থ চিত্তকে পূর্ণ মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে অক্ষম, সেই গ্রন্থের কোন গুনও স্থায়ীকালের জন্য পাঠককে বাঁধিতে পারে না। শ্রেণী শিল্পীদের গ্রন্থাবলীতে মানুষের নিত্যকার সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া অন্তরের গভীর মর্ম্মে আঘাত করিয়া মানুষকে সত্যের পথে আনিয়া হাজির করে। সাহিত্যের মধ্যে মানুষ তাহার হৃদয়ের ছবি খুঁজিতে থাকে, আত্মতৃপ্তি চায়, আর যে স্থানে আপনার মনোমত বস্তু পায় সে স্থানেই আকৃষ্ট হয়! কিন্তু এই রুচি সকলের এক প্রকার নহে। সকলেই আপন আপন রুচি অনুযায়ী গ্রন্থই খুঁজিয়া পড়ে। এজন্য সমগ্র দেশটাকে পাঠানুরাগী করিতে হইতে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থেরই প্রয়োজন, তবু তাহারই ভিতরে আদর্শকে ঠিক রাখিতে হইবে। যাহা আদর্শকে ঠিক রাখে, উন্নতির পথে লইয়া যায়, পরন্তু সৌন্দর্য্য ও রসে ভরপুর করিয়া তোলে আমি বিবেচনা করি তাহাই আর্ট। একটী সুন্দর চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে একটী জঘন্য চরিত্রের অবতারণা করিতে হয় বটে ; কিন্তু তাহা না করিয়াও গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে যথা সীতা দেবী কর্ত্তৃক জর্জ্জ এলিয়টের বঙ্গানুবাদ স্মৃতির সৌরভ। এই গ্রন্থ খানিতে চরিত্রহীনা বা চরিত্রহীনের স্থান নাই। এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সুকঠিন সন্দেহ নাই কিন্তু সাধনার জোর থাকিলে অন্ধকার গুহায়ও মাণিক মেলে। আজকাল অনেক গ্রন্থে এরূপ পাঠ করিতে হয় যে নারী দেশের সেবার জন্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল—ইহাকে আমি আদর্শ বলিয়া

মানিতে পারি না। স্ত্রীলোকে এরূপ করিলে সে বরং আদর্শপ্লুত হইল কারণ স্ত্রীলোকের আদর্শ এরূপ হইলে সংসারে শান্তি থাকিতে পারে না পরন্তু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। উক্ত উদাহরণ গুলি জীবনের ব্যতিরেক। ব্যতিরেক জীবন লইয়া সর্ব্ব-মানবের সাহিত্য হইতে পারে না। কেহ কেহ লিখিয়া থাকেন নারী বিশ্বের, দেহের সহিত সতীত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। এই ভয়াবহ কথা কেমন করিয়া তাঁহারা উল্লেখ করেন ? নারী যদি বিশ্বের হয়, দেহের সহিত সতীত্বের সম্বন্ধ না থাকে ; তাহা হইলে সমস্ত জগতের ভিত্তি একদিনেই মাটীতে মিশিয়া যাইবে। যাহাকে নিজে ভালবাসা যায়, তাহাকে অপরকে আত্মদান করিতে দেখিতে চিত্ত আপনা আপনি ব্যথিত হইয়া উঠে না কি ? যাঁহারা ইহাকে আর্ট বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, যেখানে নারীর দেহের উপর কাহারও অধিকার নাই সেখানে কতই না হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। যাহারা এরূপ করেন তাঁহারা হৃদয় লইয়া খেলা করেন, আপনাকে আপনি ফাঁকি দেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত কিছুই রহে না, সবই নিঃশেষ হইয়া যায়।

মানুষের অন্তঃকরণের এরূপ একটা আকার আছে তাহা সহজে বুঝা যায় না, এই আকার জলের ন্যায়, জলকে যেমন যে পাতে রাখ সে সেই আকার ধারণ করিবে। একদেশে মানুষ দীর্ঘকাল বাস করিলে, তাহার রুচি নীতি অনেকই সেই দেশের অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বই-ই আমাদের সেই মনকে নিত্য প্রভাবন্বিত করে। তাহার ফলে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ না হইলেও, নানা ভাবে নানাকাজে ফুটিয়া উঠে। সৌন্দর্য্যের পূজারীই হউন আর নীতি প্রচারক হউক, সাহিত্যিক মাত্রেরই এই কথা স্মরণে রাখা উচিৎ যে তাঁহার লেখা শুধু তাঁহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

*মাসিক মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

## পল্লীর প্রতি নারীর কর্ত্তব্য
### আংশিক

*যদি আমার সন্তোষ লাভ করতে চাও, তবে গরীব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট কর।*

(কোরান শরিফ)

মহিলাগণ মনে করেন, তাঁহাদের যা কিছু কর্ম্মক্ষেত্র কেবল অন্তঃপুর ও সহরে ; কিন্তু অন্তঃপুরেই যে কর্ত্তব্যের শেষ হয় না—তাহাদের অনেক কর্ত্তব্য ও কর্ম্ম বাহিরেও থাকে—শিক্ষার অভাবে এ কথা তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। পল্লীই যে দেশের প্রাণ, হিন্দু ও মুসলমানের তিনভাগ লোক পল্লীতেই বাস করে। তাহার মধ্যে মুসলমানই

অধিক। এই শ্রেণীর লোকেরাই দেশের অন্ন যোগাইয়া থাকে। যাহারা পৌষে ভাত যোগাইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরণের দ্বারে গিয়া পৌঁছায়, তাহাদের দিকে সুধীজনের দৃষ্টি পড়ে না। তাহাদের ঘরের পাশে পচা ডোবা, পচা পুকুরের পানির প্রাচুর্য্য। কিন্তু অন্ন যাহারা যোগায়, তাহাদের সংখ্যা যে উপেক্ষণীয় নহে এবং জাতির উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের বাদ দিলে চলিবে না—যাহারা জাতির এতখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহাদের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। এ সব কথা আজ গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পল্লীর উন্নতি নাই বলিয়া মুসলমান সমাজও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ; কারণ দুটি চারিটী জোনাকীর আলোতে ঘনীভূত অন্ধকার দূর হয় না। আজ আর বসিয়া থাকিবার দিন নাই। পুরুষ কেন ? পল্লীর কল্যাণ নারীকেও ভাবিতে হইবে। তাহার যতটুকু সাধ্যে কুলায় পল্লীর জন্য তাহা করিতে হইবে এবং এইভাবে চলিলে সমাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে।

পল্লীর ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য খানা ডোবা ভরাট করা, বন-জঙ্গল সাফ করা নারীর পক্ষে কষ্টসাধ্য সত্য। কিন্তু যিনি যতটা পারেন, বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া দুইদশজন বালিকাকে শিক্ষা দান করা বোধ হয় কাহার পক্ষে তেমন কষ্টকর হইবে না। তাহাতে অন্ততঃ কিছু আলো ছড়াইয়া পড়িবে। ইহারই ভিতর দিয়া তাহাদের কুসংস্কারগুলি দূর করিতে পারা যায়। বিনা পয়সায় পড়াইতে চাহিলে আজ কালকার দিনে অনেকেই পড়িতে ইচ্ছুক হইবে। গ্রামে যে কৃষকশ্রেণীর মুসলমান আছেন, তাঁহারা নামে কেবল মুসলমান। কে মুসলিম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ইহাও অনেকে জানে না। জানে শুধু তাহারা শেষ নবীর উন্নত—তাহার পর ইসলাম ধর্ম্ম যে কি ? তাহার বিধানগুলি কল্যাণকর কিনা, কোথায় তাহার উদারতা, কোথায় সাম্য-মৈত্রী তাহা তাহাদের ধারণারও অতীত। ইহা যিনি তাহাদের বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি কেবল শিক্ষা দানই করিবেন না, পূণ্য সঞ্চয়ও করিবেন। তবে তাহাদের এই এক আপত্তি থাকিতে পারে যে একজনের বাড়ী যাইয়া পড়া মুসলমান মেয়ের পক্ষে শোভনীয় নহে ; কিন্তু পড়ার জন্য যে পর্দ্দা ভাঙ্গার হানি নাই বরং মানুষ হইয়া উঠিবার জন্য যে ভাঙ্গাই উচিত, ইহা তাহাদের অভিভাবককে বুঝাইতে পারিলে তাহারা অনুমতি না দিয়া পারিবে না।

. . . গ্রামের নারী কেবল এইটুকু জেনে রাখে যে, দুইটী খাইয়া-পরিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু কেবলমাত্র খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই যে জীবন ধারণের আসল উদ্দেশ্য নহে, ইহাতেই যে জীবনের সফলতা আসে না, ইহা অপেক্ষাও যে জীবনের বৃহৎ কর্ত্তব্য আছে, ইহা তাহাদের বোধগম্য নহে। . . . মুসলমান নারী যে, শিক্ষা-দীক্ষায় এতদূর পশ্চাদপদ্ ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয়। ইহার একটী বৃহৎ কারণ অহেতুকী পর্দ্দা। এই কুসংস্কার নারী শিক্ষার মূলে কুঠারঘাত করিতেছে এবং নারী জাতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্য ইহাও অপর এক বৃহৎ কারণ ; আর ইহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সেজন্য পুরুষেরাই বিশেষভাবে দায়ী।

*গুলিস্তাঁ*, অগ্রহায়ণ ১৩৪০

## প্রথম চা খাওয়া

অজ পাড়া গাঁ। প্রকাণ্ড আটচালার বারান্দার একপ্রান্তে চুল্লীর সন্নিকট একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া বাটীর গৃহিণী হাসিমুখে চুলায় জ্বাল ঠেলিতেছেন। চুলার উপর প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে পানি গরম হইতেছে। অদূরে মোড়ার উপর বসিয়া গৃহিণীর কলিকাতা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত প্রৌঢ় স্বামী গল্প বলিতেছেন ও চার এর পানি ফুটিয়া উঠিবার অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি জীবনে প্রথম কলিকাতা দেখিয়া আসিয়াছেন ও প্রথম চা এর অপূর্ব্ব স্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়া গৃহিণীকে চা তৈয়ারী করা শিখাইতেছেন। চা এমন অপূর্ব্ব জিনিস, গৃহিণীকে ইহারই স্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। গৃহিণী চুলায় জ্বাল ঠেলিতেছেন আর এক একবার অবাক্ নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া কলিকাতার গল্প শুনিতেছেন বলিলে ভুল হয়—গিলিতেছেন। আশে-পাশে বধূরা, কন্যারা কেহ রুটি বেলিতেছে, কেহ বা ময়দা মাখিতেছে, কেহ কেহ হাতের কাজ ফেলিয়া অবাক্ মুখে কর্ত্তার পানে চাহিয়া কলিকাতার গল্প শুনিতেছে। একধারে কাঠের খাঞ্চায় কুস্‌লী পাকান নানা প্রকার পিঠা স্তূপাকৃত হইয়া রহিয়াছে। বালক-বালিকাদলের চোখের দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সকলেই এক একবার ডেক্‌চির দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিতেছে, পানি ফুটিল কি'না এবং অন্তরে অন্তরে চা এর অনাস্বাদিত আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। কর্ত্তা আগাইয়া আসিয়া ঢাক্‌নিটা একটু টানিয়া দেখিয়া বলিলেন—'আর বেশী দেরী নেই।' সঙ্গে সঙ্গে খুসীতে মুখ ফিরাইতেই গৃহিণীর কানের আড়ানী, হাতের বাজুর ঝুল সঘনে দুলিয়া উঠিল। মেয়েদের ও বধূদের কানের ঝুমকো দুলিতে লাগিল। গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যইত বেলা হইয়াছে, বধূর সবুজ সাড়ীর আঁচলে রৌদ্র লাগিয়া ঝিক্-মিক্ করিতেছে। বিস্ময়ে বধূদের, কন্যাদের জামদানী সাড়ীর আঁচল ধূলায় লুটাইতেছে হুঁস নাই—কি দিন আজকে। কর্ত্তাও রৌদ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—'বেলা হয়েছে।' তারপব আবার সগৌরবে কহিলেন—'গিন্নি চিড়েখানায় যখন সিংহ ডেকে উঠ্‌লো সে কি! পহেলা ত ডরই লেগেছিল। আর পানির মধ্যি যে জলহাতী আছে, কি যে তার চেহারা না দেখলি বুঝার যো নেই! কত রং-বেরং-এর পাখ্-পাখলী অত কয়ে শেষ করা যায় না! আমার ইচ্ছা করে তোমারে দেখাতে।' গৃহিণী খুশীর আতিশয্যে সজোরে মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন— 'না বাবা! আমার ডর করে।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাকের নথ সগৌরবে দুলিয়া উঠিল। এমন সময় চাএর পানিও ফুটিয়া উঠিল। তাহা আর কাহার চোখে পড়িবার আগে কর্ত্তার নজরেই পড়িল। কর্ত্তা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'গিন্নি নামাও নামাও পানি ফুটে গেছে!' গৃহিণী কর্ত্তার চীৎকারে দিশা না পাইয়া পাশে ন্যাতা থাকিতেও সাড়ীর আঁচল দ্বারাই হাড়ী নামাইলেন। কর্ত্তা সগৌরবে আগাইয়া আসিয়া পানিতে চা এর পাতা ফেলিলেন। সকলের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল কি হয়। কর্ত্তা একটু থামিয়া চা ছাকিয়া দুধ-চিনি মিশাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকাদের মধ্যে সোর পড়িয়া গেল—'আমাকে আগে, আমাকে আগে।' হাসিতে, কথাতে, মৃদু চীৎকারে রীতিমত একটা সোর পড়িয়া গেল। কর্ত্তা অতিকষ্টে এক এক পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। বালক-বালিকা, বৌ-ঝি ভাল লাগার অপেক্ষা ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ছোট বধূ লজ্জায় দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল ; গৃহিণীর তাহার দিকে নজর পড়িবা মাত্র কহিলেন—'ও মা ! তুমি ওখানে শিগগীর এসো।' ছোট বধূ আগাইয়া আসিলে তিনি তাহাকে বেশ খুশী করিবার জন্য চাএর পরিমাণ একটু বেশী করিয়া দিলেন। আজ তাঁহার চাল-চলনে আনন্দ ও গর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছিল। গ্রামের মধ্যে তাঁহার স্বামীই কলিকাতা গিয়াছেন ও চা এই নূতন জিনিস তাঁহার বাড়ীতে প্রথম খাওয়া হইতেছে। এ গর্ব্ব ও আনন্দ তাঁহার প্রত্যেক কাজে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাই বাড়ীর রাখাল বালক চাহিলে তিনি তাহাকে বাটীটা পূর্ণ করিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে কর্ত্তা ও গৃহিণী চা খাইতে খাইতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া চা পান পর্ব্ব শেষ হইলে কর্ত্তা গৃহিণীর পানে কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন—'কাল ঈদের দিন, নূতন জামাই আসিলে চা তৈরী করিয়া দিবার সময় তাঁহাকে যেন ডাকা হয়।'

দুইপাশে স্বর্ণ বর্ণের সরিষা ক্ষেত। মাঝখানের সরু পথ ধরিয়া নূতন জামাইয়ের পাল্কী বহিয়া বেহারারা আসিতেছিল। শীতের বাতাস সরিষা ক্ষেতকে দোল দিয়া বহিতেছিল। দূর বনানীতে মর্ম্মর ধ্বনি জাগিতেছিল। বসন্তের ফুল কোথাও ফুটিয়াছিল না বটে ; কিন্তু বরের মনে লাল, গোলাবী, হল্‌দে বহু বর্ণেরই ফুল ফুটিতেছিল বেহারারাও নূতন জামাই লইয়া যাইতেছে বলিয়া মনের আনন্দে গাহিতেছিল—"নদী কিনারে বগিলা চরে চুন্ চুন চুনি দানা খায়।" অবশেষে পাল্কী বাড়ীর দুয়ারে আসিলে বর মুখের হাসি লুকাইবার জন্য তাড়াতাড়ী মুখে রুমাল দিল। শালা, শালী, নানীশাশুড়ী সকলেই হাসি মুখে আগাইয়া আসিল। নানীশাশুড়ী পাল্কীর নিকট আগাইয়া গিয়া কহিলেন,—"কি গো, নূতন জামাই ! একি আমাকে মনে করে আসা হয়েছে—না কনেকে ?" প্রত্যুত্তরে নূতন জামাই হাসিয়া উত্তর দিল,—"আপনাকে।" "তাই বটে" বলিয়া নানীশাশুড়ী বরের নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে আগাইয়া গেলেন। শালা-শালী সকলেই বরের পিছু পিছু আসিয়া জড় হইল। বর বসিলে নানীশাশুড়ী খাবার লইয়া আসিলেন। বর হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল বটে ; কিন্তু কোনটাই তাহার খাওয়া হইতেছিল না। তাহার চক্ষু দুইটী কেবল কাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল দেখিয়া নানীশাশুড়ী কহিলেন,—"বুঝেছি নাত্‌জামাই ! তুমি একা খাবে না।" এই বলিয়া তিনি বালক-বালিকা, শালী শালাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোরা যা, না হলে ত নাত্‌নি লজ্জা করে নাত্‌জামাইএর সঙ্গে খাবে না।" বলিয়া তিনি নাতনীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। বালক-বালিকা, শালা-শালীরা একাগ্রচিত্তে সকৌতুকে বর দেখিতেছিল। তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। নানীশাশুড়ী কাজের লোক। তিনি নাতনীকে প্রায় টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া বরের পাশে বসাইয়া দিয়া কহিলেন,—"নাতজামাই ! এবার কিন্তু সব খাওয়া চাই।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন ও একটু

পরে ধুমায়িত দুইপেয়ালা চা লইয়া আসিয়া দুইজনের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"এবার বুড়ী আপদ বিদায় হচ্ছে, তোমরা মনের সুখে খাও।" বলিয়া বাহির হইতে শিকল দিয়া চলিয়া গেলেন। বর এ পর্য্যন্ত বধূকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। সে পিছন হইতে চুপ করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"ফেরো।" বধূ সরমে ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। বর দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিল—এ যেন কোন অমরার সৌন্দর্য্য রাশি বহিয়া আনিয়াছে। সে মিনতির কণ্ঠে কহিল,—"কথা কও।" বধূ অধিক সরমে আপনার কোলে মুখ লুকাইল। বর দুইহাতে বধূর মুখ তুলিবার চেষ্টা করিয়া না পারিয়া ছাড়িয়া দিল। বধূ ঘোমটা টানিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। বর ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া উহার একটী কথা শোনা যায়। কেমন করিয়া আলাপ করা যায়! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তাহার মুখের কাছে সেই চায়ের কাপ যেই তুলিয়া ধরিল, অমনি দুষ্টু কনে হাসিয়া ঠেলা দিতেই বরের হাত হইতে পেয়ালা পড়িয়া গিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ছড়াইয়া পড়িল। এবার বোকা-বনিয়া-যাওয়া বরের পানে চাহিয়া কনে একবার খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বর বোকা বনিয়া গিয়াও না হাসিয়া পারিল না। এমন সময় খাবারের তাকিদ দিতে নানীশাশুড়ী আসিয়া শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই ব্যাপার বুঝিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং ঠাট্টা-সম্পর্কীয়াদের উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—"ওলো! তোরা আয়, নূতন বরের কীর্ত্তি দেখে যা।" ঠাট্টা সম্পর্কীয়াদের কানে কথা যাইবা মাত্র তারা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়া ঘর ভরিয়া ফেলিল। তাহার পর হা হা, হো হো, হি-হি হাসির ধ্বনিতে ঘর ভরিয়া গেল। আর বর-কনের মনে এক স্বর্গীয় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

*গুলিস্তাঁ*, পৌষ ১৩৪০

## বর্ত্তমানে নারীর কর্ত্তব্য
আংশিক

. . . অজ্ঞতার ফলে নারীকে কত অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। আমাদের দৈনন্দীন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কত অসহ্য জ্বালায় আমাদিগকে জ্বলিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে বিবাহ ব্যাপার একটী। সমাজের খামখেয়ালী প্রথামত প্রত্যেক কুমারীকে বিবাহ দিতেই হইবে, যে কুমারীর বিবাহ সে বিবাহ করিতে সম্মত কি না বা সে বিবাহের উপযুক্ত কি না, বা এখন তাহার বিবাহ হইলে ইহার ফল কি দাঁড়াইবে এসব দিকে সমাজের যেন দেখিবার কিছু নাই। নারী-সমাজের মূর্খতা ও অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে নারীর কত না দুর্গতি। যেখানে দাবী তাহার খুবই বেশী সেই স্বামীর ঘরে তাহাকে ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়।

নারী যেন জানিতেছে সে তাহাই, তাহাকে সুখে হোক দুঃখে হোক সারাটী জীবন মুখ বন্ধ করিয়া কলের পুতুলের মত চলিতে হইবে—তাহার একটী অভিলাষ একটী ইচ্ছাও জনমে প্রকাশ পাইবে না। এমনি ভাবে জীবিতে মরিতে হইবে তাহার উপর সে বিধবা হইলে তখন তাহার দুটা ভাত কাপড়ের জন্য যে লাঞ্ছণা ভোগ করিতে হয় তাহাতে সে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করে। মানব জনমে ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে ? এই জীবনের কোথায় সার্থকতা অছে ? এমন জীবন, মানুষ হইয়া আমরা বহন করি ? এই জীবন হইতে, এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নিজে উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখিতে হইবে—যাহাতে নিজের মনে না হয় আমি একান্ত অসহায়া, দুর্ব্বলা, যাহাতে পুরুষের মনে না হয়, "আমি ছাড়া, নারীর গতি নাই।" নিজেকে অসহায়া দুর্ব্বলা মনে করিলে হৃদয়ে যে দুর্ব্বলতা জাগে তাহাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতা জগতে কোন উপকার করিতে পারে না। আর আপনার উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রহিলে হৃদয়ে যে সবলতা থাকে তাহা অন্তরকে সজীব রাখে। দুর্ব্বলতা পাপ, এই দুর্ব্বলতা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।

*মোয়াজ্জিন*, ৩য় বর্ষ, আষাঢ়-চৈত্র ১৩৩৮

## তথ্যসূত্র

১. নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩), *আনোয়ারা* (প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ১৯১৪ ; পুনর্মুদ্রণ ঢাকা : আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮৮) এবং *গরীবের মেয়ে* (প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ১৯২৪ ; পুনর্মুদ্রণ ঢাকা : আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮৮) নামে দুটি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাস দুটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি পাবনা শহরে থাকতেন, সেখানে শিক্ষকতা এবং লেখালেখি করতেন। তাঁর গল্পের নারী চরিত্ররা বেশির ভাগই আদর্শ স্ত্রী ও মায়ের দৃষ্টান্ত, স্বামীর হাতে গড়া, অল্পবিস্তর শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণা। এই স্বামীরাও নব্যশিক্ষিত, মাদ্রাসাশিক্ষার বাইরে তারা কিছু কিছু ইংরেজিশিক্ষাও পেতে শুরু করেছে।
নজিবর রহমান সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আলোচনা করেছেন তাঁর সাক্ষাৎকারে, দ্র. এই সংকলন, পৃ. ২৯৯

২. দ্র. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের সাক্ষাৎকার, এই সংকলন, পৃ. ২৬৩

# রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী
## অসমাপ্ত শিল্পীজীবন
### ১৯০৭-১৯৩৪

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর জন্ম হয় ১৯০৭ সালে, নোয়াখালিতে। বাবা আবদুর রশিদ খান, মা হাজেরা খানম। আবদুর রশিদ খান কলকাতা করপোরেশনের তৎকালীন মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, দেশবন্ধু তাঁকে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। সেই সূত্রে রাজিয়া খাতুনের ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময়ই বাড়ি থেকে দূরে, কলকাতা প্রবাসে কেটেছিল। নোয়াখালির বাড়ির মসজিদের ইমামের কাছে রাজিয়া খাতুনের লেখাপড়া শুরু হয়। পরে, তাঁকে বড়মামা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর বাবা) বাংলা, উর্দু, ফারসি এবং ইংরেজি কিছুটা কিছুটা শেখান। কলকাতায় একজন গৃহশিক্ষক আসতেন রাজিয়া খাতুনদের লেখাপড়া করাতে।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর লেখালেখির শুরু বেশ ছোটবেলায়, কবিতা দিয়ে। প্রথম দিকে 'রাজিয়া খাতুন' নামে তাঁর লেখা ছাপা হতো, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (ভিন্নমতে ১৩৩২) বিয়ে হবার পর তাঁর নামের সঙ্গে 'চৌধুরাণী' পরিচয়টুকু যোগ হয়।[১]

কুমিল্লার শুয়াগাজী জমিদার পরিবারের সন্তান আশরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে রাজিয়া খাতুনের বিয়ে হয় ; আশরফ উদ্দীনের তখন বছর তিরিশ বয়স। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক ছিলেন। বি. এল. পাস করার পর আশরফ উদ্দীনের বিলেত যাবার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তখনই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের কাজে মেতে ওঠেন। সে সময় তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়। দেশভাগের পরেও তিনি খদ্দর আর গান্ধীটুপি পরেই তাঁর জীবনের বাকি বছরগুলো কাটিয়ে গেছেন।[২]

অসমবয়সী, আদর্শবান স্বামীর সঙ্গে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর একটি বিরল, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামীকে লেখা চিঠি (কয়েকটি এখানে সংকলিত) সেই বন্ধুত্বের সাক্ষ্য বহন করে। রাজিয়া খাতুনের প্রবন্ধে, গল্পে তাঁর প্রতিভার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তেমন কোনও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'চোখবাঁধা ঘানির বলদ ও বঙ্গীয় মোসলেম মহিলায় বিশেষ পার্থক্য নাই'[৩]— এমন মন্তব্যে রোকেয়ার প্রভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তুলনায় স্বামীর অনুরোধে রচিত দু' একটি রাজনৈতিক কবিতা এবং গানের স্বকীয়তা অনেকটাই বেশি বলে মনে হয়।[৪]

তবে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর শিল্পীমনকে সবচেয়ে চমৎকার ফুটিয়ে তোলে তাঁর চিঠি।

লেখিকার জীবদ্দশায় তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি *উপহার* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ, অন্যটি একটি গল্পের সংকলন—*পথের কাহিনী*।[৫] তাঁর প্রবন্ধ গল্প কবিতা ছাপা হত *সওগাত, নওরোজ, নয়া বাংলা, মোহাম্মদী*-তে। ১৯৮২ সালে কুমিল্লার আবদুল কুদ্দুস সাহেব তাঁর লেখাগুলি সংগ্রহ করে *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর রচনা সংকলন* নামে একটি বই সম্পাদনা করেন।[৬] বইটি প্রকাশ করেছিলেন রাবেয়া খাতুন, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর দ্বিতীয় সন্তান। রাবেয়া খাতুনের যখন স্রেফ সাড়ে তিন বছর বয়স ছিল, তখন তাঁর মা মারা যান।

বাবার মতন রাজনীতির জগতের মানুষ রাবেয়া খাতুন। কুমিল্লা শহরে থাকেন, তাঁর প্রতিদিন খুব ব্যস্ততায় কাটে। তবু তারই মধ্যে প্রায়-না-দেখা মায়ের জন্য একটু সময় করতে রাবেয়া খাতুনের অসুবিধা হয় না। আমাদের তিনি মায়ের ছবি, চিঠি দেখাচ্ছিলেন খুব যত্ন নিয়ে। এমন করেই ষাট-পেরোনো মেয়ের বহুকাল হারানো মাকে নির্মাণ—শোনা কথা, খুঁজে পাওয়া লেখা, ছেঁড়া চিঠি আর আবছা স্মৃতি দিয়ে। এই নির্মাণের মধ্যে সত্য আর কল্পনা, স্মৃতি বিস্মৃতি মিলে মিশে যাচ্ছিল, আর সেদিন ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারির এক সকালে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী আমাদের সামনে হাজির হচ্ছিলেন তাঁর অসমাপ্ত শিল্পীজীবন নিয়ে।

'আমার তখন সাড়ে তিন বছর, আমার মা যখন মারা যান। আমার বড় বোন, ওর নাম সালেহা, ওর পাঁচ বছর। ছোট বোনটা হবার পাঁচ মাস পরেই মা মারা যান।

'আমার বাবা সব সময় জেলে জেলে থাকতেন। মা এত অনুভূতিপ্রবণ মহিলা ছিলেন, উনি আমার বাবার অভাবটা খুব বেশি feel করতেন। বাবার রাজনীতি, বাবার জেলে যাওয়া, এসব ব্যাপারে consent ছিল ঠিকই কিন্তু তবু ওনার অভাবটা খুব বেশি feel করতেন। আমার মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। মারা যাবার কিছু মাস আগে থেকে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে মারা যাবার ঠিক আগে আগেই ওঁর ক্ষয়রোগও ধরা পড়েছিল। বিধান রায় চিকিৎসা করেছিলেন। পরে একজন কবিরাজ, শ্যামাদাস বাচস্পতি নাম, তিনিও দেখেছিলেন মাকে। খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই কবিরাজ। মার সেন্সগুলি কিন্তু ঠিকই ছিল, যদিও পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। একবার দুষ্টুমি করে কবিরাজের গায়ে মুর্গির স্যুপ ঢেলে দিয়েছিলেন!

'এসবই আমার নানী, খালাদের কাছে শোনা। ওঁদের হাতেই আমরা মানুষ হয়েছি, নানার বাড়িতে। মায়ের মৃত্যুর পর আমরা অনেকদিন পর্যন্ত কলকাতায় নানাবাড়িতে থেকে গিয়েছিলাম। চার সুরাওয়ার্দি অ্যাভেনিউ। বাবা জেলে গেলে মা কুমিল্লা থেকে কলকাতায় চলে আসতেন। বাবাকে বেশির ভাগ দমদম সেন্ট্রাল জেলেই রাখত। তখন মাসে দু' একবার মাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিত।

'আমরা তখন ছোট ছোট, আমাদের তেমন কিছু মনে নেই। আমার শুধু শেষ একটা ছবি মনে পড়ে। আম্মা মারা গেছেন, আর তাঁর চুলগুলো খাট থেকে ঝোলানো রয়েছে। আমার মায়ের খুব লম্বা লম্বা চুল ছিল। মারা যাবার পর বোধহয় ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর, আগরবাতি-টাতি জ্বালায় তো—আমার মনে হয় যেন এখনও সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগছে।

'আম্মার বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। মা'রা আট ভাইবোন, মা সবচেয়ে বড়। মায়ের যখন বিয়ে হয় নানীর তখন এই একত্রিশ বত্রিশ। তখন পর্দাপ্রথা ছিল খুব, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ; আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক প্রথাটা এইরকম ছিল যে মেয়েদের স্কুলকলেজে পড়ার ব্যাপারে নিষেধ ছিল। তাই আমার মার আর স্কুলে যাওয়া হয়নি, বাড়িতেই পড়াশুনো শিখেছেন। বিয়ের পর বাবার উৎসাহ ছিল মায়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে। কিন্তু তার আগেই মা অল্পস্বল্প লেখালেখি শুরু করেছিলেন। 'উপহার' নামে একটা ছোট কবিতার বই ছাপা হয়েছিল, 'মানুষ' কবিতাটা ছিল তাতে। ওই কবিতাগুলো মার নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে লেখা।

'আম্মার পরের বোন বিয়ের আগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন, বিয়ের পর এম. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। সইফুরা হোসেন চৌধুরী। ওনার স্বামী জজ ছিলেন, তাঁর ইচ্ছাতেই খালার অতদূর পড়া হয়েছিল। মেজো খালা খুব ভাল গান করতেন। রেডিওতে না, এমনি বাড়িতেই গাইতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত গান করেছেন। বাড়িতে ঐ যে পর্দা ছিল, নানী খালারা সবাই পর্দা করতেন। আমার বাবার বাড়িতেও পর্দা ছিল। আমরাও তো এই সেদিন পর্যন্ত বোরখা পরেছি।

'আমরা খুব ছোটবেলায় কলকাতায় নিরুপমা দেবীর 'শিশু বিদ্যাপিঠ' বলে একটা স্কুলে পড়েছি। তারপর নানা ভর্তি করে দিলেন কলকাতারই ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে। তারপর, যখন আমার এইট-নাইনে পড়ার সময়, তখন বাবা শুয়াগাজির গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলেন। আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করেছি। কলকাতায় রায়টের সময় লীলা রায় (নাগ)—*জয়শ্রী* পত্রিকার লীলা রায়—আমাদের বাসায় আসতেন।[৭] আমরা 'পিসিমা' বলতাম। উনি আমাদের খুব দেখতেন। বলতেন, স্কুল কলেজে যাওয়া হচ্ছে না তো বাসাতেই পড়ো। আর মালবিকা মিত্র নামে এক মহিলা আমাদের পড়াতে আসতেন।

'আম্মা ইংরাজি বাংলা ফারসি, তিনটে ভাষা জানতেন। বিয়ের পর আম্মা যখন শুয়াগাজির গ্রামের বাড়িতে আসেন, তখন উনি লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন। রান্নাবান্না খুব ভাল পারতেন না। বাড়িতে প্রায় তিরিশ চল্লিশজন মেয়ে কাজ করত। গ্রামের মেয়েদের আমার মা লেখাপড়া শেখাতেন, একটা স্কুলের মতো করেছিলেন বাড়িতে। লেখাপড়া, সেলাই—মানে, গ্রামের মেয়েরা ওনার উপর নির্ভরশীল ছিল, যে কোনও ব্যাপারে আম্মার পরামর্শ নিত, যেটা আমাদের জমিদার বাড়িতে খুব দুর্লভ ছিল। আম্মা জমিদার বাড়ির নিয়মটাই পাল্টে দিয়েছিলেন। জমিদার বাড়ির শ্রেণী বিভাগটা। দুটো কাজের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন, বিয়ে দিয়েছিলেন।

'এইসব নিয়ে কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে কোনও অসুবিধা হয়নি। আমার দাদা [ঠাকুর্দা] ছিলেন না, তবে দুই দাদী ছিলেন। কেউই আম্মার কাজে বাধা দিতেন না। শিক্ষিতা বলে ওনার একটা আলাদা সম্মান ছিল। সকালবেলায় খুব তাড়াতাড়ি সুজি লুচি, এইসব কিছু একটা নাস্তার জোগাড় করে, ঘরদোর একটু গোছগাছ করে, শাশুড়িদের চুলটুল বেঁধে দিয়ে নিজের ঘরে এসে বইখাতা নিয়ে বসে পড়তেন। খাটের উপরে, চারপাশে বই ছড়ানো থাকত। বাবা হয়ত বাইরে গেছেন, ফিরে এসে দেখতেন ঐভাবে আম্মা বসে আছেন। বাবার কাছে শুনেছি এইসব কথা। বাবার উপর আম্মার একটা মস্ত প্রভাব ছিল। বাবা আমাদের প্রায়ই বলতেন, "আমি তো একটা জংলি ছিলাম। তোদের মা-ই আমাকে মানুষ করেছিল।" একবার রাগ করে বাবা একটা কাজের মেয়েকে থাপ্পড় মেরেছিলেন। পরে ঘরে এসে দেখেন আম্মা চুপ করে বসে আছেন আর চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি পড়ছে। মা বলেছিলেন, "ছিঃ, তুমি একটা মেয়ের গায়ে হাত তুললে!" বাবা পরে আমাদের এই ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "সেদিন আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল।" বাবা আম্মাকে "রাজু" বলে ডাকতেন।

'ফুফুদের কাছে শুনেছি, আম্মার স্বভাবটা এমনই মধুর ছিল যে, ওঁরা কেউ যদি ভাবীর একটা শাড়ি বা কিছু পছন্দ করতেন, অমনি আম্মা সেটা ওঁদের দিয়ে দিতেন। আম্মা নিজে অবশ্য সব সময় খদ্দর পরতেন। বিয়ের শাড়িটাও খদ্দরের ছিল। তাতে জরির কাজ করা ছিল। আম্মার গয়না ছিল অনেক। তার থেকে অনেকটা বাবাকে *নয়া বাংলা* নামে একটা পত্রিকা করার জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুটা দিয়েছিলেন এক দেওরের চিকিৎসার জন্য [সে অবশ্য বাঁচেনি]। আর অনেক গয়না আম্মা পাগল হবার পর কলকাতার চারতলার ছাদ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

'একটাই সখ ছিল আম্মার, তখন যত পত্রিকা বের হতো, নানাকে বলতেন সব এনে দিতে। *সওগাত*, *মোহাম্মদী* . . .। ঐসব পত্রিকায় মা লেখা পাঠাতেন। ডাকে, অথবা কারও হাতে। *মোহাম্মদী*-র আকরম খাঁর ছেলে এসে আম্মার কাছ থেকে লেখা নিয়ে যেতেন। *সওগাত*-এর নাসিরুদ্দীন সাহেব ছিলেন। আমার মা'র প্রবন্ধগুলো খুব ভাল। কবিতাগুলোও। গল্পগুলোতে একটা মুসলিম মুসলিম ভাব আছে। কবিতার আধ্যাত্মিকভাবটা আমার ভাল লাগে। বাবার জন্য আম্মা ঐ 'চাষা' কবিতাটা লিখেছিলেন। আর একবার বাবাদের একটা সভার জন্য একটা কবিতা লিখেছিলেন, তাতে সুর দিয়েছিলেন কুমিল্লার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য :[৮]

মরণ সাগরতীরে বসে গাহি
জীবনের জয়গান
মরণের পারে বসে আছি যারা
এ তো তাদেরই অভিযান।

'সুফিয়া খালাম্মার একটু জুনিয়ার ছিলেন আম্মা [আসলে, সুফিয়া কামালই

ছিলেন বয়সে ছোট]। আমাকে একবার খালাম্মা বলেছিলেন, "রাজিয়া যদি বেঁচে থাকত, তাহলে ও অনেক বড় লেখিকা হতো।" আম্মার ডাক নাম ছিল ননী। বড় হতে হতে কত শুনেছি, ননী এমন ছিল, ননী তেমন ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আম্মার ছায়া পাইনি।'

ম.ভ.
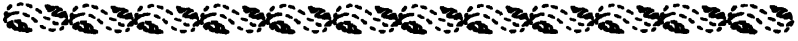
## সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান

অত্যাচার ও দুঃখভার প্রপীড়িতা নারীর বিষয় কিছু লিখিতে গেলেই মনটা ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। অতীতে আমাদের সমাজে চাঁদ সুলতানা, নূরজাহান, জাহানারা, জেবউন্নিসা প্রভৃতি ছিলেন, এসব কথা বলায় লাভ আছে কি ? আছে শুধু ক্ষণিকের সুখ আত্মপ্রসাদ। অতীতের মোহে আত্মহারা হওয়া ঠিক নয়, আবার অতীতের কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। অতীতকে মনে রাখিব ও অতীতের আলোচনা করিব ভবিষ্যতকে তদপেক্ষাও ভাস্বর ও প্রভদীপ্ত করিয়া তুলিতে।

এতদিন মোসলেম নারী সমাজ সমস্ত অবিচার সহিয়াও নীরব ছিল, কেননা পৃথিবী তাহাদের গৃহমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দু একজন করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইতেছেন। তাই ক্রমে তাহাদের চোখ ফুটিতেছে। ইহাতে সমাজের প্রাচীনপন্থী দল বলিতেছে, "তাইত ! লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েগুলোর ঘাড়ে ভুত চাপিল। উহাদিগকে হেরেমের কঠোরতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে উহারা বাঁচিবে না।" আমরা যে এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, তাহাই আশ্চর্য। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি হইয়াছে, গভর্ণমেন্টের দয়ায় মানুষ খুন করিলে ফাঁসী হয়, আর আমরা যে এতগুলি প্রাণী আলো হাওয়া বঞ্চিত হইয়া আশা, আনন্দ ও উৎসাহ শূন্যভাবে অন্তঃপুরের কঠোর অবরোধ ও পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে মরিতেছি, সেদিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া পথে ঘাটে বেড়ানো পছন্দ করি না, কারণ তাহাতে নারীর সম্ভ্রম, সৌকুমার্য কোমলতা নষ্ট হয়। শরিয়তে যতটা পর্দা আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা অর্থ রাস্তায় নাচিয়া বেড়ানো নয়, আমরা চাই প্রকৃত মুক্তি, যা মনকে উন্নত, মহান, পবিত্র, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করে ; নিজের ধর্ম ও সত্যেরে সহিত পরিচিত করে ; অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বিভিন্ন তথ্য আমাদের মনোগোচর করিয়া দেয়। সমাজ কি এইটুকুও দিতে পারে না ?

পুরুষ আমাদের সম্মান ও মর্যাদা করে গুণানুসারে। কন্যা, মাতা, ভগিনী বা সহধর্মিনী বলিয়া নয়, আমরা সৌন্দর্য, রন্ধন ও সেবায় কতটা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারি, তাহাই তাঁহার দেখেন। সাধারণতঃ এই তুলাদণ্ডেই আমাদের ওজন

করা হয়। এই দিক দিয়া যদি কোথাও ত্রুটি থাকে, তবে সে নারীর আর নির্যাতনের সীমা থাকে না। তাহারা এটুকু বিচার করে না যে, নিখুঁৎ সুন্দরী বধূর স্বামীরূপে অন্ততঃ সুশ্রী বলিয়া দাবী করিবার এবং কর্ম-নিপুণা, পতিব্রতা ও সতী স্ত্রীর স্বামীরূপে কর্মঠ, স্নেহময় ও চরিত্রবান নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের আছে কি না! এই 'সতী' শব্দটা এক প্রহেলিকা। ইহা নারীদের প্রতি সর্বস্থানে এবং যখন তখন প্রয়োগ করা হয়—কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করার মত ইহার প্রতিশব্দ, বাংলা, বা এমন যে সভ্য ইংরেজি ভাষা, তাহাতেও নাই। 'সতীত্ব' (Chastity) এসব বুলি একমাত্র নারীর জন্যই একচেটিয়া ভাবে তৈরী হইয়াছে। ইহা কি পুরষের নৈতিক হীনতার পরিচায়ক নয়? অবশ্য নৈতিক চরিত্র বলতে শুধু একদিক বুঝায় না, চরিত্রগত সমুদয় গুণকেই বুঝাইয়া থাকে। "স্বৎ" শব্দ হইতেই "সতীত্বের" উৎপত্তি। সুতরাং মানব চরিত্রের যে কোন গুণের হ্রাস পাইলেই তাহাদের 'অসৎ' 'অসতী' শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করা হয়, পুরুষের প্রতি 'অসৎ' শব্দ কি সেইভাবে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে?

আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়, যখন চরিত্রহীন স্বামী পত্নীর মাথার ঘোমটা পড়িলে ক্রুদ্ধ হন, আবলুশনিন্দিত দেহের বর্ণ লইয়া পুরুষ অপ্সরা বা ডানাকাটা পরী কামনা করেন এবং ষাট বৎসরের প্রৌঢ় ষোলবৎসরের তরুণী ঘরে আনিতে উৎসুক হন! সমাজেও নারীর মর্যাদা এই।

পল্লীগ্রামে অনেকের অভ্যাস আছে পত্নীকে প্রহার করা। ইহা যে পল্লী মানবের বৈশিষ্ট্য, তাহা বলি না; কারণ অনেক শহুরে ভদ্রলোকও প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় উপরোক্ত গুণটার সদ্ব্যবহার করেন। তবে শহরে লোকলজ্জা ও নারীর তেজস্বিতার ভয়ে এবং পারিপার্শ্বিক শিক্ষার গুণে ইহা সংক্রামক হইতে পারে না। মোটের উপর অত্যাচারী ও অনাদরকারী শিক্ষিত স্বামী অপেক্ষা অশিক্ষিত স্বামী অনেক ভাল। তাহারা স্ত্রীর বিশেষ কোন ব্যবহারকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ভাবিয়া প্রহার করে, উহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র; কিন্তু শিক্ষিতের ক্রোধ এ অবহেলা বড় ভয়ানক। তাহা অনেক নারী জীবনকে দুঃসহ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। অনেক উৎপীড়িতা পল্লীনারীর সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহার এই উত্তেজনামূলক প্রহারকে স্নেহের দাবী ও অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। তবে পল্লীতেও অসুখী নারী আছে। অত্যাচারের ধারাও সব সময় এক নয়। পল্লীর পুরুষগণ সাধারণতঃ শহুরে ভদ্রলোকের ন্যায় মাতাল ও চরিত্রহীন হয় না। তাহারা সকলেই যে মহাধার্ম্মিক, একথাও বলি না। ভালমন্দ সব সমাজেই আছে। এই সমস্ত কলঙ্কের প্রতিকার নারীর হাতেই। তাহারা শক্তিময়ী ও তেজস্বিনী হইলে কাপুরুষের সাধ্যও নাই যে অত্যাচার করে।

অতএব দেখা যায়, সমাজে আমাদের আদর শুধু রূপ ও সেবার জন্য,—সম্বন্ধ হিসাবে নয়। অনেক স্থলে, রূপই গুণ অপেক্ষ অধিক সমাদর লাল করে। যে গৃহে দুই স্ত্রী, সে গৃহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপ যৌবনের আকর্ষণেই পুরুষ নারীকে গ্রহণ করে এবং যে নারী পতি সেবা অধিক করিতে পারে, তারই অধিক খ্যাতি

হয়। কেহ যেন মনে করিবেন না আমরা নারীসমাজকে পুরুষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাই ? আমরা নারীকে গৃহলক্ষ্মী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণকে সংযত ও সংহত করিতে বলি, নিজের স্থান অধিকার করিয়া সম্রাজ্ঞীস্বরূপ হইতে বলি। দুনিয়াতে পুরুষ ও নারীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। পুরুষ কর্ম, নারী শক্তি ; পুরুষ কর্মক্ষেত্রে, নারী গৃহ ; পুরুষ লালসা, নারী তৃপ্তি ; পুরুষ কামনা, নারী সংযম ; পুরুষ উগ্র আবেগ, নারী শান্তি। দুইয়ের মিলনেই সংসার মধুময় হয়, তাই বিবাহের উৎপত্তি। এই Co-operation বা সহযোগমূলক বিবাহকে লোকে আত্মবিক্রয়ে পরিণত করিয়াছে। মনোরঞ্জন যেখানে বাধ্যতামূলক, সেখানেই গণিকাবৃত্তির উৎপত্তি। আমরা বারাঙ্গনাদিগকে ঘৃণা করি ; কিন্তু ঘরে ঘরে গণিকাবৃত্তি চলিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য করি না। স্বামী ভালবাসে না, তবুও তাহাকে রূপ যৌবন ও বেশভুষার আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, তবুও নিত্য নব সাজে সজ্জিতা হইয়া তাহার মন ভুলাইতে হইবে। ইহাকে শুদ্ধ ভাষায় "পাতিব্রত্য" বলিতে চাও বল, কিন্তু আমার মতে তাহা ঠিক উল্টা। স্বামী যদি ভালবাসে তবে স্ত্রীও মনোরঞ্জন করিবে,—তাই বলিয়া গণিকা সাজিবে কেন ? কয়টি সন্তান পবিত্র মনোভাব হইতে উৎপন্ন ? তাই সেগুলির মনও হয় পিতামাতার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও লালসাদীপ্ত, ইংরেজীতে যাহাকে বলে "Flirtation"। অনেক স্বামী নূতনত্বের নেশা কাটা পর্যন্ত স্ত্রীর মুখ দেখেন, তৎপরই আবার নূতন ফুলের সন্ধানে ছোটেন। স্ত্রীরও উচিত দৃপ্তভাবে তেজস্বিতা, যুক্তি ও ভালবাসা দ্বারা স্বামীকে ফিরাইবার চেষ্টা করা। ইহাতে অকৃতকার্য হইলে সরিয়া পড়া—কুকুরের ন্যায় পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ানো কোন মতেই উচিত নয়।

অনেকে বলেন, বিবাহে প্রেম হয় না—প্রেম কামনাহীন। একথার কোন ভিত্তি নাই। প্রেম পাত্রের মধ্যে সর্বকামনা ও আকাঙ্খার সমাপ্তি করিয়া কুৎসিত, পুরাতন ও বৃদ্ধকেও যে ভালবাসায় সুন্দর, নিত্য-নূতন এবং প্রাণময় করিয়া দেখিতে পারে, সেই-ই যথার্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা। নৈকট্য লালসাকে সংযত ও সংহত করে, উগ্র প্রেম স্নিগ্ধ করে। হাস্নাহানা যে দিন বেলায় পরিণত হয়, সেই দিনই সাধনার সমাপ্তি। কোন প্রেমই কামনাশূন্য নয়। মাতা কামনা করে—পুত্র বড় হইয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জল করিবে, সুন্দরী ও গুণবতী বধূ আনিয়া তাঁহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিবে। সন্তান চায়—পিতামাতা তাহাদিগকে ভালবাসা, স্নেহযত্ন, উত্তম বসনভূষণ, এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবে। পতি পত্নী চায় পরস্পরের যত্ন, ভালবাসা, সেবা ও সহানুভূতি। আল্লাহতালার প্রতি আমাদের যে প্রেম, তাহাও কামনাময়। তাঁহাকে ভালবাসি বিনা স্বার্থে নয়। এমন যে তাপসী রাবেয়া—তিনিও ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ চাহেন নাই সত্য, কিন্তু মানসিক সুখ চাহিয়াছেন, স্বয়ং আল্লাহতালাকেও তাঁহার প্রেম চাহিয়াছেন। সামাজিক ও পারিবারিক ধারার জন্য অনেকে প্রেমাস্পদকে পায় না। এই ব্যর্থ প্রেম হইতেই কবির কামনাহীন প্রেমের উৎপত্তি। কিন্তু ও মোহ কিছুই নয়, দুইটি নিরাশ প্রেমিকা প্রেমিকার মিলন করিয়া দাও, দেখিবে সেই উন্মত্ত আবেগ

ও মোহ দুইদিনেই প্রশমিত হইয়া যাইবে। তখন সেই সর্ব্বগুণময়ী মানসী তিলোত্তমা ও রামী শ্যামীর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। সর্ব্ব দোষ ত্রুটিসত্ত্বেও বিবাহিত পতি পত্নী পরস্পরে ভালবাসে, সেইটুকু বিবাহের বিশেষত্ব। ইহা অপেক্ষা পবিত্র ও মধুময় প্রেম আর কি হইতে পারে ? মরু মরীচিকার আশায় না ছুটিয়া আল্লাহতালা স্বহস্তে যাহাকে জীবন পথে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই স্ত্রী পুরুষ সকলে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবে গৃহ কল্যাণ ও মঙ্গলময় হইবে। বস্তুতঃ যে গৃহে ও সমাজে নারীর সম্ভ্রম নাই, সে গৃহ ও সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

*সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৪

# মুসলিম মহিলার সাহিত্য সাধনা

গৃহের কর্ম্মক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত, তাই নারী মাত্রেরই বাইরে কাজ করার স্থান অপরিসর। সময়ও সংকীর্ণ। কিন্তু একথা ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে যে দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, শোভা সম্পদ যা কিছু তা আল্লাহতালা প্রকৃতির কোলে ঢেলে দিয়েছেন। সেই প্রকৃতির সঙ্গে যার যতটা যোগ সে ঠিক সেই পরিমাণেই আনন্দ সম্পদের অধিকারী। ফুল ফল ইত্যাদি যেমন স্রষ্টার স্বাভাবিক দান, বোধ হয় সাহিত্যও ঠিক তাই। যদিও এ কথার সমর্থনের জন্য কোন চিন্তানায়কের মত উধৃত করা যাবে না, তবুও মনে হয় এ খুবই সত্য। অন্তরের এমন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস নারীরও থাকা চাই। চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখে মনে হয়, নারী শুধু দেহের খোরাকেই সন্তুষ্ট নয়, মনের খোরাকও সে চায়। আজ যে শুধু এ তৃষ্ণা নারীর মনে জেগেছে তা নয়, এ চিরদিনের— তাই সুদূর পল্লীর কোলে শ্যামল ছায়া ঘেরা কুটীরেও অসহনীয় অবরোধগর্ব্বিতা পল্লীবালার কণ্ঠেও মধুর কিবতা ও গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—

পিঠ পরে পিঠ ঝাঁপা খোপায় কনক চাঁপা
মুখ যেন পূর্নিমার চাঁদ
বাটা ভরা পান গুয়া কর্পূর চন্দন চুয়া
কার আশে পাতে কন্যা ফাঁদ।

এ সব মধ্যাহ্নের অবসরকে আনন্দময় করে কখনো কখনো কর্ম্ম বাড়ীর বিচিত্র কোলাহলমুখর প্রাঙ্গণেও শোনা যায়। কেউ বলেছে—

শতেক রকমে যদি যোগাও রে মন
পর যে পরই থাকে, না হয় আপন

অথবা—

দিন রাত খাওয়া ভাল ঝাটা আর লাথি
তবুওনা খাইওরে কন্যা সতীনের ভাত।

এই ধরণের বহু ছড়া পল্লী গৃহিণীদের মুখে শোনা যায়। বোধ হয় অধিকাংশই তাদের স্বরচিত এবং বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতা ও দুঃখ বেদনার সাক্ষী। এ সব কি দেশ-কাল-শ্রেণী নির্ব্বিশেষে মনের ক্ষুধা ও তা মিটানোর চেষ্টা করার প্রমাণ নয় ? এই মনের খোরাকের নামই সাহিত্য। একে প্রচার, স্থায়ী এবং সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংবাদপত্রের সৃষ্টি। সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্য সময় বা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্তরের ক্ষুধা, একে জলের মতই সর্ব্বগামী করে তুলেছে।

নানা অকাজের বোঝা বাদ দিলেও সন্তান পালন ও গৃহের শৃঙ্খলা বিধান নারীর প্রধান কর্তব্য। একটু কর্ম্মপটুতা ও আলস্যহীনতা থাকলে ও সব গৃহকর্তব্যসমাধা করেও সাহিত্যালোচনার যথেষ্ট সময় হয়। অনেক শিক্ষিত মহিলাও বলেন, লেখাপড়া করার সময় পাওয়া যায় না। সময় যদি না-ই হবে তা হলে কার্পেটের কুকুর বিড়াল তৈরী হয় কি করে ? সেলাই অতি প্রয়োজনীয় শিল্প, তবে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজেও সময় নষ্ট হয়। ঐ সব অকাজের গৃহসম্ভারের চেয়ে একখানা ভাল বই লিখলে বা পড়লে লাভ বেশী, কেন যে বুঝতে চান না তা বুঝতে পারি না। ছেলেদের সুযোগ সুবিধা অনেক। মার উচিত গৃহ কর্ম্ম শোখানোর সঙ্গেই মেয়ে যাতে অবসরটুকু পরনিন্দা পরচর্চায় ব্যয় না করে সাহিত্য জিনিষ কি বুঝতে চেষ্টা করে সেই শিক্ষাও দেওয়া। এতে সকলেই যে সরস্বতী হ'য়ে দাঁড়াবেন তা হয়তো নয়। কিন্তু সুযোগের অভাব যে ফুলটি অকালে শুকায় সে তো এ ক্ষেত্রে পাপড়ি মেলার সুযোগ অন্ততঃ পায়। হাজারে একটি মেয়েও যদি এই প্রচেষ্টার ফলে মানসিক প্রতিভায় রূপময়ী হয় তাও তো জাতির গৌরব।

মহিলা লেখিকাদের কাছে অনেক বেশী আশা করা যায়। শিক্ষিতা নারী জাতির প্রধান সম্পদ। কেননা সন্তানের জন্য জননীই প্রথম ও উত্তম শিক্ষয়িত্রী। স্বভাবতঃ নারী ও পুরুষ মানব চরিত্র গঠনের দুইদিক ভাগ করে নিয়েছে। পুরুষ অন্ন, বস্ত্র ও পুঁথিগত বিদ্যা সন্তানকে দান করতে পারে কিন্তু নারী স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা দিয়ে, এমন কি নিজেকে উৎসর্গ করেও সন্তানের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত করে ও জীবন্ত রাখে। পুরুষ কর্ম্মপ্রবণ, নারী প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ। বিনা মূলধনে শুধু প্রাণ নিয়ে যাদের কারবার তারা যে মানব মনের সুখ দুঃখ ইত্যাদি যত রকম অনুভূতি আছে ও তা সহজে বুঝতে ও অপূর্ব্ব বর্ণ সম্পাতে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। মন বুঝে চলা যাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য মানব মনের ঘাত প্রতি ঘাতময় কাহিনী, পথের দুঃখ বেদনার সান্ত্বনা বাণী, লোকে সেই নারীদের মুখেই শুনতে চায়।

*সওগাত*, মহিলা সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৫

## শ্রমিক

"বলি শুনছ, আমার জামাটা ধুয়ে দেবে ?" বলিতে বলিতে সাতাশ আটাশ বৎসরের যুবক রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। গৃহমধ্যে একটি বাইশ তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী রাঁধিতেছিল, সে হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, জামা ধোব কি গো ? কাল মোটে ধুয়েছি। আজই আবার ধুতে হবে ? তাছাড়া সবেমাত্র তরকারি চাপিয়েছি, ভাত ডাল হয়ে গেছে, এখন রেখে গেলে পুড়ে যাবে যে। আমার ট্রাঙ্কে একটা পুরানো জামা সেলাই করে রেখেছি, সেইটা পরে যাও। বৈকালে এটা ধুয়ে রাখবো।" যুবক একটু অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর নাক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "শীগগীর ভাত তৈরী কর সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, আজ আর ফিরতেই পারব না। কাল কতক্ষণে ফিরি তাও বলা যায় না।" স্ত্রী হাসিয়া মুখ সরাইয়া লইল, যুবক কাপড় লইয়া স্নান করিতে গেল।

ইহারা পূর্বে অবস্থাপন্ন ছিল। পূর্বের জমিদারী চাল এখন কিছুই নাই। শৈশবে মাতার মৃত্যু হওয়ায় ইহার পিতা সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই সুযোগে কর্মচারিগণ দুইহাতে লুট করিয়া তাঁহাকে রিক্ত করিয়া দেয়। পিতা বহুকষ্টে পুত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়া ২১ বৎসর বয়সে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন। সে আজ ৬ বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একটি পৌত্র দেখিয়া গিয়াছেন। এখন আরও দুইটা সন্তান হইয়াছে। এখন তাহের হোসেন শ্বশুরের সাহায্যে ত্রিশ টাকা বেতনে গার্ডের চাকুরী পাইয়াছেন। দরিদ্রের জন্য ইহাই যথেষ্ট। পরিবারও খুব ছোট নয়। নিজে, স্ত্রী এবং পাঁচ, তিন বৎসর ও ছয়মাস বয়স্ক পুত্রকন্যা তিনটা, বাজার করা ও ফুট ফরমায়েশের জন্য একটা ১৩-১৪ বৎসরের ছোক্‌রা চাকর—মোট ছয়জন। বাসা ষ্টেশন-কোয়ার্টারেই পাওয়া গিয়াছে। চাকরটির বেতন মাসিক দুই টাকা ও খোরাক-পোষাক দিতে হয়। তার উপরে নিজেদের খাওয়া দাওয়া ও কাপড়-চোপড় ছাড়া অসুখ-বিসুখ প্রভৃতিতো নিত্যই আছে। বড় ছেলেটি প্রায়ই অসুস্থ থাকে। মেয়ে ও ছ'মাসের শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন। স্ত্রী রহিমার সৌন্দর্যের বা বেশ-ভূষার কোন আড়ম্বর না থাকিলেও তাহাকে সুন্দরী বলা চলে। উপন্যাসের নায়িকাও নয়—আবার কুৎসিতাও নয়। সাধারণ ভদ্রলোকের মেয়ে যেমন হয়, সেই রকমই। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ঈষৎ লম্বা-ছাঁচের মুখ। কালো বড় বড় চোখ দুটি ও সুগঠিত দীর্ঘদেহ সবটাই মানানসই। বিবাহের সময় শ্বশুর বধূকে কিছু দিতে না পারিলেও বালা ও ইয়ারিং এবং ছোটখাট দু' একখানা অলঙ্কার দিয়াছিলেন। বালা জোড়া তাঁহার অসুখের সময়ই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ইয়ারিং জোড়া সর্বদাই কানে থাকিত। হাতে কতকগুলি কাঁচের চুড়ি। এই বেশেই তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। সর্বপরি তাহার মুখে যে একটু লীলা-চপল হাসি ও আত্মসমাহিত ভাব বিরাজ করিত, সেইটুকুই মনকে মুগ্ধ ও সম্ভ্রম-নত করিত। মেয়েটো মার মতই শ্যামা ও প্রিয়দর্শনা। কিন্তু ছেলে দু'টি বাপের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুশ্রী। ছেলেমেয়ে দু'টি পূর্বেই ভাত ডাল খাইয়াছিল। রহিমা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া

পরিপাটি করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন বাহির করিল। দু'টি পান সাজিল। স্বামীও স্নান করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। সামান্য আয়োজন—ভাত, ডাল, তেঁতুলের অম্বল, মৌরলা মাছ ও আলুর তরকারী। কিন্তু রহিমার শ্রীহস্তের স্পর্শে তাহাই অমৃতের ন্যায় হইয়াছিল। অন্ততঃ তাহার স্বামীর নিকট সে রকমই লাগিবার কথা।

দুইদিন পরের কথা। আসন্ন সন্ধ্যা। রহিমা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম সারিয়া ছেলেপিলেকে খাওয়াইয়া ছোট ছেলেটিকে বুকে লইয়া একখানা বই পড়িতে লাগিল। এ অভ্যাসটুকু তার বরাবরই ছিল। মোটামুটি বাংলা ও উর্দ্দু তার জানা ছিল। স্বামীও কোনদিন দিবসের খাটুনির পরে তাহার এই অবসরের আনন্দটুকুতে বাধা দেয় নাই। বরং প্রায়ই সে সংসার খরচ হইতে কায়ক্লেশে দুই চারি টাকা বাঁচাইয়া দু'একখানা বই ও মাসিক পত্রিকা কিনিয়া দিত। তাই রহিমার সাহিত্যচর্চা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং গোপনে সে কিছু কিছু লিখিত—কিন্তু সে সব লোক-লোচনের অন্তরালেই থাকিত। সে পড়িতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কান ছিল পথের পানে। সহসা সে ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল— "রমু"! রহিমা ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সহসা স্বামীর বিবর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই সে সভয়ে পিছাইয়া আসিল। সেই সুদর্শন যুবক দুইদিনে কি হইয়া গিয়াছে! যেন খুনী আসামী—বয়সও দ্বিগুণ বোধ হইতেছে। তাহার বিহ্বল ভাব দেখিয়া তাহের অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"ঘরে চল রমু"। ঘরে গিয়া রহিমা নীরবে পাখা করিতে লগিল। দু'জনেই নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহের হাত-পা ধুইয়া আসিয়া বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"পথে দাঁড়াতে হ'ল রহিমা। যে রকম রেলওয়ে স্ট্রাইক চলেছে, তাতে বুঝি চাকুরী আর থাকে না। পাঁচটা প্রাণীর চলে কেমন করে? একপ্রাণ কুকুরেরও চলে বটে, কিন্তু পাঁচজনকে খাওয়ায় কে? যে রকম অবস্থা—তাতে পথে চলাই দায়। কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার ও নেতারা পথে-ঘাটে অপমান আরম্ভ করেছে। বলতো কি করি? আরও বলে যে চাকুরী ছাড়লে কোন দেশী কোম্পানীতে তোমার এক বৎসরের মধ্যে ষাট টাকা বেতনের কাজ দেব। সে সব খুব জানি। এরকম যে ওরা আরও কতজনকে মজিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দুরা দিব্বি চাকুরী করছে। যত দোষ আমাদের বেলা। কথায় কথায় স্বদেশী আন্দোলনের উদাহরণ দেয়! আমরা নাকি দেশের জন্য কিছুই করি না। বড় ছেলেটির অসুখ। সে দিন নীলমণি ডাক্তার অষুধের দামের জন্য ধরেছিল। তোমার হাতে কত আছে?" রহিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ত্রিশটি টাকার আর কত থাকবে? ছেলের তো নিত্যই অসুখ। তা' ছাড়া মুদির দোকানে আর ছোট খোকার দুধওয়ালীরও মোট ৮/১০ টাকা পাওনা হয়েছে। কুড়িটা টাকা কষ্টে সৃষ্টে জমিয়েছি।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহের বলিল—"গত বৎসর ছোট খোকার আমাশা ও আমার নিউমোনিয়া জ্বরের সময় দেশের বাড়ীখানাও পাঁচশত টাকায় বিক্রী করেছি। তার মধ্যে দু'তিন শত টাকাতো চিকিৎসা খরচেই গেল। বাকি যা' ছিল চারমাস বিনা-বেতনে ছুটি নেওয়াতে তাও ফুরিয়েছে। চার বৎসর চাকুরী করে এইতো অবস্থা। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই।" সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রী কাহারও খাওয়া হইল না।

পরদিন প্রভাতে তাহের উঠিতেই একজন ভলান্টিয়ার আসিয়া তাহাকে কংগ্রেস অফিসে লইয়া গেল। সেখানে বাবু বিশ্ববিজয় মিত্র; মৌলবী আবু নাসের সাহেব প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা কর্মিগণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই মিত্রমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"এই যে ! তুমি এসে পড়েছ দেখছি। তোমার কথাই হচ্ছিল ভায়া। তা দেখ, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমাকে ত আর বোঝাতে হবে না। বার বার বলছি, তোমার কানেই যায় না। তোমায় ১৫ দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি চাকুরী না ছাড়—তবে তোমার ধোপা, নাপিত, এমন কি বাজার-হাটও বন্ধ করা হবে।" তাহের শুষ্ক মুখে বলিল—"যদি বলেন তো, আমি কংগ্রেসের ফান্ডে দু'এক টাকা মাসিক চাঁদাও কষ্টে-সৃষ্টি দিতে পারি। চাকুরী ছাড়লে পাঁচটি প্রাণী খাবে কি ?" মিত্রমহাশয় রঙ্গভরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"দেশ চায় প্রাণ, দেশ টাকা চায় না। তবে টাকায় কাজের আংশিক সাহায্য হয় বটে।" তাহের সাহস করিয়া কহিল—"আমার প্রাণ নিয়ে কি হ'বে ? আচ্ছা, নরেশ মিত্রকে চাকুরী ছাড়তে বলেন না কেন ?" মিত্র মহাশয়ের মুখ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। কারণ নরেশ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। তবু দম্ভভরে সপ্রতিভভাবে বলিলেন—"যাও হে ফাজিল ছোকরা, তার কথা তার সঙ্গে হ'বে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে।" পথে দেখিল—একদল স্বেচ্ছাসেবক পতাকহস্তে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া একজন চাপাসুরে বলিয়া উঠিল—"বিশ্বাসঘাতক ! স্বদেশদ্রোহী !" অপমানে তাহেরের কর্ণমূল ও সুগৌর গণ্ড রক্তিম হইয়া উঠিল। সে বাসায় ফিরিয়াই পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া ফেলিল। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন—"দেখহে, কাজটা বুঝে-শুনে করলে না। ওদের তালেই নেচে উঠলে। যে রকম অসময়ে আমাদের ঠেকিয়ে গেলে, এরপর তোমার গভর্ণমেন্ট সার্ভিস পাওয়া কঠিন হবে" তাহের কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রহিমা মলিন মুখে বলিল—"বড় খোকার বড্ড জ্বর এসেছে। বিকালে ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লে হ'তো। ওরজন্য একশিশি কুইনাইন, দু'টি বেদানা আর বার্লীও আনতে হ'বে। তাহের ভাঙ্গাগলায় বলিল—"চাকরী তো ছেড়ে দিয়ে এলুম।" রহিমা শূন্যনয়নে একদিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন এক পেয়াদা আসিয়া নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল "পনের দিনের মধ্যে এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবে।" বড় ছেলেটির অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। রহিমার হাতে যে টাকা কুড়িটি ছিল, তাহা মুদীর ও ডাক্তারের দেনা শুধিতেই খরচ হইয়া গেল। এখন এতগুলি লোকের খাওয়া ও চিকিৎসা-খরচ জুটে কোথা হইতে ? রহিমার যে ইয়ারিং জোড়া ও দুগাছি ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁধান শাঁখা ছিল, তাহা ও মেয়েটির পায়ের রুপার মল দু'গাছা বিক্রয় করিতে হইল। বিক্রয় করিলে জিনিষের মূল্য হয় না। পুরাতন জিনিষে আর কতই বা পাওয়া যায় ? মাত্র ষোলটা টাকা পাওয়া গেল। অনবরত চিকিৎসা ও খাওয়ায় সবই খরচ হইয়া গেল।

আজ পনের দিনের রাত্রি। ছেলেটির অবস্থা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রহিমা পনের দিন যাবৎ একবেলা আহার স্বামী-পুত্রকে

খাওয়াইয়াছে। দুইদিন শুধু ফেন জুটিয়াছে। আজ তাহাও জুটে নাই। এক মুঠা চাউল ছিল, তাহাই ভাজিয়া মেয়েটিকে দুইবেলা খাওয়াইয়াছে। আজ তাহেরও উপবাসী। মৃতপ্রায় ছেলেটির মাত্র একবেলা বার্লি জুটিয়াছে। রহিমার পিতার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ভ্রাতার নিকট পত্র লেখায় তিনি উত্তর দিয়াছেন—"আমাদের অবস্থা তো আপনি জানেন। এ বৎসর অজন্মা হওয়ায় স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইতে না পারায় শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এ অবস্থায় শ্রীমতীকে আনা আমি ভাল মনে করি না।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। উপবাসক্লিষ্টা রহিমা পুত্রের পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছোট শিশুটা মায়ের বুক চুষিয়া কিছুই না পাইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে। তিনদিন তাহার দুধ আসে নাই। তাহার কোঁক্‌ড়া চুল ও ফুলোফুলো গোলাপীগণ্ডে বাতির আলো পড়িয়া দেবশিশুর ন্যায় দেখাইতেছে।

তাহের বসিয়া একদৃষ্টে নক্ষত্রখচিত অসীম অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়াছিল। কৃষ্ণ-পক্ষ রজনী। তাতে নীল আকাশে তারাগুলির কি শোভা! সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? বহুদিন পরে তাহার হারানো মাকে মনে পড়িল। দুঃখ দৈন্যের মাঝে মাতৃস্নেহ রিক্ত ব্যথিত মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে চাঁদ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সহসা রুগ্ন ছেলেটি ডাকিল "বাবা, পানি।" তাহের উঠিয়া একটু পানি তাহার মুখে দিল। ক্ষুদ্র শিশু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"বাবা, সেই সুন্দর গানটা গাও না। সেই—যাতে হজরতের নাম আছে!" তাহের অতি মৃদুকরুণকণ্ঠে "আয় হবিব পেয়ারে খোদা আঁখকি রওশন, দেল-আরাম" গজলটি গাহিতে লাগিল। তাহেরের গম্ভীর-করুণ কণ্ঠ ও নিশার নীরব ভাষা, গাম্ভীর্যে ও কারুণ্যে এক হইয়া গেল। গাওয়া শেষ হইলে দেখিল—রসুলের পবিত্র নাম শুনিতে শুনিতে শিশুর কোমল প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখের পানি শুকাইয়া গেল। একখানা শুভ্র বস্ত্রে মৃতদেহ ঢাকা দিয়া সে আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল—কাহারও শান্তিভঙ্গ করিল না। কাল যে সে কি খাইবে, কোথায় থাকিবে—তাহারও ঠিক নাই, এতবড় বিশাল সংসারে তাহাদের কথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নাই। অর্দ্ধাহার-পীড়িত ছেলেটি বিশ্বপিতার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিল। প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ছোট শিশুটি কাল হইতে অনাহারে শুকাইয়া মরিবে, মেয়েটি মার নিকট ভাত না পাইয়া তাহার নিকট চাহিবে—সে কি উত্তর দিবে? যদি বাপের ভিটা আঁকড়িয়া চাষবাস করিয়া শরীর খাটাইত, তাহা হইলে এত দুরবস্থা হইত না; বরং ক্ষেতের ধান-তরকারীতেই বেশ চলিত। শরাফৎ ও চাকুরীর মোহই তাহাকে মাটি করিয়াছে। নিজে কৃষি করিতে লজ্জাবোধ না করিলে অন্নাভাব নিশ্চয়ই ঘটিত না।

পাশ্ববর্তী এক জমিদার-গৃহে পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ বাইজি আসিয়াছে। তিন রাত্র নাচ-গানের মূল্য দশ হাজার টাকা। সেইদিকে চাহিয়া তাহেরের দীপ্ত আয়তচক্ষু দুইটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—

"আমার ঘরে খাবার নেই, ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে গেল—আর এ ব্যক্তি বিনা-আয়াসে শুধু আমোদের জন্য এত টাকা ব্যয় করছে ! খোদা এই কি তোমার বিচার ? বুঝলুম তুমিও মানুষেরই ন্যায় অকরুণ—বিচার-শূন্য ও খেয়ালী। বুঝিবা দয়ামায়া কিছুই নাই, মানুষের মাথার উপর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষণ করিতেই বুঝি তুমি আছ।" পরক্ষণেই ভূমিতে লুটাইয়া কাতরস্বরে কহিল—"আছ বই কি প্রভু ? মাতার স্নেহে, পিতার মমতায়, পুত্র-কন্যার আদরে, প্রতিবেশীর সৌজন্যে-সহানুভূতিতে, জলের শীতলতায়, জীবনের সার্থকতায়-সর্ব্বত্র যে তুমি বিরাজমান। তোমাকে অস্বীকার করি কোন্ সাহসে ?" পরদিন প্রভতের অরুণ কিরণে ধরা আলোকিত হইল। বেলা ৯টার মধ্যেই শিশুটির দাফন-কাফন সামাধা হইল। পুত্রকে সমাহিত করিয়া তাহের কোটরগত চক্ষু ও উস্কোখুস্কোচুলে গৃহে ফিরিল। চক্ষু শুষ্ক-দেহ উপবাস-খিন্ন। রহিমার চক্ষে পানি নাই। সেও ধরাশয্যায় মূর্চ্ছিতায় ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। শিশু-পুত্রটিও অতি ক্ষুধায় মূর্চ্ছিতপ্রায়। এমন সময় সরকারের পেয়াদা আসিয়া বলিল—"সাহেব ! আপনি দোস্‌রা জায়গায় যান, নূতন বাবু এসেছে।" টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সামান্য কাপড়-চোপড় ও তৈজস-পত্র পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। রহিমার শেষ সম্বল নাকফুল ও কানফুল দুইটি বিক্রয় করিয়া সেই বৃষ্টির মধ্যেই তাহারা রহিমার পিতৃগৃহাভিমুখে চলিল। সেই নিরন্ন ও দারিদ্রপূর্ণ গৃহে কিভাবে দিন কাটিবে, কে জানে ?

সন্ধ্যায় তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌছিল, দেখিল ঘরের চালে খর নাই, বৃষ্টির পানি ঘর ভিজাইতেছে। রহিমার ভ্রাতা সেইদিনই সকালে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, একটা ছোকরা চাকর প্রহরী স্বরুপ রহিয়াছে। সেও নিকটবর্তী তাহার গৃহ হইতেই খাইয়া আসে।. . . রহিমা ক্লান্ত ভাবে বসিয়া। ছোকরাটি নিজগৃহ হইতে এক বাসন ভাত আনিয়া মেয়েটিকে খাওয়াইল।

সন্ধ্যায় স্থানীয় এক নেতার গৃহে কর্মীবৃন্দ সমাগত হইয়াছেন। একজন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া বলিলেন—"আরে, সেই তাহের চাচা যে ভেগেছে জান ?" আর একজন সজোরে টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিলেন—"তাই নাকি ? তা বেটাকে বহুকষ্টে বাগে আন্‌তে হয়েছে।"একজন নূতন কর্মী বলিল "আজ সকালে ওর বড় ছেলেটি মারা গেছে, বেচারা প্রাণীর আহার যে কোথা হ'তে যোগাবে আল্লাই জানেন, কংগ্রেস-ফন্ড হ'তে কিছু দিলে হ'ত না ?" মিত্রমহাশয় তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিলেন—"রেখে দাও তোমার চালাকি। দেশে দিব্যি জমিদারী রয়েছে। ওবেটার সাদা আদমীদের পা চাটতে ভাল লাগে। টাকা দেব কোথা হ'তে ? এতলোক চাকুরী ছেড়েছে যে দু'টাকা করে দিলেও কংগ্রেস ফন্ডে কুলোবেনা।"

কাপের পর কাপ চা অথবা তথাকথিত কুলির রক্ত ও সিগারেট উড়িতে লাগিল।

*সওগাত*, আশ্বিন ১৩৩৪

## চিঠি[১]

### ১

আজিজপুর
২২.১.২৫

প্রিয় আমার !

দু'দিন পরে যে মনে পড়ল ! তবুও ভাল, আমি মনে করেছিলাম বুঝি—না বলব না, তুমি রাগ করবে।

আজ ছোট মামা আমায় একটা ছেঁড়া খাতা দিলেন। কি আনন্দ হয়েছে আমার সেটা পেয়ে। ১৩২৭ সনের ২২ শে জ্যৈষ্ঠ হ'তে সেটার জন্ম, সেই আমার সর্ব-প্রথম লেখা ! বহুদিনের ভুলে যাওয়া খেলাসঙ্গিনীটি যেন আমায় ডাকল। এমন মিষ্টি লেগেছে সেই হিজিবিজিগুলি। লেখা হিসাবে বোধ হয় সেগুলি কিছুই না। কিন্তু এগুলি দেখে সেই বার বছর বয়সের কত খেলা-ধূলা হাসি-কান্নার কথা মনে পড়ে। একটা দিনেও মানুষের কত পরিবর্তন হয়। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে ছোট মামা সেগুলি যত্ন করে রাখাতেই আছে। না হলে এতদিনে মাটিতে মিশত, বড় এলোমেলো আমি-আমার মত এমন অদ্ভুত জীব বোধ হয় দুনিয়াতে আর একটিও নেই। শরীরটা শুধু মানুষের মত, নাহলে পশুর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিলনা। এটা যে আমার খুব গৌরবজনক তা নয়, কিন্তু কি করি মানুষ হ'তে পারলাম না তো ! আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে কি জবাব দেব জান ? বলব যে "তুমি আমাকে যেমন গড়েছ তেম্‌নি আছি, অন্য কিছু হওয়া ভাগ্যে ঘটে নাই" বেশ চমৎকার হ'বে না ?

আশা করি তোমার শরীর এখন ভালই, তুমি লিখনাতো কিছুই জানার অধিকার নাই বুঝি ? আচ্ছা না থাক, ভাল থাকাটাই আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি না লিখলে কি হবে ? কুশল কামনা—

তোমার—
রাজিয়া

### ২

আজিজপুর
২৬.৩.২৫
বেলা ১০টা

প্রিয় আমার !

তোমার ২৩ তারিখের পত্রখানা আজ পেয়েছি। সকাল থেকে মাথা ঘামিয়ে পড়াটা মাথায় ঢুকাতে পারলাম না। এমন সময় পত্রখানা দেখে ভেবেছিলাম যে এইবার যদি একটু ঢোকে। কিন্তু আমি যেমন—আমার পুরস্কারও তেমনি। মনটা একেবারে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেছে আর কি !

আমি যে খারাপ তা কি অস্বীকার করি ? আমি খারাপ, আমার লেখা খারাপ,

আমার মন খারাপ, সবই খারাপ। এমন মানুষের কাছেও কি পত্র লেখা যায় ? এতদিন বোঝ নাই—তাই লিখেছ। এখন বুঝি বুদ্ধি গজিয়েছে ? তাও এতদিন পরে ! দু'দিন চারদিন নয় [. . .] এই নির্বুদ্ধিতা ক'রে এসেছ।—কথাটা বোধহয় ভুল না ?—একটা জীবনের স্থায়িত্বের তুলনায় ৮-৯ মাস বা ৮-৯ বছর বেশী কিছু নয়। এই রকম তুলনা করলে ৮-৯ মাস পাঁচ মিনিটের চেয়েও কম। এই সামান্য ক'দিনের পরিচয়ে বোধহয়—আর লিখব না আমি, যদি তোমার মনে কষ্ট হয় ? যা লিখেছি তাই যথেষ্ট।—রাগ করোনা তুমি। কেন এরকম লিখবে ?—আমার কষ্ট হয়না বুঝি ?

আমি তোমার মত সোজা মানুষ হ'তে চাইনা, আমার যা প্রাপ্য, তাতে বঞ্চিত করার কোনই অধিকার নেই তোমার। তোমার মঙ্গল সংবাদ পাওয়ার দাবী কি আমার নেই ?—যদি "নেই" বল তাহ'লে আর আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু সেকথা না বললে পত্র না লিখে পারবে না তুমি। একবার শুধু তাই বল, তারপর দেখা যাবে।

তোমার
রাজিয়া

৩

সুয়াগাজী
১.৪.৩০

"পত্র পেয়েছি ও ভাল করে বুঝেছি। তবে মুস্কিল কি জান ? তোমার বাচ্চাটি অসুস্থ। প্রতি রাত্রেই জ্বর হচ্ছে। দোয়া কোরো।

হিন্দুরা বলে—"জগৎ মিথ্যা, সংসার অনিত্য ও মায়াময়, ইহকাল অনিত্য ও পরকাল সত্য।" তুমি কি বল ? আমারতো মনে হয় এসলামে এসবের সমর্থন নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য—মহাবিচারের দিন মুক্তি পাওয়ার জন্য, পুণ্য ও পাথেয় সঞ্চয় করার উপায় থাকত না তাহলে। সাধকদের পুণ্যস্মৃতি, হাদিসের অমর বাণী, কোরানের অমৃতধারা এই জগৎ-সংসারেই মানুষকে প্রাণ ও শক্তি দান করে। মানুষ দুনিয়াতে থেকেই সাধনার বলে আল্লাহতালার সান্নিধ্য লাভ করে। সেই দুনিয়া নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়।

তোমাকে দেখার ইচ্ছা হয় খুব। কিন্তু স্বইচ্ছায় তা পূরণ হবার নয়—তা বুঝতে পারি।"

তোমার
রাজিয়া

৪

P. 304
P.O. Circus
15.6.32

অনেক দিন আগে তোমার পত্র পেয়েছি, তুমি আর লিখলেনা যে :—

কাল তোমার ফরমায়েসী স্পিরিট, কোরোসিন, ষ্টোভের ছুঁচ, সাবান, বিস্কুট ও আষাঢ়ের ভারতবর্ষ পাঠিয়েছি। পেয়েছ বোধ হয়। বড় ভাই সাহেব লিখেছেন পনের টাকা নাকি তোমার জন্য পাঠিয়েছেন, যদি না পেয়ে থাক লিখবে আমি পাঠাব। আমার কাছে এপ্রিলের প্রথমে মফিজের যাওয়ার খরচ ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা পাঠিয়েছিলেন, আর পাঠাননি, শীঘ্রই পাঠাবেন লিখেছেন। শরিফা নাকি কাজি বাড়ীর বজলুর সঙ্গে মোরাদনগর যেয়ে পৌঁছেছে, বড় ভাই সাহেব সেখান হ'তে আনিয়ে মা'র কাছে দিয়েছেন। ভালই হ'য়েছে। আমি বিয়ে দিতে লিখেছি, ওর যা স্বভাব, সংশোধনের অতীত। আমার আপাততঃ অন্য লোকের দরকার নেই। পরে দরকার হ'লে দেখা যাবে।

এখানে আম্মার ও বাচ্চুর পেটের অসুখ হ'য়েছে। সালেহা, রাবু ও অন্যান্য সব খোদার ফজলে ভাল, বাড়ীতে মা একরকম আছেন। বড় ভাই সাহেব জ্বরের পর হতে চোখে ভাল দেখতে পাননা লিখেছেন। আমি এখন ভালই আছি, তবে দুর্ব্বলতা যায়না। ঔষধ তো এখনও খাই। ভবিষ্যতের জন্য ভয় হয়। বেঁচে থাকাটা বড় বেশী স্পৃহনীয়ও মনে হয় না। বিধাতার সৃষ্টি এই দুনিয়া কত সুন্দর! কিন্তু মানুষের হিংসা দ্বেষ পঙ্কিল মনের কালো ছায়া কি বিশ্রী! দেখে দেখে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। মনে হয় পালাতে পারলে বাঁচি।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবনা বোধ হয়। বিধিদত্ত যে অধিকার তারই জন্য আবার মানুষের কাছে আবেদন নিবেদন করতে মন চায়না।

দাদু এখনও আসেননি। বৌকে নিয়ে দু'একমাসের মধ্যে আসবেন বোধ হয়। কালু এ মাসের শেষভাগে আসতে পারে। এবাড়ী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পাঁচ তলার ছাদ পরশু শেষ হ'বে। বারান্দার কাজও শীঘ্র আরম্ভ হবে।

তোমার শরীর আশা করি ভাল ; সর্দ্দি সেরেছে? কোন কিছুর দরকার হ'লে লিখে দিও। "বিচিত্রা" এখনও বের হয়নি। পরে পাঠাব। আগে যে দু'খানা টেবলক্লথ পাঠিয়েছি তা পেয়েছ কিনা কোন দিনই লিখলেনা। আরও দুখানা সেলাই করছি, পাঠাব? বালিশের ওয়াড়ের দরকার আছে? কেমন থাক সর্ব্বদাই লিখতে চেষ্টা করো।

আম নাকি ওখানে বারটার বেশী নেওয়া হয় না? কাল কতগুলি ফেরৎ এসেছে।

রাজিয়া

Janab Moulvi Ashrafuddin Ahmad Chowdhury Saheb,
"A" Class Prisoner.

৫

P. 304
P.O. Circus
8.3.33

দু'সপ্তাহ যাবৎ তোমার পত্র পাওয়া যায় না। আশা করি ভাল আছ। এখানে আমার গলার ব্যথা সেরেছে। কিন্তু আম্মা ও বিনুর গলা ব্যথা হয়েছে ও বিনুর টনসিল খুব ফুলেছে, আমার কাশি সামান্য কমেছে। বাচ্চার গালে ছোট একটা ফোঁড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। বড় বাবা আগের মতই, বড় ভাই সাহেবের পত্র পেয়েছি পরসু, বাড়ীর সব ভালই এক রকম, শীঘ্র আমাদের নিতে আসবেন লিখেছেন, কতদিনে আসবেন কে জানে, আম্মা কিন্তু তুমি না আসতে যেতে নিষেধ করেন। বলেন ছেলে মেয়েদের অসুবিধা হবে। সে যখন বড় ভাই সাহেব আসবেন দেখা যাবে, আমি এখনো কিছু স্থির করিনে যাওয়া বা না যাওয়া।

পরশু "সওগাত" দিয়েছি। গল্প যা বেরোয়, রাবিশ। আজকাল তো প্রায় লেখকদেরই কাজ হ'য়েছে আবর্জ্জনামাখা। যারা নূতন লেখক তারা তো অল্পদিনে নাম করার এমন সুযোগ ছাড়ে না ; আর্ট হল আজকাল ঐ। প্রথম প্রথম মেয়েদের নিয়ে এত লঘুতা দেখে ভারি রাগ ধরত। এখন ভাবি ওরা মানুষ নয়। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে যে সম্ভ্রম জ্ঞানহীনা দু'চার জন নেই, এমন নয়। কিন্তু তাই নিয়ে এমনভাবে সাহিত্যে স্থান দিয়ে রাখার কি দরকার ?

শরিফার পঞ্চম বার বিয়ে হ'ল শুক্রবারে, এক কাবাবওয়ালার সঙ্গে। যাক— আপদ তো চুকল, এখন, এখন ওখানে টিকে থাকলে হয়। আমার কাজ নেই অমন চাকরাণী রেখে। ওর কাণ্ড দেখেশুনে আমার মনে হল "শেষ প্রশ্নে"র কমলের কথা। অতি শিক্ষা ও অশিক্ষার কি একই ফল ফলে নাকি ? আজ পত্রিকায় দেখলাম আমেরিকায় গত জানুয়ারী মাসে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে শিক্ষা দেওয়া হবে "বিবাহের উদ্দেশ্য ও পবিত্রতা" "ধর্মের চক্ষে বিবাহ রীতি" ইত্যাদি। অথচ এদেশে আরম্ভ হয়েছে "বিবাহের চেয়ে বড়" নাম দিয়ে উপন্যাস লেখা। মূলকথা ওরা ওসব দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই আবার পুরানো আদর্শটাই তাদের চোখে নূতন ঠেকছে। এদেশে সমাজ বিপ্লব এখনও শেষ হওয়ার দিন আসেনি। চরমে পৌঁছে শেষ হবে। সেদিন আবার পুরাণা নীতিগুলিই ভাল বলবে, না ? আমার বুদ্ধির দৌড় দেখে হেসো না যেন।

গতবারের ডিমগুলো নাকি নামাতে ভেঙ্গে গেছে। ঘি, দাঁতন, ইংরেজী বইখানা পেয়েছ বোধহয়। ওর প্রথম কবিতাটা আজিজপুরে থাকতে তুমি আমায় পড়িয়েছিলে। সালেহাকে পড়তে দিয়েছি, খালি দুষ্টামি করে।

শীঘ্র উত্তর দিও। আমি যদি তোমার মত চুপ করে থাকি। তুমি বন্দী আমি কি মুক্ত ? যা তিন প্রহরী, দিন রাত যেন সড়কি উচিয়ে রয়েছেন, কিল, চড়, কামড়, কত রকমের মার। এখন আবার বাচ্চাটাও কিল দিতে ও চুল টানতে শিখেছে।

একটু ত্রুটি হ'ল এক একজন যেন খেতে আসেন। যা শান্ত বাবা তাদের' হাবলা ? বড় ভাই সাহেবকে টাকার জন্য লিখেছিলাম পাঠিয়েছেন কি ?

রাজিয়া

To
Ashrafuddin Ahmad Chowdhury Saheb.
"A" Class prisoner.

৬

P. 304
P.O. Circus

পত্র পেয়েছি। ১৮ তারিখের। উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু পালন করাই কঠিন। তুচ্ছ খুঁটিনাটি আমার মনকে আঘাত করলেও আমি সহজেই সেসব মুছে ফেলি। কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমার উপর অভিনব আর এক পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন, সেসব সহ্য করা, বলা, কোনটাই সহজ নয়। দশ পনের দিন হয় এক বেনামি চিঠি এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বাবা এনেছেন পিয়নের হাত হ'তে। বক্তার মূল বক্তব্য এই যে আমি কবিতা লিখি, সাহিত্য ও গানের চর্চা করি, সুতরাং আমার দ্বারা সর্ব্বাধিক অপকার্য্যই সম্ভব। এমন ভাষায় এমন সব অপবাদ দেওয়া হয়েছে যা আমি এতখানি বয়সে কোনদিন কল্পনাও করিনি। একটুখানি পড়েই আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বাবা ও আম্মা পড়েছেন—তাঁদের কাছেই আছে সেখানা। হাসিও পায়, কান্নাও আসে। অনন্ত অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার, সামান্য একটু অক্ষর-পরিচয় তো আমার বিদ্যা ? আর ভাঙ্গা দেহমন নিয়ে যখন দুনিয়াকে দূরে রেখে একান্তে পড়ে আছি সেই সময় তিনচারটির মা হ'য়ে এই আমার প্রাপ্য ছিল ?—দিন রাত আল্লাহ তা'লার প্রতি মন হ'তে প্রশ্ন ওঠে "কেন এ শাস্তি ? তোমার সৃষ্ট একটি প্রাণীর মনেও আমার প্রতি এমন কু-ধারণা এল কেন ?" আমি কি যিনি স্রষ্টা সেই প্রভুরও এমন পরিহাসের যোগ্যা ?—যাক—সৃষ্টি করার সময় যেমন আমার নিজের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না, আজও ভাগ্য-বিপর্য্যয়েও তার উপর কোনই হাত নেই,—তিনি আমার চোখে দুনিয়াটা কালো ক'রে দিচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজেকে উজ্জ্বল রাখারই চেষ্টা করব,—দোওয়া ক'রো। কয়লাও তো আগুনে পুড়ে উজ্জ্বল হয়, আর আমি তো মানুষ।

ভেবেছিলাম এসব তোমাকে জানিয়ে উদ্বিগ্ন করবোনা। কিন্তু জানই তো কোন সুখ দুঃখ আমি তোমার নিকট হ'তে গোপন করতে পারিনা। তুমি আরও লিখতে বল !

স্বপ্ন জিনিষটা বাস্তবের চেয়ে সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় অ-সুন্দর বর্ত্তমানে যারা তোমার . . . পেয়েছে ও পাচ্ছে সুন্দর ভবিষ্যতে হয়ত তারা থাকবে না। দু'জন গেছেও। সালাহুদ্দিন, আলা,—সর্ব্বপ্রধান সম্পদ 'মা'—মানুষের জীবনে খোদার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,—তিনিও যে বহুদিন থাকবেন আমার তো মনে হয়না, থেকেও তাঁর লাভই বা কি ? এগুলি তুমি আমার দুর্ব্বল মনের প্রলাপ

মনে কর, না কিন্তু তা নয়। এসব মা ভাবেন। বলেনও। আমি বলছি—হয়ত কোনদিন এর সত্যতা দেখতে পাবে।

কাল সিগার পাঠিয়েছি, এতকাল পরে কি যে সব ছাই খাওয়া আরম্ভ ক'রেছ, যা দু'চক্ষে দেখতে পারিনা। সাবান পেয়েছি, ঘড়িটা কে নিয়ে গেল ?—টেব্‌লক্লথ গেলে আমি—তোমাকেই চোর বলব, হারানো তোমার চিরকালের অভ্যাস, আমিই বা মন্দ কি। কত কিছুই যে হারাই। এত হারাবার ভয় থাকলে সেই দুইখানা না হয় ফেরৎ দিও, নূতন দু'খানা দেব।

বড় ভাই সাহেবের পত্র পেয়েছি, খুঁটিনাটি অসুখ প্রায়ই থাকে, মা আগের মত আছেন। মেয়েরা বুঝি আমার দুষ্টুমি পেয়েছে ?—আম্মার কাছে শুনেছি ছোট বেলায় দুর্দ্দান্ত আমি মোটেই ছিলাম না। মা'র কাছে তোমার সুখ্যাতিও শোনা আছে !

বাড়ীতে থাকতেও তো চাকরাণীদের তোমার কাজ আমি সহজে করতে দিতাম না, আর এখন কি-ই বা করি সাতদিনে একদিন যার জন্য বকবে তুমি ?—তোমার মেয়েরাও তো কত খাটায় আমাকে, এমন মেজাজি সব হয়েছে ! দিন রাত ওদের মন যোগাতে হয়। রাবুর একটু পেটে অসুখ হয়েছে। কালও ওরা দমদম গিয়েছিল। কত কথা লিখেছি, রাগ ক'রো না। উত্তর দিও। বড় ভাই সাহেব আমাকেও পনের টাকা পাঠিয়েছেন।

রাজিয়া

## তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, 'কবি ও কথাশিল্পী রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী', (ঢাকা : *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ফাল্গুন ১৩৮৩)

২. আশরাফ উদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরীর বিভাগপূর্ব রাজনীতিতে যে ভূমিকা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, তিনখণ্ড, (ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৮, ৮৯, ৮৯) এবং আবুল হায়াতের *Mussalmans of Bengal* (Calcutta : Jahed Ali, 1966) গ্রন্থে। তাঁর বিভাগোত্তর রাজনীতির কথা আমরা শুনেছি তাঁর মেয়ে রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর কাছে। তিনি পাকিস্তান আমলে নেজামে ইসলাম দলের নেতৃত্বে ছিলেন এবং মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

৩. 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা', *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর রচনা সংকলন*, আবদুল কুদ্দুস সম্পা., (কুমিল্লা : রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, ১৯৮২), পৃ. ৪

৪. 'চাষা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল *নওরোজ* পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৩৪-এ। স্বামীর *নয়া বাংলা* পত্রিকার জন্য একটি বাণীও লিখেছিলেন রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী : 'সত্য সাধনা সকলের মাঝে/জাগায়ে তুলিতে হবে/ মরণের ছায়া দূরে চলে যাবে/ জীবনের জয় জয় রবে। . . .'

৫. *উপহার* কাব্যসংকলনটি সম্পর্কে আবদুল কুদ্দুস লিখেছেন : 'সংকলনটি বিবাহপূর্ব সময় দম দম, কলিকাতা থেকে ৫ই মাঘ ১৩৩২ সালে প্রকাশিত। পাঁচটি কবিতার প্রথম দুটি লেখা ১৯/৯/২৪ আর শেষটি ১৩২৭ [বঃ] ২২শে জ্যৈষ্ঠ।' ('ভূমিকা', *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী রচনা সংকলন*, পূর্বোক্ত)। রাবেয়া খাতুন অবশ্য একই রচনা সংকলনে লিখেছেন যে তাঁর মায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৩৩১ সনের ১৮ই বৈশাখ (পৃ. 'খ')। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ লিখেছেন *পথের কাহিনী* প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার মোহাম্মদী বুক এজেন্সী থেকে, প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ খায়রুন আলাম খাঁ (*দৈনিক ইত্তেফাক*, পূর্বোক্ত)। বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য, তাই বইটির প্রকাশকাল আমরা জানতে পারিনি।

৬. *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর রচনা সংকলন*, পূর্বোক্ত

৭. লীলা নাগ (বিয়ের পর রায়) বাঙালি মুসলমান নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, তার কথা তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি সঙ্ঘ'-এর ইতিহাস থেকে জানা যায়। ১৯২০-২৮-এর মধ্যে ঢাকায় ঐ সঙ্ঘের সদস্যরা মেয়েদের চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম স্কুলটি, যেটি কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল নামে আজ পরিচিত। আর একটি বর্তমান বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, তৃতীয়টি তৎকালীন 'নারী শিক্ষা মন্দির', বর্তমান শের-এ-বাংলা স্কুল, চতুর্থটি পুরানা পল্টন গার্লস স্কুল। এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সোনিয়া নিশাত আমিনের *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939* বইটি, (Leiden, New York, Koln : E. J. Brill, 1996), পৃ. ১৬১-১৬৪।

৮. ১৯৩৬ সালে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে কুমিল্লায় জেলা কৃষক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এটি ছিল তার উদ্বোধন সঙ্গীত।

৯. চিঠিপত্র বিষয়ে একটি সাধারণ কথা বলা প্রয়োজন। সম্বোধন ছাড়া চিঠিগুলির বেশির ভাগই রাজিয়া খাতুন লিখেছিলেন তাঁর স্বামী যখন জেলে ছিলেন তখন। চিঠিগুলিতে অনেক খুঁটিনাটি ঘরের কথা আছে, তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা জানতে পারিনি।

# শামসুননাহার মাহমুদ
# জীবনীকার ও নারী আন্দোলন নেত্রী
## ১৯০৮-১৯৬৪

নোয়াখালী জেলায় ১৯০৮ সালে শামসুননাহার মাহমুদের জন্ম হয়। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্যরা শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়ে আসছিলেন। পিতামহ ও তাঁর ভাইয়েরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, অর্থাৎ তখনকার দিনের গ্র্যাজুয়েট। কথিত আছে, শামসুননাহারের প্রপিতামহ মুনশী তমিজউদ্দিনের স্ত্রীকে ব্রিটিশ সরকার এজন্য 'রত্নগর্ভা' উপাধি এবং একটি স্বর্ণপদক দিয়েছিলেন। তবে শামসুননাহারের পিতৃকূলের নারীরা কেউ লেখা-পড়া শিখেছিলেন বলে শোনা যায় না। যদিও অবরোধবাসিনী নারীদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর মাতামহ আবদুল আজিজের নেতৃত্বে পিতামহ ফজলুল করিম ও আরও কয়েকজন ১৮৮৩ সালে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্মিলনীর উৎসাহী সদস্যদের সহযোগিতায় ঘরে বসে মেয়েরা স্কুলপাঠ্য বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে উচ্চশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতো। শামসুননাহারের মাতামহী এভাবে পঞ্চম শ্রেণী অব্দি লেখা-পড়া শিখেছিলেন। তাঁর মেয়েরাও সবাই ভাল বাংলা ও উর্দু জানতেন। শামসুননাহারই মনে হয় পরিবারের প্রথম মেয়ে যাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ২৫ বছর বয়সে বাবা নুরুল্লাহ চৌধুরী মারা যাবার পর, ছয় মাসের শামসুননাহার ও ৩ বছরের হবীবুল্লাহ্ বাহারকে নিয়ে তাঁদের মা আসিয়া খাতুন চট্টগ্রামে বাবার বাড়িতে উঠে আসেন। মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তখন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর। চট্টগ্রামের খাস্তগীর স্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করার পর শামসুননাহারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হলো। কারণ 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ নারীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন, অবরোধবিরোধী ছিলেন না।[২] এ নিয়ে কিশোরী শামসুননাহারের মনে ক্ষোভ ছিল। *নজরুলকে যেমন দেখেছি* বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'ন' বছর বয়সে ফরমান জারি হলো স্কুল ছাড়তে হবে। সেই থেকে বাড়ি বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করি। বছরের পর বছর কাটে। চোখের সামনে সহপাঠী হিন্দু, ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করে, ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে যায়, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কেউ কেউ পড়তে যায় কলকাতা বেথুন কলেজে, ডায়োসিসন কলেজে। মাঝে মাঝে তারা চিঠিপত্র দেয়, তাতে থাকে নতুন দুনিয়ার ইঙ্গিত। আমাদের পাশের বাড়ি বৌদ্ধ পরিবারের মেয়ে, স্কুলে আমার চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রী, "দিদি" জোর্তিময়ী

চৌধুরী (পরে *বিলেত দেশটা মাটির* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা জোর্তিমালা দেবী) চট্টগ্রাম,[২] কলিকাতা ও রেঙ্গুনে পড়াশোনা ক'রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত পাড়ি দিলেন। মনে হয়, আমরা অন্ধকারের জীব, আর ওরা, আলোর দেশের বাসিন্দা। দিনের পর দিন মনের মধ্যে কেবলই গুমরাতে থাকে বিদ্রোহ।'[৩]

এই বিদ্রোহী নাতনিকে সামাল দিতে না পেরে নানা তখন একজন বৃদ্ধ হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করলেন। শুরু হলো অভিনব পদ্ধতিতে পাঠ দেয়া-নেয়া। পড়ার টেবিলের ওপর ঝোলানো পর্দার এপাশে ছাত্রী, ওপাশে শিক্ষক। শিক্ষক পড়েন, ছাত্রী শোনেন। শিক্ষক লেখার কাজ দেন, ছাত্রী লিখে খাতাটা ঠেলে পর্দার ওপাশে পাঠিয়ে দেন। মেধাবী ছাত্রী শামসুননাহার এভাবে পড়াশোনা করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করলেন। তারও আগে পুণ্যাত্মা নারীদের জীবন নিয়ে *পুণ্যময়ী* বইটি লিখে ফেলেছিলেন তিনি।[৪] ম্যাট্রিক পাস করার পর আবারও শুরু হলো সেই অন্তহীন ঘরে বসে থাকা।

সময়টা ১৯২৬ সাল। কলকাতা থেকে বড় ভাই হবীবুল্লাহ্ বাহারের সঙ্গে কবি নজরুল এলেন শামসুননাহারদের চট্টগ্রামের বাড়িতে। তখন ওঁর নজরুলের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। অন্দরে অন্তরীন থেকে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, গান শোনা হলো কেবল। নজরুল কলকাতা ফিরে গিয়ে শামসুননাহারকে লিখলেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী ক'রে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আর আট হাত চওড়া দেয়াল। বাহিরের আঘাত ঐ দেয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল ; এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে—"আমরা বন্দিনী"। দ্বার খুলবার দুঃসাহসিকা আজ কোথায় ? তাকেই চাইছেন যুগ-দেবতা।'[৫]

উচ্চশিক্ষার জন্য শামসুননাহারের তখন বিদ্রোহ চলছে। এই বিদ্রোহের আগুনে কাজী নজরুল যেন ঘৃতাহূতি দিলেন। নানা খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তখন প্রয়াত। মা আর নানী মিলে শামসুননাহারের উচ্চশিক্ষার সাধ পূরণের জন্য তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন শিক্ষিত হৃদয়বান ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে। এই বিয়ে শামসুননাহারের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিয়ে তাঁর জীবনের বন্দিত্বও ঘুচালো। তারপর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি ; তারপর কেবল সোপান বেয়ে উপরে উঠে চলা।

১৯৩২ সালে রোকেয়া শামসুননাহারের বি.এ. পাশ করা উপলক্ষে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেছিলেন।[৬] এই পর্বে শামসুননাহার হয়ে উঠলেন রোকেয়ার মানসকন্যা, যে নারী সমস্ত বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে উচ্চশিক্ষিত হতে পারবে, সেই সঙ্গে নারীজাগরণে নিজেকে নিবেদন করবে। শামসুননাহার আসলে তাই করেছিলেন। প্রথমে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম দিয়ে

তাঁর বিপুল কর্মজীবন শুরু হলো। তারপর 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে' যোগ দিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন ভারত সংস্কার আইন পাশ করে তখন ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। শামসুননাহার 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর পক্ষ থেকে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন চালালেন। ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার দাবিতে আইন পাস হলো। ১৯৩৯ সালে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শামসুননাহার কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা পদে নিয়োগ পেলেন। শর্ত ছিল তিন বছরের মধ্যে তাঁকে এম.এ. পাস করতে হবে। বি.এ. পাস করার দশ বছর পর ১৯৪২ সালে তিনি এম.এ. পাস করলেন। অন্যদিকে সাহিত্য চর্চাও তাঁর থেমে রইলো না। ১৯৩৩ সালে দুই ভাই-বোন হবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুননাহারের যুগ্ম সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো সাহিত্য পত্রিকা *বুলবুল*। *বুলবুল*-এর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আত্মবিচ্ছেদে ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী কোথাও ধ্বনিত হোতে পারল একে আমি শুভলক্ষণ বলে মনে করি। . . . এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্বোধ জড়ত্বে যে বেদনার সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের পত্রে তারই লক্ষণ সূচিত।'[৭]

হবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুননাহার সাহিত্যচর্চায় অনেকগুলো বছর হাত ধরাধরি করে চলেছেন। কর্মযজ্ঞে একজন হয়ে উঠেছিলেন অন্যের পরিপূরক। ভাই-বোনের কাজে ও লেখায় আজীবন মিত্রতা বড় একটা দেখা যায় না। নজরুল *সিন্ধু হিন্দোল* কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, 'কে তোমাদের ভাল,/"বাহার" আন গুলশানে গুল/"নাহার" আন আলো।'[৮]

তিরিশের দশকে শামসুননাহারের কর্মজীবন অসংখ্য স্রোতধারায় উৎসারিত হতে লাগল। অবিভক্ত ভারতের নারী আন্দোলনে, নারী-সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন। অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া, বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ উইমেন ইত্যাদি নারী প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। এই সূত্রে দেশ বিদেশের খ্যাতনামা নারী নেত্রীদের সঙ্গে তাঁর মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনার সুযোগ হলো। ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ সেবায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এম. বি. ই উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। ১৯৪৫ সালে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ব্রেবোর্ন থেকে ছুটি নিতে হলো।

দেশভাগের পর ঢাকায় ফিরে শামসুননাহারের মূল কর্মস্রোত আগের খাতেই বইতে শুরু করলো। তিনি সরকারি নারী সংগঠন A.P.W.A (All Pakistan Women's Association)-তে নিজেকে যুক্ত করলেন। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হয়ে তিনি গেলেন বিদেশের অনেক সেমিনার, সম্মেলনে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ায় নারীদের কর্মপ্রচেষ্টা যুক্ত করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি যেন বিশ্বাস করতেন যে সরকারি নীতির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়েই নারী প্রগতি

আসবে। তাই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন যে রক্তক্ষয়ী আপোষহীন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, শামসুননাহার সেদিকে পিঠ দিয়ে থাকলেন। তবে নারীর অধিকারের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনড়, বরাবরই সরব। মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১, প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণীর। ঢাকায় বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর আমৃত্যু তিনি তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ১৪ এপ্রিল শামসুননাহার মাহমুদ মারা যান।

শামসুননাহারের দুই পুত্র মামুন মাহমুদ ও মঈনুদ্দীন মাহমুদ। মামুন মাহমুদের জন্ম ১৯২৯ সালে, কবি নজরুল চট্টগ্রামে বসে লিখেছিলেন, 'পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর/এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।' এই 'শিশু যাদুকর' ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে শহীদ হলেন মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। তিনি তখন রাজশাহীর ডি আই জি অফ পুলিস ছিলেন। মামুন মাহমুদ ১৯৬৬ সাল থেকেই পাকিস্তানের সামরিক সরকারের অগণতান্ত্রিক, নৃশংস ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। তাঁকে হত্যা করে পাক সরকার যেন পরিহাস ছলে শামসুননাহার মাহমুদ ও হবীবুল্লাহ্ বাহারের নামে ঢাকার দু'টি রাস্তার নামকরণ করল।[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, হবীবুল্লাহ্ বাহার দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী হয়েছিলেন। বাহান্ন সালে প্রকাশ্য রাজপথে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানর খবর পেয়ে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৩ সালের ৬ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে ভাষণ দেবার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি জ্ঞান হারান। হবীবুল্লাহ্ বাহার এর পর আরও এক যুগ বেঁচেছিলেন, কিন্তু তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি।

শ.আ.
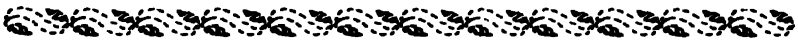
## রোকেয়া-জীবনী
### শেষাংশ

প্রথম যখন রোকেয়া-জীবনী লিখিবার কল্পনা করি তখন রোকেয়া জীবিত ছিলেন। এই মহিমাময়ী নারীর সঙ্গে কয়েক বৎসর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। অবসর সময়ে গল্প করিতে করিতে তিনি আপনার জীবনের নানা বিচিত্র ছবি আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেন। এভাবে তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ও ততোধিক অদ্ভুত চরিত্রের এমন বহু নিগূঢ় তথ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে যাহা জানা অন্য কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।

রোকেয়া-জীবনী রচনার গোড়ার কথা আলোচনা করিতে গিয়া সকলের আগে যাহাকে স্মরণ করি তিনি আমার মা। অদ্ভুত নারীর বিচিত্র জীবনকাহিনী লিখিয়া

সাধারণে প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলের আগে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই কথামত আমি রোকেয়া-জীবনী লেখায় হাত দিই। ইহার উপকরণ সংগ্রহের দায়িত্বও অনেকটা মায়েরই। রোকেয়ার মৃত্যুর পরও তিনি যে কোন সুযোগে নানা জনের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে ভালোবাসিতেন। রোকেয়ার সঙ্গে তিনি আজ একই লোকে বাস করিতেছেন। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সাধের রোকেয়া-জীবনী তাঁহার জীবনকালে দিনের আলোক দেখিতে পাইল না। সময়ের অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ একথা বলিয়া অপরাধ বাড়াইব না। দীর্ঘসূত্রতাকে প্রশ্রয় না দিলে বোধ হয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক শুধু মায়ের নহে স্বয়ং রোকেয়ারও চরণ ছুঁইয়া ধন্য হইতে পারিত। আজ মরণের পর পার হইতে এই দুই মহীয়সী নারী আমার পরিশ্রমের এই ক্ষুদ্র ফলটিকে আশীর্ব্বাদ করুন!

রোকেয়া-জীবনীর যাহারা মাল-মশলা যোগাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ইসকান্দর গজনভী, শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ, মিসেস্ এইচ. টি. হোসায়ন, মিসেস্ এফ. রশীদ ও মিঃ সাবের প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সকলের শেষে একথাও স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে আমার অগ্রজের দায়িত্ব নিতান্ত কম নহে। তিনি অনবরত তাড়া না দিলে রোকেয়া-জীবনী কবে প্রকাশিত হইত বলা কঠিন।

গত বৎসর মাসিক বুলবুলে রোকেয়া-জীবনী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেসময় পাঠিকা ভগ্নিদের মধ্যে অনেকে ইহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন ; শুধু পড়িয়াছেন এমন নয়, পড়িয়া নিজেদের মধ্যে এক নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কেহ কেহ নিজ মুখে একথা উল্লেখও করিয়াছেন।

যাহাদের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক লেখা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকে ইহাকে স্নেহের চোখে দেখিলে ধন্য হইব।

'বুলবুল' হাউস — শামসুন নাহার
কলিকাতা।

## মুস্‌লিম-বঙ্গে নারী-আন্দোলন

বাংলায় মুসলমান মেয়েদের সামাজিক জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় গত বিশ বৎসরে তাঁহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশ বৎসর আগে যাঁহারা গৃহের চারি প্রাচীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসাকে ঘোর পাপের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই আজ রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বিলাত পর্য্যন্ত দরবার করিতেছেন। সমাজের যে দিকেই তাকানো যায়, দেখা যাইবে আজিকার মুস্‌লিম নারী-সমাজে সমস্ত ব্যাপারে একটা নূতন চাঞ্চল্য ও উৎসাহের লক্ষণ জাগিয়াছে।

সমস্ত বিষয়েই অনুভব করা যায় যে আমরা উন্নতির যুগে বাস করিতেছি, আমাদের চারিদিকে সমাজের চেহারা দিনে দিনে বদলিয়া যাইতেছে, দেশের মেয়েদের অভাব আকাঙ্ক্ষা সব কিছুতেই একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন আসিতেছে।

কিছুদিন আগে দমদম হইতে বিমান-পোত-চালনা শিক্ষার জন্য যে দাস-রায় মেমোরিয়াল বৃত্তি ঘোষণা করা হয়, মুসলমান মেয়েরা তাহাতে পর্য্যন্ত প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা আজ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে, হাইকোর্টের এডভোকেট হিসাবে এবং আরও নানাভাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্রীর অভাব নাই। মুসলমান মহিলারা স্কুল স্থাপন করিতেছেন, স্কুল পরিচালনা করিতেছেন, সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সমিতির মধ্য দিয়া সমাজসেবায় দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শুধু কলিকাতার নয়, কলিকাতার বাহিরেও বহু বালিকা স্কুল, গার্লস্ হোম বা মহিলা সমিতি আছে, যাহার মূলে রহিয়াছে মুসলমান মেয়েদেরই সাধনা।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়া মুসলমান বালিকারা হিন্দু বালিকাদের চেয়েও অনেক অগ্রসর।

বাংলার মিউনিসিপালিটিতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রথম যে মেয়ে মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনি মুসলমান।

জাগরণের এই আলোকময় প্রভাতে আজ সকলের আগে যাঁহাকে মনে পড়ে, তিনি আর কেহই নহেন—বাংলার মুসলমান নারী-আন্দোলনের জন্মদাত্রী, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রদূত মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসায়ন। আমরা জানি, ইংরেজের আমলে মুসলমান নারীদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্য হইতে আলোকের পথে টানিয়া আনিবার প্রথম চেষ্টা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আলোকের দূতী বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে আর কয়েকটী যুবক নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া নীরবে মুসলমান মেয়েদের চলার পথ সুগম করিবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করিতেছিলেন। পাঠ্যজীবনে ইহাদের চেষ্টায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় সুহৃদ সম্মিলনী নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারই মধ্য দিয়া ইহারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে উদার মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যে নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশ জুড়িয়া স্কুল-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক সেই নিয়মে ইহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের মেয়েদের জন্য গৃহে গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন।*

কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল সেদিন, যেদি আলোকের দূতী রোকেয়ার

*এই অক্লান্ত কর্ম্মী, নারীহিতৈষী যুবকদিগের মধ্যে নোয়াখালীর মৌলবী আবদুল আজীজ, মৌলবী ফজলুল করীম, মৌলবী বজলুর রহীম ও বরিশালের মৌলবী হেমায়েৎ উদ্দীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মুস্‌লিম-বঙ্গে সকলের আগে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহারা তাহাদেরই মধ্যে কয়েকজন।

অপূর্ব্ব প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল! আমাদের জীবনে মধ্যাহ্ন এখনো আসে নাই। কিন্তু আঁধারের বুক চিরিয়া যে-নারী আলোক-শিশুকে বাঁচাইয়া আনিলেন, মধ্যদিনে তাঁহার উদ্দেশে আমাদের হাতের জয়পতাকা নিশ্চয়ই অবনত হইবে।

গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুস্‌লিম নারীদের সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বা মুস্‌লিম মহিলা সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই মহিলা সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সহিত তাঁহার বিশবৎসরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আঞ্জুমনের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্ম্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।

আঞ্জুমনে খাওয়াতীন তাহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে, তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্ত বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী-সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে!

প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিলেন। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিবেন একথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাঁহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন।

কোথাও হয়ত বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে অভিভাবকের রোষকষায়িতলোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে তখন তিনি সভার নির্দিষ্ট তারিখে, কোন নিকট-আত্মীয়ের গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে পুঁটুলিতে রহিয়াছে সভায় যোগদান করিবার উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টায় রোকেয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

একাকী অন্ধকার-পথে কত নিন্দা-গ্লানি, কত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাঁহাকে

পথ চলিতে হইয়াছে, তাঁহার একটী মাত্র কথায় তাহার সবখানি আমাদের চোখের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তাঁহার শেষ জীবনে যখন আমাকে এই সমিতির কাজে হাত দিতে হইয়াছিল, তখন একবার বাহির হইতে অকারণে সামান্য বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলাম, সে সময় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাতে আঘাত করিতে না পারে ; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।' এই একটী কথাই তাঁহার জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই একটী মাত্র কথার মধ্যে যেন আমারা এক নিমেষে তাঁহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিয়া পাই ! বাস্তবিক চিরদিন তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ও মস্তকের আবরণে কেবলই আঘাতের পর আঘাত বর্ষিত হইয়াছিল। উদগ্র কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া চিরদিন দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সভাসমিতি কাহাকে বলে অনেক স্থলে তাহাও রোকেয়াকে অনেক কষ্টে শিখাইতে হইত। তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন—একবার অনেক সাধ্যসাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটী শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমনের এক মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিংয়ের কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন— 'সভার নাম করিয়া বাড়ীর বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না !' রোকেয়া অনেক কষ্টে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, এখনই যে-কাজ শেষ হইয়া গেল তাহারই নাম সভা।

রোকেয়া বলিতেন, 'যে কক্ষে সভা বসিত প্রত্যেকটী অধিবেশনের পর তাহার দেওয়ালগুলির পানের পিকে এমন রঞ্জিত হইয়া যাইত যে, প্রত্যেক বারেই চুণকাম না করাইলে চলিত না।'

স্বয়ং সভানেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সমাগত মহিলাদের মধ্যে কেহই অনুভব করিতেন না, যে-সময় সভার কাজ চলিতেছে অন্ততঃ সে-সময়টুকু নিজ নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা প্রয়োজন। সে যুগে রোকেয়া কি ধরণের সভা করিতেন আজ বিশ বৎসর পরে তাহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

ক্রমে রোকেয়ার চারিধারে একটী ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। ধীরে অতি ধীরে তাঁহারা বুঝিলেন—সভা-সমিতি কাহাকে বলে, তাঁহারা দেখিলেন, নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা শিখিলেন তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে আঞ্জুমনের খাওয়াতীন বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুস্‌লিম নারীর চক্ষু ফুটাইল।

রোকেয়া আজ নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে-পতাকা তিনি এতকাল উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা ধুলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা জাগিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের কাজ হইল, তাঁহার হাতের

জয়পতাকা সাবধানে বহন করিয়া লইয়া পথ চলা—যে কাজ তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সম্পূর্ণ করিয়া তোলা।

মনে হয় দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের উপরে আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলামের প্রভাব দিনে দিনে আরও বিস্তৃত হইতেছে। দেশের সমস্ত শক্তিশালী নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করায় গত কয়েক বৎসরে নারীসমাজের সমুদয় কল্যাণ-আয়োজনের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। নারীর সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও আইনগত অধিকার-অনধিকার লইয়া এই সমিতি যে আন্দোলন করিয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। এমন কি এসব ব্যাপারে দেশের গভর্ণমেন্টও ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ইহার মতামতকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের আগামী শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে। ১৯৩৫ সনের শেষভাগে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবার জন্য বিহার-উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার লরী হ্যামন্ডের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, নারীর অধিকার লইয়া এই সমিতি তাহার সঙ্গেও দরবার করিয়াছিল। কলিকাতা কাউন্সিল হাউসে সমিতির প্রতিনিধি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বঙ্গনারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করেন।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমিতি যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপত্তন করিয়াছে, ভবিষ্যতে হয়ত ইহাই দেশের নারীসমস্যার একটা দিক সমাধানের পথে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়া গেল, এদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার বিবরণ স্থায়ী অক্ষরে লেখা থাকিবে। আয়ার্ল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাকর্ম্মিগণ সমগ্র নারী জাতির কল্যাণ কামনায় ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম, বাঙ্গলা বা নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি এই সম্মিলনে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া মুসলমান মেয়েদের কর্ম্মপ্রিয়তার পরিচয় দেন।

সমিতির কাজে রোকেয়ার অনুবর্ত্তিগণকে যে পদে পদে বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া পথ চলিতে হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু দেশের নারীচিত্তকে জাগ্রত করিবার জন্য যিনি এত দীর্ঘ দিন আপনাকে তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গেলেন, যুদ্ধজয়ের সমস্ত যশোভাগ তাঁহারই প্রাপ্য।

## অবসান

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বাংলার নারী ইতিহাসে এক শোচনীয় দিন। আমাদের বড় আদরের, বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের রোকেয়া সেদিন অকস্মাৎ পরলোক যাত্রা করিলেন। দুর্ব্বার সাহস, একাগ্রে সাধনা ও কঠিন পণ লইয়া যিনি এত দীর্ঘ

দিন একই লক্ষ্যে চলিয়াছিলেন, কোন্ এক অদৃশ্য চালকের বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সকল ছাড়িয়া এক নিমেষেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। সৈনিকের জীবনের সহিত রোকেয়ার জীবনের কি চমৎকার সাদৃশ্য!

রাত্রি অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবেমাত্র উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার জীবনের কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিদিনের মত নূতন উদ্যমে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এমনি সময়ে মুস্‌লিম বঙ্গের একটী বিরাট কর্ম্মকেন্দ্রে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইল।

কলিকাতার অলিতে গলিতে দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইল না। শুধু কলিকাতাই নয়, দেখিতে দেখিতে হাওড়া প্রভৃতি আশে পাশের সমস্ত স্থানে রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে শেষবারের মত দেখিয়া লইবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অসংখ্য নারী সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন।

চিরদিনই রোকেয়া স্কুলের কাজকর্ম্মে অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাগজ-পত্রের ফাইলের মধ্যে তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। সেই রাত্রিই তাঁহার জীবনের কালরাত্রি একথা তখন কে জানিত? প্রত্যূষে যখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন তখনও তাঁহার দেহে বা মনে গ্লানির চিহ্নমাত্র নাই। পূবের আকাশে হাস্যমুখী উষা। রোকেয়ারও ঠিক তেমনি শান্ত প্রসন্ন ভাব। মুখহাত ধুইবার জন্য তিনি গোসলখানায় ঢুকিয়াছেন। মৃত্যুর দূত বুঝি আলো-আঁধারের মধ্যে সেখানেই ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কি করিয়া কি হইল কে বলিবে? মুখহাত ধোওয়া আর হইল না। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা লইয়া ছটফট্ করিতে করিতে রোকেয়া আবার শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ব্যথিতের আর্ত্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দকুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল। সৌন্দর্য্যে রমণীয়, মহত্ত্বে বরণীয় ও গৌরবে স্মরণীয় একটী জীবনের উপর করাল কাল চকিতে তাহার কাল যবনিকা টানিয়া দিল। অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল যে প্রদীপ দীপ্ততেজে জ্বলিয়াছিল, কালের এক ফুৎকারে তাহা নিভিয়া গেল।

ভিতরে ভিতরে রোকেয়ার স্বাস্থ্য বোধহয় কিছুদিন হইতে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। যখনই তাঁহার কাছে গিয়েছি—সেই চিরপরিচিত প্রসন্ন-উজ্জ্বল হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন। শুধু কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে জানিতে পারিতাম যে তিনি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থামত তিনি ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার বলিতেন—হাওয়া পরিবর্ত্তন ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। রোগী উত্তর করিতেন 'বিশ্রাম করিব কি, আমার যে মরিবারও অবসর নাই।'

তাঁহার কথাগুলি কিন্তু আমার মায়ের মনে শঙ্কার উদ্রেক করিত। মা বলিতেন—এবারে বুঝিবা সত্য সত্যই তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইল! রোকেয়ার জীবনের পরিপূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা মায়ের বড়ই ইচ্ছা ছিল। যখনই সুযোগ হইত, মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিতেন, আর আমাকে বলিতেন—এই রহস্যময় জীবনের ইতিহাস পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ভার তোমার উপর রহিল।

স্কুল বা আঞ্জুমন সংক্রান্ত নানা কাজে রোকেয়ার সেখানে মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়িত। কখনো আঞ্জুমনের রিপোর্ট লেখা, কখনো স্কুলের কাগজ পত্রের ফাইল গোছাইয়া দেওয়া, আর কখনো বা শিক্ষয়িত্রী কম পড়িলে স্কুলের অধ্যাপনার কাজে সাহায্য করা—এমনি নানা ধরণের কাজ। কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝে নিরালা এক একবার আমাকে নিয়া বসিতেন। সেই সুযোগে নানা কথা উঠিত। মৃত্যুর অল্পদিন আগে একবার হঠাৎ বলিলেন—'আমি তো চলিলাম!' বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম—'কোথায়'? তিনি উত্তর দিলেন—'আমি কি চিরটা কাল এই ভূতের বোঝা বহিয়া মরিব? এবার আমার ছুটির নিবার পালা। আমার জন্য এক 'হোজরা' তৈয়ার হইতেছে। বাকী কটা দিন আমি সেখানেই অজ্ঞাতবাস করিব।' কথাটা খুলিয়া বলিলেন না। পরে জানিয়াছিলাম যে ঘাটশীলায় তাঁহার নূতন বাড়ী হইতেছে। কিন্তু যে-সাধনায় তাঁহার জীবন-যৌবন, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ-সম্পদ সমস্তই ব্যয় হইয়াছে—পূর্ণ সাফল্য আসিবার আগেই তিনি তাহা ছাড়িয়া চলিবেন বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবার জন্য, কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'স্কুলের তবে কি উপায়?' হাসিয়া বলিলেন, 'স্কুলের জন্য তোমরাই তো রহিলে। আমাকে এবার ছুটি দাও।' বলিলাম, 'কিন্তু পারিবেন কি, স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িয়া দূরে থাকিতে? বিশ্রাম যে আপনার পক্ষে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে!' মুখে কথাটার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু উঠিয়া ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, চিঠিখানা লিখিয়াছেন তাঁহার চিরকালের এক হিতৈষী বন্ধু, শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। চিঠিতে স্কুলের অবস্থা, সমাজের ব্যবহার, রোকেয়ার সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা রহিয়াছে। প্রতি ছত্রে ছত্রে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং রোকেয়ার প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—"আপনার এই যে জীবন-ব্যাপী ত্যাগ, দুর্ভাগ্য সমাজ তাহার কি প্রতিদান দিল? এক একবার ইচ্ছা হয় বলি, আপনি এই অকৃতজ্ঞ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করুন। স্কুলের জন্য জীবনপাত করিয়াই বা আপনার কি লাভ? যাহা করিয়াছেন এইটুকুই মানুষের শক্তির অতীত। এবার নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির দিকে ফিরিয়া দেখুন। স্কুলের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে এবার বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন।

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবি, একি সম্ভব? পারিবেন কি আপনি স্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিতে? মৎস্য যদি জলাশয় না হইলে একদণ্ড টিকিতে না পারে,

আপনিই বা স্কুলের আবেষ্টনের মধ্যে না হইলে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন ?

"তারপরে সমাজের নিন্দা, ভ্রুকুটী ও বিরুদ্ধতা। এই লইয়াই ত আপনার জীবন! ইহাই আপনার পুরস্কার, ইহাতেই তো আপনার তৃপ্তি। এ সব না হইলেই বা আপনি বাঁচিবেন কি লইয়া ?"

মনে হইল চিঠিখানির মধ্যে রোকেয়ার অন্তরের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। বুঝিলাম, প্রথমে যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা তাঁহার মনের কথা নয়। দেহে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকিতে স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব! কিন্তু যে বিদায়ের আভাস তিনি সেদিন কথা প্রসঙ্গে দিয়াছিলেন, জীবনে না হইলেও মরণে যে তাহা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে একথা তখন কে ভাবিয়াছিল ?

রোকেয়া মরিলেন—জাতিকে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিয়া তিনি নক্ষত্রের দেশে নিরুদ্দেশ হইলেন। যে স্কুল-গৃহের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে ছিল তাঁহার শিরা উপশিরার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে তাহা হইতে তিনি চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর! রোকেয়াকে হারাইয়া সেদিন কলিকাতা মহানগরীতে যেন শোকের তুফান বহিয়াছিল। বাংলার মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেই সেদিন বজ্রাহত!

১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলায় কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির পাতায় পাতায় দেখা গেল শোকের এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিখ্যাত পত্রিকাগুলির বিশেষ সংখ্যা বাহির হইল। সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়া দেশের ছোট বড় নেতা, সাহিত্যিক সকলে এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। স্বয়ং বাংলার গভর্ণর বাহাদুর দেশের ও জাতির এই বিরাট ক্ষতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন।

বাংলা-মায়ের দুলালী রোকেয়াকে স্মরণ করিয়া দেশবাসিগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতা আলবার্ট হলে এক মহতী সভায় সমবেত হইলেন। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি ও আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বাঙ্গালা বা নিখিলবঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি। অতবড় হলে বুঝি সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না। যাঁহারা জীবনে কোনদিন পর্দ্দার বাহিরে যান নাই, এমনও অনেক মুসলমান মহিলাকে সেদিন আলবার্ট হলের বক্তৃতামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা গেল। সভানেত্রীত্ব করিলেন কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস পি. কে. রায়। রোকেয়ার প্রতিভা, একনিষ্ঠ সমাজসেবা, মহান ত্যাগ, জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যচর্চ্চা ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইংরাজী, বাংলা ও উর্দ্দুতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিলেন। চিরদিন যে-সমাজ আঘাতের পর আঘাতই হানিয়াছে, সেই সমাজেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপনে এত শ্রদ্ধা-প্রীতি, এত কৃতজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা কে জানিত ?

সকলের শেষে বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইলেন রোকেয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এক তরুণ যুবক ; তিনি বলিলেন, "আজিকার বেদনা-উৎসবে সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু

কিসের জন্য ? লাট-বেলাট নহে, রাজা-মহারাজা নহে—একটী অবলা নারীর মৃত্যু আজ এতগুলি লোককে একত্রে মিলিত করিয়াছে। জাতি যে আজ জাগ্রত, ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয় !

"সভায় অনেকে অনেক কিছু বলিলেন। রোকেয়ার যে সকল গুণ ও কার্য্যবলীর কথা তাঁহারা উল্লেখ করিলেন তাহার প্রত্যেকটীই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জাতি তাঁহাকে কি প্রতিদান দিয়াছে ? তাঁহার জীবনব্যাপী ত্যাগের ফলে সমাজের নিকট হইতে তিনি কি পাইয়াছেন ? পাইয়াছেন অশ্রাব্য নিন্দা ও অকথ্য লাঞ্ছনা। এতবড় সভায় আজ কে আছে, একথার প্রতিবাদ করিবে ? এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটী মানুষ আজ আপনার বুকে হাত দিয়া বলুন—একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পলে পলে কাহারা তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাহারা তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া চলিয়াছিল। তাঁহারা বলিতে পারেন কি, রোকেয়ার মৃত্যুতে আজ শোক প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কি অধিকার ?

"রোকেয়া নাই। তিনি আজ ধূলিমলিন পৃথিবীর নিন্দাগ্লানি হইতে অনেক উর্দ্ধে। তিনি শহীদের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রণক্লান্ত আত্মা বুঝি সমাজের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সকলের অলক্ষ্যে এই সভাগৃহে আজ অসহ্য ব্যথায় ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে।"

বিস্তীর্ণ সভাগৃহের প্রতি প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল—"অসহ্য বেদনায় ফরিয়াদ করিতেছে।" এই মর্ম্মভেদী অভিযোগের উত্তরে কিছু বলিবার জন্য কাহারও মুখে ভাষা জোগাইল না। বিপুল জনসভা শুধু নিরুত্তরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। যুগজননী রোকেয়ার চলার পথে কুশ-কন্টক রচনা করিয়া জাতি যে পাপ করিয়াছিল চোখের জলে বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

জীবনকালে শুধু ব্যথা আর আঘাতই ছিল যাঁহার পুরস্কার, সেদিনকার মৃত্যু-উৎসবে বিপুল গৌরবে অশ্রুর মালায় তাঁহার অভিষেক হইল। কিন্তু পরপার হইতে বুঝি তিনি সেদিন তীব্র দুঃখে উচ্চারণ করিলেন—'অবেলায় এ যে বড়ই অবেলায়।'

তরুণ বক্তা আবার বলিলেন—"আমরা যে মহাপাপ করিয়াছি অশ্রুজলে তাহা মুছিবে না। তাহার একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্তই বুঝি সম্ভব। এই সভাস্থলে রোকেয়ার পুণ্যস্মৃতিকে সাক্ষী করিয়া আমরা প্রত্যেকটী মানুষ আজ পণ করিতে পারি যে আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মেয়েকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। বাংলাদেশের একটী বালিকাও যেদিন আর অশিক্ষিত থাকিবে না, সেদিন—শুধু সেদিনই বুঝি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

সভানেত্রী তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পরলোকগতার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "রোকেয়া নাই এবং তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা মিলিত হইয়াছি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মাত্র সেদিন তাঁহাকে দেখিলাম, স্কুল সংক্রান্ত নানা বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইল।

"প্রায় পচিশ বৎসর আগে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় ; সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই। খর্ব্বাকৃতি পরমা সুন্দরী নারী—দেখিয়া মনে হইল এক বিশিষ্ট ছাপ সর্ব্বাঙ্গে লেখা রহিয়াছে ; উৎসাহ, উদ্যম, ও শক্তির যেন এক জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

"আমি তখন কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন সবেমাত্র সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের স্কুলের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর সহিত তিনি পরিচিত হইতে চাহিলেন। তিনি নিজে কোন স্কুলে কলেজে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। চোখে দেখিয়া স্কুল পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন এবং সেই অনুসারে নিজের স্কুল গড়িয়া তুলিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"যতই দিন যাইতে লাগিত ততই তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। তিনি জানিতেন, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান কখনো প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে পারে না। মানুষের জীবনকে উচ্চতর স্তরে তুলিয়া দিতে পারে যে-ধর্ম্ম, তাহাই শাশ্বত সত্যধর্ম্ম।

"আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম ; কারণ আমার আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটা মিল ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ জানিতেন না, আমিও কখনো জানি নাই।

"আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কারণ ভারতীয় নারীত্বের যে আদর্শ আমি চিরদিন মনে মনে পোষণ করিয়াছি—যাহা একান্তই ভারতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমি মনে করি—তাহারই বিকাশ দেখিয়াছিলাম তাঁহার জীবনে!"

শুধু আলবার্ট হলের এই জনসভায় যোগদান করিয়া কলিকাতার মহিলা সমাজ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না ; শোকার্ত্ত মনের বেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে এক বিরাট মহিলা সভার আয়োজন করিলেন। সভানেত্রীত্ব করিলেন লেডী আবদুর রহিম। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শতশত নারীর চোখে সেদিন বেদনার অশ্রু বহিল। বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া চোখের জলে অনেকেই মুখে ভাষা হারাইয়া ফেলিলেন। জীবনে যাঁহারা রোকেয়াকে চেনেন নাই, সেদিন তাঁহাদেরও বুঝি চোখ ফুটিয়াছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতি ধূলিকণায় যেন সেদিন লেখা ছিল এক অব্যক্ত হাহাকার।

রোকেয়ার সমাধি হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে তাঁহার আত্মীয়বর্গের পুরাতন গোরস্থানে। আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শবদেহ সোদপুরে নেওয়া হইল।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় কলিকাতার নারী সমাজে অসন্তোষ ও অতৃপ্তির মৃদু গুঞ্জন শুনা গিয়াছিল। 'কোকিল যতক্ষণ কাকের বাসায় থাকে ততক্ষণ সে কাকের, কিন্তু যে মাত্র সে গান করিয়া উড়িতে শিখে তখন সে সমগ্র প্রকৃতির, সে বসন্তের, সে বিশ্বের।' রোকেয়ার উপরে আত্মীয় স্বজনের দাবী ছাড়াইয়া সমগ্র মানব-সমাজের দাবী আসিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ গোরস্থানের মাটিতে যেখানে শত শত মানুষের

অস্থিমজ্জা মিশিয়া রহিয়াছে সেখানেই তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হইলে বুঝি তাঁহারও আত্মা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিত। যাহাদিগকে লইয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাদের চোখের অন্তরালে পল্লীজননীর নিভৃতক্রোড়ে তিনি চিরদিনের মত ঘুমাইয়া রহিলেন।

আজও বৎসর বৎসর আঞ্জুমান খাওয়াতীনের উদ্যোগে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে রোকেয়ার স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়া থাকে। শোকের অশ্রু হয়ত আজ শুকাইয়াছে, কিন্তু শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিঃশেষ হয় নাই—হয়তো কখনো হইবেও না। রোকেয়ার ত্যাগ-পূত জীবনের পুণ্যস্মৃতি এদেশের মুসলমান নারী-সমাজে অনন্তকাল ধরিয়া শক্তি ও প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস হইয়া জাগিয়া থাকিবে।

বাংলার মুসলমান নারী-সমাজকে জাগ্রত করিয়া রোকেয়া আজ অমৃতলোকযাত্রী। রোকেয়া মরিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে বাঁচিয়া উঠিয়াছে শত শত রোকেয়া—রোকেয়ার স্মৃতিসভায় দাঁড়াইয়া সকলের আগে একথাই মনে পড়ে। রোকেয়া মৃত, একথা যে কত বড় মিথ্যা—শত শত নারী সেদিন আপনার বুকে বুকে তাহা অনুভব করেন!

## সফল স্বপ্ন

রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া কলিকাতার আকাশে সবেমাত্র ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে ; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল, একথা আগেই বলিয়াছি। এই ঘটনার একটী সুন্দর অর্থ দেখিয়া পাওয়া যায়। এ যেন আমাদের সমাজের অবস্থারই প্রতীক। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় গগনের প্রভাতীতারা। তাঁহার প্রয়াণ—সেও যেন হইল প্রভাতীতারারই বিদায়যাত্রা। তিনি আসিলেন কালরাত্রির অন্ধকারে, গাহিলেন প্রভাতের আগমনী। রাত্রি অবসান হইল, অন্ধকার কাটিয়া গেল। অরুণ আলোকে মুক্ত আকাশতলে সমবেত হইল আলোক-শিশুর দল। রোকেয়া রাত্রির আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়াছিলেন—অন্ধকারে জ্বলিয়াছিলেন প্রদীপের মতো। দিনের আলোয় তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তাঁহার কাজ ফুরাইল, আনন্দে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রোকেয়া শুধু কর্ম্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। নারী-জাগরণের যে অভিনব স্বপ্ন জীবনের সোনালী ঊষায় তাঁহার চোখের সম্মুখে জাগিয়াছিল, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। সংসারে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চভিলাষের অন্ত নাই। দৃষ্টিমান মানুষের নয়ন-সমক্ষে ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বহু কর্ম্মযোগী, হৃদয়বান ব্যক্তি মানব কল্যাণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনকালে স্বপ্ন হয়ত শুধু স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে—সম্ভবের দেশে পক্ষ বিস্তার করে নাই।

কিন্তু রোকেয়ার অদৃষ্ট অন্যরূপ। এযুগে আমরা দেখিতে পাই কামাল পাশা,

মুসোলিনী প্রভৃতি মহামানুষ জীবনকালেই নিজের আরব্ধ কার্য্যের ফলভোগ করিতে পারিতেছেন। এদিক দিয়া ইঁহাদের ভাগ্যের সহিত রোকেয়ার ভাগ্যের তুলনা হয়। ইহাদেরই মত রোকেয়ারও জীবদ্দশাতে তাঁহার সাধের স্বপ্ন বাস্তবরূপে লাভ করিয়াছিল।

'সুলতানার স্বপ্ন' নামক ইংরাজী গ্রন্থে রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তাহার পরিণতি কল্পনা করিতে গিয়া আকাশপথে ভ্রমণের যে মনোরম স্বপ্ন মানস-নয়নে দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ আমাদের বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"যে সময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম তখন এরোপ্লেন ও জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না! এমন কি সেসময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখা কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সেসব কিছুই দেখি নাই। প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ সনে) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শূন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনো উড়ো জাহাজে উঠিতে পারিব এরূপ আশা কোনদিন করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।"

কিন্তু সুলতানার সেই বিচিত্র স্বপ্ন কিরূপে রোকেয়ার নিজের জীবনে সাফল্যলাভ করিল, তাহারও বর্ণনা আমরা তাঁহারই লেখনী-মুখে পাই।

"২রা ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃঃ) মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। দমদমের এরোড্রোমে পৌঁছিয়া দেখি একেবারে মুক্ত ময়দান। কেবল আমাদের মোটর তিনটী এবং আমরাই। আমি আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান মোরাদের প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি ধরাখানা সবই সরাতুল্য। আমি ক্রমে তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার! আমার দক্ষিণ দিকে অস্তগামী সূর্য্য, দ্বাদশীর পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র—উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নীচে চাহিয়া দেখি, কলিকাতার পাকা বাড়ীগুলি—কোঠা, বালাখানা, ইমারত,—সব ইষ্টক-স্তূপের মত দেখাইতেছে। হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ! আর হুগলী নদী—সেত জলাশয়ের সামান্য একটী রেখার মত দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশ মাইল চক্কর দিয়া নীচে নামিলাম।

"পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুস্‌লিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধ-বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই।"

সুদূর অতীতে কল্পনার চোখে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের আনন্দে সেদিন তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তির বিকাশই তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নয়। নারীজাগরণের সম্মোহন স্বপ্নে তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত বিভোর হইয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা বিফল হয় নাই। জীবনের সায়াহ্নে

কল্পনা তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাঁহার স্বপ্ন বাস্তব জীবনে অভিনব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার শেষ জীবনের কথা আলোচনা করিলে একটী সুন্দর ছবি মনে জাগে: একটী মৃত নারী-সমাজ ধীরে—অতি ধীরে নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছে, আর একটী কল্যাণী বিধবা সমস্ত প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া সেই জাগরণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতেছে।

রোকেয়ার মৃত্যুর কয়েকমাস্ পূর্ব্বে একটী নারী-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলাম। এই সম্মিলনে সভানেত্রীত্ব করিয়া তিনি আমাদিগকে গৌরবান্বিত করেন। সাফল্যের গৌরব ও তৃপ্তি তাঁহার সেদিনকার অভিভাষণের প্রতি ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বলেন—"আজ আমি আপনাদের দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে আমি মুস্‌লিম নারী-সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু ঘুম তাঁহাদের কিছুতেই ভাঙিতেছিল না। ডাকিয়া ডাকিয়া জাগাই—আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমান। বাইশ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা আগে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেন, পরে উঠিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন—কিন্তু গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। সুখের বিষয় এদিকে কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, তাঁহারা চোখ রগড়াইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ এতগুলি শিক্ষিতা মহিলাকে দেখিতে পাইয়া চক্ষু জুড়াইল।"

এই সম্মিলনের কয়েক বৎসর আগে একটী মহিলা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনারা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে আমি আজ বাইশ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন ? সে জীব ভারত-নারী। ঐ জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। পশুর জন্য চিন্তা-করিবারও লোক আছে। তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটী লোকও এ ভূভারতে নাই।"

কিন্তু আজিকার সম্মিলনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতি ও স্থায়িত্বের বিষয়ে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া তিনি সকৌতুকে বলিলেন—"আমাদের মত অবরোধ-বন্দিনীদের পুড়িয়া দিলে ভূতেও খায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহস করিয়া অবরোধের নাগপাশ ছিঁড়িতে পারিয়াছেন তাঁহারাই এ কাজে অগ্রসর হউন।" বলিতে বলিতে আশা ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে তাঁহার দুচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ আর তাঁহাকে নারীজাতির জন্য কাঁদিবার লোক খুঁজিতে হইল না। জাগ্রত নারী-শক্তিতে তাঁহার চেয়ে আর কে বেশী আস্থাবান ছিল ? দায়িত্ব বাস্তবিক পক্ষে যাঁহাদের—তাঁহাদেরই হাতে তাহা তুলিয়া দিতে পারিয়া বুঝি তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রোকেয়ার সঙ্গে দেখা হইলে প্রায়ই অনুযোগ করিতেন—'তোমাকে আর কত

বলিব ? বি. এ. পরীক্ষাটা শেষ না করিয়া কেন যে ফেলিয়া রাখিয়াছ জানি না।' আনন্দের বিষয় এই যে, মৃত্যুর বৎসরেই তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিন তাঁহার চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেহ হয় নাই।

একদিন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলাম যে, আমার পরীক্ষায় সাফল্য উপলক্ষে তিনি এক মহিলা সভার আয়োজন করিতেছেন। বুঝিলাম, ইহাতে আমার কৃতিত্বের পরিচয় যতটা নাই—তার চেয়ে বেশী আছে তাঁহারই আনন্দের প্রকাশ।

রোকেয়ার আহ্বানে সেদিন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সেদিন সভাসমক্ষে তাঁহার মুখে চোখে যে আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জীবনে ভুলিব না।

অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিতে গিয়া তিনি বলিলেন—"আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে—আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায় ? অনেকেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না। যে বাদশাহ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।"

বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে বুঝি আর অপূর্ণতার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। ৫৩ বছর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনিতাম—"বেশী নয়, আর দশটী বছর যদি বাঁচিতে পারি তবে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি এমন মজবুত করিয়া দিয়া যাইতে পারিব যে তাহার স্থায়িত্বের জন্য আর ভাবিবার কারণ থাকিবে না।"

স্কুলের একটী নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি বিল্ডিং ফাণ্ডে সঞ্চয়ও কম করেন নাই। আর কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিলে স্কুলকে নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি এই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে প্রার্থিত অবকাশ দেয় নাই।

তিনি আজ মরণের পরপারে, কিন্তু তাঁহার বড় সাধের সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল আজ একটী প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিচালন-ভার আজ গভর্ণমেন্ট নিজ হাতে লইয়াছেন।

শুধুই তাহাই নয়। দেশব্যাপী জড়তা ও অবসাদের মধ্যে রোকেয়া যে কর্ম্মের স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন তাহারও গতি দিন দিন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া চলিয়াছে। মুস্‌লিম বঙ্গের মুক্তিপথ-যাত্রিণীদের ঘিরিয়া বুঝি তাঁহার কল্যাণ-আঁখি আজিও অনিমেষে জাগিয়া আছে। মনে হয়, পরপার হইতে আজিও তিনি তাহাদের শিরে অহরহ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

## চরিত্র পাঠ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাহজাহানের উদ্দেশে বলিয়াছেন, 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, তোমার তাজমহলের চেয়ে—হে সম্রাট, তুমি ছিলে মহত্তর।' রোকেয়ার জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই বলিতে ইচ্ছা হয়। মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য রোকেয়া একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—বহুদিন পরেও হয়ত একথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মানুষের শির অবনত হইবে। কিন্তু শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বলিতে তাঁহার সত্যকার পরিচয় হইল না—বাংলার মুসলমান নারীসমাজের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে একটা সমাজের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; আর এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী এই কল্যাণী নারী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকারের কুঁড়িতে রোকেয়া ফুটিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত, এ যেন প্রকৃতির রহস্য বিলাস! দীর্ঘকাল শবসাধনা করিয়া তিনি কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন, তাঁহার স্বপ্ন কিরূপে সফল হইল—তাহাও এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে মনে হয় সাফল্যের বীজ তাঁহার নিজের চরিত্রের মধ্যেই লুকানো ছিল।

মনে হয়, রোকেয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার কঠিন পণ ও আদর্শের প্রতি তাঁহার বিশ্বস্ততা। 'সত্য প্রিয় হোক, আর অপ্রিয় হোক, সাধারণের গৃহীত হোক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হোক, সত্যকে বুঝিব, খুঁজিব ও গ্রহণ করিব' এই ছিল তাঁহার পণ। শুধু ইহাই নয়। তাঁহার আদর্শ ছিল ইহার চেয়েও উচ্চ। সত্যকে শুধু গ্রহণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। সত্যকে প্রচার করিবেন—দেশের প্রত্যেকটী হতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পথে টানিয়া লইবেন, এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সমাজসেবা করেন অনেকেই। কিন্তু রোকেয়ার মত এমন আপন-ভোলা সমাজসেবা কে কবে দেখিয়াছে! সমাজের জন্য এমন করিয়া নিজের ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন, বিত্তসম্পত্তি, মানসম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্ত হইতে সংসারে ক'জন লোক পারিয়াছেন জানি না।

রাজনীতিক্ষেত্রে কত প্রসিদ্ধ দেশনেতাকে অনেক সময় মত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ ও নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোকেয়ার ছিল একই রাজনীতি—তাহা নারীজাগরণ। অর্দ্ধশতাব্দী আগে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকেই মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত সত্যপথ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এতখানি দৃঢ়তা ও এতখানি একাগ্রচিত্ততা যাঁহার মধ্যে ছিল, এত দীর্ঘ দিন পরেও সাফল্যের সুবর্ণ-কুঞ্জিকা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

রোকেয়া-জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চোখে উজ্জ্বল হইয়া জাগে তাঁহার স্বভাবের একটী গুণ—কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাহার মন ছিল মমতা-মধুতে ভরা। নারীর দুঃখে সে মন মোমের মত গলিয়া যাইত। কি করিয়া এ দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি বেদনায় আকুল হইতেন। কিন্তু এই কোমল নারী-চিত্তেরই অন্তরালে এত দৃঢ়তার স্থান কোথায় ছিল তাহা কে বলিবে? কুসুমকোমলা নারী কোথা হইতে পাইলেন অত অবিচলিত অধ্যবসায়, অত দুর্ব্বার শক্তি ও সাহস, কে একথার উত্তর দিবে?

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এই সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে; কিন্তু এই বিদ্রোহ তাঁহার স্নেহ-সুকুমার হৃদয়ের গভীর মমতাবোধকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ধ্বংসের আনন্দের চেয়ে সৃষ্টির বেদনাই তাঁহার জীবনে বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্ম্মী প্রতিভা। তাঁহার কথা, তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার সাহিত্য—সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তিনি সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে চিরকালই বেশী ফুটিয়াছে তাঁহার দরদী মনের তীব্র বেদনা-বোধ। তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এখানেই।

জীবনের প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া তিনি সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা নির্ণয় করিয়াছিলেন তিনি নিপুণ চিকিৎসকের মতই। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা—একথা তিনি ধ্রুব জানিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, শিক্ষার আলো যেদিন জ্বলিবে সেদিন কুসংস্কার কুয়াসার মত আপনিই মিলাইয়া যাইবে—তাহার জন্য আর হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধপ্রথা একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত অবরোধপ্রথার তুলনা হয়। বিনাযন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী শত শত নারীও এই অবরোধ-গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিলতিল করিয়া মরিতেছে।'

পর্দ্দা অর্থে তিনি বুঝিতেন সবল ব্যক্তিত্ব, কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর নয়—তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই একথা বলিবেন। 'পর্দ্দা ও অবরোধ ভিন্ন জিনিষ—পর্দ্দা ঐসলামিক কিন্তু অবরোধ অনৈসলামিক' এই বুলি আজকাল অনেককেই আওড়াইতে শুনি। কিন্তু একদিকে নারীর আচরণের সুন্দর সংযম ও শালীনতা অর্থাৎ পর্দ্দা এবং অন্য দিকে অর্থহীন, প্রাণঘাতী অবরোধ—এই দুইয়ের মধ্যে এক যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য সেই সুদূর অতীতে রোকেয়াই সকলের আগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই লেখনী মুখে একথা সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, তাঁহার 'মতিচূর' ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে রোকেয়ার আসল বিদ্রোহ অবরোধের বিরুদ্ধে নয়। তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি জানিতেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধের মুখোস আপনি খসিয়া পড়িবে! তাই শিক্ষা প্রচারের জন্যই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। জগতের কয়জন সংস্কারক এত সংযম, এত সতর্কতা, এত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিতে পারি না।

রোকেয়া অক্ষরের দাসত্ব না করিয়া ইস্‌লামের মর্ম্ম উদঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী যেদিন প্রচারিত হয় সেদিন অন্ধ সমাজ বারে বারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল—'পাপের পথে লইয়া যাইতে চায়, কে এই ধর্ম্মদ্রোহিণী?' কিন্তু রোকেয়া বিচলিত হন নাই। মিথ্যা আচার ও অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি ইস্‌লামের সত্যরূপ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন—একথা তিনি নিশ্চিত জানিলেন। ধর্ম্মের বাহ্য খোলসকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন নাই—এখানেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব।

টিয়া পাখীর মত কোরাণ মুখস্থ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরাণ মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাঁহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইস্‌লামের মর্ম্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?" এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন "নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আবণের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলিতেন—আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়—আমাদের জন্মগত অধিকার। ইস্‌লাম নারীকে সাতশ বছর আগে যে অধিকার দিয়াছে তার চেয়ে আমাদের দাবী একবিন্দুও বেশী নয়।

তিনি বলিতেন—'ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্‌লামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসেরাত (পারলৌকিক সেতু) পার হইবেন, আর সে সময় স্ত্রীকন্যাকেও হ্যান্ডব্যাগে পুরিয়া পার করিয়া নিবেন।' এই তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তির অন্তরালে ফুটিয়াছে তাঁহার ক্ষমাহীন অভিযোগের তীব্র জ্বালা।

তিনি আরও বলিতেন—'বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলেই শুনি মুসলমান বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই। কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের জন্য হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ৎ মানিতেন তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।' সমাজ তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহিণী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! কিন্তু তিনি সমাজের চোখে আঙুল দিয়া ধর্ম্মের সত্যকার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দ্দেশকে কোরাণের পাতায় আবদ্ধ

না রাখিয়া বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন।

রোকেয়া ছিলেন অতি পুরাতন এক সম্ভ্রান্ত শরীফ বংশের সন্তান। মান মর্য্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে বর্ত্তমান বাংলায় যে সকল পরিবার অগ্রগণ্য তাহার অনেকগুলির সঙ্গেই ছিল রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কখনো গৌরব অনুভব করিতে দেখি নাই। বরং সম্ভ্রান্ত অর্থে তিনি বুঝিতেন অভিশপ্ত। আমার বি. এ. পাশ উপলক্ষে বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আরও কয়েকটী মুসলমান মেয়ে বি. এ. পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নাহারের পাশে একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ সে এক অভিশপ্ত অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, যাদের জন্য লেখা পড়া একেবারে হারাম।' বংশমর্য্যাদাকেই আশ্রয় করিয়া অশিক্ষা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইবার বেশী সুযোগ পাইয়াছিল, তাই সম্ভ্রান্ত বংশের নামেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

ঘরের চেয়ে বাহিরকেই তিনি বেশী আপনার বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ঘরের সম্পর্ক দেহের, রক্তের ; কিন্তু বাহিরের সম্পর্ক হৃদয়ের—অন্তরের অন্তরতম জনার।

তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়া। মনে পড়ে, তাঁহার সহজ, সরস, সাবলীল অথচ তীক্ষ্ণ, জোরালো লেখা বাল্যকালেই মনকে যেন কেমন অভিভূত করিত। তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিত যে নূতন জীবনের বাণী, তাহা যেন অলক্ষ্যে প্রাণের দুয়ারে আঘাত করিয়া যাইত।

দশ বৎসর বয়সেই যখন স্কুল ছাড়িয়া পর্দ্দানশীন হই, তখন হইতে উচ্চশিক্ষা জন্য মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াই ছিল ; আর তাহাই রোকেয়ার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ। সমাজের এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অভিযোগ করিতাম। পরে জানিয়াছিলাম আমার বাল্যের সেই ক্ষীণ প্রচেষ্টা রোকেয়ার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই।

পনের ষোল বৎসর আগে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া বহুকাল আগের একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রিবেলা আমরা বিহারের এক জলপথে নৌকাযাগে যাইতেছিলাম। বাহিরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শুধু নদীতীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে কেয়াফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।" এইভাবেই বিনা পরিচয়েই তিনি আমাকে স্নেহের সূত্রে বাঁধিয়া লইলেন। বাংলাদেশের কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী বালিকা শিক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইয়াছে, সেই ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে আপনার, তাহারই সঙ্গে ছিল তাঁহার প্রাণের যোগ সব চেয়ে বেশী।

আমার শৈশব ও কৈশোরের কল্পনার সেই রহস্যময়ী নারীকে প্রথম স্বশরীরে দেখিলাম ১৯২৫ সনে এই কলিকাতার বুকে। মনে হইল, আমি ধন্য হইলাম, আমার নূতন জন্ম লাভ হইল।

তাহার পর হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রতিদিন যেন তাঁহার চরিত্রের নূতন নূতন পরিচয় চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে।

সহজ অনাড়ম্বর ভদ্রতা ও মধুর ব্যবহারে তিনি অতি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সরল সুন্দর একটী হাসির রেখা তাঁহার মুখে সকল সময়েই লাগিয়া থাকিত। শত ঘাত প্রতিঘাতেও তাহা কখনো ম্লান হইতে দেখি নাই। আঞ্জুমনের সভায় কতবার দেখিয়াছি, ছুতানাতা ধরিয়া মহিলাগণ তাঁহাকে অপ্রিয় ভাষায় অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন ; এমনকি কোন কোন অশিক্ষিত মহিলা সমিতি ও স্কুল সম্পর্কিত টাকাকড়ির হিসাব লইয়া তাঁহাকে মুখের উপর অপমান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে কখনো বিচলিত হইতে দেখি নাই।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার দেখা করিতে গিয়া যেন তাঁহাকে একটু মলিন দেখিলাম। মনে হইত তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখে একটু বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। বুঝিলাম, আজিকার আঘাত গুরুতর। জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, 'জীবনে অনেক দংশনই সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আজিকার দংশনের বিষ বুঝি সকলের চেয়ে তীব্র।' ঘটনা খুলিয়া বলিতে বলিতে ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল, কিন্তু ঠোঁটের কোণের হাসিটি তখনো মিলাইয়া যায় নাই।

কাজের কথাবার্ত্তার মধ্যেও তিনি উপমা দিয়া, ছড়া কাটিয়া বাক্যলাপকে সরস ও চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিতেন। এই রহস্যপ্রিয়তা তাঁহার স্বভাবের একটী চমৎকার বৈশিষ্ট্য। কি কথায়, কি বক্তৃতায়, কি সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রোকেয়ার নিজের কোন সন্তান বাঁচিয়া ছিল না। কিন্তু বাহিরকে তিনি ঘরে বাঁধিয়াছিলেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনে অসংখ্য পরের সন্তানকে তিনি আপনার বক্ষঃরক্তে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। স্কুলের অসংখ্য বালিকা তাঁহারই মধ্যে মাতৃরূপের সন্ধান পাইত। প্রত্যেকটি বালিকাকে তিনি চিরদিন কিরূপ গভীর স্নেহে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং বালিকাগুলিও তাঁহাকে কি অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছে, নীচে কয়েকটী কথায় তাহার পরিচয় দিয়া এই মহিমময়ী নারীর বিচিত্র চরিত্রের আলোচনা শেষ করি। কথাগুলি বলিয়াছে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের এক পুরাতন ছাত্রী, রোকেয়ার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এই আদর্শ বালিকা, রওশন আরা।

"সেই পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে যেন একটী নিবিড় আন্তরিকতা মিশানো থাকিত। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাতে যেন তাহাদেরও প্রাণে সাড়া না জাগাইয়া পারিত না।

"মনে পড়ে তাঁর আদেশমত দৈনিক ক্লাস আরম্ভের পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটা 'দোওয়া' পড়িতেন, আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। ঐ 'দোওয়া'টি যখন তিনি পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর

আন্তরিকতা-ভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়—মুখে বলা যায় না।

"তিনি আমাদের মাঝে মাঝে নানারকম পরীক্ষার জন্য অন্যান্য স্কুলে নিয়া যাইতেন—যেমন বঙ্গীয় পরিষদের পরীক্ষা, বৃত্তি পরীক্ষা ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বে আমরা পরীক্ষার্থিনীরা যথাসময়ে মিলিত হইয়াই দেখিতে পাইতাম যেন এক পবিত্রা শুদ্ধা তপস্বিনী আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই ইঙ্গিতে আমাদের আহ্বান করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেন এবং মধুর সুরে দোওয়া পড়া আরম্ভ করিতেন ; আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম, তারপর তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া 'বাসে' উঠিতাম। 'বাস' স্কুল কম্পাউন্ড না ছাড়া পর্য্যন্ত তেমনিভাবে আমাদের দোওয়া পড়া চলিতে থাকিত। ক্রমে 'বাস' চলার দ্রুততার মধ্যে তিনি থামিয়া যাইতেন, আমরাও যেন তখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতাম। ভয়ভীতি হইতে মন যেন তখন আমাদের অনেকটা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাণে আসিয়াছে যেন একটা স্বর্গীয় প্রেরণা।

"তখন অতশত বুঝিতাম না ; কিন্তু আজ ভাবি, সেই পতিপুত্রহীনা মহিলার আমরা কে ছিলাম, যে আমাদের কল্যাণ কামনায় তাঁর আকুল প্রার্থনা খোদার 'আরশ' কাঁপাইয়াছে। আমাদের অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রীদের মঙ্গলই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল চান, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই মহীয়সী নারী সারাজীবন প্রাণ ভরিয়া রাশি রাশি নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় বালিকার মঙ্গল কামনা করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া—একথার উত্তর কে দিবে ? প্রতিধ্বনি বলিতেছে, কে উত্তর দিবে ?"

## তথ্যসূত্র

১. *রোকেয়া-জীবনী*-তে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কথা লিখেছেন শামসুননাহার। দ্র. এই সংকলন, পৃ. ২১০

২. জ্যোতির্মালা দেবী (১৯০৩-১৯৮১)-এর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। ১৯২৪ সালে তিনি বি.এ. পাস করে কমার্স এবং জার্নালিজম পড়তে বিলেতে যান। সেখানে তিনি দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে আসেন, এবং সেই সূত্রে অরবিন্দের। শেষজীবনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। আরও দ্র. এই সংকলন, পৃ. ২৬৬, ২৭৬

৩. শামসুননাহার মাহমুদ, *নজরুলকে যেমন দেখেছি*, (কলকাতা : নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৫৮), প. ৩৫

৪. *পুণ্যময়ী*, (কলকাতা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯২৫)। এই বইটি সম্পর্কে শামসুননাহার তাঁর *নজরুলকে যেমন দেখেছি* (পূর্বোক্ত)-তে লিখেছেন : '১৯২৫ সালে

ভাই [ হবীবুল্লাহ্ বাহার ] ডাক্তারী পড়তে যান কলকাতায়। . . . ভাইয়ের আগ্রহে ও উদ্যোগে তখন কলকাতা থেকে আমার বাল্যের রচনা 'পুণ্যময়ী' বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইকে উপলক্ষ করে আমার ভাইয়ের মারফতে নজরুল আমাকে পাঠিয়েছিলেন আশিসবাণী। কবির স্বহস্ত লিখিত কবিতাখানি ব্লক করে 'পুণ্যময়ীর' প্রথম পাতায় ছাপানো হয়েছিল।' এছাড়া ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি 'প্রশস্তি' লিখেছিলেন, যা বইটির সঙ্গে ছাপা হয়।

৫. *নজরুলকে যেমন দেখেছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৬. দ্র. *রোকেয়া-জীবনী*, (কলকাতা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৮), পৃ. ৯২-৯৩, এবং এই সংকলন, পৃ. ২২২

৭. উদ্ধৃত আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *শামসুন নাহার মাহমুদ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)। পৃ. ৫৯

৮. উদ্ধৃত, *নজরুলকে যেমন দেখেছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫। *সিন্ধু হিন্দোল* প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ, উৎসর্গ পত্রে নজরুল লেখেন (৩৯. ৭. ২৬) 'আমার এই লেখাগুলি আমার আদরের ভাই-বো'ন বাহার ও নাহারকে দিলাম।'

৯. সেলিনা বাহার জামান, *স্মৃতিসুধায়*, (ঢাকা . বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯১), পৃ. ৫৩

# সুফিয়া কামাল
# কবি ও সমাজসেবী

'তুই তো ফুলকবি। তা ফুলকবি হয়েও সমাজের কাজ করতে হবে।' রোকেয়া সাখাওয়াতের এই আদেশ, কিংবা আর্শীবাদ, শিরোধার্য করে নিয়ে কবি সুফিয়া কামাল সারা জীবন পথ চললেন। তিনি হলেন রোকেয়ার ভাবশিষ্যা, তাঁরই ভাবাদর্শে গড়া। এ শতাব্দীর শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াৎ যে যুগের সূচনা করেছিলেন, তার সর্বশেষ জীবিত ব্যক্তিত্ব সুফিয়া কামাল।

১৯২৭/২৮ থেকে ১৯৩২—এই চার বছর সুফিয়া কামাল (সে সময় সুফিয়া এন. হোসেন) রোকেয়ার কাছাকাছি ছিলেন। সে সময় *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে লেখা এক চিঠিতে দেখা যায়, তিনি এরই মধ্যে রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রোকেয়াকে বুঝে উঠতে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হয়নি। ১৯২৯ সালের ২৩ জুলাই মাত্র ১৮ বছর বয়সের সুফিয়া কামাল চিঠিতে লিখছেন, 'যুগ যুগ ধরে নারীরা যে অত্যাচার অবহেলা সয়ে এসেছে খেলার পুতুল হয়ে, তাকে দূর করতে কেবল দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখেই নয়—এর প্রতিকার হবে বিদ্রোহে। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিদ্রোহ করবে কারা, এবং কাদের বিরুদ্ধে ? করবে পুরুষের বিরুদ্ধেই ; . . . মোসলেম অন্ধকার সমাজ হতে আলোর অগ্রদূতী যে ক'টা মহিলা বের হয়েছেন তাদের মধ্যে মিসেস আর এস হোসেন (বেগম রোকেয়া) সাহেবা প্রধানা। কিন্তু তাঁকে কিই না সইতে হয়েছে ও হচ্ছে ? কিন্তু একদিন ঐ সমাজ তাঁকে বুঝবে। তখন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লোকের অভাব হবে না।'[১]

সে সময় সুফিয়া কামাল রোকেয়ার ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীনে ইসলাম, অর্থাৎ মুসলিম মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রোকেয়াকে দেখা, তাঁর কথা শোনা, বোঝা—সবই এই সূত্রে। তবে এই চার বছরে সুফিয়া কামালের জীবন-পথও নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি যে কেবল কবিতা লিখবেন না, পরবর্তীকালে সমাজসেবায় সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে যাবেন—তারও ভিত মনে হয় সেই সময়টিতে গাঁথা হয়ে যায়।

১৯৩৩ সালে স্বামীর (সৈয়দ নেহাল হোসেনের) মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি কলকাতায় বসবাসের জন্য এলেন। সামনে তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সঙ্গে রয়েছে শিশু-কন্যা, জীবনভর বাপের বাড়িতে আশ্রিতা মা। তার মধ্যে মাথার ওপর রোকেয়ার ছায়াও নেই। তখন *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সদ্য বিধবা

সুফিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কলকাতার কর্পোরেশন স্কুলে তারপর দীর্ঘ নয় বছর ৫০ টাকা মাইনেতে শিক্ষকতা করলেন তিনি। তখনকার কয়েকটি পত্রিকায় লেখালেখি করে কিছু রোজগার হতো। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮-এ যথাক্রমে তাঁর গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা* এবং *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কল্যাণীয়া সুফিয়া, তোমার কবিতা আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।' (উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৭/২৮-এ তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বার কয়েক গেছেন। কবির এক জন্মদিনে সুফিয়া কামাল তাঁকে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন।)[২]

এই পর্বে (১৯৩৩-১৯৩৯) সুফিয়া কামালকে আমরা দেখি, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিবাদী এবং সৃজনশীলও। শায়েস্তাবাদের মামাবাড়ি—একই সঙ্গে ছিল তাঁর স্বামীগৃহও (প্রয়াত স্বামী ছিলেন মামাত দাদা)—ছেড়ে তখন কলকাতার অনিশ্চিত জীবন বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই অথচ তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করে সংসার চালাচ্ছেন। অতিমাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম এবং একাকিত্বের যন্ত্রণায় হয়ত তিনি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর উদ্যোগে চট্টগ্রামের কামালউদ্দিন খানের সঙ্গে সুফিয়া কামালের আবার বিয়ে হয়।

সুফিয়া কামালের জীবনপঞ্জির পরের কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দাঙ্গা বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং *বেগম* পত্রিকার সম্পাদিকার পদ গ্রহণের পাশাপাশি চারটি সন্তানের জননী হলেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন কবি সুফিয়া কামালের কর্মস্রোতকে আরও সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র চার বছরের মাথায় সমসাময়িকদের অনেকেই কোন পক্ষ নেবেন এই প্রশ্নে দোটানায় পড়েছিলেন। কেউ কেউ সরাসরি সরকারি পদে আসীনও হলেন। সেসময় অনেকদিনের সহকর্মী বান্ধবী শামসুননাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামালের পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেল। তিনি ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো কোনওভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিপক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল, 'পাকিস্তানের শুরুতেই মাতৃভাষার উপর আঘাত এল। রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অবশ্য শায়েস্তাবাদের আমাদের পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু আমাদের রক্ত অস্থি মজ্জায় যে ভাষা মিশে গেছে তা বাংলা।'[৩] তখন সুফিয়া কামালের কলমে যেন কথার জোয়ার এল। ভাষা আন্দোলন নিয়ে এত বেশি কবিতা তিনি লিখেছেন, যা অন্য কোনও বিষয়ে কখনও লেখেননি। ১৯৯১ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'একুশের সংকলন : গ্রন্থপঞ্জি' বইয়ে 'একুশ' নিয়ে সুফিয়া কামালের ৬৫টি কবিতার উল্লেখ আছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে পাকিস্তানি সামরিক সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবীরা সে সময় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সরকারি বাধা নিষেধ ভেঙে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আযোজন করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব কটি শহরে একমাস

ধরে সে উৎসব চলল। সে সময়টিতে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে সুফিয়া কামাল বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। এছাড়া 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' প্রণয়নের পর মৌলবাদীরা যে অপপ্রচার শুরু করে, তার প্রতিবাদে কবি সুফিয়া কামাল ও শামসুননাহার মাহমুদ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।[৪]

৭১-এর পুরো সময়টা ঢাকার ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাসায় বসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল কিংবদন্তীতুল্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতটা অবিচল থাকার নজির বিশেষ দেখা যায় না। সে সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা যে তাঁকে মেরে ফেলেনি, তা কেবল আন্তর্জাতিক চাপ ছিল বলে। দেশি কোলাবোরেটররা তাঁর ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসনের বরফ-শীতল দিনগুলিতে সুফিয়া কামালের কণ্ঠ বাংলাদেশের মানুষকে বিভিন্ন সময় সোচ্চার করেছে। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের সময় কার্ফু ভেঙে ঢাকার রাজপথে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। নারী নির্যাতনের প্রতিটি বিষয়ে সুফিয়া কামাল আজ অব্দি সোচ্চার। মৌলবাদীরাও তাঁর ওপর বিরামহীন ফতোয়া জারি করে চলেছে। তাদের পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা মঞ্চগুলি এখনও সুফিয়া কামালের বিরুদ্ধে মুখর।

সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান-পতনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন। কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি কখনও নাম লেখাননি। এটা তাঁর বড় পরিচয়। সুফিয়া কামালের ত্যাগ সাহস প্রখ্যাত জননেতাদেরও হার মানায়। তাঁর জীবনেতিহাস নিরবচ্ছিন্নভাবে আপোষহীনতার ইতিহাস। নিজের সম্পর্কে তাঁর মতামত হলো, 'আমার "জীবন দর্শন" বলতে কিছু নেই, আমি আমার বিবেকের কথাই বলি।' আজকের বাংলাদেশে সুফিয়া কামালের যে মাতৃভাবমূর্তির জ্যোতির্বলয় তৈরি হয়েছে, সেই বিভা ভেদ করে নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নির্ণয় করা, আরও অনেক বছর অপেক্ষার পর হয়তো সম্ভব হবে।

কবি সুফিয়া কামালের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫। সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ১৬টি সংগঠনের। সাহিত্য, নারীমুক্তি ও মানবতাবাদী আন্দোলনের জন্য এ পর্যন্ত দেশ বিদেশের প্রায় ৩৫টি পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

শ.আ.
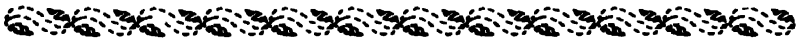
## সাঁঝের মায়া

অনন্ত সূর্যাস্ত-অন্তে আজিকার সূর্যাস্তের কালে
সুন্দর দক্ষিণ হস্তে পশ্চিমের দিকপ্রান্ত-ভালে

দক্ষিণা দানিয়া গেল, বিচিত্র রঙের তুলি তার—
বুঝি আজি দিনশেষে নিঃশেষে সে করিয়া উজাড়
দানের আনন্দ গেল শেষ করি' মহা সমারোহে।
সুমধুর মোহে
ধীরে ধীরে ধীরে
প্রদীপ্ত ভাস্কর এসে বেলাশেষে দিবসের তীরে
ডুবিল যে শান্ত মহিমায়,
তাহারি সে অস্তরাগে বসন্তের সন্ধ্যাকাশ ছায়।
ওগো ক্লান্ত দিবাকর! তব অস্ত-উৎসবের রাগে
হেথা মর্তে বনানীর পল্লবে পল্লবে দোলা লাগে।
শেষ রশ্মিকরে তব বিদায়ের ব্যথিত চুম্বন
পাঠায়েছ। তরুশিরে বিচিত্র বর্ণের আলিম্পন
করিয়াছে উন্মন অধীর
মৌনা, বাক্যহীনা, মূক বক্ষখানি স্তব্ধ বিটপীর।
তারো চেয়ে বিড়ম্বিতা হেথা এক বন্দিনীর আঁখি
উদাস সন্ধ্যায় আজি অস্তাচল-পথপরি রাখি'
ফিরায়ে আনিতে না পারে—
দূর হতে শুধু বারে বারে
একান্ত এ মিনতি জানায় :
কখনও ডাকিয়ো তারে তোমার এ শেষের সভায়!
সাঙ্গ হলে সব কর্ম কোলাহল হলে অবসান,
দীপ-নাহি-জ্বালা গৃহে এমনি সন্ধ্যায় যেন তোমার আহ্বান
গোধূলি-লিপিতে আসে। নিঃশব্দ নীরব গানে গানে,
পূরবীর সুরে সুরে, অনুভবি' তারে প্রাণে প্রাণে
মুক্তি লভে বন্দী আত্মা—সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে,
নিশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প-বিকাশের প্রয়োজনে।

## উপেক্ষিতা

অব্যক্ত বেদনা-ভার জুড়ে আছে হিয়াটীর পরতে পরতে
কারে নাহি দিতে পারি, ব্যথী মোর কেহ নাহি এ মর জগতে
ঝড়ে শুধু অশ্রু মোর মরে না কো দেহ
গোপন ব্যথার গর্ব্ব দেখে নিক কেহ।

তাই আজি মূঢ় নর গেল গো মথিয়া
আমার এ অনাদৃত ব্যথাভরা হিয়া !
সুপ্ত হ'য়েছিল যাহা গুপ্ত হৃদি মাঝে
যুগ যুগ ধরি যাহা নীরবে বিরাজে,—
ওরে মূঢ় অকরুণ অপ্রেমিক নিঠুর পাষাণ !
হানিলি রে আজি তাহে ব্যঙ্গভরা ক্ষর অগ্নিবাণ।
তার কি বিলায় বাস যে ফুল ফুটিয়া গেল মাটীতে ঝরিয়া,
ওরে মূর্খ তবে কেন মরিস ঘুরিয়া ?

মনে আছে আজো মনে আছে
বিদেশীয়া এসেছিল কাছে !
প্রশান্ত কোমল দিঠি আনন্দে উজ্জ্বল চোখে আমারে চাহিয়া
নিয়েছিল, ব'রেছিল কি গান গাহিয়া।
কয়েছিল 'প্রিয়তমে' ! সে কথা আজিও
ভুলি নাই—ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়।
সেই যে সাঁঝের বেলা বরমালা নিজ হাতে দিনু পরাইয়া
বাহুডোরে বেঁধে মোরে প্রথম প্রণয়-চিন্‌ এঁকে দিলে 'প্রিয়া'
শরম-লালিম রাগে রাঙাইয়া সাজাইয়া মোরে
অতৃপ্ত আঁখির তব পলক না পড়ে।
সৌন্দর্য্যের রাণী আমি, ক'য়েছিলে দিয়েছিলে সবি
প্রিয়তম, তাই আমি তাই আমি কবি।
আমার সাধের কবি মনে আছে সেও
ভুলিব না ভুলিব না ভুলিব না প্রিয়।

তার পর আরো
প্রেম তব হ'ল আরো গাঢ়।
অস্তাচলে গোধূলির রাগ-রেখা প্রায়,
কে জানিত তব রাগ ওরি মতো মিশে যাবে হায় !
জানি নাই বুঝি নাই ভাবি নাই তাও
কেমনে প্রেমের পাশে কামনার প্রদীপ জ্বালাও।
কামনার ক্ষুদ্র শিখাটীরে
কেন বা জ্বালালে ধীরে ধীরে।
শুকাল প্রেমের ফুল বাড়িল কামনা
জ্ব'লে গেনু ও অনলে নারী আমি ক্ষুদ্র তৃণকণা।
প্রায়শ্চিত্তে তারি তরে ফেলে গেলে এ মরুর মাঝে

অসহায়া একা মোরে জীবনের সাঁঝে।
তাই আজি কেঁদে মরে অনাদৃত ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ হিয়া
নাহি জানি আসি কবে নিভাইবে এ-অনল প্রেমবারি দিয়া
যদি তুমি ফির কভু, সেই আশা ক্ষুদ্র কণাটীরে
রাখিয়াছি চেপে বক্ষে-নীরে।
ফির যদি পুনরায়, আবার প্রেমের এই ক্ষুদ্র দীপশিখা
বাড়াইব জ্বালাইব এ আঁধার মন্দির-মণিকা।

*নওরোজ*, আষাঢ় ১৩৩৪

## নিবেদন

বলো যদি দাঁড়াই তবে
দাঁড়াই হাতে পাত্র ভ'রে—
আব্-হারাতের স্নিগ্ধ-বারি,
সুর-ভরা-বীণ্ অপর করে।
হাফেজ ওমর থাক্ দাঁড়ায়ে।
মোর দুয়ারে হাত বাড়ায়ে,
পেয়ালা ভ'রে প্রেম-পীযুষে
ধরব আগে ওই অধরে॥

*সওগাত*, বৈশাখ ১৩৩৬

## বিজয়িনী

শরতের শেফাল-ঝরা প্রভাত।

জেলার এস-ডি-ও আসমত আলী সাহেব প্রতিদিনই হয় পদব্রজে নহে ত ঘোড়ায় চড়িয়া সকাল সন্ধ্যা ভৈরব নদের হাওয়া খাইতে যান। আজও গিয়েছিলেন পদব্রজে।

একটু দেরী করিয়া কিন্তু নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া ততোধিক ব্যস্তভাবে পত্নীকে ডাকিলেন—হাজেরা। পুত্র স্কুলে যাইবে বলিয়া খাইতে বসিয়াছিল, হাজেরা খাতুন তাহার তদারক করিতেছিলেন। স্বামীর ডাক শুনিয়া হাত না ধুইয়াই আসিয়া দেখা দিলেন।

আসমত আলী কহিলেন—আজ নদীতীরে বেড়াতে গিয়ে আমার এক বন্ধুকে

দেখতে পেলাম কিন্তু তার অবস্থা যে রকম, বোধহয় বাঁচবে না। তাকে নৌকার মধ্যে একা ফেলে রেখে চাকর বাকরের হাতে ফেলে দিয়ে আমি থাকতে পারব না—হাসপাতালেও দিতে পারব না। তাকে আনতে আমি পাল্কী পাঠিয়ে এসেছি—বাল্যবন্ধু, বড় ঘরের ছেলে। এই অবস্থায় কী করে যে আমি জানি না—সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তাকে আনাচ্ছি, তোমাকে তার দেখাশুনা করতে হবে। মাসুমাও যেন একটু দেখে শুনে—সে কোথায় ?

দ্বার পার্শ্ব হইতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কহিল—কে ভাই এমন বন্ধু তোমার ? তা দেখাশুনা করতে হবে তাতে আর আমার বাধা কি ? তাকে রাখবে কোন ঘরে বলো, ঠিক করে দিই—

আসমত পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন—যে ঘরটায় দুপুরে তোমাদের মজলিস বসে সেটাই হবে, আসবাবও ওটায় কম আছে। শুধু একখানা খাট পেতে দাও, কী বলো ? তোমার কিছু আপত্তি আছে ?

হাজেরা কহিলেন—না, আপত্তি কি ? রোগা মানুষ, তোমার বন্ধু—তাকে দেখাশোনা করতে পারব, আর ঘরখানাই দিতে আপত্তি হবে না কি ? কিন্তু কে তিনি—নামটাও কি বললে চিন্‌ব না ?

আসমল কহিলেন—নাম ত নিশ্চয়ই জানো, দেখেছও ত তাকে, সেই পাবনার আবুল কাসেম চৌধুরী।

তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বাহিরের দিকে। দেখিলেন, পাল্কী আসিতেছে। ত্বরিতপদে তিনি নামিয়া গেলেন। নামটা শুনিয়া মাসুমা যে একটুখানি চমকাইয়া উঠিল তাহা কেহই লক্ষ্য করিলেন না। হাজেরা কহিলেন—ওই ত পাল্কী এসে পড়ল। মাসু, মধ্যের বড় টেবিলটা সরিয়ে তোমার ঘরের খাটখানা পেতে দাও। মাজু যখন আসবে ততদিন আমরাও এখানে থাকব না—বন্ধুও সেরে উঠে চলে যাবেন—যাও তুমি, আমিও যাই ছোট টেবিলটা আমার ঘর থেকে দিই গিয়ে, অত বড়লোক আহা বেচারা ভাগ্যে উনি দেখেছিলেন। দুইজনে দুইদিকে কাজে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মসজিদের নামাজীরা নামাজ পড়িয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। আসমত কাচারী হইতে ফিরিয়া সামান্য কিছু খাইয়া বন্ধুর শয্যাপার্শে আসিয়া বসিলেন। সেই যে পাল্কী হইতে সাবধানে নামাইয়া বিছানায় শোয়ান হইয়াছে অজ্ঞান অবস্থায়ই—এখন পর্যন্ত জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যায় নাই। সরকারী ডাক্তার ছাড়া অন্য একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকেও দেখান হইয়াছে। তাঁহারা রোগীর জীবনের সামান্য আশাও দেন নাই—আবার আশঙ্কাও প্রকাশ করেন নাই। অত্যধিক অনিয়মে শরীর ভাঙিয়াছে, ব্লাডপ্রেশার বাড়িয়াছে। সারাদিন মাথায় বরফ দিয়া রাখা হইয়াছে। প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকাও যেন নিঃসাড়ে হইতেছিল দুর্বলতার জন্য। জ্ঞান হইলে কি হয় তাহাই ডাক্তারদের দ্রষ্টব্য।

আসমতের অনুরোধে বে-সরকারী ডাক্তারটি রাতের জন্য রহিয়া গিয়াছেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি আসিয়া দেখিতেছেন। হাজেরা ও মাসুমা নিয়মমত ঔষধ খাওয়াইতেছে,

সেবার কোনই ত্রুটী নাই—আসমত বন্ধুর মুখের দিকে ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া আছে। সব আলো নিবাইয়া একটি মোমবাতি জ্বালাইয়াছে। আগর বাতির সুগন্ধে ঘরখানা স্নিগ্ধ উঠিয়াছে।

কাসেমের মুখখানা অনেকদিন কামানো হয় নাই বলিয়া খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরিয়া গিয়াছে। কিছু পাকা কিছু কাঁচা চুলগুলি রুক্ষ ; পরিধানেও সামান্য মলিন বেশ। আসমত মনে মনে প্রার্থনা জানাইল—একে ভালো করিয়া দাও খোদা ! অতুল ঐশ্বর্য স্ত্রী পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে যদি এ অবস্থায় মরিয়াই যায় তো জানিবেও না যে বহুদিনের বন্ধু এমনি প্রার্থনা লইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

হয়ত খোদা বন্ধুর এ প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। কাসেম একবার নড়িয়া চড়িয়া যেন পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল। রক্তরাঙা আঁখি মেলিয়া চাহিয়া যেন অপরিচিত ঘরখানাকেই চিনিবার চেষ্টা করিল। শিয়রে বসিয়া মাসুমা বরফ ব্যাগ চাপিয়াছিল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল—ডাক্তারকে একবার ডাক ভাই, হয়ত হুশ হচ্ছে। আগ্রহে ঝুঁকিয়া আসমত কহিলেন—কাসেম ! কাসেম ! চেয়ে দেখো ভাই চিনতে পারছ আমাকে ? কাসেম দুর্বলকণ্ঠে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া জানাইল চিনিতে পারিয়াছি। শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া কহিল—আসমত। আনন্দে আসমত কহিল—এই যে, আমি কাসেম। মাসুমা, ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাও। কাসেম চমকিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—মাসুমা !—মাসুমা কে ?

ততক্ষণে মাসুমা চলিয়া গিয়াছে। আসমত কহিল—মাসুমা আমার বোন—তুমি আমার কাছে আছো, আমাকে চিনতে পারছ ?—কেমন লাগছে এখন ? কাসেম তখনও সামলাইতে পারে নাই। একটু চুপ করিয়া কহিল—কেমন লাগছে শুধাচ্ছ ? আর কেমন তবুও খোদার কাছে হাজার শোকর, আমার মতো পাপীকে করুণা করে তোমার কাছে—তোমার মতো বন্ধুর স্নেহ ছায়াতলে মরতে দিলেন।

আসমত কহিলেন—ছিঃ ওকথা বলো না। তুমি ভালো হয়ে উঠবে কাসেম। এই যে ডাক্তার ? এসেছো, এসো, দেখো ত—জ্ঞান ত বেশ হয়েছে, বোধ হয় জ্বরটাও ছেড়ে যাবে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁর মুখও প্রসন্ন হইল। একটু ব্যবধানে আসমতকে কহিলেন, আশঙ্কার কারণ নেই, জ্বরটাও ভোররাত নাগাদ ছেড়ে যাবে। তবে বেশি উত্তেজিত না হয়, মাথায় রক্ত চড়লে, আবার কী হয়—আর এই সব রোগীদের প্রায়ই দেখি উত্তেজিত হয়ে উঠেনই। যতক্ষণ জেগে থাকবেন কথাবার্তায় সুস্থ রাখবেন ; ঘুম হলে ভালো। আমি ঔষধ বদলে দিচ্ছি—এখনও আমাকে থাকতে হবে, না বাড়ি যাব বলুন ? আসমত তবুও ডাক্তার বাবুকে যাইতে দিলেন না। ডাক্তার ঔষধ বদলাইয়া পাঠাইতে নিচে চলিয়া গেলেন। হাজেরা আসিল ; কাসেম দেখিয়া শীর্ণ হাত কপালে ঠেকাইয়া সালাম জানাইল। প্রতিসালাম করিয়া হাজেরা বরফব্যাগ মাথায় চাপাইয়া আসমতের প্রতি চাহিয়া কহিল—তুমি ব্যাগটা ধরো, আমি একটু কিছু এঁকে খাওয়াই, অনেকক্ষণ খাননি কিছু—

আসমত তাহাই করিল। হাজেরা পথ্য খাওয়াইয়া সযত্নে মুখ মুছাইয়া কহিল—এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন। জ্বরটা ছেড়ে যাবে, মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

ক্লান্তিতে সত্যই কাসেমের চোখ জুড়িয়া আসিয়াছিল—আসমত ধীরে ধীরে কাসেমের শীর্ণ হাত দু'খানিতে হাত বুলাইতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল। সেই শব্দেই কাসেমের নিদ্রা টুটিয়া গেল। ডাকিল-আসমত! শিয়রের একটু কাছে বসিয়া মাসুমা মাথায় হাওয়া করিতেছিল, অতি ক্ষীণালোকে মানুষ স্পষ্ট চেনা যায় না, তবুও সে ডাক শুনিয়া সম্মুখে ঝুঁকিতেই কাসেমের চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তীব্র উদ্বেগভরা দৃষ্টিতে সে মাসুমার পানে চাহিল। মাসুমা সে দৃষ্টি দেখিয়া নিজেই একটু ভয় পাইয়া গেল ; অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—ভাইকে ডেকে দিচ্ছি। শিয়রের দ্বার দিয়া সে বাহির হইয়া গিয়া আসমতকে পাঠাইয়া দিল। আসমত আসিয়া কাসেমের ললাটে হাত দিল—কেমন লাগছে?

কাসেম উত্তর দিল না। নিশ্বাস তাহার বেগে বহিতেছে। চক্ষুর চাহ্‌নী কেমন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আসমত তাহা দেখিয়া দ্বারের বাহিরে যে ভৃত্য ঘুমাইয়াছিল, তাহাকে সবলে ধাক্কা দিয়া কহিলেন : ডাক্তার—শীগ্‌গীর ডাক্‌। সে তিন লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। আসমত জোরে পাখা চালাইতে লাগিল। কাসেম হাত বাড়াইয়া আসমতের হাত ধরিয়া কহিল—তোমরা কেন ডাক্তারকে ডাকছ? একটা কথা বলছি শোন। আমার শিয়রে কে বসেছিল, ঠিক বল ভাই?

আসমত একটু বিস্ময়ে বলিল 'কেন ও ত আমার বোন।' 'তোমার বোন? আপন বোন? কই আগে ত শুনিনি!'

'কেন কি হয়েছে তাতে? তোমায় কিছু বলেছে নাকি মাসুমা?'

'বাস, ওই নামটাই ভাই, এইটুকুই আমি জানতে চাইছিলাম?'

ডাক্তার আসিলেন দেখিয়া বলিলেন—একি! আপনি এ রকম অধৈর্য প্রকাশ করছেন কেন? কি হয়েছে? বেশ ত জ্বরটা ক্রমেই কমছে, চুপ করে ঘুমান ত একটু . . .'

'হাঁ ঘুমাব কিন্তু তার আগে আসমতকে কিছু বলে যেতে চাই। কি জানি যদি এই শেষ হয়!'

'ছিঃ কাসেম, আবার তুমি ছোট ছেলেদের মতো শুরু করলে।'

'না ভাই ডাক্তারকে যেতে বলো। আমি তোমার কাছে কথাগুলো বলে যাই।'

ডাক্তার দেখিলেন সে বাধা পাইয়া আরো উত্তেজিত হইতেছে। কহিলেন ; আচ্ছা . . . যাচ্ছি আমি। কিন্তু বেশি কথা যেন বলবেন না, ঘুমাবার চেষ্টা করে দেখুন। কাসেমের অধরে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। 'হাঁ হয়ত জন্মের মতোই . . . কিন্তু তার আগে যে তোমাকে কাছে পেলাম আসমত এই-এই-'

বাধা দিয়া আসমত কহিলেন—চুপ কর কাসেম। ভোর হোক, তোমার কথা শুনব—এখন ঘুমাও ভাই। আসমতের হাত ধরিয়া কাসেম কহিলেন—হয়ত সে ঘুম থেকে আর নাও জাগতে পারি আসমত। বলে যাই তোমাকে, বুকের ভার একটু

কমাতে দাও ভাই, আর পারি না। এ প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপ একা মনে পুষে রেখে আর পারি না। আসমত চমকাইয়া উঠিলেন, তারপর কহিলেন—আচ্ছা বলো—

কিন্তু তোমার ঘুম হয়তো নষ্ট করলাম, আমার এ অবস্থায় তুমি অযাচিত আশ্রয় দিয়ে কষ্ট কেন করতে গেলে ভাই।

আসমত ধমক দিয়া কাসেমকে থামাইয়া দিলেন। হাজেরা আসিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—আমি বসি এঁর কাছে। তুমি না হয় একটু শুয়ে নাও গিয়ে। আসমত কহিলেন—কাল রবিবার, কাছারী নেই, তুমি যাও, দরকার হলে ডাকব। মাসুমাকেও শুতে বলো।

'সে মাথার যন্ত্রণায় গিয়ে নিজেই শুয়ে পড়েছে। তাই না আমি এলাম, তা আমাকে ডেকো কিন্তু।'

'আচ্ছা-আচ্ছা ডাকব।' হাজেরা চলিয়া গেলেন। কাসেম কহিল : একটু পানি খাব ভাই। পানি খাওয়াইয়া আসমত মুখ মুছাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া কাসেম কহিল—

তোমার বোনের নাম মাসুমা নয় ? ওই মাসুমা নামে একজনকে আমিও চিনতুম। চিনতুম ঠিক নয় কিন্তু লোকের কথা মতো চিনতুমই। তাই ওই নামটা শুনে আর একটুখানি না দেখার মতো দেখে আমার মনে হল এই সেই—সে যা হোক, কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি ভাই, সেই মাসুমাকে যদি তুমি কোন দিন পাও—হাঁ তার খোঁজ তোমায় নিতে হবে—বন্ধুর এ শেষ অনুরোধ বলে—

আসমত কহিলেন—আঃ, কী বকছ কাসেম ? তুমি ভালো হয়ে উঠো, তোমার জিনিষ তোমারই খুঁজে নিতে হবে।

আমার জিনিষ ? কখনও নয় ও কারও নয় ভাই। হ্যাঁ, যা বলছিলুম শোন,— এই সব ওকে পেলে শুনিয়ে মাফ চেয়ে নিয়ো। পাবনা ছোটকাল থেকে যাইনি জানত ? কলকাতার নতুন বাড়িতে যখন প্রথম ওঠা হলো, বাবা দেশের অনেককে দাওয়াত দিলেন। অনেকেই এলো—তার মধ্যে এই মাসুমাও এসেছিল ওর বাপের সঙ্গে। ওর বাপ নাকি কেমন ভাই আমার বাবার। তিনিও এলেন। সৌম্য-শান্ত। কোলে এই মাসুমা, বছর সাত আটেক হবে। আমার বয়স তখন পনের হবে। ঘর প্রবেশ উপলক্ষে সে কী ধুম। তা তো তোমার মনে আছে ? আমার ওসব উৎসব আরো যেন খুশীতে ভরে উঠেছিল ঐ মাসুমাকে পেয়ে—ছোট বোন ছিল না কিন্তু তার অভাবও ত বোধ করিনি। মাসুমাকে দেখে আমার ভারী ভাল লাগল। এই ভাল লাগা কিন্তু তখনকার ভালবাসা নয়, কিন্তু পরে . . . একটু পানি দাও ভাই—

আসমত পানি দিয়া কহিলেন—একটু চুপ থাক ভাই, না হয় কাল শুনবো।

কাল হবে কি না কে জানে ভাই . . . আর এখন যে ভাবে বলব বেঁচে উঠলে কি আর ঠিক এই ভাবে বলতে পারব ? শোন ! . . . আসমত দেখিল আপত্তি করিলে আরো উত্তেজিত হইয়া উঠে, অতএব চুপ করিয়া শোনাই ভাল—যদি মনটা হাল্কা হইয়া ভাল হইয়া উঠে।

তাহাকে চুপ দেখিয়া কাসেম বলিল: হ্যাঁ কী বলছিলুম, সে দিন ধুমধামে মৌলুদ হয়ে গেল, সন্ধ্যার পর আমিও হয়রান হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম, মাসুমা আমার টেবিলের উপর চড়ে আগোছাল বইয়ের স্তূপ থেকে একটার পর একটা বই বের করে সরবে নাম গুলির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত। আমি ঘরে ঢোকাতে সে প্রথমটায় চুপ করে আবার বেশ সহজ কণ্ঠে আমাকে বললে—এতগুলি বই আপনার—সব আপনি পড়েন ? আমি হেসে মাথা হেলিয়া জানালাম যে তাই। সে আবার আগ্রহের সাথে বইগুলি দেখতে দেখতে বললে—আমিও বড় হয়ে এত এত বই পড়ব, আমি পড়তে শিখছি কিনা।

আমি শুয়ে পড়ে বললুম, কী কী পড়তে শিখলে বলো ত ?

এক নিশ্বাসে সে 'হাসি খুশি' থেকে শুরু করে 'উর্দূ পহেলী কেতাব' একটানা শুনিয়ে গেল। আমি হেসে বললাম—তুমি কেমন ভাল পড়তে পার, আমি তেমন পারি না। সে অবিশ্বাস ভরে বললে—তবে এত বই বুঝি এমনি পেয়েছেন ? আসল কথা আমাকে শুনাবেন না . . . না ? সহসা তার বাবা পার্শ্বের কামরা হতে ডাকলেন—মাসুমা ! সে এক দৌড়ে চলে গেল।

পরের দিন আমি স্কুল থেকে ফিরেছি, বইগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে—মাকে খাবার দিতে বলে ছাদে গিয়ে টবের ফুলগাছগুলো বাগানে লাগাব বলে দেখতে গেছি—দেখলাম মাসুমা গাছের গোড়াগুলো একটি কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। আমার রাগ হোল। বললুম—এই ! গাছে কেন হাত দিয়েছ ? সে কাজ বন্ধ না করে বললে—বারে, শুকিয়ে আঁকড়িয়ে যাচ্ছিল, আমি আরও ভাল করছি কিনা ?

বললাম—রাখো, ভাল আর করতে হবে না। সরো ! সে সরে গেল। আমি গাছগুলো দেখতে দেখতে একবার তার মুখের দিকে চাইলুম। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্যাস্তের আয়োজন শুরু হয়েছে। ওরই আভা বুঝি মাসুমার মুখে। ভারি ভালো লাগল। একটু কোমল সুরে বল্লুম—রাগ করেছ মাসুমা ? তার মাটিভরা হাত দিয়ে সামনের ছোট ছোট চুলগুলি পিছনে সরিয়ে দিতে দিতে বললে—না, রাগ ত আমি করিনি ; আমরা আজ চলে যাব কি না। আমিও চলে যাব, গাছগুলিও মরবে—পানি দেবেন না কিছু না। আমি ত কালও পানি দিয়েছি, নয়ত কেমন করে গাছ থাকত দেখতাম—বলেই সে হাসল। আমি বললুম : আজই যাবে ? কখন ? রাত্রের গাড়ীতে . . . বেশ হবে রাত্রে গাড়ীতে আলো জ্বলবে পাখা চলবে বেশ হবে।

আমি উঠে এসে তার হাত ধরে বললুম—আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে না ? অকুণ্ঠিতভাবে সে ঘাড় নেড়ে বললে আপনার জন্য নয়, চাচীর জন্য মন বড় ঘাবড়াবে, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন কিনা ? আমি হঠাৎ তার নরম লাল গাল দুটিতে চুমা দিয়ে বললুম—আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি মাসুমা !—সত্যি। সত্যি সত্যি ?—হাঁ, তুমি গেলে আমি কাঁদব, একটুও ভালো লাগবে না।

'আমিও তা হলে আপনাকে ভালোবাসবো।' আমি বললুম—সত্যি ? সে বললে : হাঁ—আপনি আমাদের ওখানে ছুটিতে যাবেন, তা হলে খুব খেলব—আচ্ছা ? আমি

বললুম : আচ্ছা—তবে আমাকে একটা চুমো দাও। সে নরম হাতে আমার গলা জড়িয়ে আমার দুই গালে দুইটি চুম্বন দিল। জানো আসমত ? শিশুর সে চুম্বনে তখন হয়ত কিছুই ছিল না, কিন্তু আমার মনে আজো সে চুম্বনের স্মৃতি মধুর হয়ে আছে। প্রথম কৈশোরের সেই মধুর ক্ষণে একটি বালিকার নির্মল চুম্বন আমার মনে চুম্বনের মাধুর্য এঁকে দিলে। আমি তাকে বার বার চুম্বন করলুম, সে আমার হাত ধরে পরম সারল্যে সেই চুম্বন উপভোগ করে গেল।

তার মন সরল, কিছু সে মনে করলে না, কিন্তু নিজের কাছে আমি নিজেই যেন চুরি করছি বলে মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি নিচে চলে এলুম। আমার পিছনে সেও নেমে এল। খেতে বসে কি জানি কী এক দুঃসহ আনন্দ ও ব্যথার বেগে বার বার কেঁপে উঠছিলুম। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে বেরিয়ে গেলুম মাঠে। সেখানে তোমাদের সঙ্গে মিলে হল্লা যতই করলুম কিন্তু মন আমার যেন কেবলই ঘরের পানে ছুট্‌ছিল কিন্তু তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এসে দেরী করার জন্য বাবার কাছে বকুনি ত খেলামই, উপরন্তু মাসুমারাও চলে গেছে। মা একলা বসে সুপারি কাটছিলেন অপরাধীর মতো তাঁর কাছে গেলুম। তিনি বললেন : একটু আগে এলেনা—মেয়েটা তোমার জন্য কত দুঃখ করল। বুকটা ধপাস্ করে উঠ্‌ল আর কিছু বলেনি ত ? মা আর কিছু বললেন না, আমিও কোন রকমে খাওয়া সেরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ঘরময় সেই প্রথম অনুভব করলুম বিরাট শূন্যতা।—কতক্ষণ পরে শুন্‌লুম, হয়ত আমাকে নিদ্রিত ভেবেই মা বাবাকে বলছেন : মাসুমা মেয়েটি বড় ভালো। কাসেমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে বউ করে রাখতে সাধ হয়। বাবা বললেন : হুঃ। মেয়ে ভালো দেখতে তাই কি ? মাষ্টারী ছাড়া বাপের আছে কি। মাষ্টারী না থাকলে ভিখারী। তার মেয়ে ঘরে আনা—ওকথা মনেও এনো না। মা বললেন : তা হলোই বা। তোমারই ত ভাইয়ের মেয়ে, আর একটাই ত ছেলে, যা আছে খেয়ে দেয়ে খোদা রাখলে দুঃখ কিসের ? বাবা কঠিন স্বরে বললেন : যা হবার নয় তা বকো না। মা চুপ করলেন।

—আমার মন সেই কৈশোরের স্বপ্নভঙ্গে অদ্ভুত ব্যথায় ছেয়ে গেল। আসমত . . . হ্যাঁ তারপর বলি শোন। কত বছর কেটে গেল। মাও মরে গেলেন—বি-এ এম-এ পাশও করলুম। হয়ত মাসুমাকেও ভুলে গেছলুম, কিন্তু শুন্‌লুম ওরও বাপ মরে গেছেন ওকে একটি মাষ্টারেরই হাতে সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তেই। বাবা বুঝি কিছু টাকা বিয়ের খরচা বাবদ দিয়ে মস্ত উপকার করলেন ভেবে খুবই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছিলেন। আমার বিলাত যাওয়ার সবই ঠিক ছিল। বাবা অসুখে পড়লেন, আমার বিয়ে দিয়ে তিনি চোখ বুঁজতে চান। ওরই মধ্যে আমার বিয়ে হল। ধনীর দুহিতা আদরে লালিতা আসেমার সঙ্গে। বিয়ে করে খুবই খুশী না হলেও খুশী যে হলুম সেটা ঠিক। সুন্দরী তরুণী গরবিনী আসেমা আমার কাছে অতুলনীয় মনে হল।

—বাবা মারা গেলেন। সুখেই গেলেন বলতে হবে। আমার অতুল ঐশ্বর্য, গৃহে

তরুণী পত্নী, বাইরে মানমর্যাদা হাসি খুশী, জীবনের সুখ-তরণী বিনা বাধায় উধাও চলেছে! অমনি সময়ে মাসুমার স্বামী আবু আলী আমার বাড়িতে একদিন এসে উপস্থিত। শুনলাম ওর বাবার ঋণের দায়ে মরবার আগে পর্যন্ত আমার বাবা ওদের ভিটা ছাড়া করে গেছেন সেটা ও ফিরিয়ে চায় না, কিন্তু মাসুমার বাবার কিছু সম্পত্তি আমাদের মধ্যে আছে সেটুকু চায় আলাদা করে নিতে।

বল্‌লুম—আমি ত ঠিক জানি না, তবে নায়েব ম্যানজারের সঙ্গে হিসাব-কিতাবে বেরুলে নিশ্চয় দিয়ে দেবো, জোর প্রতিশ্রুতি দিলাম। শুধালাম—কী করা হয়? বললে—মাষ্টারী, তবে গ্রামে আর নয় কলকাতায় কাজ পেয়েছে। বল্‌লুম—পরম আগ্রহেই বললুম : মাসুমাকে নিয়ে এসেছ? ও বললে : হাঁ, আমারও একটি ছোট ভাই ছাড়া কেউ নেই। ভাইটি পড়ে স্কুলে, আমরা কলকাতা এসেছি পনরো ষোলো দিন হবে। ইন্টালীর ওদিকে আছি। পরম উৎসাহে বল্‌লুম—এতদিনে একবার খবর দেবার কথা মনে হল না! চলো এখুনি যাব তোমার বাড়ি। লজ্জিত হয়ে আলী বললে 'নতুন এসেছি, ভালোমতো গোছগাছ করে আপনাকে নিয়ে যাবার কথা বলছিল . . . বাধা দিয়ে বল্‌লুম—হাঁ, মাসুমা গিন্নি হয়েছে কি না! আচ্ছা, দেখি ওর দাওয়াতের আগেই গিয়ে পড়লে ও কি করে।

এগারটা বেজেছিল। গাড়ীতে উঠে চল্‌লুম ওদের ওখানে। গাড়ীতে বসে আলীর সঙ্গে কথাবার্তা হল কেমন লাজুক নম্র ছেলেটি। বেশ লাগল। বাড়ির গলিতে নেমে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই মিষ্টিকণ্ঠে উত্তর হল—নাম না বললে দুয়ার খুলছি না . . . আলী যেন একটু রেঙে উঠল, আমি জোরে কড়াটা নেড়ে দিলুম। আলী বললে: আমি আলী, দুয়ার খোলো। দুয়ারটা একপেশে হয়ে খুল্‌ল। আমিই আগে ভিতরে গেলুম, আলী পিছনে। মাসুমা। এই সেই মাসুমা। আধাশাড়ী ভিজা হয়ত ঘর ধুচ্ছিল। মুখের উপর শ্রমকাতর লালিমা—পা দুটি খালি, তবু কি সুন্দর। তবু কি সুন্দর। আমাকে দেখে একটু চমকে কাপড় টেনে দুয়ারের আড়ালে দাঁড়ালে। আমি সামলে নিয়ে বললুম : আমাকে চিনলে না মাসুমা? আমি কাসেম। সে হেসে আমাকে সালাম করলে। বল্‌লুম : থাক থাক, আর সালামে কাজ নেই। কত দিন এসেছ, গিয়ে সালাম করেছিলে?

আলী বেচারা তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে বারান্দায় এনে আমাকে বসতে অনুরোধ করলে। মাসুমা আবার হেসে বললে বড়লোকের বাড়ি যেতে—আমি বাধা দিয়ে বললুম—ভয় লাগে বুঝি? সে বললে : ইস্‌! ভয় আমি কাউকেই করি না, তবে বড়লোকের বাড়ি গেলে এতদিন পর দেখে যদি কেউ চিনতে না পারে সেই ভেবে যাই নি। তবে আপনাকে যখন এখানে বসে দেখলাম তখন বেগম সাহেবকে দেখতে যাব ভাবছি। তা দেখুন না উনি বলেন : গয়না নেই, ভালো কাপড় নেই, কী পরে যাব—আচ্ছা বলুন ত? আমার যদি আপন হয় তবে আমি ছেঁড়া কাপড়ে গেলেও আমার আদর হবে না।

আমি হেসে আলীর দিকে চেয়ে কিছু বলতে চাইলাম—বেচারা আলী! ওকে

মাসুমা যে রকম চালায় তা বুঝলুম—এই স্পষ্টবাদিতার লজ্জার সঙ্গে ওর মুখে যে অপূর্ব ভাব ফুটে উঠল তার কথা আমার মনে আছে, কী সুখী এরা দুটিতে। সেই সময় মনে পড়ল ঐশ্বর্যে আদরে সুখের খাতিরে তৃপ্তিই বা কি . . . আর এদের বিত্তহীন চিত্তের ঐশ্বর্যের কি ঔজ্জ্বল্য। আমার মনে হল এই সামান্য মাষ্টারের কাছে আমার মতো ধনবানও হার মানতে বাধ্য। এই সুখ সৌভাগ্য আমার নেই। আমি মনের চিন্তাকে চাপা দিয়ে তাদের আনন্দে ডুবে গেলুম। চিরপরিচিত জনের মতো মাসুমা কথাবার্তা কইতে লাগল। এ কথা সে কথায় সব খবর জেনে নিয়ে বললে, যখন এসেছেন তখন না খেয়ে যেতে পারবেন না, তবে একটু দেরী হবে, আমার নাওয়াটা বাকি আছে—আপনি বসুন আগে একটু শরবৎ দিয়ে মিঠা মুখ করিয়ে নি।

ওর ধারণ ধরনে—আমায় অসীম আনন্দ দিচ্ছিল। কি যে বলব ওর অফুরন্ত কথার সামনে ভেবে পেলুম না, তবু বললুম : দুপুর বেলা আমি কি খেতে এসেছি নাকি, আর একদিন এসে খাব।

ঘরের ভিতর শরবৎ তৈরী করতে করতে মাসুমা বলে উঠল ঃ একদিন নয়ত ভাবী আপনার জন্য দেরী করে খাবেন তাতে আর কি হবে? আমি যে কতদিন অমনি থাকি—জিজ্ঞেস করুন না, ওই ত বসে আছেন। আজ এ বন্ধু কাল ও বন্ধু ওখানে হামেশাই খাওয়া জোটে। আর আমি থাকতুম ঘরে উপোস—এখন দেখি কলকাতায় কার কটা বন্ধু জোটে।

এবারে আলীর মুখ ফুটল। বললে—দেখুন না, এসেই গণ্ডা ভরে বন্ধু জুটিয়েছে, তা ভালোই বদলা শোধ হোক, আর খোটা শুনতে পারি না। মাসুমা দুই গ্লাস শরবৎ দিয়ে গেল। আমি ও আলী খেতে খেতে নানা কথা বললুম, ওদের ঘরকন্নার কথা, গ্রাম কেন ছাড়ল, কি করে চলেছে—আলী একটু ইতস্ততঃ করে বললে : বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম, বাবা মারা যাওয়ায় আর পড়া হল না। পাবনায় যা কিছু ছিল দেনার দায়ে আপনার বাবার কাছে সবই চলে গেছে। ওর (মাসুমার) বাপের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু আপনি ত ওখানে নেই, নায়েব ম্যানেজারের সঙ্গে একটা কথা নিয়ে রাগারাগি হওয়ায় ওর ইচ্ছায় চেষ্টা করে কলকাতায় এলুম। কিছু নগদ টাকা ছিল . . . একটা কারবারের শেয়ার নিলুম, দেখি কতদূর হয়।

আলীর নানা কথার পর বুঝলুম ওরা সামান্য অবস্থাতেই আছে, তবুও সুখের সীমা নেই। আরও জানতে পারলুম মাসুমা অন্তঃস্বত্বা! একজন চাকরাণীও এবার রাখবে।

মাসুমা নেয়ে আসতে আবার তার কাজ ও মুখ এক সঙ্গে চলতে লাগল। আলীর ছোট ভাই আবু এমাম কোথা থেকে এসে আমাকে দেখে একটু অবাক হলো। মাসুমা তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে—অতি সুন্দর সহজ সম্পর্কে।

ক্রমেই আমি মাসুমার ব্যবহারে অবাক হতে লাগলুম। সাধারণ একটি গেঁয়ো মেয়ে, সেই কবেকার কথা। আমার সঙ্গে ওর সহজ আনন্দের ভাবটুকু আমাকে শুধু মুগ্ধ করলে না, লুব্ধও করলে। খেতে দিয়ে মাসুমা বললে, আজ ভাবী যখন শুনবেন

আমার পাল্লায় পড়ে আপনার এত দেরী হয়েছে তখন গালি যা দেবেন।

আমি বললুম 'সে ত বাড়ি নেই, তার মার ওখানে আছে।'

মাসুমা বিস্ময়ের স্বরে বললে 'আজ রবিবার।'

আমি বললুম 'বেকার মানুষ আমি, আমার সবদিনই রবিবার।'

মাসুমা বললে 'ওঃ হাঁ ঠিক ত। তা হলেও যেতেন ত আপনি সেখানে। তা না এই অন্ধকূপে এসে বসে কষ্ট করছেন। কোথায় শালা শালীর হাসি-গল্পের মধ্যে পাখার তলায় বসে কোরমা পোলাও খাবেন, তা না এই গরমে ডাল ভাত'—বলেই হাতের পাখাটা সে জোরে চালিয়ে দিলে।

বললুম 'থাক্ থাক্—তোমার ভাবী ত রোজই যখন ইচ্ছা যান, তাই বলে রোজই আমি কিন্তু শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পাত পাতি না। তার চেয়ে তোমাদের এই ডাল ভাত আমি বেশি তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে খুশী হয়েছি মাসুমা, এটা তুমি বিশ্বাস করো আর না করো।'

আমার স্বরটা শেষের দিকটায় গাঢ় হয়ে এলো। তাতে অমন যে মাসুমা সেও কী ভেবে জানি চুপ হয়ে গেল। সত্যি আসমত! আমার গৃহের এই দৈন্য এতদিন আমার চোখে পড়লেও মনে হয়ত বেশি আমলে আসেনি কিন্তু সেই মধ্যাহ্নের সেই সুখী পরিবারটির স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-পুলকে স্পন্দমান সংসারটির কার্যকলাপ, আপন হাতে রাঁধাবাড়া করে খাওয়ানোর তৃপ্তিসুখ দেখে মনে মনে ভাবছিলাম—কত সুখী এরা। আর আমি? হয়ত কোনদিন বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে শুনি বেগম সাহেবা বাপের ওখানে গেছেন, আমি যেন যাই। প্রথম প্রথম যেতামও, শালী-শালাদের হাসি তামাসার ভিতর দিয়ে আনন্দে সময়টাও মন্দ কাটত না। কিন্তু পরে আমি সে সব পছন্দও করতাম না, ভালোও বাসতাম না। একাই খেয়ে নিতাম যা থাকত। কোনোদিন হয়ত বা সন্ধ্যায় গৃহে ফিরতাম আসেমাকে নিয়ে বেড়াতে বা সিনেমায় যাবার আশায়। কিন্তু কোথায় সে? সে কখন চলে গেছে . . . কোনোদিন ও-তরফের কারুর একটা শ্লিপ পেতুম, কোনোদিন বা শুধু বেয়ারার কাছেই শুনতাম : বলে গেছে—যেন আমি যাই।

এই করে বেকার দিন কী করে কাটত তা জানি না, তবে যতক্ষণ আসেমা কাছে থাকত আগের সেই সব কথা প্রায়ই মনে উঠত না। অথবা উঠলেও আসেমার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি কম মনে করে নিজেই ক্ষমা করে নিতুম। কোনোদিন কোন অনুযোগ ও পরে কান্নাকাটির বানে ভেসে আমারই মানিয়ে নিতে হত।

তারপর একদিন আমিই গাড়ী করে এসে মাসুমাকে নিয়ে গেলাম আমার বাড়ি। আসেমা—আর মাসুমা। কতক্ষণ ধরে উভয়ের কথাবার্তা শুনলুম, আচার ব্যবহার দেখলুম। আমার কি মনে হল জান? আসেমা সযত্ন তৈরী কাট্ গ্লাসের জিনিস আর মাসুমা বহুমূল্য সাধারণ কাটের একখণ্ড হীরক। আসেমার সৌন্দর্যে আছে সাধ্য সাধনার চটক আর মাসুমার আছে স্বাভাবিক হীরকখণ্ডের মতোই অপরূপ দ্যুতি। বহুদিন অতীত বাল্যের সেই খেলার ছলে ভালবাসার বস্তু আমার কাছে প্রার্থনায়—বাঞ্ছনীয় কিন্তু এ সম্পদ অন্যের। ভাগ্যবান সে আমার চেয়ে, এই অমূল্য সম্পদের

অধীশ্বর হয়ে। অভাগা আমি কেন এই অমূল্য সম্পদকে লোভের চক্ষুতে দেখলাম।

আসেমার সঙ্গে প্রথম মাসুমার বেশ বনল। কিন্তু নারী কী করে টের পায় কার কাছে তার কোন্ বিষয়ে পরাভব। মাসুমা মাঝে মাঝে আস্ত। কোনদিন আমি থাকতুম, কোনদিন থাকতুম না। আসেমাকে সে নিজের মতে আনতে চাইত—নানা ভাবের নানা উন্নতির আলোচনায়। এরই মধ্যে সে বহু প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে। আশ্চর্য আসমত। মাসুমা সামান্য হয়েও অল্পদিনে যে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করল, আসেমা এতদিনেও তা পারেনি।

মাসুমার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল। কথায় কথায় আলীকে তার কিভাবে বন্দোবস্ত হবে তাই একদিন জিজ্ঞাসা করলুম। লাজুকভাবে সে উত্তর দিলে : তার ব্যবস্থা মাসুমাই নিজে করে নিয়েছে—ও হাসপাতালে যাবে। শুনে রাগ হল, মাসুমাকেও স্পষ্টাস্পষ্টি আমার আপত্তি জানালাম। ও এমনভাবে সে কথা কাটিয়ে দিলে যার পরে আর আমার কিছুই বলবার রইল না।

হাসপাতাল থেকে ও ফিরে এল অতুল মাতৃত্বের গৌরব নিয়ে। ওর চোখের চাউনী থেকে হাসিটি পর্যন্ত উজ্জ্বল গৌরবে, আনন্দে ঝলমল করছে, আলীরও তাই। আসেমা এখন যেন স্পষ্টাস্পষ্টি ওর প্রতি হিংসুকা হয়ে উঠল—আমাদের বাড়ি মাসুমার আসা যাওয়া বা তাদের ওখানে আমার আসা যাওয়া আসেমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। মাসুমা চালাক মেয়ে। সে নিজে নিজে আসা যাওয়া কমাল—অতি শান্ত সৌষ্ঠবের সঙ্গে। আমার অন্তর তার প্রতি আরও ধাওয়া করল। আসমত, এই পরম চাওয়ার ধনকে কিন্তু আমি অপমানের একশেষ করেছি চরমভাবে। ওঃ মন এ অপরাধ ভুলতে পারে না ভাই।

আসমত ধীর হস্তে বন্ধুর উত্তেজিত শ্রমকাতর মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন। কাসেম আবার বলিল।

এমনি করে বছর খানেক কাটল ওদের মিলন—মাধুর্য, তৃপ্তির হাসি আমার আনেন্দের যোগান দিত নিত্য। ছেলেটি হওয়ায় ওদের খরচ বাড়ল, একটি দাই রাখতে হল। আলীর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ল, মাসুমাও কত রকম সেলাই করে আয় করত। দেখে আমার বিস্ময় বাড়ত। কারুর কাছে ওরা ধারে না। ইন্টালীর বাড়ি ছেড়ে পার্কসার্কাসে ছোট দোতলা বাড়ি নিয়ে নিচে ভাড়া দিয়ে ওপরে তারা থাকত। দুটি মাত্র কামরা, কিন্তু পারিপাট্যে পরিচ্ছন্নতায় মনে আনন্দ দিত।

এরই মধ্যে আসেমার হল শরীর খারাপ—হাওয়া বদল করতে হবে। তার ভাই সিলোনে থাকে, কাজেই সিলোন যাওয়ার ব্যবস্থা হল। মাসুমাকে ছেড়ে যেতে মন আমার একটুও চাইছিল না, অথচ না গিয়ে উপায় নেই। আলীকে বলে গেলুম চিঠিপত্র যেন লেখে। আমরা চলে গেলুম।

প্রায় দেড় মাস পরে হঠাৎ খবর পেলুম সাত দিনের টাইফয়েডে আলী মারা গেছে। এত খারাপ লাগল। ইচ্ছা হল ছুটে চলে আসি। কিন্তু কোন অসিলায়ই আমি আসতে পারলুম না। আসেমাই জোর করে আসতে দিল না, যা ভাবলে তা ঠিকই।

মনের মধ্যেও সেই বাধার জন্যে আমি হেরে গেলুম। ইচ্ছে করেই বেশি জোর দিলুম না।

আরো পাঁচমাস সেখানে থাকার পর কলকাতায় ফিরে এলুম। এসেই মাসুমার কাছে গেলুম। অবাক হয়ে দেখলুম শোকবিহ্বলা নারীর বদলে দীপ্ত এক জ্যোতির প্রতিমা . . . কোন কথা বলবার সাহস সেদিন হল না। নীরব নতমুখে কতক্ষণ বসে রইলাম। আলীর ছোট ভাইটি আই-এ পড়ছিল। তার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে—কোনো একটা কাজের চেষ্টায় আছে। তারই মুখে যা কিছু কথা শুনলাম। মাসুমা শুধু বললে, দেশে যে জমিটুকু আছে তাতে আপনার লোকজন দিয়ে যদি একটা ঘর উঠিয়ে দেন তো দেশে গিয়ে থাকি। আমি সম্মতি জানালুম।

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলুম, ঘর দুয়ার তেমনি আছে। খাটের উপরে আলীর মাথার বালিশ দুটি পর্যন্ত তখনও সাজান আছে যেন সে কোথাও গেছে এখনি এসে পড়বে। . . . খোকাটি আধ আধ স্বরে কত কথা বলছে, মাসুমা প্রত্যেকটির উত্তর দিয়ে খোকাকে শান্ত করছে।

আমি চলে এলুম। ঘরে এসে প্রথমেই আসেমার কাছে তীব্র প্রতিবাদ শুনলুম কেন ওখানে আমি গেছলুম ? এই প্রথম দিন আমি তাকে বললুম 'আমার ইচ্ছে।' এরপর এই কথা নিয়ে যে তুমুল কাণ্ড হল, কত অকথ্য আমি শুনলাম, তার বর্ণনা আর করব না। তবে মোট কথা, আসেমার অতটা ঈর্ষাই মাসুমাকে পাওয়ার ইচ্ছাটাকে আমার মনে তীব্রভাবে জাগিয়ে দিলে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম মাসুমাকে আমি ঘরে আনবই।

—মাসুমার ওখানে যাওয়া আমার বন্ধ হল না। কিন্তু গেলেও দিনের পর দিন তার সেই স্বল্প কথাবার্তা, কেমন একটা ঔদাসীন্য মাখান নিস্পৃহতা আমাকে পীড়া দিত। তার কথার মধ্যে শুধু ছিল কবে সে যেতে পারবে দেশের বাড়িতে। আমি তাকে বলতুম—মাসখানেক পরে আমিও যাব, তখন একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। ও বেশি জোর দিত না, আমিও তার দেশে যাওয়ার ইচ্ছা না হয়—এই প্রার্থনাই করতুম। ক্রমে আসেমার কথাবার্তার ফলে শ্বশুরপক্ষ থেকে অভিযোগ এল। প্রশ্ন হল কেন আমি মাসুমার ওখানে যাই। আমার জন্মাবধি কারু কাছে কৈফিয়ৎ দিইনি। কথাটা শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে গেল বললুম মাসুমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। সেই জন্য যাই।

—এতদিন এই সত্যটা শুনবার আশায় যেন সবাই ছিল। শুনে কেউ আর মুখে কিছু বললে না। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি বাড়ি খালি। চিঠি রাখা আছে—আসেমা বাপের বাড়িই থাকবে, সেখানে চলে গেছে। ভাবলুম ভালই হল। অবশ্য রোজই কিন্তু আমি মাসুমার ওখানে যেতুম না। আর কত সাধাসাধি করেও এ পর্যন্ত তাকে আমি কোন সাহায্যই নেওয়াতে পারিনি। ওদের অল্প খরচ কোথা থেকে মাসুমা বেশ ভাল মতেই চালাত। শুধু মাসুমা অপেক্ষা করছিল দেশে যাবার। এরই মধ্যে এই কাণ্ড হয়ে গেল।

—বছর খানেক হল আলী মারা গেছে, সামান্য দুঃখও ওদের দেখতে পাইনি ; কিন্তু আমার সব থাকতেও আমায় সর্বহারা হতে হল। রাত দশটা বেজেছিল, সোজা গেলুম মাসুমার ওখানে। তার দেবর আমাকে এমনি অসময়ে আসতে দেখে বিস্মিত হল। তাকে বললুম, মাসুমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। বললে : যান উপরে। সে নিচের বারান্দায় কার সঙ্গে কথা বলছে, আমি উপরে গেলাম। মাসুমা খোকাটিকে ঘুম পাড়িয়ে নামাজ পড়ে উঠেছে। অজুর পানিতে বা চোখের পানিতে চক্ষুপল্লব তখনও আর্দ্র। বললুম : কতক্ষণ তোমার সময় হবে কি আমার কথা শুনতে ? বললে : বলুন কি কথা আছে। এক নিশ্বাসে তাকে সব বললুম একটি কথাও না বলে সে সব শুনে বললে : কি করতে হবে বলুন আমাকে ? ভাবীকে ফিরিয়ে আনতে আমি যেতে পারি একবার। দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললুম : না, তাকে আমার চাই না, তুমি যদি আমার হও—

. . . বাধা দিয়ে আর্তকণ্ঠে সে বললে : 'আমি ? আমাকে নিয়ে আপনি কি করবেন ?' . . . পাগলের মতো আমি বললুম : কি করবো জিজ্ঞাসা করছ ? সেই ছোটবেলা থেকে যা করেছি সেইরকম সেই ভালবাসা যা তোমার প্রতি এ পর্যন্ত আছে সেই ভাল তোমোকে বাস্‌বো। আমার শূন্য ঘর তুমি পূর্ণ কর ! সে কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, পরে বসে পড়ে বললে—আপনি বড়ভায়ের মতো, এ পাগলামী কেন করছেন ? ঘরে যান, স্বামী-স্ত্রীর কত ঝগড়া হয়। আর আপনি কেন আসেন আমার এখানে ? না এল ত ভাবীও ভাল থাকেন। তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ? যান ঘরে যান, এ পাগলামী আপনার সাজে না।

—রাগে ক্ষোভে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। যার জন্য এত, সেই বলছে কিনা পাগ্‌লামী—মাসুমা না হয়ে যদি অন্য কেউ হত, উঠিয়ে তাকে আছড়ে মেরে ফেলতুম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে তক্ষুণি তার কাছে মিনতি জানালাম, বেদনা জানালাম, কান্না আমার চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ল কিন্তু সে পাষাণী তেমনি অচলা অটলা ? শুধু বললে : যান, ফিরে যান, আপনার মেজাজ ভাল হলে ভেবে দেখবেন, ভাবীর মত করিয়ে যদি আমার এখানে আসতে পারেন তবে আসবেন, নয়ত তাঁকে বিরক্তি করে আসাটা আমিও পছন্দ করি না।'

শুনে পাগলের মতো আমি আরো কি কি বলেছিলাম আজ মনে নেই। কিন্তু তার দেবর এসে বললে : 'আপনি যাবেন না এখন ? রাত যে অনেক হল।'

আমি কিছু বলবার আগেই মাসুমা বললে 'হ্যাঁ, যাবেন বইকি। তুমি ওঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এস।'

—যন্ত্র চালিতের মতো আমি নেমে এলুম। বাড়ি ফিরে সারারাত আমার ঘুম হল না, আসেমাও ছিল না। আরাম বোধ করলুম। সারারাত ভাবলুম কি উপায়ে মাসুমাকে লাভ করা যায়। মনে করলুম রোজ যাব ওর কাছে, দেশেও পাঠাব না। দেখি কি করে ও আমাকে এড়াতে পারে ?

ভোরে উঠে কিছু খেয়ে গেলুম ওর ওখানে—দেখলুম বাড়ি নেই। শুনলুম,

মাসখানেক হল মাসুমা কাদের বাড়ি সেলাই শেখাবার বন্দোবস্ত করেছে, সেইখানে গেছে। তারা গাড়ী পাঠায়। আলীর ভাইও আবার পড়া শুরু করেছে। সন্ধ্যায় নাকি সেও ট্যুইশনি করে। বুঝলুম তাই মাসুমা আজ কাল দেশে যাবার কথা তোলে না। রাগ হল নিজের উপর কেন এতদিন খবর দিন নি। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা আবার গেলুম। তার দেবর তখন বাড়ি ছিল না। মাসুমা খোকাকে কোলে করে চাঁদ দেখাচ্ছিল। আমি যেতেই বললে 'ভাবী বাড়ি ফিরেছেন ? আমি যাব দেখা করতে।'

সহাস্য মুখের প্রশ্ন শুনে আমার সাহস বাড়ল। . . . বললুম না, সে ফেরেনি, তাকে ফেরাতেও চাই না ; তুমি চল।

তার মুখের হাসি ম্লান হয়ে এল, কিন্তু ঘুচল না। বললে 'আর একটি বিয়ে করবার ইচ্ছে আপনাদের হলেই স্ত্রীর দোষ দেন। কিন্তু নিজের মনের দোষটা আপনাদের চোখে পড়ে না।'

আমি অধীর হয়ে বললুম ! 'মাসুমা মনে কর এমনি সন্ধ্যার কথা। কেন তুমি আমাকে সেদিন ভালবাসার অবকাশ দিয়েছিলে ? সেই থেকে তোমার কথা ভুলেছি ভেবেছ ?'

—সে অমনি মধুর হাসি হেসে বললে, 'এতই ভালবাসা ছিল যদি, তবে তখন কেন বিয়ে করে ঘরে নেন্‌নি ?'

—বল্‌লুম 'বাবা থাকতে আমার মতের ত জোর ছিল না মাসুমা—সব ত তুমি জান। কিন্তু ভালবাসা আমার তোমার প্রতি ছিলই বরাবর। তোমাকে এখানে আবার দেখা অবধি আমার শয়নে স্বপনে তুমিই যে আবার আমার ধ্যানের ধন হয়ে উঠেছে।'

—মাসুমা বললে 'আমি জানি। কিন্তু যাকে ভালবাসা যায়, তাকে যে ভোগ করতেই হবে একথা কেন মনে করেন ? আপনি আমাকে যে ভালবাসেন সে কথা হয়ত সত্য। আমিও আপনাকে ভালই বাসি কিন্তু তাই বলে আজ আমাকে নইলে আপনাকে চলবে না—এর কোন মানে নেই। এতদিন যেমন ছিল, আজো তেমনি চলবে আমাকে ছাড়া—ও ; শুধু ভাবীকে একবার আনুন গিয়ে।'

—মূঢ় আমি, মূর্খ আমি, তার মুখে ভালবাসার কথা শুনে শুনে মনে করলুম আমাকেও ও তেমনিই ভালবাসে। . . . আশায়, আনন্দে উৎসাহিত হয়ে তার হাত ধরতে হাত বাড়ালুম। সে কৌশলে হাত সরিয়ে খোকাকে চুম্বন করতে লাগল। বল্‌লুম : 'তোমার পায়ে পড়ি, মাসুমা, তুমি রাজি হও—আমার সর্বস্ব তোমাকে দান করব।'

—সে এইবার আমার দিকে ফিরে বললে 'সত্যি নাকি ? কী কী আছে আপনার এবং আমাকে কি দেবেন ?'

নিজের মনের উৎসাহে থিয়েটারী ঢংয়ে তাকে কত কি বলে গেলুম, আজ তার মনেই করতে পারি না। কিন্তু মাসুমা পরম উপেক্ষা ও কৌতুক—ভরে তখনও অত কথার ওপরও শুধু হাসছে দেখে আমার রাগ হল। লজ্জাও পেলুম। বললাম 'তোমার আমার পরবই, দেখে নিও তুমি।' বলে তরতর করে সিড়ি দিয়ে নেমে এলুম।

—আবার দু'তিন দিন পর তার ওখানে গেলুম। দেখলুম, তার খোকার জ্বর হয়েছে—বেশ আশঙ্কাজনক জ্বর ! আমারও যেন উপলক্ষ জুটল। সেলাই শেখাতেও আর যেতে পারে না। হাতের পয়সাও কমে এসেছিল। মাসুমার দৃঢ়তার যেন কেমন শিথিল এলানো ভাবে পরিণত হল। হাজার হোক নারী সে—সন্তান স্নেহের কাছে নারীর সব মান গর্ব ভেঙ্গে যায় !

—ডাক্তার ডাকা ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা আমি যা করেছি অমন পাষাণী মাসুমারও আর তাতে আপত্তি করবার উপায় ছিল না। শুধু রাত্রে সে কিছুতেই আমাকে থাকতে দিত না। টাইফয়েড—মাসুমার মনে আশঙ্কা জাগছিল পাছে সেও তার বাপের সাথী হয়।

—তেরো দিনে খোকার জ্বর ছাড়ল। মাসুমার মুখে গভীর পরিতৃপ্তি নিদর্শন দেখতে পেলুম। খোকা ক্রমেই ভাল হতে লাগল। আবার মাসুমা তার দেবরকে পাঠিয়ে সেই কাজটা ঠিক করবার চেষ্টা করল। আমার কানে একথা যেতে আমি মাসুমাকে আপত্তি জানালাম। আবার সেই কথা কাটাকাটি, সেই বচসা বিরক্তি ও ব্যাথায় আমার মন ভরে গেল। কয়েকটি কড়া কথা শোনাবার প্রবল ইচ্ছা সেদিন কোনমতে সংযত করলুম।

কয়েকদিন পরে ওদের ওখানে গিয়ে দেখলুম, আসবার-পত্র যেন কোথাও যাবার আয়োজনে প্যাক করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ?

আলীর ভাই বললে 'ভাবীর ইচ্ছা, এখানে থাকবেন না। শরীরও ভাল না, তাই দেশে যাবেন।'

—অসহিষ্ণু হয়ে বললাম 'এতদিন ত শুনিনি—গিয়ে থাকা হবে কোথায় ?'

—সে বললে 'আপাততঃ ভাবীর কোন পরিচিত লোকের বাড়ি। পরে ঘর দুয়ার উঠিয়ে নেওয়া যাবে।'

—মাসুমার সঙ্গে কথাটি না বলে আমি নেমে এলাম। একবার চেয়ে দেখলাম, মাসুমা আমার দিকে উপর হতে চেয়ে আছে !

রাগই করি আর যাই করি মাসুমার আশা ছাড়তে পারলুম না—সন্ধ্যায় আবার গেলুম। আলীর ভাই সানের উপর খোকাকে নিয়ে খেলা দিচ্ছে—আজ ও ট্যুউশনিতে যায়নি। দোরের কাছে গিয়ে শুধু শুনলুম, মাসুমা বলছে . . . তুমি থাকতে আমার আর কোন গতির কথা তোমার চিন্তা করতে হবে না।

—আমি ঘরে প্রবেশ করলুম। আগের কথা কিছু শুনিনি, পরেও শুনলাম না ; কিন্তু ওই কয়টি কথা আমার অন্তরে বিষ ছড়িয়ে দিলে। আলীর ভাই মাসুমারই বয়সী, তবে কি—তবে কি—আর ভাবতে পারলুম না। আলীর ভাইকে বললাম, 'তুমি একটু যাও, আমি কিছু বল্‌ব মাসুমাকে'—সে উঠে গেল। কিন্তু যাবার সময় তার চাউনী দিয়ে যেন বিঁধে গেল।

—মাসুমাকে বললাম 'আজ শেষবার তোমাকে বলছি মাসুমা। মানে মানে আমার কথা শোন, নইলে পরে পস্তাবে।'

—মাসুমা বললে 'এইটুও না। আপনি বাজে বক্‌বেন না।'

—বাজে ! আমার সব কথা বাজে ! আর ওই ছোঁড়াটার সব কাজের কথা। দুঃসহ ক্রোধে উন্মাদের মতো আমি জোর গলায় বললাম 'বুঝেছি, কেন তুমি আমাকে কবুল করতে চাও না। ওই দেবর আজকাল তোমার গতিবিধির কর্তা।'

—মাসুমার চোখ জ্বলে উঠল। আমি ক্ষেপে গিয়ে বললাম বেশ। দেখে নেব কত সুখে থাক তোমার ঐ ভালবাসার দেবরকে নিয়ে . . .'

—আলীর ভাই দৌড়ে এসে বললে, 'অনেক হয়েছে, যান এখান থেকে। ভাবীর জন্যই এতদিন আপনার মান ছিল। আজ তাঁরই যখন অপমান করলেন আপনি, তখন আপনার কোন মান আমার কাছে নেই—উঠুন।'

—আমি ত উঠছিলামই—উঠলুম। মাসুমা বললে 'এমাম ! তুমিও কি পাগল হলে ? ওঁর সঙ্গে ও—রকম ব্যবহার করলে !'

—সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে আমি বললাম 'হ্যাঁ, ও ত পাগল তোমার রূপের।'

—এমামের তীব্র স্বর শোনা গেল 'ছাড়ুন। ওকে দেখিয়ে দি মজাটা . . .' মাসুমা বললে 'ছি, লোকে কি কুকুরকে কামড়ায় ? কুকুরই লোককে কামড়ায় !'

—কুকুর-আমি কুকুর। সত্যই তখন বেত্রাহত কুকুরের মতো সেখান থেকে আমার ল্যাজ গুটিয়ে পালান ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। পালালুম সেখান থেকে। অগ্নিগিরির মতো আমার অন্তর তখন অপমানের ক্ষোভে ভরে আছে।

—মাসুমাকে যদি কিছু শাস্তি দিতে পারতাম মনটা যেন শান্ত হত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বারোটার সময় বাড়ি গিয়ে দেখলাম, খোদার কি বিধান ! আমার বড় শালা আমার অপেক্ষায় নাকি আটটা থেকে বসে আছেন ! পরম বিজ্ঞভাবে তিনি জানালেন, আমি কোথায় গেছলুম তাঁরা জানেন ; শুধু আমি লজ্জা পাব ভেবে সেখানে যান নি।

—কৃতার্থ হলুম ! বললাম : দরকার আছে আমার সঙ্গে ?

তিনি বললেন 'হ্যাঁ, তোমার এ ছন্নছাড়া ভাব আর আসেমার ও কান্নাকাটি আর ভাল লাগছে না। যদি বল আমরাই মাসুমাকে ভাল দেখে অন্য কোথাও বিয়ে দেবার চেষ্টা করি ! অল্পবয়সী যুবতীর এভাবে ত সত্যি থাকা ভাল দেখায় না, আর-থাকাও যায় না . . .'

—আসমত ! পশু পিশাচ আমি ! যাকে আমার সর্বস্ব দেবার আরাধনা করছি, যার জন্য আমার অন্তর নিশিদিন হাহাকার করছে সেই মানসী প্রতিমা নিষ্কলঙ্ক সতীর নামে আমি সেদিন দিলুম জঘন্য অপবাদ !' তাও কার কাছে ? যারা তার প্রতি বিমুখ তাদেরই কাছে ! . . . আজ আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে ; কিন্তু সেদিন কেমন করে বললাম ভাই ? বললাম 'তার বিয়ের ভাবনা আর কাউকে ভাবতে হবে না—সে তা করবেও না।'

—তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন 'বটে ! ব্যাপারটা কি ?'

—বললুম, অম্লান মুখে অকম্পিত কণ্ঠে বললুম—সে তার দেবরকে নিয়েই আছে।

—এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জিবটা কেন খসে গেল না আজ তাই ভাবছি। তিনি কিন্তু শুনে পরম সন্তুষ্টচিত্তে বিজ্ঞভাবেই বললেন 'এ কথা আমার আগেই খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, তাই তোমার কাছে এলুম। মিছিমিছি ও-সব খারাপ কথার মধ্যে গিয়ে তুমি শুধু একটা বদনাম কিনলে। তা তুমি ব্যাটাছেলে—তার আর কি ? এবারে চলো আমার সঙ্গে। আসেমাও কেঁদে কেটে অসুখ বাধিয়ে বসে আছে।'

—এদিকে কথাটা বলে ফেলেই আমার মন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মুখের কথা বেরিয়ে গেছে যখন, তখন আর তাকে ফেরাতে পারলুম না ; কিন্তু তখনি গিয়ে আসেমাকে আদর করবার সোহাগ জানাবার প্রবৃত্তি অভিনয়ের খাতিরেও আমার হল না। বললুম 'এখন যাব না আমি। তাই কেন ? আর কোন কালেই যাব না। আসেমা আমায় ছেড়ে গেছে নিজের ইচ্ছা মতো। যদি ইচ্ছা হয় আসতেও পারে যখন খুশী।' বলেই ঘরে গিয়ে সম্বন্ধীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলুম।

—পরদিন একটু বেলা করে ঘুম ভাঙ্গল—কারণ যখন ঘুমিয়েছি শুকতারা তখন উঠেছিল। ঘুম ভাঙ্গবার সঙ্গে একটা কোলাহল কানে এল। দুয়ার খুলে বেরিয়ে দেখলুম, শ্বশুর গোষ্ঠীতে বাড়ি ভরে গেছে। আসেমা নত মুখে দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে ! ওকে দেখেই পিত্ত জ্বলে উঠল ; কারণ ও—ই যেন বেশি করে মাসুমাকে মনে পড়িয়ে দিল। ওকে সহ্য করতে পারলুম না, ছুটে নাইবার ঘরে চলে গেলুম। কিন্তু যাব কোথা ? নেয়ে এসেও নিস্তার নেই। শরীর মন অসহায় হয়ে পড়ছিল, আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ভাই, রামায়ণে পড়েছি হনুমান নিজের আগুনে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে নিজের মুখও পুড়িয়েছিল, তবু লেজের আগুন আর নেভাতে পারেনি, আমারও সেই দশা হল। চারপাশ থেকে মাসুমার নামে যে সব তীব্র মন্তব্য আমার কানে আসতে লাগল তাতে আমি কানে গলান সীসা ঢেলে দেওয়ার যন্ত্রণা বোধ করলুম। কিন্তু আমারই কথার স্ফুলিঙ্গে এই আগুন জ্বলে সীসা গলেছে !

—পাগলের মতো মাসুমাদের বাড়ির দুয়ারে গিয়ে উঠলুম। দেখলুম মাসুমারা চলে গেছে। খবর নিয়ে জানলুম দেশে তারা যায়নি, কোথা যে গেছে তা কেউ জানে না।

—কোথায় গেল, আমার সকল সাধ, সকল আশার সমাধি দিয়ে এই মাসুমা মরীচিকা ? . . . পাগলের মতো কলকাতার অলিতে গলিতে খোঁজ করলুম, মিলল না। . . . ঘর দোর সব বিষ লাগল। শরীর খারাপের অসিলায় মাসুমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম। কত দিকে কত সন্ধান করলুম ! তিনটি বছর এমনি করে কাটল। আজ প্রায় দশমাস হবে একদিন কলেজ স্ট্রীটে ঠিক আলীর মতো একজনকে দেখতে পেলুম। গাড়ী রুখে দেখলুম ঠিক আলীর ভাই, মাসুমার দেবরই বটে। নির্লজ্জের মতো তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলুম, বললুম ঃ 'দয়া করে খবরটুকু জানাও।' দারুণ ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলে ; অনেক মিনতিতে শুধু জানালে যে মাসুমা ভাল আছে—বেঁচে আছে। এমাম চাকরীর চেষ্টায় কলকাতা এসেছিল, আজ চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কিছুতেই সে বললে না।

—জোর করে সে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। অবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে রইলুম! বেঁচে আছে ভাল আছে মাসুমা, এইটুকু জানলুম কিন্তু তার কাছে গিয়ে ভুল ভাঙ্গিয়ে পায়ে ধরে মাফ চাইবার পথ ত রুদ্ধ! এ আত্মগ্লানি কী করে ঘুঁচাই? এ তিলতিল দাহন ত আর সহ্য না। শুনেছিলুম, মাসুমার মামার বাড়ি পূর্ব বঙ্গে কোথা। তাই আবার বেরিয়ে পড়লুম তার খোঁজে। কিন্তু সবই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল ভাই—সে আলেয়া যে কোথায় মিলিয়ে গেছে, আর তার দেখা পাব না। কিন্তু তোমার এই 'মাসুমা' ডাক, শুনে ক্ষীণ দৃষ্টিতে যাকে দেখলাম, তার মুখেও সেই মাসুমারই আদল আসে। কিন্তু সে ছিল বিধবা। এ সধবা, হাতে যেমন চুড়ি দেখলাম। হয়ত তার পছন্দ মতো ও ইচ্ছায় সে কাউকে বিয়ে করতেও পারে। তা তারা যা ইচ্ছা করুক, আজ আর সামান্য ভোগ লিপ্সার আকর্ষণে তাকে চাই না। সে মহীয়সী! তার পা দুটি ধরে শুধু ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিতুম! সে নিশ্চয় ক্ষমা করত। আর-আর সমস্ত শক্তি দিয়ে তার ছেলেটিকে যদি মানুষ করবার পথ পেতাম, তাই করতাম। কারণ ওই ছেলেটিই যে তার প্রাণ।

কাসেমের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা নামিয়া আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আসমত চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কাসেম রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আবার কী বলিতে চাহিল।

আসমত কহিলেন 'থামো কাসেম, আর তুমি কথা বলো না ভাই, পাপের অনুতাপ খোদা গ্রহণ করেন। মানুষ ত কোন ছার! তুমি সুস্থ হও, আমি একটু আসছি।' কাসেম তাহাকে যাইতে মানা করিল। কিন্তু আসমত চলিয়া গেলেন।

একটু পরে আসমত মাসুমাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। আলোর আড়াল সরাইয়া ডাকিলেন—'কাসেম!'

কাসেম চক্ষু বুজিয়া ছিল, ডাক শুনিয়া চক্ষু মেলিল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া সে শুধু চাহিয়াই রহিল। আসমত কহিলেন 'এই সেই মাসুমা, ক্ষমা চেয়ে নাও। বড় দুঃখ পেয়েছে বোনটি আমার। তুমিও অবশ্য কম দুঃখ পাওনি। কিন্তু কাসেম, তোমার বোঝা উচিত ছিল, নারীর মন জয় করার সামর্থ্য অর্থের নেই। যদি তোমার সঙ্গে মাসুমার বিয়ে হত আমি খুশীই হতুম। কিন্তু আমি জানি আমার এই বোনটি শুধু একজনের স্ত্রী হয়ে থাকতে পারে না। জগতের আর্ত আতুররা ওর সন্তান হবে—ওর ব্রত, ওর জীবনের মূল অর্থই এই। খোদা তাই ওকে এমনি করেন। মাসুমা আমার আপন বোন নয়, কিন্তু ওর বাবা আমার ওস্তাদ ছিলেন। তোমার অত্যাচারে বোনটি আমার মামার বাড়ি এসেছিল। পূজার ছুটিতে এসে ওকে দেখে তাই আমার বোনের অভাব পুরাবার জন্য ঘরে আনলুম। দীন দুঃখী ওর দানে শূন্য ঝোলা পূর্ণ করে যায়। মাসুমা! তুমি আমার এই বন্ধুটিকে ক্ষমা করো।'

মাসুমা দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে ছিল। কাসেমের ললাটে হাত দিয়া কহিল 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন বয়স অল্প ছিল, কী কথায় মানুষকে বোঝাতে হয় জানতুম না। তাই আপনার জীবনটা এমনি করে নষ্ট করলুম—এ অপরাধ আমারও কম নয়।'

নির্বাক কাসেম চক্ষু মুদিয়া ছিল ! গভীর পরিতৃপ্তির ছাপ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। যে কহিল 'অন্তিমে তোমার ক্ষমা পেলুম কিন্তু তোমার কথা আমি শুনলাম, তোমার ছেলে . . . ?'

মাসুমা গাঢ় কণ্ঠে কহিল 'ভাল আছে। সে পড়ছে কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থাকে। এমামও ভায়ের এখানে কাজ করে। সে বলেছিল, আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ভেবেছিলুম, তার সঙ্গে ছুটিতে কল্‌কাতায় যাব। গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব, ভাবীকে ঘরে এনে দেব।'

কাসেম অবিরত কাঁদিতে লাগিল। মাসুমা তাহার চক্ষু সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিল 'ভালই করেছিলেন, দুঃখ দিয়েছিলেন—দুনিয়া চিনলুম। আমার দুঃখ নেই . . . আপনিও দুঃখ রাখবেন না। দুনিয়ায় বেঁচে থেকে অনেক কিছু করবার আছে—শুধু একজনের অভাবে কিছু আসে যায় না। ভাইয়ের কাছে এ শিক্ষা পেলুম।

'বিয়ে আমি করিনি। ভাবী ছাড়েন না, কাঁদাকাঁটি করেন, তাই চুড়ি বালাও পরি, খাই দাই—ও ভাল। দেখেছেন না কেমন মোটা হয়েছি ! আপনি ভাল হোন, একসঙ্গে কলকাতা গিয়ে আপনাদের মিলন দেখে আসব।—এখন একটু ঘুমান ; আমি মাথায় হাওয়া করছি—হাত বুলাচ্ছি।'

আসমত উঠিয়া আলোটা আড়াল করিয়া দিলেন। হাজেরাও আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আসমতের দিকে চাহিয়া কহিলেন 'তুমি যাও' এখন আমরা থাকি।'

আসমত চলিয়া গেলেন। ঘড়িতে তিনটা বাজিল। এক দাগ ঔষধ ও কিছু পথ্য খাওয়াইয়া হাজেরা ও মাসুমা কাসেমের কাছে বসিলেন। মাসুমা ধীরে ধীরে ললাটে হাত বুলাইয়া দিল। অশান্তি ও আত্মগ্লানির হাত হইতে শান্তি পাইয়া ধীরে ধীরে শ্রান্ত কাসেম ঘুমাইয়া পড়িল।

*কেয়ার কাঁটা*, ১৯৩৭

## চিঠি[৫]

১৪/১, সারেং লেন
কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৯২৭

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,

সময়ে অসময়ে অনেক রূপে অযথা বিরক্ত আপনাকে অনেক রূপে করে থাকি—ও যতদিন খোদার ফজলে 'সওগাত' সম্পাদক রূপে আপনি আছেন, ততদিন করবই। এতে কোনোদিন আপনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছুটি বলেননি। সেই কারণে সাহসও বেড়ে গেছে বেজায় বেয়াড়া রকমের। কুণ্ঠালজ্জা বা দীর্ঘচ্ছন্দের ভূমিকাও

তাই কোনোদিন আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে বসে করিনি। আজ এটুকুও হয় ত নিতান্তই অবাস্তব তবু . . .।

কাগজে সেদিন দেখলুম, তাকে ঢাকায় কারা নাকি আক্রমন করে মারধোর পর্যন্ত করেছে।—যদি সত্যিই হয় যে, সে এমন কোনো কাজ করায় তাকে এরূপ ভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তাহলে আরো বেশী করে দরকার তাকে আগ্‌লাবার।

বর্তমান সময়ে ওর একটা মান অপমানে আমাদের সমস্ত মোসলেম সমাজের মান অপমান জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আপনাদের আরো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে আছেন বটে কিন্তু তাঁরা শুধু অহং-ই। এরা নিজের অঙ্গে একটু আঘাত পেলে উঁহু করবেন, কিন্তু সমাজ কিংবা জাতীয় কোনো কাজে এদের কোনো টান নেই, এটা আপনি ভালোই জানেন। নয় তো আমাদের বাঙ্গালী মোসলেম জাতির মধ্যে একটি মাত্র সাহিত্য জগতের আশাপ্রদীপ ওই কাজী, ওর কি এমনি হেলার দশা হয় কখনো? এমন কেউ নেই যে ওকে আপন বলে স্বীকার করে। তাই-ত তার এ দশা।

আজ যদি বেঁচে থাকতেন মিসেস এম, রহমান, মায়ের কোলে শিশুর মতোই শান্তিতে কাজী থাকতে পারত, কিন্তু ওটার দুর্ভাগ্য, তাই মা পেয়েও মা হারাল। বোন ত জন্মাতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। ভাই?—তাও কি হতে পারে না? বোধ হয় তা পারে। তবুও আশ্চর্য্য হচ্ছি যে এ সময় কারু কাছে কাজীর নাম করলেও শিট্‌কে ওঠেন, পাছে লজ্জা পেতে হয়—কি ক্ষোভ?

আমার স্বামী এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, নয়ত ওঁকে দিয়ে কাজীর খোঁজ নেওয়াতুম। আপনাকেই শুধু এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারি, আপনি ওকে দেখবেন। ওর মা হয়ে বোন হয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। হতভাগাটাকে পথ থেকে এনে স্নেহ দিয়ে ওকে বাঁধুন। এ দুরন্ত শাসনে শায়েস্তা হবেই না। যদি কোনো রকমে তাকে ধরে বেঁধে কলকাতা আনতে পারেন তবেই রক্ষা। নয় ত ওর লজ্জা, আমাদের লজ্জা, মোসলেম সমাজের লজ্জা, মুসলমান সাহিত্য সেবীদের লজ্জা। যদি ও এখন একেবারে নাম হারিয়ে বসে। ভেবে দেখবেন একটু। তার মা-ও মারা গেছে শুনলুম। এখন কাজী কোথায় আছে ও তার স্ত্রীপুত্র কোথায় আছে, অনুগ্রহ্ করে সত্ত্বর জানাবেন। কি কি ঘটনা হলো আমাকে জানাবেন। ওর মা বেঁচে থাকলে হয় ত এমনি অধীর আগ্রহে আকুল অনুরোধ জানাত আপনাকে, আমিও জানাচ্ছি। আমি কাজীর বোন, আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট করে সব কথা জানাবেন ও তার দিকে একটু খেয়াল করবেন। রবীন্দ্রনাথের পর আর এক রবীন্দ্রনাথ হয় ত হবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আর হবে না।

ইতি

সুফিয়া এন. হোসেন

## তথ্যসূত্র

১. দ্র. এই সংকলন, পৃ. একুশ, চল্লিশ—টীকা ২৬

২. উদ্ধৃত, সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল,* (ঢাকা : নারী উদ্যোগ কেন্দ্র ১৯৯৩), পৃ. ১৮২

৩. সুফিয়া কামাল, *একালে আমাদের কাল,* (ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৫৩-৫৪

৪. দ্র. 'প্রস্তাবনা', এই সংকলন, পৃ. ২৯, ২০৮ এবং শামসুননাহার মাহমুদের পরিচিতি, এই সংকলন, পৃ. ২০৮

৫. *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে কাজী নজরুল ইসলামের ছন্নছাড়া জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুফিয়া কামাল (তখন সুফিয়া এন. হোসেন) এই চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে। চিঠিটি সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন : 'আমি সুফিয়ার চিঠিখানা পড়ে বিমুগ্ধ ও বিশেষ লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সাহিত্যিক বা অন্য কেউ এরূপ দরদ দিয়ে নজরুলের দুঃসময়ে তাঁর জন্য কিছু বলেন নি। . . . সুফিয়া লিখেছেন, তাঁকে ধরে এনে স্নেহ দিয়ে বাঁধতে হবে। আমি স্থির করলাম, সে চেষ্টাই কববো।' (*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ,* ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫, পৃ. ৬৮১-৮২)

## আগের পাতার চিত্রসূচী

ওপরে : মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
মধ্যিখানে : নূরজাহান বেগম ও বাবা নাসিরুদ্দীন
নিচে বাঁদিক থেকে : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বেগম সুফিয়া কামাল, হামিদা খানম

# নারী জাগরণের দিশারী মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৩)। বাংলার মুসলমান নারী জাগরণের অন্যতম দিশারী। তাঁর *সওগাত* পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮) বহু বাঙালি মুসলিম লেখিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, অনেক লেখিকা ধারাবাহিকভাবে তাঁদের লেখনী চালাতে সক্ষম হন নাসিরুদ্দীনের উৎসাহে, উদ্দীপনায়। পুরনো, শক্ত গাছের মতন এই মানুষটিকে আমরাও আমাদের সময়ে পেয়েছি, এ নেহাত কম পাওয়া নয়। তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি নারীবাদী পত্রিকা, *রূপান্তর*-এর তরফ থেকে শাহীন আখতার তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। *রূপান্তর*-এর অনুমোদন নিয়ে আমরা এই সাক্ষাৎকারটি সামান্য পরিমার্জন করে এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম।
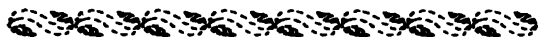
কথা হচ্ছিল *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে।

'ছোটবেলা থেকে পত্রপত্রিকা, ছবির বই পড়তে ভালবাসতাম। দেখতাম এ সবকিছুই প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের, সম্পাদকও তারা। বাংলা ভাষায় মুসলমানদের কোনও পত্রিকা নেই। এই যে নেই—অথচ বঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, মাতৃভাষা তাদের বাংলা, কিন্তু পড়ে আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা—এর ফলে যত রকমের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অধঃপতনের চিন্তা দেখা যেত সেই সময়ে। আমার মনে এই ভাবনা জাগ্রত হলো স্কুলে পড়ার সময়েই—ছোটবেলা থেকেই।'

মোহম্মদ নাসিরুদ্দীনের এই ছোটবেলাটি বিশ শতকের গোড়ার দিককার কোনও এক সময়ের। তখন বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা কি—এ নিয়ে এক বির্তক শুরু হয়। বির্তককারীদের এক দলের মত ছিল—বাংলা হিন্দুদের ভাষা, এবং বাংলা সংস্কৃতি হিন্দুদেরই সংস্কৃতি। অন্য একটি দল হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যতা মেনে নিয়ে স্বীকার করতেন—তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা এবং বাংলা সংস্কৃতি চর্চা করা অতি আবশ্যক। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন দ্বিতীয় দলটিরই একজন। ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অন্য একটি অবহেলিত দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাতির প্রতি।

'যে তিনটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে *সওগাত* বের করি, তার মধ্যে বাঙালি মুসলিম নারী-জাগরণ ছিল একটি। আমি দেখলাম একটি সমাজের অর্ধেক নারী। তারা যদি পঙ্গু হয়ে

থাকে তাহলে সমাজ এক পায়ে হাঁটবে কীভাবে? এই চিন্তাটা শুরু থেকেই ছিল।'

বাঙালি মুসলিম নারী-জাগরণ আন্দোলনের এক বিশিষ্ট কর্মী এই মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন। ত্রিকালদর্শী মানুষটি ১০৩ বছর বয়সে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারেন, কথা বলতে ভালবাসেন—ভালবাসেন স্মৃতিচারণ করতে। জানালেন কথা বলায় ডাক্তারের বারণ নেই। যে সব কথা বলতে ভাল লাগে—সে সবই বলতে বলেছে ডাক্তার।

আমি সেই সুযোগটুকুই নিয়েছিলাম। পরপর দুদিন, ('৯১-এর মার্চের ৮ও ৯ তারিখ), দু ঘণ্টা তাঁর স্মৃতিচারণ শুনেছি, মাঝে মাঝে টুকটাক প্রশ্ন করেছি। যে সব প্রশ্ন শুনে তিনি বিরক্ত হন, বিব্রত বোধ করেন সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছি। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন একজন আশাতীত রকমের বিবেচক মানুষ। শুরুতেই জেনে নিয়েছিলেন আমার উদ্দেশ্য, কেন আমি সাক্ষাৎকারটি নিচ্ছি। তারপর দুই ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের এই স্মৃতিচারণে কোনও না কোনওভাবে আমার উদ্দিষ্ট বিষয়টিকে জায়গা করে দিয়েছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে, সম্পাদনার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তা' উপস্থাপনের। আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই সুবিবেচক, প্রাজ্ঞ মানুষটির প্রতি।

*সওগাত* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। এর প্রায় ১৫ বছর আগে রোকেয়া সাখাওয়াতের নারী-বিষয়ক র‍্যাডিক্যাল লেখাগুলি ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে, প্লাবিত করে গেছে বহু বছরের বিশুষ্ক জনপদ। এর পলিতে ততদিনে স্বাভাবিকভাবেই নতুন প্রজন্মের বীজ অংকুরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বরং দীর্ঘ ১২ বছর (১৯০৫-১৯১৭) রোকেয়ার লেখনিও স্তব্ধ ছিল। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন বললেন—'*সওগাত*-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার জন্য রোকেয়ার কাছ থেকে দুটো লেখা পেয়েছিলাম। একটি কবিতা। নাম 'সওগাত'। অন্যটির নাম 'সিসেম ফাঁক'। এটি সমাজচিত্র। তখন অন্য কোনও মুসলমান মহিলার কাছ থেকে কোন লেখা পাইনি।'

রোকেয়া প্রসঙ্গে সেদিন তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। '*সওগাত* বের করার সময় রোকেয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে জানিয়েছিলাম—এ পত্রিকায় মেয়েদের লেখার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবং আপনার স্কুল যেমন মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা, *সওগাত*ও হবে সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য তদ্রুপ। *সওগাত* বের হবে জেনে উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। প্রায় সময়ই টেলিফোন করতেন, লোক পাঠাতেন, কবে পত্রিকা বের হচ্ছে জানতে চাইতেন। রোকেয়া কবি ছিলেন না। কিন্তু *সওগাত* বের হচ্ছে শুনে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে একটি কবিতাই লিখে ফেললেন। সঙ্গে একটি চিঠি—"আমি কবি নই। উৎসাহ দমন করতে না পেরে এটি লিখে ফেলেছি। কবিতা হিসেবে হয়তো কিছুই হয়নি, তবে অভিনন্দন রূপে গ্রহণ করলে খুশী হবো।"

*সওগাত*-এ মুসলিম নারীর শুভাগমন ঘোষণা করে 'সওগাত' নামের এই কবিতাটি প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।' দ্বিতীয় সংখ্যা *সওগাত*-এর জন্য দুজন মহিলার কাঁচা হাতের রচনা তিনি পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি

কবিতা ছাপা হয়। ছোট ছোট কবিতা লিখে সেকালে মেয়েরা সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন।

তখন মোহম্মদ নাসিরুদ্দীন *সওগাত*-এ মেয়ে সাহিত্যিকদের ছবিও ছাপাতেন এবং সচিত্র 'মহিলা জগৎ' বিভাগ খুলেছিলেন তিনি। এতে মৌলবাদীরা ক্ষেপে ওঠে। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন—'মোল্লারা যত বেশি গালাগালি করে আমি তত বেশি মেয়েদের লেখা ও ছবি ছাপাই।' এমতাবস্থায় এক সময় সচিত্র *মহিলা সওগাত* বের করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রথমতঃ বিলেতি পত্রপত্রিকা দেখে। তাঁর ভাষায়—'মেয়েরা কেউ আকাশে উড়ছে, কেউ বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু করছে—এগুলো আমার মনে স্ট্রাইক করে। তাছাড়া তখনকার হিন্দু নারীদের বাইরে বেরিয়ে আসা, সভা-সমিতিতে যোগদান—মোল্লাদের বিরুদ্ধে রাগ আমার আরও বেড়ে যায়।'

কিন্তু এত দুরুহ কাজ। লেখিকার অভাব, রক্ষণশীলদের চাপ! আমার প্রশ্ন ছিল কী উপায়ে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন তখন?

'ঐ একটা সাধনা। কোন কাজে কেউ যদি লেগে থাকে—যা হোক করব, কিছুতেই পশ্চাৎপদ হব না—এভাবে মনকে যদি ঠিক করে নেওয়া যায়, তাহলে কিছুতেই কিছু আটকায় না। আর ভালও লাগত—এত বড় লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী *সওগাত*-এ লিখেছেন, আমার বাড়িতেও আসতেন। রবীন্দ্রনাথের বড় বোন স্বর্ণকুমারী দেবী লেখা পাঠাতেন। তারপর সরলা দেবী চৌধুরাণী। এমনকি সরোজিনী নাইডু ইংরেজি কবিতা লিখে পাঠালেন *মহিলা সওগাত*-এর জন্য! ফটো সহকারে তাঁদের লেখা ছাপিয়ে মুসলমান মেয়েদের সামনে তুলে ধরলাম। তখন *Illustrated Weekly of India* নামে একটি কাগজ বের হতো। বিলেতি কাগজ একটি ছিল—এগুলো থেকে তথ্য ও ফটো সংগ্রহ করে ছাপতাম।

'মহিলা সংখ্যা বের করার আগে লেখা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। দু-একজন করে মহিলা তাঁদের লেখা পাঠাতে লাগলেন। *সওগাত* ও *সাপ্তাহিক সওগাত*-এর মাধ্যমে বাড়িয়ে দিলাম নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতি আন্দোলনের প্রচারণা। কয়েকজনকে আবার মুখে মুখে বলে দিলাম মেয়ে লেখকদের সন্ধান দিতে।

'অনেক চেষ্টা করে রোকেয়াকে পাওয়া গেল। কারণ তখন তিনি স্কুলে ও অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আরও কয়েকজন মেয়ে পেয়েছিলাম তখন। এই নিয়ে আরম্ভ করলাম। তারপর একজনকে যোগাড় করলাম, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, বরিশালের। মেয়েটি খুব ভাল লিখত। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, মিসেস এম. রহমান—এ রকম আট-দশ জন।

'১৯২৯ সালে *মহিলা সওগাত* যখন বের করি তখন অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছিল—এ লোকটার সাহস কত। একে তো হুলস্থুল, তার মধ্যে মহিলা সংখ্যা *সওগাত*, তাও আবার সচিত্র! প্রেস থেকে মহিলা সংখ্যা বের হওয়ার পর দেখি হকারদের ঘিরে মোল্লাদেরই ভিড় বেশি। অফিসের সামনে এ বলে আমাকে দাও, এ বলে আমাকে দাও।'

শুধুমাত্র মেয়েদের লেখা ও ফটো ছাপানোই *সওগাত* সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল না। মূলত তিনি মুসলিম নারীর অবরোধ এবং অবগুণ্ঠনে লুণ্ঠিত অবস্থায় আঘাত করেছিলেন। রোকেয়াও তখন পর্দার আড়ালে। তাঁর ভাষ্য—'পর্দা ছাড়লে স্কুলে চালানো সম্ভব হবে না। কেউ মেয়ে পাঠাবে না স্কুলে।' ১৯০৪ সালে লেখা 'বোরকা' প্রবন্ধে পর্দা সম্পর্কে রোকেয়ার পিছুটান খুবই স্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীতে (প্রায় ২০ বছর পর) লেখা *অবরোধবাসিনীতে* তিনি সুকঠোর পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তখন 'বোরকা' রোকেয়ার লেখা বলেই মনে হয় না। আয়রনি হলেও তিনি আমৃত্যু পর্দার আড়ালে জীবনপাত করে গেছেন।

সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন কবি সুফিয়া কামাল এবং মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার কথা বলেন। বিস্তারিতভাবে শোনান দু'দুটি বিজয়ের কাহিনী। এখন তিনি চোখে দেখতে পান না কিন্তু তার কণ্ঠ নিসৃত প্রগাঢ় উচ্চারণে ঝরে পড়ছিল একজন বিজয়ীর জবানবন্দি। খুব সাদামাটা কথার মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সেদিন যা বলেছিলেন—

'সুফিয়ার [কবি সুফিয়া কামাল] কবিতার খাতাটি তাঁর এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমার হস্তগত হয়েছিল। তিনি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন ; ঐ বাড়িতে বাংলা কবিতা লেখা ছিল নিষিদ্ধ। সময়টা ১৯২৭ সাল। *সওগাত* পত্রিকা অফিস তখন ইসলামিয়া কলেজের উত্তর দিকে ওয়েলেসলি স্ট্রীটে। সেই আত্মীয় ছেলেটি সুফিয়ার খাতাটি নিয়ে হাজির হলো অফিসে। খাতা খুলে দেখি হাতের লেখা আঁকা বাঁক', স্কুলে তো পড়েননি, বানান ভুল, একটা কবিতারও নাম নেই।

'এর আগের বছর *সওগাত*-এ সুফিয়ার একটি কবিতা ছাপিয়েছিলাম। সেই কবিতাটির নাম ছিল না। কোথাও দাঁড়ি কমা নেই। কবিতাটি তিনি একটানা লিখে গেছেন। তিন-চার বার পড়ে, লাইন ঠিক করে, যথাস্থানে কমা দাঁড়ি ইত্যাদি বসিয়ে কবিতাটি আবার পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। এমন সহজ সরল ভাষায় ভাব ব্যক্ত করেছেন—উচ্চ শিক্ষিতা না হলেও তিনি যে স্বভাব কবি তা বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না। এই কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম 'বাসন্তী'। এখনও এর একটি অংশ মনে আছে—

আমার এ বনের পথে
কানেন ফুল ফোটাতে
ভুলে কেউ করতো না গো
কোনদিন আসা—যাওয়া
সেদিন ফাল্গুন প্রাতে
তরুণের উদয় সাথে
সহসা দিল দেখা
উদাসী দক্ষিণ হাওয়া

'তারপর একদিন *সওগাত* অফিসে সেই ছেলেটির সঙ্গে ভেলভেটের বোরখা পড়ে এলেন এক তরুণী। তরুণীটি বোরখার নেকাব তুলে বললেন—"আমি সুফিয়া। আমার কবিতা ছাপিয়ে বাড়িতে তো খুব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন।"

'বললাম—"তোমার স্বামী কী বলে ?"

'"তার কথায়ই তো আসলাম। সে বলে আরও লেখো। উনি যা বলেন সেই মত চলো। এসব বিষয়ে আমার কোন মতামত নেই।"

'আমি বললাম—"এসে খুব ভাল করেছ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। যারা কবি, তাদের মন তাদের হাবভাব আলাদা, তারা কখনও বোরখা পড়ে না। তুমি কবিতা লিখছো। কবি হবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবে। কত কী তোমার করণীয়। বোরখা তোমায় মানায় না। বোরখাটা খুলে ছেলেটির হাতে দিয়ে সুফিয়া বললেন—কী করবো বাড়ির রীতি—নীতি। আমি কিন্তু বোরখা পছন্দ করি না।"

'তারপর মাঝে মাঝে তিনি *সওগাত* অফিসে আসতেন। দোতলায় সিঁড়ির উপর উঠেই বোরখাটা খুলে ফেলতেন। কালক্রমে সুফিয়া বোরখা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য স্বামীর অনুমতি পেয়ে।'

সুফিয়াই হলেন প্রথম কবি, যিদি অবরোধ ভেঙ্গে *সওগাত* অফিসে এসেছিলেন।

'তারপর কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা—একদিন ধূমকেতুর মতো আর্বিভূত হলেন *সওগাত* অফিসে। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। সেই অন্ধকার কুসংস্কারের যুগে (১৯৩০) এই তরুণীটি আধুনিক পোশাকে সজ্জিতা, চুলগুলো "বব" কটা। এসে এদিকে যান, ওদিকে যান, আমি বললাম, "বসো।" বলেন—"একটু ছাদের উপর যাই, দেখে আসি কলকাতা শহরটা।" তিনি থাকতেন কলকাতার বাইরে। *সওগাত*-এ নারী জাগরণের আন্দোলন দেখে তাঁর মন উৎসাহ, উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। তাই কলকাতা পৌঁছেই দৌড়ে এসেছিলেন *সওগাত* অফিসে। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই কাগজে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা লিখে গেছেন।'

ওঁরা ছিলেন নিয়ম ভাঙার দলে। আর *সওগাত* যুগিয়েছিল তাঁদের সাহসের খোরাক।

আমার প্রশ্ন—'আজ কি আপনার কোন উত্তরসুরিকে দেখতে পান, চারপাশে কোথাও ?'

'তখন আমরা নারী সমাজের জন্য কাজ করেছি একটা আন্তরিকতা নিয়ে। এখন এটা ব্যবসা হয়ে গেছে। নারীদের প্রতি আন্তরিক সম্পাদক এখন আর আমি দেখিনা।'

'তাহলে সবটাই পণ্ডশ্রম—কখনও কি মনে হয় আপনার ? কিংবা আক্ষরিক অর্থে নারী জাগরণ কি ঘটেছিল আমাদের দেশে ?' আমার সর্বশেষ প্রশ্নে তিনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সে সব আশংকার কথা কমবেশি আমাদের সকলের জানা। কিন্তু বুঝতে চাই না কিছুতেই। মোহম্মদ নাসিরুদ্দীনের সাক্ষাৎকারের শেষ অংশটি টেপ

রেকর্ডার থেকে আমি হুবহু তুলে ধরেছি—

'নারী জাগরণ ঠিকই এসেছে। সমাজপতিদের মধ্যে প্রগতিশীল মানসিকতার অভাবে কষ্ট হচ্ছে মেয়েদের। তারা মুখে বলে অনেক কথা। কিন্তু চায় না, মেয়েদের পুরুষের জায়গাগুলো অধিকার করুক। বিশেষভাবে যেখানে রক্ষণশীল দলের শাসকেরা পীর-ফকির করে, সেখানে মেয়েরা যতটুকু অর্জন করেছে তা রক্ষা করা কঠিন হবে। যদি না প্রগতিশীল কেউ দেশ চালায়। এখন যদি মোল্লা গভর্নমেন্ট হয় তাহলে খোমেনির শাসন কায়েম হবে। মেয়েদের ঘরের মধ্যে ঢোকাবে। সে ভয় আছে। ভয় থাকলেও বাংলার মাটি এবং বাংলার যে পরিস্থিতি তা আরবের সঙ্গে খাপ খাবে না। মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে যাবে।'

*রূপান্তর*, ১৯৯১

# সুফিয়া কামাল
# রোকেয়া যুগের শেষ প্রতিনিধি

সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালে। সাতাশি বছরের কবি আজ ভগ্নস্বাস্থ্য। তবু চেতনায় সজাগ। তিনি তিরিশের দশকের 'সওগাত যুগ'কে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ করেন নি, তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সময় থেকে সাহিত্যচর্চা এবং সমাজসেবার পথে তাঁর চলার শুরু, আজও তিনি চলেছেন, আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। এই প্রজন্মেব 'খালাম্মা' সুফিয়া কামালের সঙ্গে প্রথম যেদিন আমরা কথা বলতে যাই, সেদিন তাঁর গাছপালায় ঘেরা একতলার বারান্দায় বসে চা-নাস্তা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার উত্থাপন হয় কেবল। সেদিন তিনি তেমন সুস্থ ছিলেন না। তারপর ৬ এবং ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ওঁর কাছে ফিরে যান শাহীন আখতার। সেই দু'দিন ধরে সুফিয়া কামাল ওঁর লেখিকা হয়ে ওঠার কথা বলতে গিয়ে আরও সব নানা গল্প শোনান। এখানে ওঁর মুখের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

আমি যে পরিবারে জন্মেছিলাম সেই পরিবার শিক্ষিত ছিল ঠিকই, এবং সেই শিক্ষা ছিল আরবি, ফারসি ইত্যাদি, আমার মামারা বিদ্বান ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত থেকে শুরু করে অহমিয়া পর্যন্ত জানতেন। কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিত হবে—এ ব্যাপারে তাঁদের কোনও আগ্রহ ছিল না এবং তাঁরা বোধ করি এটা পছন্দও করতেন না। আমাদের পরিবারে আমি বাংলা শিখি আমার মায়ের কাছে। মা শিখেছিলেন আমার বাবার কাছে। প্রথমেই মনে পড়ে, আমাদের ওখানে সে সময় পেয়াদারা পুঁথি পড়তো, যাত্রা গান হতো, মিলাদ মহফিল হতো। সবই শুনতাম। বাংলা সাহিত্য যখন পড়ি তখন আমি খুবই ছোট, বানান করে করে পড়তাম।

আমার ছোটবেলা কেটেছে আমার মামাবাড়ি বরিশালের শায়েস্তাবাদের নবাববাড়িতে। সে বাড়ির পাঠাগার অত্যন্ত বড় ছিল। সবাই বলতো—পাটনার খোদাবক্সের পাঠাগারের পর শায়েস্তাবাদের পাঠাগারই (ব্যক্তিগত পাঠাগারের মধ্যে) বড় ছিল। দেশ বিদেশ থেকে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান মানুষ ওখানে যেতেন। তো সেই জায়গায় মেয়েদের লেখা-পড়ার কোনও চর্চা ছিল না। বিশেষ করে বাংলায়। ওখানে *প্রবাসী* পত্রিকায় আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ি। তখন কবিতা ছন্দ

কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু পড়ে আমার এতো ভাল লাগল! আমি যেন সাহিত্য-ছন্দের প্রথম আস্বাদ পেলাম। তখন *মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা* বলে একটা পত্রিকা বেরোত, বোধ করি ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তার সম্পাদক ছিলেন। তাতে কাজী নজরুলের হেনা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরোত। তখন আমি বানান করে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা (নাম মনে নেই) আর হেনা উপন্যাস—এ দুটি লেখা আমার খুব ভাল লাগল। তখন আমার বয়স নয়—দশ হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন আমায় বাংলা পড়তে হতো। কেউ যেন না জানে আমি বাংলা পড়ছি। তখন রোকেয়া লিখছেন, সারা তয়ফুর লিখছেন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু লিখছেন। আমি ভাবলাম—তাঁরা যখন লিখতে পারছেন, আমিও পারব। আমি লিখতে শুরু করলাম। তখন যে কী লিখেছি, তাতো মনে নেই। লেখার একটা আগ্রহ আমার মধ্যে জাগল।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তাম, নজরুলের লেখা পড়তাম। তারপর সীতাদেবী, শান্তাদেবী, বধূরানী (জ্যোর্তিমালা দেবী)। তখন তো অনেক হিন্দু মহিলা লিখতেন। আমার সবচেয়ে ভাল লাগল বেগম রোকেয়ার লেখা, নজরুলের লেখা, রবীন্দ্রনাথের লেখা।

তারপর ১২ বছর বয়সে তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। এর মধ্যে আমি অনেক কিছু লিখেছি। বরিশাল শহরে আমাদের বাড়ি ছিল। আমরা বরিশালে চলে এলাম। তখন বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সরল কুমার দত্ত *তরুণ* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। *তরুণ*-এ আমার লেখা প্রথম ছাপা হলো। সেটা ছিল 'সৈনিক বধূ' বলে একটা গল্প। কিন্তু পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হওয়ার পর আমাব পরিবারের লোকজন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গেলেন। আমি বাংলা শিখেছি, আমার বাংলা লেখা বেরিয়েছে, বাংলা অক্ষরে নাম ছাপা হয়েছে। এতে সবাই আমার ওপর রুষ্ট হলেন। বহু বাধা, বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তখন।

কিন্তু বরিশালে তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেব এরা সব ছিলেন। তারা আমার মামাকে বললেন—শুনছি আপনার পরিবারের একজন মেয়ে নাটক লেখে, এটা তো আপনাদের জন্য খুব গৌরবের কথা। কেন আপনারা বাধা দিচ্ছেন!

*তরুণ* পত্রিকায় আমি অনেক কবিতা লিখেছি। প্রথম লিখেছিলাম গল্প। সেই গল্পটা যে কোথায় হারিয়ে গেছে! বরিশালে থাকতেই ঢাকার *অভিযান* নামের একটি পত্রিকায় আমার একটি লেখা বেরিয়েছিল। সেটা পড়ে কাজী নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে একটি লম্বা চিঠি লিখলেন 'আমার বিশ্বাস হয় না যে একজন মুসলমান মেয়ে এমনি করে লিখতে পারে। আমি শুনলাম তুমি কলকাতায় আসবে। আমি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

তখনও *সওগাত* পত্রিকায় আমার কোনও লেখা বেরোয়নি। কলকাতায় এসে নাসিরুদ্দীন সাহেবকে (*সওগাত* সম্পাদক) লেখা পাঠালাম একটি চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লিখেছিলাম যে নজরুল ইসলাম লেখা পাঠাতে বলেছিলেন, এই লেখাটা পাঠালাম। এই প্রথম আমার কবিতা ছাপা হয়। এই নাসিরুদ্দীন সাহেবই বরাবর *সওগাত*-এ

লেখা ছাপিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। নজরুলের উৎসাহ আমি যেটুকুন পেয়েছি, তার জোরেই সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথও আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। স্নেহ করেছেন।

আমরা তো কলকাতায় গেলাম। তখনও আমাদের পর্দা পশিদার ভেতর থাকতে হতো। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় আমার স্বামী [প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন] কলেজে গেছেন, আমার ভাইও বাড়িতে নেই, নজরুল 'সুফিয়া সুফিয়া' বলে হাঁক দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। আমি, আমার মা তখন বাড়িতে। তিনি ঠিক বন্যার মতো, তিনি কি আর বাধা মানেন ! তোমরা তো সেই নজরুলকে দেখোনি। দেখতে যদি বুঝতে—তিনি কী রকম মানুষ ছিলেন। হুড়মুড় করে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন—'তুমি সেই সুফিয়া, এতোটুকু মানুষ ! আমি তো ভেবেছিলাম, মিসেস এস. এন. হোসেন মস্ত বড় লেখিকা হবেন। আরে আরে আমার কোনও ছোট বোন নেই, তুমি আমার ছোট বোন।' এক সঙ্গে এত কথা বললেন তিনি ! 'তুমি আমায় দাদু ডাকবে। তুমি করে বলবে। কই আম্মা কই ?' আমার আম্মা আগেকার দিনের মানুষ তো, সামনে আসতে চান না। নজরুল শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে, পায়ে হাত দিয়ে আম্মাকে সালাম করলেন। আজকালকার দিনে সে সব মানুষ তো আর দেখা যায় না। প্রাণখোলা হাসি। এই বলে 'চা আনো, পান আনো।' নাসিরুদ্দীন সাহেব না থাকলে নজরুলের তখন বাঁচার উপায় ছিল না। নজরুল তখন থাকতেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের জীবন নিয়ে নজরুলের তখন মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি বেরিয়েছিল। তিনি তখন কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতেন। খান মোহম্মদ মইনুদ্দীন ছিলেন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি নাসিরুদ্দীন সাহেবকে বললেন নজরুলের দুরবস্থার [আর্থিক !] কথা। নাসিরুদ্দীন সাহেব নজরুলকে *সওগাত*-এ আশ্রয় দিলেন। তাঁকে মাসিক ভাতা দিতেন। *সওগাত*-এ বসে নজরুল তাঁর জীবনের অনেক লেখা লিখেছেন।

তখন এতো বড় ঢাকা ছিল না। ওয়ারী পর্যন্ত ছিল। নজরুল ঢাকায় এসে কিছুদিন ছিলেন। তখন এক হিন্দু বাড়িতে যেতেন গান শেখাতে। এখন তো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নানান চল হয়েছে। তখন হিন্দু ছেলেরা ভাবল—মুসলমান হয়ে হিন্দুর ঘরে আসে ! সেই গান শেখানো নিয়ে, ঐ বাড়িতে যাওয়ার পথে ওরা তাকে তাড়া করেছিল। তাদের আক্রমণ আবার তিনি একাই সামলেছেন তাদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে। যখন ঢাকায় এই মারামারির খবর শুনলাম, তখন আমি নাসিরুদ্দীন সাহেবকে ঐ চিঠিটা লিখেছিলাম।

রোকেয়ার স্কুলে পড়িনি কখনও। কিন্তু তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম নামে একটি সমিতি করলেন। কলকাতা আসার পর ওখানে কাজ করতাম। তারপর তো বেগম রোকেয়া মারা গেলেন। তিনি আমাদের আত্মীয়ের মতই ছিলেন। ছোটবেলায় দেখা হয়েছে। তখন তো আমরা বরিশালের বাড়িতে থাকতাম। সেজন্য আমি ওনার স্কুলে পড়তে পারিনি। তারপর যখন কলকাতায় আমার রোকেয়ার সঙ্গে

দেখা হলো, ততদিনে আমার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে।

আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে কাজ করতে গিয়ে আমার শামসুননাহার মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়। তখন অনেক হিন্দু মুসলমান মেয়ে ওখানে কাজ করত। আমরা [মুসলমান মেয়েরা] বোরখা পরে বস্তিতে যেতাম। বেগম রোকেয়া বলতেন, কয়েকজন মহিলা মিলে মিটিং করলে তো হবে না, মহিলাদের কাজের জায়গা বস্তিতে। আমি কলকাতার বস্তিতেও কাজ করেছি। উনিই আমাদের এ পথে নামিয়েছিলেন। সেই প্রথম আমার বস্তির দুর্দশা দেখা। কোন অবস্থায় যে তারা থাকে ! অনেক সময় পুরুষেরা আমাদের বস্তিতে ঢুকতে দেয়নি। বের করে দিতে চেয়েছে। কলকাতার বস্তির অনেকেই উর্দুভাষী। বলতো—ওরা হিন্দু ওরা বাঙালি। ঘেন্না করত আমাদের। বস্তির মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাতাম। হাতের কাজ, সেলাই, কুটীর শিল্পের কাজ শেখাতাম। অনেকদিন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের সঙ্গে ছিলাম। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তো ঢাকায় চলে এলাম।

স্বামী মারা যাওয়ার পর [সৈয়দ নেহাল হোসেন ১৯৩২-এ মারা যান] কলকাতার করপোরেশন স্কুলে পড়িয়ে, বাচ্চা নিয়ে লেখালেখি করেছি। নাসিরুদ্দীন সাহেব আমার বড় ভাইয়ের মতো। প্রতি রবিবার রবিবার তাঁর বাসায় যেতাম। *সওগাত*-এ লিখেছি। স্কুলের কাজ করতাম। *মোহাম্মদী*-তে ও লিখতাম। কয়েকটা কাগজে লেখালিখি করে পয়সা পেতাম। সে সময় অনেক কষ্ট করেছি। তো কষ্ট করতেই হয়, তোমরাও করছো। তবে সেকালে যেমন সম্মান ছিল, একালে নেই। আমরা সেকালের যে সম্মানটা পেয়েছি একালে তোমরা সেই সম্মানটা পাচ্ছো না। তখনও অবশ্য ছিল, কিছু কিছু ছেলেরা মেয়েদের ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। তখনকার অনেক ছেলে মেয়েদের নামে লিখে মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। আমার স্বামী কত ছদ্মনামে লিখেছেন, মেয়েদের হয়ে ! যাতে করে মেয়েরা লেখার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। আমাদের সময় অনেক বলতেন—লেখা-পড়া শিখে মেয়েরা কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে ? আমরা বলতাম, বেগম রোকেয়া বলতেন—নিশ্চয়ই হবে। হয়েছে তো। মেয়েরা জজ-ব্যারিস্টার হয়েছে, ডাক্তার হয়েছে। রাজ্যশাসনও করছে।

কলকাতায় থাকার সময় আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে আলাপ ছিল। মহাশ্বেতা দেবী তো আমাদের পরের। রাধারাণী দেবীর সঙ্গে আলাপ ছিল। তিনিই প্রথম মহিলা, লেখিকাদের মধ্যে যিনি তখন কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আমরা তাঁকে রাধাদি বলতাম। সভা-সমিতিতে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। *সওগাত*-এ অনেক হিন্দু মহিলা লিখতেন। হিন্দু মহিলাদের লেখালেখি করার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে বাধা হয়তো ছিল। কিন্তু আমি আমার পরিবারের কথা বলব। অত্যন্ত বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে আমাকে লিখতে হয়েছে। আমার পরিবারের কেউ চাইত না, আমি লিখি ! শেষ পর্যন্ত তো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কেবল মা আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি, আমার মা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম পরিবার থেকে [১৯৩৩ সাল]। কারণ বাংলা লেখালেখি, বাংলায় কথা বলা, বাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশা, সমাজসেবার জন্য

পর্দা ছাড়া বোরখা ছাড়া বাইরে বের হওয়া—আমাদের পরিবারের জন্য বেইজ্জতির ব্যাপার ছিল। আমাদের পরিবার একেবারে লজ্জায় ঘেন্নায় আমাদের দিকে ফিরে চাইতো না। অনেক কিছু তখন হয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে ধরতে গেলে প্রথম নবাব ফয়জুন্নেসা। শুনেছি, আমাদের আগের যুগে আরও মহিলা লিখেছেন। তখনকার যুগে আমরা লজ্জায় তো লিখতাম না। বাঙালি মুসলমান মেয়েদের বাংলা ভাষায় লেখা লজ্জার ব্যাপার ছিল। লিখলেও প্রকাশ করতাম না। কাজেই কতজন কত রকম লিখে লিখে গোপনে গোপনে রেখেছে—জানি না। কোনও মেয়ে আমাদের সময়ে লিখলে আলোচনা হতো—মেয়ে কেন বাংলায় লিখবে।

সমাজের জন্য, দেশের জন্য, সারা জাতির উন্নতির জন্য যিনি প্রথম লিখেছেন তিনি বেগম রোকেয়া। তারপর ছিলেন মিসেস এম. রহমান বলে একজন। ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে উনি লিখতেন। তারপর কবি হিসেবে ছিলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মোতাহেরা বানু। আর লেখিকা হিসেবে সারা তয়ফুর হযরতের জীবনী নিয়ে লিখেছিলেন। আর শামসুননাহার মাহমুদ রাজনীতি নিয়ে আর শিশুমঙ্গলের জন্য অনেক কিছু লিখেছেন বেচারী। এম. ফাতেমা খানম অল্পই লিখেছেন। কিন্তু ভাল লেখিকা ছিলেন। তারপর তো অসুস্থই হয়ে গেলেন। যতদূর মনে পড়ে আমাদের সময়ে এ কয়জন মুসলমান লেখিকার সঙ্গেই আমার জানাশোনা ছিল। বেশি জানাশোনা ছিল—মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুননাহার মাহমুদ আর বেগম রোকেয়ার সঙ্গে। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। দুজনে মিলে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক মিটিং-এ গেছি। তিনি পাবনায় থাকতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন।

মেয়েরা যে লিখবে সেই সুযোগই পেত না। লেখার জন্য একটা ক্ষেত্র তো প্রস্তুত করতে হয়। তখনকার মেয়েরা কবিতা প্রবন্ধ যা-ই লিখুক, সমাজ-সংস্কারের জন্যই লিখেছে। এই ধারাটা বেগম রোকেয়ার আমল থেকে শুরু হয়েছে।

আমি তো বলি যে আমরা কেবল কুলিগিরি করেছি, আমরা খালি রাস্তা সাফ করতে চেয়েছি। সেই রাস্তায় এখনকার মেয়েরা হেঁটে বেড়াতে পারছে। তাদের ধরণ ধারণ বদলে গেছে! এই পরিবর্তন যুগে, যুগের সঙ্গে তাল রেখে তারা লিখছে। কবিতা কাব্যে দেখ, এখন সেই আগের সুর নেই, নতুন সুর হয়েছে। আমাদের সময় ছিল বিশ্বাসের সুর, কাজ করতে হবে—এগিয়ে যেতে হবে। এখন হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ। তোমাদের এখন প্রতিযোগিতা করে দাঁড়াতে হয়। তুমি একজন মেয়ে, তুমি তোমার জীবন দিয়েই দেখ—কোনও পুরুষমানুষ চাইবে না তুমি ওপরে ওঠো। কারণ তার জায়গাটা তোমাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কাজেই তোমাকে ওখানে জোর করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগোতে হবে। সেজন্যই আমি বলি এখনকার মেয়েদের আরও সাহসী হতে হবে, আরও সংগ্রামী হতে হবে। আমরাও সাহসী ছিলাম। আমাদের অসীম সাহস ছিল। আমাদের ওপর অনেক রকম ধর্মীয় বাধা, সাংসারিক বাধা,

সামাজিক বাধা, তারপর সংস্কারের বাধা ছিল। তারপর বিরাট সংসারের দায়িত্ব। তখনকার দিনে বিরাট সংসার ছিল, যৌথ পরিবার ছিল। বউ হিসেবে, মেয়ে হিসেবে সবার আদেশ মেনে চলতে হতো। সবাইকে সন্তুষ্ট করে সবার কাজকর্ম করে তবে আমাদের লিখতে হয়েছে।

সেদিক থেকে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছেন। আমরা যেমন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বাধা পেয়েছি, তিনি তা পাননি। বাবা ওনাকে খুব সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন। স্বামীর সংসার করেননি, বাবা তাঁকে আশ্রয় সাশ্রয় দুই-ই দিয়েছিলেন।

তবুও তোমাদের সমস্যা আমাদের চেয়ে বেশি, কারণ আমাদের সময় একটা বিশ্বাস ছিল, সম্মান ছিল। এখন বিশ্বাসও নেই সম্মানও নেই। এখন সংশয়ের যুগ, কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না! তখন পুরুষ মানুষই আমাদের সাহস যুগিয়েছে। তা না হলে আমরা পারতাম না। ধরো, কাজী নজরুল যদি আমায় সাহস না দিতেন, নাসিরুদ্দীন সাহেব যদি সহযোগিতা তা করতেন, আমার স্বামী যদি সমর্থন না দিতেন— আমি পারতাম ? তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। কিন্তু এখন কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখন তোমাদের জায়গা দখল করতে হচ্ছে।

এখন মেয়েরা এতো লিখেও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। সমর্থন পাচ্ছে না। এখন নিজেদের চেষ্টায় দাঁড়াতে হয়। এগুলো তো বিরাট পরিবর্তন। এছাড়া তখনকার লেখায় আধুনিক কালের মেয়েদের লেখার চেয়ে গাম্ভীর্য ছিল বেশি, গভীরতা ছিল, সমাজ সচেনতা ছিল। তখন তো লেখার উদ্দেশ্য ছিল—সমাজ সংস্কার। বেগম রোকেয়ার ছিল সাধনা। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, কাজের ভিতর দিয়ে আমরা সেই আদর্শটা নিয়েছি। সেইভাবে এখনও চলেছি।

# নাসিরুদ্দীন কন্যা নূরজাহান বেগম

নূরজাহান বেগম মহিলা সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা *বেগম*-এর সম্পাদিকা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতায় তাঁর বাবা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের হাতে জন্ম এই সাপ্তাহিকটির। তারপর প্রায় চার দশক ধরে নূরজাহান *বেগম*-এর সম্পাদনার কাজ করে আসছেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তাদের সঙ্গে পত্রিকাটিও কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিট থেকে ঢাকায় পাটুয়াখালিতে স্থানান্তরিত হয়। এই ওয়েলেসলি স্ট্রিটে নূরজাহান বেগম পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়েছেন। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ছিলেন *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক। *সওগাত* অফিস ছিল বাড়িতেই। প্রতি সন্ধ্যায় সাহিত্য মজলিস বসতো সেখানে। সেই সুবাদে তখনকার খ্যাতনামা প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিকদের নূরজাহান বেগম খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন। প্রগতিশীল সাহিত্য শিবিরে তাঁর অবস্থান ছিল। পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণে তিনি অসংখ্য দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নূরজাহান বেগমের হাতেখড়ি বাবার কাছেই। আজ এই বাহাত্তর বছর বয়সেও বাবার নির্দেশিত পথ ধরেই হেঁটে চলেছেন তিনি।

মাসিক *সওগাত* অর্ধ্ব শতাব্দী জুড়ে বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যচর্চার পথ যেমন প্রশস্ত করেছিল, তেমনি অসংখ্য লেখিকার প্রথম পদচারণা এখানে। দেশ বিভাগোত্তর কালে এর পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। বাঙালি মুসলিম লেখিকা, সমাজসেবী, সাংস্কৃতিকর্মীদের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায় মেয়েদের জন্যই আলাদা করে গড়া সাপ্তাহিক *বেগম* এবং 'বেগম ক্লাব'। অনেক বিদেশী প্রতিনিধিও এখানে সম্বর্ধনা পেয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব সময় অব্দি *বেগম* এবং 'বেগম ক্লাব' এই বাংলার নারী আন্দোলনে যুগান্তরকারী ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে আরও কিছু মহিলা পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলেও পত্রিকা-কেন্দ্রিক লেখিকা-সমাবেশ, চর্চাস্থল এতো বড় কলেবরে আর কোথাও দেখা যায় নি।

এহেন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ পটুয়াটুলির *সওগাত* প্রেস থেকে এখন আর *সওগাত* বের হয় না। পাকিস্তান-বিরোধী ১৯৬৯-এর উত্তাল আন্দোলনের দিনগুলোতে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে *বেগম* সপ্তাহান্তে প্রকাশিত হয়। 'বেগম ক্লাব'-এর ধূসর, মলিন অডিটোরিয়ামটি এখানে। আগের জৌলুস, জমজমাট ভাব সেই কবে অন্তর্হিত হয়েছে। নূরজাহান বেগম *বেগম*-এর নথিপত্র নিয়ে প্রতিদিন এখানেই বসেন। সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের কম্বাইন্ড হ্যান্ড রওশন। রওশন একই সঙ্গে *সওগাত*-এর প্রেসবয়, বেয়ারা, ম্যানেজার ছিলেন। এখন এই প্রৌঢ় ফোরম্যানের দায়িত্বে রত।

আমরা নূরজাহান বেগমের স্মৃতিচারণধর্মী সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি '৯৬ এর ১৫ জুন বিকেল ৩টে নাগাদ। *বেগম*-এর কাজ একা সামলাতে গিয়ে তাঁর দুপুরের খাওয়া তখনও হয়ে ওঠেনি। সাক্ষাৎকারের মাঝখানে আমাদের অনুরোধে তিনি খেতে উঠলেন। কিন্তু খাওয়ার থেকে পরিবেশনই ছিল মূখ্য। সওগাত সাহিত্য মজলিসে ভরপেট আতিথেয়তার জন্য মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন কিংবদন্তী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য স্মৃতিগারে বিচরণরত প্রায় আধ ডজন সাদা বেড়ালকে খাইয়ে তবে নিজে খেলেন।

নূরজাহান বেগম এর সাক্ষাৎকারটি আমরটা টেপ রেকর্ডারে গ্রহণ করি। প্রতিলিপিটি কয়েকটি সাব হেডিং-এর আওতায় সাজান হলেও স্বতঃস্ফূর্ততা অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে তাঁর মুখের ভাষাটিতে আমরা হাত দিইনি।
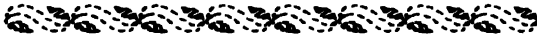
## আমার শৈশব

আমার জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ জুন চাঁদপুরের পাইকারদী গ্রামে। ছোটবেলাতে গ্রামেই ছিলাম। দু'বার জলে পড়ে অতিকষ্টে বেঁচেছি। তখন বাবা, মা ও আমাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এই প্রথম আমাদের কলকাতায় আসা। ১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রিট ছিল কলকাতায়। আমরা তখন ওখানে থাকতাম। যখন কলকাতায় এলাম তখন *সওগাত*-এর খুব জমজমাট অবস্থা। কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে অনেক কবি সাহিত্যিককে খুব কাছে থেকে দেখেছি। ছোট ছিলাম বলে সবার দারুণ স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। আমাকে সবাই 'নূরী' বলে ডাকতেন। বাবা বাইরে চলে গেলে ওঁরা যদি লেখা দিতে আসতেন, আমাকে ডেকে বলতেন, 'নূরী, তোমার বাবা এলে বলো, আমি এই লেখাগুলো দিয়ে গেলাম।' লেখকদের এই লেখাগুলো বাবা ফিরে এলে রাতে তখন তাকে দিতে যেতাম, তখন মনে হতো যেন বিরাট একটা কাজ করে ফেলেছি।

ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশ আমি পেয়েছি, আমরা মনে হয় না বাংলাদেশের কোন মেয়ে তা পেয়েছে। কারণ, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিক এবং হিন্দু সাহিত্যিকরাও বিকেলে সওগাত মজলিসে এসে বসতেন। সেই পরিবেশটা আমি পেয়েছিলাম। তখন আমি কিছু না বুঝলেও মায়ের চারপাশে ঘুরতাম। মনে হতো বাড়ির ভেতর বিরাট কিছু হচ্ছে এবং সেখানে চা-নাস্তা আমায় পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করতো তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। আর কাজী সাহেবের জন্য বিশেষ করে নিয়ে যেতাম পান এবং জর্দা। সবচেয়ে আনন্দের দিন সেদিন আমার ছিল, যেদিন দেখলাম একটি প্রাইভেট কার

গোলাপ ফুল দিয়ে সাজিয়ে কাজী সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নাগরিক সম্বর্ধনায়। কী অপরূপ দৃশ্য ! সে দৃশ্য আমি জীবনেও ভুলবো না। কাজী সাহেব সম্বর্ধনার পরই *সওগাত* অফিসে এসে ডাকলেন—'নূরী' ! আমাকে নূরী ডাকতেন তিনি। এর একটা ইতিহাস আছে। আমাকে বাবা আদর করে ডাকতেন 'নূরূ'। কাজী নজরুল ইসলামের নিজেরই ডাকনাম নুরু ছিল। তখন তিনি বললেন—'না, ওকে আমি নূরীই ডাকবো।' তারপর তিনি একটা থলে থেকে বের করে দেখালেন সোনার কলম, সোনার দোয়াত। কাজী সাহেবের সে কী আনন্দ !

## সাহিত্য মজলিসে নারী !

সেকালে সাহিত্য মজলিসে কোনও মেয়েই দেখিনি। আমি যখন কলকাতায় যাই তখন একজন মাত্র মহিলা আমি দেখতে পাই, তিনি কবি সুফিয়া কামাল। তখন ছিলেন সুফিয়া এন. হোসেন। কবি সুফিয়া কামাল তখন থেকে যে আমার খালা এখনও তা-ই আছেন। এখনও কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছে ছুটে যাই এবং পরামর্শ নিই।

এই যে আপনি প্রশ্নটা করলেন মেয়েরা সাহিত্যের মজলিসে আসত কিনা। সে যুগে কোনও মেয়ের বাইরে বেরোনো, অফিসে যাওয়া, বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাবা বললেন—'একটা কাজ করো। ভাঙতে হয় তো আমরাই বাধা ভাঙব। আমার স্ত্রী আজ থেকে আর বোরকা পরবে না। আর যারা যারা আমার সঙ্গী আছ তারাও কেউ বোরকা পরতে পারবে না। এবং যারা যারা *সওগাত* অফিসে আসবে, তাদের পরিবারের লোকজনদেরও নিয়ে আসবে। নিজেরা নিজেদের মতো আলাপ আলোচনা করবে। তারপর দেখলাম যাঁরাই আসতেন সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীদেরও নিয়ে আসতেন। অন্দরমহলে তাঁদের সঙ্গে মায়ের খুব আলাপ আলোচনা চলত। তবে রান্নাবান্না নিয়ে, সেলাই টেলাই নিয়ে, রাজনীতি নয়। বাবা শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ঘরে আবদ্ধ থাকার দরকার নেই। বের করো এদেরকে।' কী করে বের করা যায় ! 'চল স্টিমারে করে একবার বেড়িয়ে আসি।' পাঁচ-ছজন তাদের স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। চললাম আমরা সবাই। স্টিমারে বেড়িয়ে আসার পর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কারণ তখন মেয়েরা, আমার মায়েরা তাঁদের স্বামীদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। সমালোচনার কোনও পরোয়া তাঁরা করেননি।

## রোকেয়ার স্কুল

কাজী নজরুল ইসলামের সম্বর্ধনার পরই রোকেয়া বাবাকে ফোন করে বললেন—'নাসিরুদ্দীন সাহেব আমার স্কুলে আপনার মেয়েকে দেন।' বাবা বললেন, 'মেয়ে তো খুব ছোট, কী করে স্কুলে যাবে।' রোকেয়া বললেন, 'আমার দাই আছে—ওকে গাড়িতে

করে নিয়ে আসবে। কোন অসুবিধে হবে না।' বাবা মাকে জানালেন। মা বললেন,—'না, এতো ছোট মেয়ে আমি স্কুলে দেব না।' বাবা বললেন—'যাক না। স্কুলে থাকতে ভাল লাগলে থাকবে, না হয় আমরা নিয়ে আসব।'

আমার তো ওখানে খুব ভাল লাগল, ছোট ছোট বাচ্চা আরও অনেকে আছে। তখন আমি বেগম রোকেয়াকে দেখেছি এবং এখনও রোকেয়াকে চোখের ওপরে দেখছি এজন্য যে প্রতি বছর তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং তাঁর স্মৃতিটুকু বিলীন হয়ে যায়নি। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। বেঁটে, চোখে চশমা, সবসময় লম্বা আস্তিনের জামা পরতেন, সাদা শাড়ি, কালো জুতো। এবং তিনি ধীরে ধীরে হাঁটতেন। কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে। এবং প্রত্যেকটা ক্লাসে তিনি রোজ সকালবেলা এসে ছাত্রী-সংখ্যা ঠিক আছে কিনা, ছাত্রীরা সব আসছে কিনা আমার মনে হয় তা দেখতেন। তিনি আসলে আমরা সবাই দাঁড়াতাম। মিটিমিটি হেসে তিনি চলে যেতেন। তিনিও ক্লাস এইট, নাইনের ক্লাস নিতেন। তখন যে শিক্ষাব্যবস্থা তিনি করেছিলেন সেটা হলো—দুপুরবেলা আমাদের টিফিনের পরে ছোট ছোট খাটিয়া আর বালিশ দিয়েছিলেন। আমরা সব লাইন ধরে টিফিন খেয়ে শুয়ে পড়তাম। কোনও কোনও বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ত। আর আমরা যারা দুষ্টু ছিলাম শুয়ে শুয়ে কথা বলতাম, গল্প করতাম। ঘণ্টা বাজলে আমরা ক্লাসে চলে যেতাম। কিন্তু যারা ঘুমিয়ে পড়ত, তাদের আর তোলা হতো না, স্কুল ছুটির সময় বাসার দাই বা অভিভাবক এসে তাদের নিয়ে যেত। কী সুন্দর ব্যবস্থা ! তারপর বাবা দেখলেন, মেয়ে এক সঙ্গে আরবি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা পড়ছে। এতগুলো ভাষা যদি একসঙ্গে পড়ানো হয়, তাহলে তো মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এর পরে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাড়িতে একজন শিক্ষক রাখা হলো, তিনিই পড়াশোনা করাতেন, দেখা-শুনা করতেন। তারপর বেগম রোকেয়া বাবাকে আবার ফোন করলেন—'আপনার মেয়ে স্কুলে আসছে না অনেক দিন হয়ে গেল। আমি তো স্কুলের কিছু পরিবর্তন করেছি। এখন স্কুলে খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, সব ধর্মের শিক্ষয়িত্রী আছে। স্কুলে পাঠিয়ে দিন।' স্কুলে সব ধর্মের ছাত্রী ছিল। বাবা আবার আমাকে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে পাঠিয়ে দিলেন। রোকেয়াকে আর পাইনি—ততোদিনে উনি মারা গেছেন। আমি ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলাম। ম্যাট্রিক দিয়েছি আমি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল থেকে।

তো স্কুলের যে পরিবর্তনটা হয়েছিল তা অপূর্ব। স্কুল থেকে এমন কোনও বিষয় নেই, যে বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করিনি। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে এস্রাজ বাজানো থেকে শুরু করে সেতার, ভায়োলিন—এর প্রত্যেকটির আমরা সা-রে-গা-মা করেছি। হাতেখড়ি করেছি। যেমন সেতার আমার ভাল লাগত, আমি পিকআপ করলাম। ভায়োলিন বাজাতে পারতাম না। হারমোনিয়ামের যে দিদি ছিলেন তিনি কোরাস গান করাতেন। আরেকটা ছিল সূচিশিল্প। যে সব মেয়েরা সূচিশিল্পে ভাল, তিন মাস অন্তর অন্তর একটি প্রতিযোগিতা হতো। এ ছাড়া ছিল আরেকটা প্রতিযোগিতা—অংকন শিল্প। এছাড়া নাটক ছিল, খেলাধূলা ছিল। সে সময়ও এসব ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল।

আমরা যে সকলের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি তা-না। তারা বলেছে, মুসলমান মেয়েদের নাচ গান শিখিয়ে কী হবে। এসব ইসলামের পরিপন্থী। কিন্তু আমাদের অভিভাবকেরা তাদের কথা শোনেননি। তারা বলেছেন, এগুলো করা ভাল, এগিয়ে যাও। তখন তরুণ একটি দল তাঁদের পরিবারকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় আনার জন্য তাঁদের স্ত্রী থেকে শুরু করে সন্তানদের মধ্যে বীজ বপন করেছিলেন।

## বাবার কথা

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে, আমরা আজকে যে সব প্রোগ্রেসিভ কথা বলছি, এটা আমার বাবা বহু আগে বলে গেছেন। উনি পেছনের কথা বলেননি, পেছনে যেতে বলেননি। তিনি বলেছেন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমরা চলো। যুগধর্মটাকে অস্বীকার করলে তোমাদের কিছু হবে না। আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি, তিনি তাঁদের মধ্যে এই বীজ বপন করে গেছেন। এ জিনিসটা এখন কল্পনা করা যায় না, কী করে তিনি সেই সময় এসব চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। মেয়েদের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৯১৮ সালে তিনি রোকেয়ার লেখা দিয়ে *সওগাত* আরম্ভ করেছিলেন এবং তিনি চিন্তা করেছেন মেয়েদের লেখা কীভাবে সংগ্রহ করা যায়, কোথায় পাওয়া যায়, এসব নিয়ে। ১৯৩০ সালে মহিলা সংখ্যা *সওগাত* বের করে তিনি অবাক করে দিলেন সবাইকে। গোড়াপন্থীরা যদিও প্রথমে গালাগালি করেছে। কাফের বলেছে। তিনি কী করে ফজিলতুন নেসাকে, প্রথম বাঙালি মুসলিম মেয়ে, বিদেশে পাঠালেন ! তিনি ভাবলেন, যদি একজন মুসলমান মেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যায়, তাহলে মুসলমান মেয়েদের জন্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে। এ কাজের জন্য বাবাকে অনেক নাকানি চোবানি খেতে হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যু হতে পারে—এরকম ঘটনাও ঘটেছে। তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। এখন বক্তব্য হলো যে, নাসিরুদ্দীন সাহেব যে কাজগুলো করে গেছেন, আমাদের জন্য যে পথ প্রশস্ত করে গেছেন এখনও কিন্তু আমরা পুরোপুরি সে পথে এগোতে পারিনি। আমরা আজও বলছি, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন মেয়েদের জন্য, মেয়েদের স্বাধীনতা, অধিকার সম্পর্কে যে সব কথা বলে গেছেন—এসবও আমরা পুরোপুরি এখনও পাইনি। এখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমরা আশাবাদী মেয়েরা যদি শিক্ষিত হই, বেশি দিন লাগবে না এ বাধাগুলো ডিঙ্গিয়ে আসতে।

## আশাপূর্ণা দেবী

১৯৪৬-এ আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শেষ সংখ্যা মহিলা *সওগাত* যখন বের করেন বাবা, সে সময় দেখলেন সবার লেখার সঙ্গে ছবি এসেছে, কেবল তিনটি লেখার সঙ্গে ছবি নেই। এক, সুফিয়া কামাল, দুই, আশাপূর্ণা দেবী, অন্য জন

জ্যোর্তিময়ী দেবী [বধূরানী গৌরিপুর]। যাহোক তিনি আশাপূর্ণা দেবীর কাছে গেলেন ছবির জন্য। আশাপূর্ণা দেবী বললেন, 'আমার তো কোন ছবিই নেই। লক্ষ্য করবেন, কোনও পত্রিকায় তখন পর্যন্ত তাঁর কোন ছবি ছাপা হয়নি।' তখন বাবা বললেন, 'আপনাদের ছবি তোলার জন্য স্টুডিওতে নিয়ে যাব, সঙ্গে সুফিয়া থাকবে।' বধূরানীকেও তাই বললেন। তাঁদের তিনজনের ছবি নেই, ছবি দরকার। বাবার স্কোডাক গাড়ি ছিল। গাড়ি নিজে চালালেন, আমি পাশে বসা। ওনারা বসলেন পেছনে। স্টুডিওতে ছবি তুলে উনি তাঁদের [আমাদের] বাসায় নিয়ে এলেন। বাসায় এসে কথাবার্তা বলার পর এল নাস্তা। নাস্তা যখন দেওয়া হলো তখন আশাপূর্ণা দেবী বললেন—'দেখেন আমার কোন সংস্কার নেই, একদম মুক্তচিন্তার মানুষ আমি। কিন্তু শাশুড়ী বাইরে খাওয়াটা পছন্দ করেন না। খেয়ে বাসায় যাব, তখন তিনি জানতে পারবেন এখানে খেয়ে গেছি। এতে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। আমি এখন খাব না' এই বলে তিনি প্লেটটা রেখে দিলেন। বাকি সবাই খেলেন। এটাই আমার আজ মনে পড়ছে, কত শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর গুরুজনদের প্রতি ! আমি আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আশাপূর্ণা দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে আমি *বেগম*-এ লিখেছিলাম। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। তিনি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন, এটাই আমি লিখেছিলাম, ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করে।

## কবি সুফিয়া কামাল ও *বেগম* পত্রিকা

সুফিয়া কামাল আমার বাবাকে বড় ভাই মনে করতেন, মাকে বোন মনে করতেন। প্রতি রবিবারে তিনি আমাদের বাসায় আসতেন। তখন তার একমাত্র মেয়ে দুলু আমার বান্ধবী ছিল। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতটা ভাল ছিল না। রোববারে কেবল আমরা সুখাদ্য খেতাম। খালাম্মার হাতের রান্না এতো ভাল ছিল ! বাবা সাধ্যমত বাজার থেকে যা নিয়ে আসতেন, উনি তা দিয়ে চমৎকার রান্না করতেন।

বাবার সঙ্গে খালাম্মার পরিচয় লেখার সূত্রে। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*-এ বাবা লিখেছেন, 'সুফিয়াকে আগে কখনো আমি দেখিনি। হঠাৎ একদিন বোরকা পরে এসে বললো, আমি সুফিয়া।' ইতিমধ্যে *সওগাত*-এ ওনার বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়ে গেছে।

ছোটবেলায় খালাকে ছাড়া মহিলা সাহিত্যিক মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে দেখেছিলাম। উনি কলকাতার বাইরে থাকতেন, যখনই কলকাতায় আসতেন, বাবার সঙ্গে দেখা করতেন, লেখা দিয়ে যেতেন। তারপরই আবার চলে যেতেন।

আমার বি.এ. পরীক্ষার পর বাবা বললেন, 'মহিলা সংখ্যা *সওগাত* দিয়ে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। মেয়েদের দ্রুত এগোতে হবে।' তখন তিনি সুফিয়া কামালকে ডেকে বললেন, 'দেখো মহিলা সংখ্যা *সওগাত*-এ তোমরা বছরে কয়েকবার ছিঁটে ফোঁটা লিখছো। এতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষ কিছু হচ্ছে

না। তার চেয়ে কাজ করো, একটা সচিত্র সাপ্তাহিক বের করো। ছবি টবি দিয়ে ভাল করে বের করলে মেয়েরা উৎসাহিত হবে।' খালাম্মা খুব উৎসাহিত হলেন। বললেন, এটা করলে তো ভাল হয়। আমি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে সব বেরিয়েছি। সুফিয়া কামাল *বেগম*-এর সম্পাদিকা হলেন। *বেগম*-এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের একটি বিরাট ছবি। মেয়েদের কিছু লেখা খালাম্মা সংগ্রহ করলেন। এ্যানাউন্স করার পর কিছু কিছু এলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অনুবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। মেয়েরা পত্রিকা অফিসে আসতে সংকোচবোধ করত। হাতের লেখা বাইরে বেরোন গোনাহ্‌র কাজ। এটা মনে করেও তারা বাইরে লেখা দেবে না। এরকম পরিস্থিতিতেও আমরা কলকাতায় *বেগম* চালিয়েছি তিন বছর। তখন যে সব লেখিকারা আসতেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাঈদা খানম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, জাহানারা আরজু, সাজেদা খাতুন, সেলিনা খান পন্নী (সেলিনা দোজা)। *বেগম* তো তিন বছর কলকাতায় চালালাম। তখন আমার সঙ্গে প্রতিভা গাঙ্গুলি ছিলেন। তিনি গুলি খেয়ে মরলেন। প্রতিভা বসু বলে একজন তরুণী ছিলেন। এছাড়া আরও হিন্দু মেয়ে যাঁরা আসতেন তাঁরা লেখা দিতেন। কলকাতা থাকাকালীন আমরা যা যা করেছি তার একটি হলো প্রীতি সম্মিলনী। *বেগম* প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহিলাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তার মধ্যে অনেক হিন্দু মহিলা এসেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। তখন খুব একটা মহিলা সংগঠন মুসলমান মহিলাদের ছিল না। একটা ছিল 'বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'। সেটায় মাঝে মাঝে আমরা অংশগ্রহণ করতাম। এবং এর খবর *বেগম*-এ দিতাম। দেশভাগ হওয়ার পর যে সব ঘটনা এদিকে হতো সে সব খবর দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে *বেগম*-এ দিয়েছি।

*বেগম*-এর প্রথম পাঁচ মাস আমি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা ছিলাম। তারপর দেখা গেল বেগম সুফিয়া কামালের অসুবিধা হয় অফিসে বসতে। কারণ ছেলে-মেয়ে সংসারের দেখাশোনা করার পর, (এছাড়া তাঁর মা ছিলেন অসুস্থ) খালাম্মার অফিসে এসে বসার বেশি সময় ছিল না। তখন উনি বললেন, 'এখন নূরজাহানকে সম্পাদিকা করেন, আমি আগে যেমন কাজ করেছি এখনও করবো।' তারপর থেকে আমি এখনও *বেগম*-এর সম্পাদিকা পদে আছি।

১৯৫০-এ ঢাকায় যখন আসি আমরা তখন বহিরাগত। কারণ আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। ঢাকার যারা অধিবাসী, তারা আমাদের পছন্দ করল না। তারা বললে, কলকাতা থেকে যে মেয়েরা আসছে, ওরা তো খোলামেলা চলবে, ওদের দেখাদেখি আমাদের মেয়েরা বাইরে বেরোতে চাইবে। তারা অনেক মেয়েদের ওপর টর্চার করেছে, নানা রকম জিনিস পত্র দরজার সামনে দিয়েছে। নানারকম উৎপাত করেছে, ইঁট পাটকেল ফেলেছে। যাতে এখানকার মেয়েরা বার না হয়। এখন ৩৮ নং শরৎ গুপ্ত রোড, যেখানে আমি থাকি, বাবা বললেন—'এখানে তোমরা অফিস করো। এখানে কেউ ঢুকতে পারবে না। আমি দেখি, কতটা তোমাদের জন্য করতে পারি।' ঢাকা আসার পর বেগম উপলক্ষে বাবা একটি সম্মেলন করলেন। সেখানে সুফিয়া কামাল,

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুননাহার মাহমুদ থেকে শুরু করে আরও অনেকে এলেন। আমরা জাঁকজমকের সঙ্গে *বেগম*-এর কাজ শুরু করলাম। পাটুয়াটুলি ঢুকতে আমাদের আরও দু'তিন বছর লেগেছিল।

## লেখিকাদের সান্নিধ্যে

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা একজন স্বভাব কবি। ওনার মনটা এতো উদার ! এতো সুন্দর মনের মহিলা আমি কম দেখেছি। আমাকে কত উৎসাহে দিয়েছেন। যখন যে লেখা পছন্দ হয়েছে, আমাকে বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা যেখানে কোনও লেখিকা পেয়েছেন সাথে করে বেগম অফিসে নিয়ে এসেছেন। অনেক মেয়েদের বই বের করার জন্য তিনি প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। তারা এখনও তাঁকে স্মরণ করে। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার ব্যক্তিগত জীবন ও তেমন কিছু জানি না। তিনি যে স্বামীর ঘর করেননি, কেবল এইটুকুই জানি। তিনি খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন। কখনও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে এমন কথা হয়েছে, যেটা উনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি স্বাধীনভাবে বেড়াতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে হয়তো বাধা এসেছে। সেজন্য উনি আর শ্বশুরবাড়িতে যানও নি। স্বামীর ঘর করেননি। নিজের স্বাধীন চিন্তা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

সৈয়দা মোতাহেরা বানুকে কলকাতায় দেখেছি। যখন আমরা কলকাতা থেকে চলে আসি, আমি খুব কেঁদেছিলাম। কেন যেন আমার খুব কান্না পেয়েছিল। এদের সবাইকে ফেলে আমরা চলে যাচ্ছি ! মোতাহেরা বানু আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। 'মা কেঁদোনা। দেশ আলাদা হয়ে গেছে। আমরাও চলে যাবো।' অনেক পরে উনি ঢাকা এসেছেন। তখন ওনাকে দেখেছি। তারপর উনি মৃত্যুশয্যায় হাসপাতালে। কী সুন্দর পরিষ্কার কণ্ঠস্বর ! আমাকে দেখে বললেন, 'অঃ তুমি এসেছো। আমি ভাল হয়ে যাব, ভাল হয়ে যাব।' তারপর তো মারাই গেলেন। সৈয়দা মোতাহেরা বানু কবি ছিলেন। কবিতাই লিখতেন।

ফজিলতুন নেসা শেষ সময় আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। এর আগে আমার এক বোনকে ইডেন কলেজে ভর্তি করাতে গিয়ে ওনাকে দেখেছিলাম। আমি গেলাম দেখতে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছি, মা কেমন আছে। বিলেতে যাওয়ার আগে উনি তো আমাদের কলকাতার বাড়িতে ছিলেন। ফজিলতুন নেসার মৃত্যুর পর ওনার একমাত্র মেয়ে বাড়ি ঘর বিক্রি করে লন্ডন চলে গেছে। এখানে থেকে আর কী করবে।

নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী হাওড়ায় [শ্রীরামপুর] থাকতেন। কলকাতায় আমি তাঁকে দেখিনি। আমি তো শুনেছি, বাবা হাওড়া [শ্রীরামপুর] গিয়ে তাঁর লেখা নিয়ে আসতেন। তিনি পুরোপুরি সংসারী ছিলেন।

কিন্তু অনেক মেয়ের জীবনে অনেক বাধা ছিল। যেমন মাজেদা খাতুন, উনি

কোনওদিন স্কুলে যাননি। সুফিয়া কামালের মত একজন বড় লেখিকা। তিনি গল্প লিখতেন। উনি বলতেন, 'সংসারে কোন কাজ নেই, আমি লিখতে বসেছি। তখনই ওদিক থেকে গঞ্জনা উঠলো, কী ছাইভস্ম লেখে বসে বসে ! আর কাজ নেই ! মনটা বিষিয়ে উঠতো। তারপর যখন লেখাটা শেষ করে রাখতাম, তখন সমস্যা দেখা দিত কাকে দিয়ে পত্রিকা অফিসে লেখাটা পাঠাব।' ওনাকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

## আমার কাজ, আমার আদর্শ

আমার বিয়ে হয়েছিল ১৯৫২ সালে, ভাষা আন্দোলনের সময়। সব দিক থেকেই আমি সুখী, আল্লাহ্‌র একটি আশীর্বাদ আমার প্রতি। বিয়ের আগেও আমি যেমন বাবার ছায়াতলে ছিলাম, বিয়ের পরও সেই আশ্রয়টি হারাইনি। আমার স্বামী একজন সাংবাদিক এবং বিয়ের আগে থেকে আমাদের পরিবারের সব কিছু তাঁর জানা ছিল, আমার সম্পর্কে জানা ছিল। এজন্য এ দিকটাতে কোনও রকম বাধা আজ পর্যন্ত আসেনি। এই যে আমি এখানে বসে আছি, এখান থেকে আমি হয়ত রাত সাতটা আটটায় বাসায় যাব। তিনি ঐদিকে দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে হয়ত দেখাও হবে না। কিন্তু এ নিয়ে উনি কোন কথা বলবেন না। তিনি জানেন আমি একটি বিরাট দায়িত্ব বহন করে যাচ্ছি।

আমি বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সেভাবেই চলছি। আমার মেয়ে দুটি। দুটির মধ্যে ইংলিশে এম. এ. একটি। অন্যজন সমাজ বিজ্ঞানে এম. এ.। তাদের পড়াশুনা করানর দায়িত্ব আমি শেষ করেছি। তারা সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছে। তাদের বাবা সাংবাদিক, নানা সাংবাদিক। সমাজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রাথমিক ধারণার বীজ বপন করেছি। কিন্তু পত্রিকা অফিস করা, নিয়মিত লেখার ব্যাপারে তাদের নিয়ে আসতে পারিনি এজন্য যে, তারা বলে—'তোমরা যেভাবে অফিস করো বা করেছো, এভাবে করতে থাকলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমাদের জীবনও ব্যর্থ। কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিসে বসে থাকা ! আমার জীবন নেই ! লাইফ নেই ! আমরা এদিক ওদিক যাব না ! অনুষ্ঠানে যোগ দিব না ! আমি আশা করি আর এটুকু বয়স হলে ওরা বেরিয়ে আসবে। তারুণ্যের জোয়ার কমে আসলে, ওরা বেরিয়ে আসবে।'

আমি তো বাবার টাইট প্রোগ্রামের মধ্যে থাকতাম। বাবা আমাকে এদিক ওদিক কখনও যেতে দিতেন না। আমিও কোনও দিকে কোনও প্রোগ্রাম তাঁর অনুমতি ছাড়া করিনি। আমার স্বামী সিনেমার টিকিট করে নিয়ে এসেছেন, ছয়টার শোতে যেতে হবে। বাবা বললেন, টিকিটগুলি ফেলে দাও। আমার সঙ্গে *বেগম* অফিসে যেতে হবে। আমার স্বামী তখন কিছু বলতেন না। পরে গজর গজর করতেন—'এটা একটা কথা হলো !' এ ধরনের নানা রকমের প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করতে হয়েছে। এখন আনন্দ

পাচ্ছি এজন্য, বাবা মারা যাওয়ার পরও *বেগম* আমি এই তিন বছর ধরে টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। ওনার মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

# হামিদা খানম
# উচ্চশিক্ষার প্রথম যুগ

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার পরিচয় খুঁজতে গিয়ে হামিদা খানমের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। শুরুতে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল। আমাদের পরিকল্পনাও ছিল তাই। যাতে করে বোনের মেয়েদের কাছ থেকে প্রয়াত কবি সম্পর্কে কথায় কথায় অজানা অলিখিত ঘরোয়া তথ্য জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কথোপকথনের এক পর্যায়ে হামিদা খানমের বাচনভঙ্গি, গুছিয়ে কথা বলার ধরন আমাদের আকৃষ্ঠ করে। তারপর কুড়ির দশকের পাবনা শহর, তিরিশের বেথুন এবং সে সময়কার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, মুসলমান নারীর অবস্থা—এসব শুনতে শুনতে আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। প্রথমে উনি আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎকার দিতে আপত্তি জানালেও পরে অন্য আরেকদিন তাঁর বাড়ীতে যেতে বলেন আমাদের।

হামিদা খানমের জন্ম ১৯২৩ সালে রাজশাহীতে, কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন পাবনায়, নানা-বাড়ীতে। পাবনার গার্লস স্কুলে লেখা-পড়া শুরু করে ঐ স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনি। তারপর দেশভাগ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন ; বেথুন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে, পরে ব্রেবোর্ন কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা হিসেবে।

এই শতাব্দীর প্রথম চারটি দশক বাঙালি মুসলমান নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সময় ছিল। দ্রুতই দৃশ্যপট পরিবর্তিত হচ্ছিল। তিরিশের দশকের শেষের দিকে বেথুনে যেখানে হাতে গোনা কজন মুসলমান ছাত্রী, চল্লিশের দশকের সূচনাতেই ব্রেবোর্নে বাংলার মুসলমান মেয়েদের সমাগম। এই যুগান্তরকারী সময়ের দ্রষ্টা হামিদা খানম।

তিনি অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সমাজের প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষিত নারী। তাঁর মা-খালারা স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই হিসেবে তিনি স্কুল পড়ুয়া মুসলমান নারীদের দ্বিতীয় প্রজন্মের। তাই পরিবারিকভাবে পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁকে কোন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সেই সময় বড় বোন মহসিনা আলি ক্যালকাটা আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। বড় ভাই আবদুল আহাদ শৈশব থেকেই সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পান এবং শান্তিনিকেতনে যান। পরবর্তীকালে তিনি সুরকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে একটি মফঃস্বল শহরের মুসলমান পরিবারে এ ধরনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা নিতান্তই ব্যতিক্রমী ঘটনা, তাই হামিদা খানম ও তাঁর বড় বোনকে দেখা যায় মুসলমান সম্প্রদায় থেকে

বিচ্ছিন্ন। তাদের বন্ধু, ক্লাসমেটরা সবাই হিন্দু পরিবারের মেয়ে। এমনকি তাঁর মায়ের বন্ধুরাও ছিলেন হিন্দুঘরের বৌ-ঝি। এ রকম পরিস্থিতিতে নানা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মানের যশ ও প্রতিপত্তি হামিদা খানমের পাবনা গার্লস স্কুলে এবং কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালানর সহায়ক হয়েছিল। তদুপরি তাঁর মাও এক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আপোষহীন, বেপরোয়া।

হামিদা খানমের এই সাক্ষাৎকার তাঁর ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এখানে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক জীবন্তভাবে উঠে এসেছে। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে হামিদা খানমের বর্ণনাগুণে। বছর কুড়ি ঢাকা গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ থাকার পর বর্তমানে তিনি অবসর-জীবন যাপন করছেন। নানান ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন হামিদা খানম, এখনও আছেন।
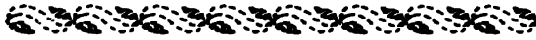
আমি স্কুলে যখন ভর্তি হই, আমার বয়স তখন কেবল চার বছর। আমার বড় বোনকে মা ও খালা স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে প্রতিভাদিকে মার এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, মা তখনই ঠিক করে ফেললেন আমাকেও স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার তখন অক্ষরজ্ঞান হয়নি, স্কুল সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার নেই তখন। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম এবং নিয়মিত স্কুলে যেতে থাকলাম বড় বোনের সঙ্গে। তখনকার একটা ক্লাসের কথা একটু একটু মনে পড়ে। ছড়ার ক্লাস। একটা মেয়ে বলত : 'ডাক রে সাধের পায়রা মিনি পরান ভরে ডাক', আর আমরা যারা ছোট ছোট ছিলাম তারা কীর্তনের ধুয়ো ধরার মত করে বলতাম : 'বক্‌বক্‌ কুমকুম/ বক্‌বক্‌ কুমকুম/ বক্‌বক্‌ কুমকুম / বক্‌!' এই একটা স্মৃতি আমার খুব ভাল ভাবে মনে আছে। ওটা বোধ হয় বেবি সেকশন ছিল। তারপর আমি টপা টপ ডবল প্রমোশন পেয়ে আমার বড় বোনকে ধরে ফেললাম। যার জন্য খুব অল্প বয়সে আমি ম্যাট্রিক পাস করি।

সবচেয়ে interesting ব্যাপার হচ্ছে, ক্লাস সিক্‌স পর্যন্ত আমি মনে করতে পারি না যে আমাদের সঙ্গে কোনও মুসলমান মেয়ে ভর্তি হয়েছিল কিনা! মানে কেউ ভর্তি হয়নি আর কি। তারপর ক্লাস সেভেনে আমাদের সঙ্গে ভর্তি হল তিনটি মুসলমান মেয়ে, কিছু দিন পর তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেল। আবার আমি আর আমার বড় বোন। সেই জন্য আমাদের কোন মুসলমান বন্ধু ছিল না স্কুল লাইফে। একই ক্লাসে না পড়লে তো মানুষের বন্ধুত্ব হয় না। স্কুলে তখন প্রায় আড়াইশ'র মতো ছাত্রী, সব হিন্দু। পাবনা খুব জমিদার প্রধান জায়গা। বড় বড় ধনীলোকের মেয়েরা পড়ত সেখানে। মধ্যবিত্ত পড়ত, নিম্ন মধ্যবিত্তও পড়ত। মুসলমান মেয়ে স্কুলে বোধ হয় সব মিলিয়ে আমরা যখন ক্লাস টেনে, তখন ছ'সাতজনের বেশি হবে না।

আমি যখন ক্লাশ টু-তে পড়ি, আমার একটু একটু মনে আছে হঠাৎ একজন জমিদার গিন্নি, ধবধবে সাদা শাড়ি পরা, বেশ ফ্যাশনেবল, ঘুরে ঘুরে স্কুলটা দেখছেন। তারপর দেখলাম স্কুল থেকে আমাকে একটা মেডেল দেয়া হলো। মেডেলের একপাশে লেখা 'In memory of my beloved son Gopal।' আর অন্য পাশে লেখা আছে—'Hameeda Banu (আমি তখন বানু লিখতাম) for Superior Intelligence'। পরবর্তীকালে আমি যখন বড় হলাম তখন মনে হয়েছিল, মহিলা কত উদার ছিলেন যে একজন মুসলমান মেয়েকে মৃত সন্তানের কথা মনে করে এই মেডেলটা দিয়েছিলেন!

এমনিতে পাবনাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ওখানে তখন কোনও ধরনের গন্ডগোল হয়নি, রায়টও হয়নি। অবশ্য হিন্দু মুসলমান সমপর্যায়ের ছিল না। মুসলমানরা গরীব ছিল তো! মুসলমান শিক্ষিত পরিবার হাতে গোনা যেত। যেমন গড়ে মুসলমানরা ছিল দর্জি, তাঁতী, ঘরামী, ছোট দোকানদার। আরেকটা সম্প্রদায় ছিল। তাদেরকে নলে বলা হতো। পদ্মার পার ঘেষে তারা থাকত। বছরের একটা সময় তারা নল খাগড়া কাটতে বরিশালের দিকে যেত। সেই পাড়াটাকে নলে পাড়া বলা হতো। ঠিক ইছামতীর পাড়ে ছিলেন সপ্ততীর্থ ঠাকুর। ওনার বাড়িতে টোল ছিল। সেই টোলে অনেক দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসত সংস্কৃত পড়তে। তার ঠিক পেছনেই হচ্ছে মুসলমান গোয়ালার বাড়ি। তার পাশেই আবার আরেকটা বাড়ি ছিল—সেইটা ছিল খ্রিষ্টান ছুতোর মিস্তিরির। এই যে খ্রিস্টানের বাড়ি, মুসলমানের বাড়ি—তার পাশে আবার হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়ি—এ নিয়ে কোনও কথা আমরা কোনওদিন শুনিনি। আবার আমাদের পাড়া ছিল যে এলাকাটায় সেখানে হিন্দু অফিসাররা থাকতেন, পেছনের দিকে মুসলমান পাড়া ছিল। এই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখন কোনও তিক্ত ঘটনা ঘটেনি। পরবর্তী কালের clash হওয়ার পর্যায়টা তখনও আসেনি। আসলে clash কখন হয়, যখন একজনের interest-এর সঙ্গে আরেকজনের interest বাধা পায়। তখনই দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে clash হয়। সেহেতু সেসময় দুটো সম্প্রদায় এত উঁচু নিচুতে যে প্রজা আর জমিদারেব সম্পর্ক ছিল—সুতরাং clash হয়নি। তা সত্ত্বেও আমি বলব সম্পর্ক ভাল ছিল। আমরাও কখনও সাম্প্রদায়িকতার কোপানলে পড়িনি। এর কারণ আমি বলব, আমার নানা যেহেতু কাজ করেছিলেন ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে, তাই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নানাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য নানাকে ব্রিটিশ সরকার খান বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি হাইস্কুল করার পর যে হেডমিস্ট্রেস এলেন তিনি নানার বন্ধুর মেয়ে, ব্রাহ্ম, উচ্চশিক্ষিতা। এছাড়া তিন চারজন শিক্ষিকা ছিলেন ব্রাহ্ম। তাদের জন্য স্কুলের পরিবেশটা বদলে গেল। আমরা যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হই, আগে তো জুতো পরতাম, জুতো পরা ছেড়ে দিলাম কারণ হিন্দু মেয়েরা গবুর চামড়ার জুতো পরত না। তখন ক্লাসে কেবল আমরা দু-বোন, গরুর চামড়ার জুতো পরে তো যেতে পারি

না ! কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম হেডমিস্ট্রেস যখন বললেন—তখন আমরা ক্লাস থ্রি থেকে কেবল ফোরে উঠেছি—আবার জুতো পরা আরম্ভ করলাম। ব্রাহ্ম হেড মিস্ট্রেস চামড়ার জুতো পরতেন, মাথায় কাপড় দিতেন। তখনকার দিনে ঘোমটা তো ব্রোচ দিয়ে আটকানর নিয়ম ছিল। খুব dignified ছিলেন। সবাই তখন জুতো পরা আরম্ভ করল।

আমরা প্রথম হেঁটেই স্কুলে যেতাম। তারপর মুসলমান বড় মেয়েরা যাতে হাইস্কুলে আসতে যেতে পারে তার জন্য নানা একটা বাস আনালেন কলকাতা থেকে। বাসের জানলাগুলো ছিল তারের জাফরি দিয়ে ঢাকা। কিন্তু তা সত্বেও মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা খুব একটা বাড়ল না। কারণ তখন পর্যন্ত মুসলমান সমাজ মেয়েদের লেখাপড়াটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। মেয়েদের লেখাপড়া ! এই একটু চিঠি-পত্র লিখতে শিখলে, একটুখানি বই পড়তে পারলেই হয়ে যেত। মা-খালাদের তো কিশোর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের হয়তো খুব কষ্ট হয়েছিল বন্দী জীবনে। মা তাই ঠিক করেছিলেন, কোনও মেয়েকে ছোট বয়সে বিয়ে দেবেন না, যে যতখানি পড়তে পারে, পড়বে। অনেকে বলত যে, মায়ের নাকি বেশিই বয়সে বিয়ে হয়েছিল। চোদ্দ-পনের বছর বয়সে মায়ের বিয়ে হয়েছিল—তখনকার দিনের তুলনায় বেশ বয়স ! তখন তো নয় বছর, দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। যেহেতু নানী মারা গেছেন, যেহেতু ছোট ভাই-বোন ছিল, সেজন্য একটু বেশি বয়সে মায়ের বিয়ে হয়েছে। খালাদের বিয়ে হয়েছে কম বয়সে।

মা খুব ছোট বয়সে স্কুলে পড়েছেন। একটু বড় হওয়ার পর বাড়িতে বসে মিশনারিদের কাছে পড়েছেন। খালারা অবশ্য মিশনারি স্কুলে গেছেন। মা ভাল বাংলা জানতেন, ইংরেজিটা একটু আধটু পড়তে পারতেন।

কলকাতা থেকে নানার আনানো বাসে আমি দু'চার দিন স্কুলে গিয়েছিলাম। মা বললেন বাসে আর যেতে হবে না, বাসটা এত ঘুরে ঘুরে যায় ! আমরা বরাবর স্কুলে হেঁটে গেছি, হেঁটে ফিরেছি। তখনকার দিনে একটা নিয়ম ছিল—স্কুলের ঝি কামিনী আমাদের বাসার সামনে এসে দাঁড়াতো। তার পর 'দিদিমণি গো !' বলে একটা ডাক দিত। আমরা রেডি হয়ে থাকতাম, ঐ ডাক শুনেই দৌড়ে গিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতাম। দল বেঁধে মেয়েদের নিয়ে সে স্কুলে পৌঁছে দিত। বড় বড় মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে রাখত আর আমরা ছোটরা সবাই গরুর পালের মতো হেঁটে হেঁটে যেতাম। আবার ছুটি হয়ে যাওয়ার পর কামিনীর সঙ্গে দল বেঁধে ফিরতাম। এই একটা জিনিস ছিল তখন, রাস্তায় কেউ কমেন্ট করত না। এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তখনকার দিনে স্কুলে যাওয়া মেয়েদের হয়ত কিছুটা সমীহর চোখে দেখত।

স্কুলের গাড়িতে যাইনি বলে, পর্দা করতাম না বলে আমি বা আমার বড় বোন কোন মুসলমান বাড়িতে বেড়াতে যেতাম না। এই যে বলবে, এত বড় মেয়ের বিয়ে হয়নি, এত বড় মেয়েরা পর্দা করে না। এই ভয়ে পাছে নিন্দা হয়, পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য কোন মুসলমান বাড়িতে বেড়াতে যেতাম না। সন্ধ্যার সময়

হয়ত মায়েদের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম হিন্দু বাড়িতে, মুসলমান বাড়িতে নয়। আমাদের বাড়িতে মা-খালারা কেউ পর্দা করতেন না। আমরা নানীর নানী তিনটে ভাষা জানতেন—উর্দু, ফারসি আরবি।

দিনের বেলায় স্কুলে যাওয়া ছাড়া আমরা বাইরে যেতাম না। রাতে মায়ের সাথে বেরোতাম। মফস্বল শহর তো, একজন কাজের ছেলে সঙ্গে যেত। হাতে লণ্ঠন, আর একটা লাঠি। লাঠিটা অবশ্য সাপের জন্য। প্রচুর সাপ ছিল পাবনাতে। লাঠি লণ্ঠন নিয়ে ও আগে আগে হাঁটত। তারপর মা। মায়ের সঙ্গে আমরা। বেশির ভাগ সময় যেতাম সপ্ততীর্থ ঠাকুরের বাড়িতে। ঠাকুরের গিন্নি মায়ের বন্ধু ছিলেন।

হিন্দু মেয়েরা হয়ত দিনের বেলা বেরোত। আমরা জানতাম না, কারণ আমরা তো দিনে বেরোতাম না। তবে এখন মেয়েরা যেমন বেরুচ্ছে, সেটা তখন কল্পনাই করা যেত না। যেমন মেয়েরা সিনেমায় যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে—এভাবে ঠিক বেরোত না। হিন্দু মেয়েদের পুজা-পার্বনে বেরোনর নিয়ম তো সামাজিকভাবে ছিলই।

মায়ের ইচ্ছে ছিল আমি বেথুন কলেজে পড়ি। বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেথুনে ভর্তি করে এলেন। এর আগে কলকাতায় অনেকবার গেছি। পাবনা থেকে ঈশ্বরদি আসতে হতো বাসে। আঠার-উনিশ মাইলের পিচডালা পথ। আর চার-পাঁচ ঘন্টা লাগত ঈশ্বরদি থেকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছতে। আমরা অনেকবার ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় গেছি, মা-দের সাথে বেড়াতেও গেছি।

আমার একটা কথা মনে পড়ে, আমি তখন ক্লাস সিক্সে উঠেছি। তখন ফ্রকই পরতাম। এখন যেটাকে নীলরতন সরকার হাসপাতাল বলে, আগে বলত ক্যাম্বেল হাসপাতাল। ওর উল্টো দিকে একটা হোটেল ছিল, সেখানে খালার [মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা] সঙ্গে উঠেছিলাম। সেখানে শিল্পী আব্বাসউদ্দিন এসেছিলেন খালার সঙ্গে দেখা করতে। খালা তখন নিয়মিত লিখছেন, সাহিত্য সভা করছেন, কলকাতা যাচ্ছেন। খালা আব্বাসউদ্দিন সাহেবকে বললেন, 'আমার এই বোনের মেয়ে খুব ভাল গান করে।' উনি আমার দুটো গান শুনলেন। আমি ওনার গাওয়া একটা গান গেয়েছিলাম, আরেকটা অন্য। গাওয়ার পর উনি ঠিক করলেন, আমার গান রেকর্ডিং করাবেন। আমাকে বললেন, 'মা তুমি ভাল করে তালিম নাও, পুজোর ছুটিতে রেকর্ডিং হবে।' তারপর আমরা কলকাতায় বেড়িয়ে পাবনা ফিরলাম ফেরার সাথে সাথে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। তখন যে একটা reaction! খান বাহাদুর সাহেবের নাতনির গান পানের দোকানে বাজবে, সিনেমা হলে বাজবে, পরিবারের সম্মান যাবে। চারপাশে একেবার টি-টি পড়ে গেল। তখন মা আমাকে বললেন—'রেকর্ডিং না-হয় না-ই করালি।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমার তো সেরকম ইচ্ছে ছিল না। রেকর্ডিং আর হলো না। তবে গানটা continue করেছি। আহাদভাই আমাকে শেখাতেন। রেকর্ডিং আর হয়নি আমার জীবনে। আসলে তখন মা চিন্তা করেছিলেন, আমার লেখাপড়ার দিকে যাতে বাধাটা না আসে। এবং আমিও মনে করি, তখন আমার পড়াশোনাটা ছিল আসল, গানটা সাইডলাইনে ছিল।

তখন মেয়েদের দুটো হস্টেল ছিল বেথুনে। আমি থাকতাম নতুন হস্টেলে। পঁচাত্তরজন আবাসিক ছাত্রী। সব ক্লাস মিলিয়ে মাত্র চারজন মুসলমান। তার মধ্যে ফোরথ ইয়ারে রাবেয়া আলী পড়তেন—পরে সৈয়দ মুজতবা আলীর স্ত্রী হয়েছিলেন। বেথুনে তখন যা পর্দা ছিল না! আমাকে প্রথম দিন মামা বেথুন কলেজের গেটে পৌঁছে দিলেন। আমি ঢুকেই দেখলাম, পাচিলের ওপর দিয়ে সেই পাচিলের সমান উঁচু তার। আর সেগুলো সবুজ হয়ে আছে, আইভি লতা আর মর্নিং গ্লোরি পেঁচিয়ে আছে। দোতলা বাস থেকে মেয়েদের যেন দেখা না যায়, সেজন্য সম্পূর্ণ আড়াল করা চারদিক থেকে। বেথুনে ভীষণ কড়াকড়ি ছিল। পারমিশন না নিয়ে হস্টেলের মেয়েরা বাইরে বেরোতে পারত না। পারমিশন নিয়েও কেউ একলা যেতে পারতো না। যিনি লোকাল গার্জেন হতেন, তিনিই কেবল মেয়েদের বাইরে নিয়ে যেতে পারতেন। আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ব্রাহ্ম। এ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন হিন্দু। ওনারা আমাদের মাঝে মাঝে দিয়ে যেতেন বাইরে। একবার হস্টেলে থেকে আমরা বাইরে গিয়েছিলাম 'চণ্ডালিকা' দেখতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে সেদিন 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই আমি প্রথম নৃত্যনাট্য দেখি। তারপর যখন শান্তিনিকেতন গেছি, ততোদিনে তো তিনি মারাই গেছেন। আমরা যে কজন মুসলমান মেয়ে বেথুনে ছিলাম, সে কজন উত্তর বঙ্গের। পূর্ব্ববাংলার আখতার ইমাম [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকোয়া হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট] ছিলেন ফোরথ ইয়ারে। আর ছিলেন জাহানারা হায়দার। পরে উনি সোশ্যাল ওয়ার্ক করতেন। মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে একমাত্র উনি তখন বোরকা পরে কলেজে আসতেন। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরে ওনাকে আমি বোরকা ছাড়া দেখি, উনি তখন সোশ্যাল ওয়ার্ক করছেন। জাহানারা হায়দার কুমিল্লার মেয়ে ছিলেন। ওনার বোরকা পরা নিয়ে অন্য মেয়েরা মাথা ঘামাত না। উনি হস্টেলে থাকতেন তো। আমি যতটুকু দেখেছি, হিন্দু মুসলমান মেয়েদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল বেথুনে। তখন ব্রাহ্ম তটিনী দাস প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম। হিন্দুদের ওপর শিক্ষার ব্যাপারে ব্রাহ্মদের প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মরা হিন্দুদের তুলনায় উদারমনা ছিলেন। আমাদের হস্টেলের আয়ারা ছিল খ্রিস্টান। হিন্দু ঠাকুর রান্না করত। আমরা রান্নাঘরে যেতাম না। এ নিয়ে মাথাও ঘামাতাম না। কিন্তু খাওয়ার সময় আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতাম। কারও মনে কিছু থাকলেও সাহস করে কেউ কিছু প্রকাশ করতো না। কারণ এ বিষয়টা encourage করা হতো না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।

বেগম মরিয়ম রশীদ ছিলেন মায়ের খালাতো বোন। উনি আবার বেগম রোকেয়ার আপন চাচাতো বোন ছিলেন। মরিয়ম খালা বেশ রক্ষণশীল ছিলেন। ওনার দুই মেয়ে জানু আপা, রানু আপা দুজনকে ক্লাস এইট শেষ করার সাথে সাথে উনি বিয়ে দিয়ে দিলেন। মাকে দেখলেই মরিয়ম খালা বলতেন, 'বড় খুকী, তোমার মেয়েদের কি বিয়ে দিতে পারবে? এত লেখাপড়া শেখাচ্ছ। বড় খুকীর বুকের পাটা আছে।'

তখন মুসলমান খানদানি মেয়েরা কেউ পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করত না। সেজন্য খালা [মরিয়ম রশীদ] ট্রামেবাসে করে পার্কসার্কাসে ওনার বাড়িতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। আমি ফার্স্ট ইয়ারে মাত্র একদিন ওনার বাড়িতে গেছি, খালা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার সঙ্গে, আমরা সেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে ট্রামে করে পার্কসার্কাসে এলাম। পার্কসার্কাসে এসে ফিটন গাড়িতে চড়লাম। তখন অনেক সুন্দর সুন্দর ফিটন গাড়ি থাকতে, ঝকঝকে ছবি আঁটা। কোচোয়ানরা সব মুসলমান। আমরা উঠে যেই বললাম কোথায় যাব, সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার ইয়া মোটা পর্দা ঝুপ করে ফেলে দিল গাড়ির ওপরে। মুসলমান মেয়ে পর্দা করবে—এটাই ছিল তাদের কথা।

বেথুনে আবার অন্য রকম একটা ট্রাডিশন ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা ভূমিকা রেখেছে, তাদের অধিকাংশই বেথুনের ছাত্রী। তখন রাজনৈতিক আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল এবং সেটা হিন্দু সমাজের মধ্যে এসে পড়ে। হিন্দু মেয়েদের মধ্যে তখন একটা প্রোগ্রেসিভ ভাব। এতো কড়াকড়ির ভেতরও রাজনৈতিক চেতনা সব মেয়েদের মধ্যে ছিল। এমনি কিন্তু কলেজে কোন রাজনৈতিক কাজ হতো না। আমার এম. এ. ক্লাসে তখন আমি একা মুসলমান মেয়ে। ইকনমিকসে পড়তো মেরী হামিদা, আসামের মেয়ে। সায়েন্সে ছিল মেহের তৈমুর (পরে কবীর)। সর্বসাকুল্যে এই তিনজন মুসলমান মেয়ে তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে।

বেথুনে বিবাহিত মেয়েও ছিল। ফাতেমা সাদেম ম্যারেড ছিলেন। হিন্দু মেয়েদের মধ্যে বেথুনে ম্যারেড মেয়ে খুব কম ছিল। বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত দু চার জন ছিল। পুরুষ প্রফেসরও ছিলেন বেথুনে। আমাদের বাংলা পড়াতেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তিনি মাথা নিচু করে পড়াতেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না। ফার্স্ট ইয়ারে আমরা ১২৫ জন মেয়ে ছিলাম। সবাই তখন ক্লাসে চুপ করে থাকতাম। সে সময় ফজিলতুন নেসা বেথুনে ম্যাথামেটিক্স পড়াতেন। উনি যে কখন আসতেন, কখন যেতেন দেখিনি কখনও। তিনি ছাড়া কোন মুসলমান প্রফেসার বেথুনে ছিল না।

এম. এ. পড়ার সময় প্রথমে আমি হ্যারিসন রোডের হোস্টেলে থাকতাম। যেখানে প্রাইভেট বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়ে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা জনাদশেক বোধ হয়। তার মধ্যে আমি একা মুসলমান। যেখানে ঠাকুর, মেট্রন সব কিন্তু হিন্দু। হামিদা যে মুসলমান, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এটা ছিল স্পেশাল ব্যাপার। একে যদি generalize করো তাহলে ঠিক হবে না। আমরা যখন স্কুলে পড়ি, আমার মনে পড়ে, আমাদের কোন হিন্দু বাড়ির বেডরুমে ঢুকতে দেওয়া হতো না। এটা এত সহজভাবে মেনে নেয়ার ব্যাপার ছিল যে, এটা আমাদের আঘাত করত না।

বেয়াল্লিশ সালে আমি ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করে রিসার্চ করতে আরম্ভ করলাম দার্শনিক অধ্যাপক সুরেশ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে। আমাকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে রিসার্চ ফেলোশিপ দেয়া হয়েছিল। আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'ধর্ম ও মানুষের ব্যক্তিত্ব'। তারপর '৪৫ সালে লেডি ব্রেবোর্নে জয়েন করি। আরবি

ফার্সি এসব বিষয়ের জন্য বেবোর্নে মুসলমান কিছু প্রফেসর ছিলেন। বাংলা পড়াতেন খোদেজা খাতুন। তার আগে ছিলেন শামসুননাহার মাহমুদ। তিনি অসুস্থ হয়ে আর কাজ করতে পারেননি। জেনারেল সাবজেক্টে আমি একাই ছিলাম মুসলমান শিক্ষয়িত্রী।

চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের কলেজে আসাটা আমাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। হস্টেলে যারা থাকছে, এরা কিন্তু কলকাতার মুসলমান নয়, সারা বাংলার, ফজলুল হক সাহেব বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজটা করেছিলেন।

দেশভাগের কদিন পর আমি বিলেত চলে গেলাম। ফিরে এলাম ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ডিগ্রি পেয়েছিলাম। যেহেতু পাকিস্তান অপশন দিয়েছিলাম, পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় ফিরে এসে ইডেন কলেজে জয়েন করলাম।

আমি অবশ্য ঢাকা আসার আগে বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। 'বাবা আমাদের তো ঢাকায় কোনও নিকটাত্মীয় নেই, আমরা হোটেলে না হয় উঠব।' বাবা দেখলাম আমার সব কথার উত্তর দিয়েছেন, হোটেলের কথাটা বাদ দিয়ে। তারপর ঢাকায় এসে দেখি তখন 'ঢাকা বোর্ডিংয়ের' মতো হোটেল ছাড়া আর কোনও হোটেলই নেই। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে যে এসে থাকতে পারে, সে রকম কোন হোটেলই নেই। ঢাকা আসার পথে ঈশ্বরদি স্টেশনে এসে আমার এতো মন খারাপ হয়ে গেল ! ঈশ্বরদি হচ্ছে জংশন স্টেশন। তখনকার দিনে আসাম মেল, দার্জিলিং মেল, সমস্ত মেল ঈশ্বরদি জংশন হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছত। একেবারে জমজমাট থাকত সব সময়। দেখলাম ঈশ্বরদি বিরান পড়ে আছে। লোক নেই, জন নেই,—প্ল্যাটফরমের একটা বেঞ্চির ওপর একজন লোক শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সেটা খুব অদ্ভুদ দৃশ্য ঈশ্বরদির পক্ষে। আমি আর বাবা আপার ক্লাশ প্যাসেঞ্জার। আমি ওয়েটিং রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, চেয়ার টেবিলগুলো অন্ধকারে পড়ে আছে।

তারপর দিন ভোরবেলা ঢাকা স্টেশনে পৌঁছলাম, এতো ঘোড়ার গাড়ি এর আগে কখনও দেখিনি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শট করে দু'পাশের দুটো জানালা বন্ধ করে দিল। আমি মেয়ে, আমাকে পর্দা করে দিল।

# সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমাজ-দর্শন

একালের অন্যতম প্রধান গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে, ১৯২৯ সালে। বাবা আবদুর রহমান ফিরদৌসী ছিলেন কংগ্রেসকর্মী, গান্ধীর অনুগামী। দাদা [ঠাকুর্দা] ফরাজি ধর্মপ্রচার ছিলেন। সিরাজের মা, আনোয়ারা বেগম, কবিতা, গল্প, গজল লিখতেন।[১] এম. আনোয়ারা বেগম যখন মারা যান তখন সিরাজের সবে ন'বছর বয়স। তবু তাঁর অনেক লেখায় মায়ের ছায়া ফুটে উঠেছে, কখনও স্পষ্ট কখনও আবছা।

পড়াশুনো, লেখালেখি, গানবাজনা, রাজনীতির জমজমাট পরিবেশ ছিল মুস্তাফা সিরাজদের বাড়িতে। আর ছিল প্রাক-স্বাধীনতা যুগের পত্রপত্রিকার অমূল্য সংগ্রহ। নব্বুই-পেরোন বৃদ্ধ আবদুর রহমান ফিরদৌসী কিন্তু এখনও তার কিছু আগলে রেখেছেন নিজের হাতে, কিন্তু অনেকটাই উৎসুক গবেষকেরা এসে নিয়ে গেছেন আর তার হদিস মেলেনি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র ধরনের। কিশোর বয়সে তিনি একটি আলকাপ গানের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বাংলার নানা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বহু সম্মান ও পুরস্কার বিভূষিত সিরাজের অবসর জীবন কাটে নিরন্তর সাহিত্যচর্চায়—পড়ায় আর লেখায়।

১৯৯৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মৌসুমী ভৌমিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। কলকাতার বেনিয়াপুকুরের তিনতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে তখন দুপুর। সিরাজের মা আনোয়ারা বেগমের স্মৃতি দিয়ে কথা শুরু হয়েছিল আর তারপর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিল কথা। সন্ধ্যের মুখে সদরে দাঁড়িয়ে সিরাজ বলেছিলেন, 'আজ মন খুলে কথা বলতে খুব ভাল লাগছিল।' সেদিনের সাক্ষাৎকারের সম্পাদিত রূপ নিচের এই লেখা।
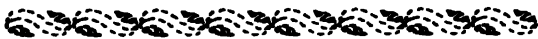
'আপনার মায়ের কথা বলুন না।'

'আমার মা মারা যান আমার ন বছর বয়স, তখন। খুব সম্ভব তখন উনিশশো আটত্রিশ হবে আর কি—।'

'মায়ের তখন কত বয়স ?'

'মায়ের বয়স তখন খুব বেশি নয়। ঐরকমই হবে, ছাব্বিশ, পঁচিশ। তার বেশি নয়। ডবল নিউমোনিয়া হয়েছিল। প্রথমে ধরতে পারেনি লোকাল ডাক্তার। ভুল করে ম্যালেরিয়া বলে চিকিৎসা করছিল। ইতিমধ্যে, বুকের দুদিকেই নিউমোনিয়া হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে তখন ঐ বহরমপুর শহর থেকে সিভিল সার্জন এসেছিলেন। তিনি বললেন যে আর কিছু করার নেই। দুটো লাং-ই নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে মারা যান। ছোটবেলায় আমি, মায়ের ঐ যে হস্তাক্ষরচর্চা, বাল্যকালে সেগুলো দেখতাম। শরের কলমে লেখা, একেবারে নিটোল হস্তাক্ষর ছিল। তার তলায় আমার সম্বন্ধে লেখা। আমাকে 'ভরতপাখি' বলে উল্লেখ করতেন। যে, আজ আমার 'ভারতপাখি' এই করেছে, ওই করেছে। অনেকটা ডায়েরির মত।'

'আপনি কি প্রথম সন্তান ?'

'আমিই প্রথম। ঐ পাঁচ-ছ বছরের স্মৃতি আমার মনে আছে। বহু স্মৃতি। আমার মনে আছে, মা লিখতেন, পড়তেন, পড়ার সময়টা ছিল দুপুরবেলা। দুপুরবেলায় তখনকার দিনে মানে, গ্রাম সব ভীষণ স্তব্ধ হয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বই তো ছিলই। পারিবারিক লাইব্রেরি, বাবার সংগ্রহে প্রচুর বই ছিল, বাংলা বই। সে সব বই মা পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন। আমার মনে পড়ে দুপুরবেলায় একদিন শরৎচন্দ্রের *শেষ প্রশ্ন* পড়ছেন। তো, প্রথম পাতাতেই বোধহয় কোথায় একটা 'অজুহাত' বলে শব্দ ছিল। আমার দূর বাল্য স্মৃতি থেকে বলছি। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, অজুহাতে কী ? আমায় বকে দিলেন যে তুমি আমাকে বিরক্ত কোর না। তুমি নিজে পড়াশুনা করগে। কিন্তু আমি চুপচাপ বসে, শুয়ে, পাশে শুয়ে শুনতাম।'

'মা কি জোরে জোরে পড়তেন ?'

'হ্যাঁ. . . না. . . মানে, মনে মনে পড়ছেন, পড়তে পড়তে কোন একটা শব্দ হয়তো মুখ দিয়ে উচ্চারণও করতেন অনেক সময়। ঐ 'অজুহাতে' শব্দটা মায়ের মুখে শুনেছিলাম। অজুহাতে কী ? তারপরে, মনে পড়ে, পাশের গ্রামে আমাদের লাইব্রেরি ছিল। পাশের গ্রাম গোকর্ণ। রাস্তার এপার-ওপার আর কি ? তো, গোকর্ণে শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতিমন্দির বলে একটি লাইব্রেরি ছিল। ঐ লাইব্রেরি থেকে মায়ের জন্য আমাকে বই এনে দিতে হত। মায়ের জন্য, আবার আমার বর্তমান মা যিনি, তাঁর জন্যেও। আমার বর্তমান মা যিনি তিনি আবার মায়ের বোন। বাবারা দুই ভাই, মায়েরা দুই বোন। ঘটনাচক্রে মার মৃত্যুর পর ঐ আমার চাচাজিও মারা গেলেন—ছোট কাকা আর কি। তো, আমার এই মাসিমা, খালাজি, তিনি বিধবা হয়েছিলেন। আমরা খুব বাচ্চা তখন। আমরা ন বছর, পরের ভাই-এর বয়স সাত বছর, একজনের বয়স পাঁচ বছর, মানে, দুবছর অন্তর চার ভাই। এর ফলে হল কি, এই বোঝাটা বইবার জন্যেই আমার বাবা আমার ছোটমাসিকে বিয়ে করলেন। এই ছোটমায়ের আদরে মানুষ হয়েছিলাম আমরা। ছোটমাসি বা যাঁকে খালাজি বলি, ইনি বেঁচে আছেন এখনও, আশির কাছাকাছি বয়স। এঁরও ছিল বোনের মত বই পড়া, লাইব্রেরির বই পড়া।'

'ইনিও লিখতেন ?'

'ইনি লিখতেন না, খুব একটা লিখতেন না। তবে এঁর চিঠির ভাষা, চিঠিপত্র যে সব লেখেন, সেই চিঠির ভাষা অত্যন্ত ছিমছাম, আধুনিক। আমার মায়ের মত।

'আমরা কুমিল্লায় রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী বলে একজনকে পেয়েছি, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন, উনিও খুব কম বয়সে মারা যান। ওঁর গদ্য, প্রবন্ধ একটু স্টিফ। কিন্তু স্বামীকে জেলে লেখা চিঠি এত সুন্দর। এত আধুনিক।'

'আমার মায়ের চরিত্রে আরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অদ্ভুত ! ১৯৩০ সালে বাবা জেলে গেলেন, আমি সবে জন্মেছি। এক বছর মত বয়স আর কি। বাবা জেলে গেছেন। অসহযোগ আন্দোলন কংগ্রেসের। তো আমি ভীষণ অসুস্থ এবং মরণাপন্ন। তখনকার দিনে তো ডাক্তার ছিল না। বাবা লিখলেন মাকে যে, তুমি যদি বল আমি মুচলেকা দিয়ে ফিরে যাই আমার মরণাপন্ন ছেলেকে দেখতে। মা তার প্রতিবাদে খুব কঠোরভাবে লিখলেন যে সেটা হয় না। আমার ছেলে মরে যায় তো যাক ; ছি তাই বলে মুচলেকা দিয়ে ফিরে আসা এই স্বামীকে আমি গ্রহণ করতে পারব না। এইভাবে, অবিকল এই ভাষায় চিঠি লিখলেন। চিঠিটা আমাদের মুখস্ত ছিল। চিঠিটা এখনও আছে বাবার কাছে। তো বাবা থেকে গেলেন, আমিও ভাল হয় উঠেছিলাম।

'তখন গ্রামে খুব পর্দার ব্যাপার ছিল। আমাদের যুগে তো পর্দা ভেঙে গেছে, এখন আমাদের বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, আমার বিয়ের বছর আমি স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যেই মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি নানা জায়গায়। তখন ভীষণ পর্দা। ঐ পর্দার মধ্যে আমার মনে আছে, খুব বাল্যকাল তবু আমার মনে আছে, একদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেছে। বোধহয় চার কি পাঁচ বছর বয়স। সেবার ভূমিকম্প হয়েছিল, নাইনটিন থারটিফোর বোধহয়। তাহলে পাঁচ বছর বয়স। ঐ বিহারে মজঃফরপুরে ভূমিকম্প হল সেই বছর। আমার মনে আছে যে মা নেই। বুবুজি আমাকে নিয়ে শুয়ে আছেন—বুবুজি বলতাম আমার ঠাকুমাকে। অনেক রাতে মা ফিরলেন, আমি জেগে গেলাম। তারপর মা গল্প শোনাতে লাগলেন। ঐ কী দেখে এলেন তার গল্প। মানে তাঁরা ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলেন বহরমপুর শহরে রাত্রিবেলায়—বাবার সঙ্গে। রাত্রির বাসে ফিরে এসে ঐসব গল্প বলতে লাগলেন। ইংরেজি ফিল্ম দেখেছিলেন। দেওয়ালে একটা পর্দার মত দেখিয়ে বলতে লাগলেন। ঐ প্রথম সিনেমা—তখন "টকি" বলত—"টকি" নামটা তখন প্রথম শুনি।'

'মার সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা তাহলে বেশ মধুর ছিল, তাই না ?'

'মা খুব তেজস্বিনী ছিলেন। আমরা চার ভাই ছোট ছোট আর কি তখন, একজন কে তো কোলে করে নিয়ে যেতে হত। তো আমরা তিন ভাই বোধহয় পাশের মাঠের একটা পদ্মপুকুরে পদ্মফুল তুলতে গিয়েছিলাম। প্যান্ট না পরে। সেই অবস্থায় বাবা হঠাৎ আমাদের ধরে ফেললেন। বাবা তখন আন্দোলন করে বেড়াতেন, কৃষক আন্দোলন, বিনয় চৌধুরীদের সঙ্গে। উনি ফিরে এসে জানতে পারলেন যে আমরা

দুপুরবেলায় ঐ রকম পুকুরে পদ্ম তুলছি। উনি তাড়া করে তিনজনকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিলেন বাড়ির ভিতরে, উলঙ্গ করে কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তিন ভাই। ছোট ভাই তো তখন হাঁটতে শেখে নি। ওখানে ছিল কিংকর ছুতোর বলে একজন। তার একটা কানা ছেলে, অন্ধ আর কি, জন্মান্ধ, ছেলেকে নিয়ে এসে কাঠের জানলার কাজ করছে। কিংকর ছুতোর মাঝে মাঝে আমাদের দেখে হেসে উঠছে। কানা ছেলেটা বলছে যে বাবা হাসছ কেন? কিন্তু ও কিছু বলে না, কেবল হেসে যাচ্ছে। মা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলেন, লক্ষ করার পর গিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি যত্ন করে পোশাক আশাক পরিয়ে দিয়ে বাবার ওপর প্রচণ্ড খেপে গেলেন। বললেন, এইভাবে ছেলেদের নষ্ট করে ফেলছ।

'মা সম্পর্কে আমার এই ধরনের সব স্মৃতি। বেশির ভাগ স্মৃতিই হল যে পাঠশালা থেকে আসছি, আসার পর দেখছি যে দুপুরে একটা পড়ার আসর বসেছে। আমাদের গ্রামে সবই প্রায় চাষী মুসলিম। চাষী মুসলিম, একমাত্র আমরা আউটসাইডার। কারণ আমার ঠাকুরদা ছিলেন ধর্মগুরু। উনি গিয়ে ঐ শিষ্যদের মধ্যে সেট্‌ল করেছিলেন। ঐ *অলীক মানুষ*-এ যে পীর বুজুর্গে চরিত্রটা আছে ওটা খানিকটা আমার ঠাকুরদা আদলে গড়া। অনেক স্মৃতি এর মধ্যে সত্যিকার স্মৃতি আছে।

'সেই দুপুরবেলায় দেখতাম সুবাসিনী নামে এক বেদের মেয়ে, সে পাশের গ্রামে গোকর্ণে থাকত, সে আসত বিদ্যাসুন্দর বইটি নিয়ে। অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানত। মায়ের কাছে এসে বইটা দিত এবং সুর ধরে মাকে শোনাত। সেই সময় আমরা থাকলে,—যদিও খুব বাচ্চা—আমাদের সুবাসিনী তাড়িয়ে দিত। বলত যে ছেলেরা এখানে থেকো না, শুনো না কিছু। ও মার কাছে গল্পগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা করত। এই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে।

'ঐ গ্রামে চারিদিকে চাষী এবং সেই চাষীজীবন ছিল অত্যন্ত—মানে, যে ধরনের জীবন এখনকার দিনে কল্পনা করা যায় না। ঐ রকম একটা পরিবেশে, আমাদের খুব বাল্যকাল থেকে অন্তত ন বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখাবার যা দায়িত্ব মা-ই নিজের হাতে নিয়ে ছিলেন। বাবা তো বাইরে বাইরে থাকতেন। মনে পড়ে, মাকে বহু বই এনে দিতাম লাইব্রেরি থেকে।'

'উনি বলে দিতেন যে কী বই এনে দিতে হবে?'

'হ্যাঁ। উনি নাম করে বলতেন যে এঁর বই এনো। বনফুলের বোধহয় *দ্বৈরথ* নামে একটি উপন্যাস তখন সবে বেরিয়েছে, নতুন। উনি পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনে খোঁজ রাখতেন। আমাদের এনে দিতে বলতেন।'

'পত্রপত্রিকা তো বাড়িতে আসত?'

'হ্যাঁ বাড়িতে পত্রপত্রিকা আসত। *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *নওরোজ*, *বুলবুল*—অনেক কাগজ বেরোত। বাবা সবকিছুর গ্রাহক হতেন।'

'মায়ের পড়া শেখা কোথা থেকে শুরু?'

'মায়ের পৈতৃকবাড়ি ছিল নগর বলে একটা গ্রামে, গোকর্ণ থেকে দশ মাইল

পশ্চিমে। সেখানকার মসজিদ-সংলগ্ন একটি মক্তবে ওঁর লেখাপড়ার শুরু। আমার মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়েটাও খুব অদ্ভুতভাবে হয়। বললাম যে, দুই ভাই, দুই বোন। আমার নানাজি, অর্থাৎ দাদামশায়, উনি ছিলেন ফরাজি মুসলমান। উনি নগরে প্রায় একানড়ের মত থাকতেন। কারণ বাকি প্রায় সবাই ছিল হানাফি মুসলমান। তখনকার দিনে ফরাজি হওয়া খুব মুশকিল ছিল। হানাফিরা ভীষণ হ্যারাস করতো। *অলীক মানুষ* উপন্যাসে এ সব আছে দেখবেন। হানাফিরা বলতো : ফরাজিদের নামাজ পড়া/ঢেঁকির মত মাথা নাড়া।

'একদিন আমার ঠাকুরদা বা দাদাজি আসছেন শিষ্যবাড়ি থেকে, সেদিন ছিল হাটবার। আমাদের গোকর্ণে রবিবার ও বুধবার হাট বসে। কোন এক রবিবার বা বুধবার উনি হাটের পথে—তখন তো রাস্তাঘাট এরকম ছিল না—গরুর গাড়ি চেপে আসতে আসতে ওঁর দুপুরের নামাজের সময় হয়েছে। গ্রামে আসবার এক মাইল আগে, এক মাইলও নয়, হাফ মাইল হবে ; মাঠের মধ্যে গাড়িটি রেখে উনি বটতলা—ঐখানে তখনকার দিনে জলটল খুব পরিষ্কার—ওখানে গাড়োয়ানকে দিয়ে বদনা এনে ওজু-টজু করে ঐ গাছতলাতে নামাজ পড়ছেন। এই সময়ে আমার নানাজি এসেছেন, ওঁদের কাছাকাছি হাট ছিল না, ঐ দশ মাইল সোজা রাস্তা ডিঙিয়ে উনি ঐ গোকর্ণের হাটে এসেছিলেন। হাটে এসে উনিও ফিরে যাচ্ছেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন যে একজন সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় এবং মুখে লম্বা চুল, মাথায় টুপি, আলখাল্লার মত পোষাক। তিনি নামাজ পড়ছেন। ফরাজি সম্প্রদায়ের নামাজ পড়ার একটু আলাদা ধরন আছে। উনি গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। পাশে দাঁড়ালেন নামাজ পড়ার জন্য। দাদাজি জোরে "আমিন" বলেছেন, নানাজিও বললেন। ঐ সময় চোখের কোনা দিয়ে, আমার দাদীর কাছে শুনেছি, পরস্পর পরস্পরকে একবার দেখে নিলেন। যে এও তো আমার সম্প্রদায়ের। এই ফরাজিরা ছিল খুব কঠোর। বলতো, সোনা পরা হারাম, গান শোনা হারাম ইত্যাদি, আবার কুসংস্কারও হারাম, পীরতন্ত্র হারাম, ফকিরি বা মিস্টিসিজম হারাম এদের কাছে। মানে মহম্মদ মানুষমাত্র। তো দাদাজি আর নানাজি নামাজ পড়ার পর পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পরের আলাপ হতে হতে ঐখানে একত্রে পরিচয় হল যে, আপনার কে আছে বাড়িতে ? আমার দুই মেয়ে আছে। উনি বললেন আমারও দুই ছেলে আছে। এদের বয়স কত ? বয়স এই। ঐখানেই কথা পাকা হয়ে গেল। নানাজি বললেন, তাহলে সামনের শুক্রবার আপনি আপনার ছেলেদের পাঠিয়ে দেবেন। কথা পাকা হয়ে থাকল। তখনকার মানুষের কথার মূল্যটা ভীষণ ছিল। তারপরের শুক্রবার গাড়ি করে গিয়ে আমার বাবা এবং কাকা, তাদের বয়সও বেশি নয়, তখন আঠেরো, বোধহয় আঠেরো, আর বারো এরকম। মায়ের বয়স বোধহয় চৌদ্দটোদ্দ হবে আর কি। তারপরে বিয়ে হয়ে গেল।

'এখন ঐখানে, নগরে, মক্তব ছিল, মসজিদ সংলগ্ন। এই মক্তবে, যদিও ওটা হানাফিদের মসজিদ, কিন্তু ঐ মক্তবে আমার মা ও মাসি দুজনেই প্রাথমিক বাংলাটা শিখেছিলেন। আরবির সঙ্গে প্রাথমিক বাংলা।'

'বাংলা শেখার ব্যাপারে কোন আপত্তি ছিল না ?'

'না, না। যে কোন মক্তব বা মাদ্রাসায় তো বাংলা শিখতেই হবে, কমপালসারি। বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল এসমস্ত। আমি যে পরীক্ষা দিয়েছি ন বছর বয়সে উনিশো উনচল্লিশ সালে, আমি পরীক্ষা দিয়েছি প্রাইমারি, আমার সার্টিফিকেট এখনও আছে, তাতে লেখা "প্রাইভেট মক্তব"। আমার সঙ্গে মক্তবের ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষা দিয়েছিল। তারা যারা যারা পাস করতে পেরেছিল তারা অনেকেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। গ্রামে হয়ত পাঠশালা নেই, স্কুল নেই, মক্তব আছে মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য। তারা মক্তব থেকে পাস করে হাই স্কুলে, হাই ইংরেজি স্কুলের আপার প্রাইমারি সেকশনে, ফাইভ-সিক্সে ভর্তি হতো। আমার সঙ্গে অনেকেই ভর্তি হয়েছিল। মক্তবে বাংলাটা মাস্ট, এখনও তাই কিন্তু। মক্তবে মাদ্রাসায় বাংলাটা এখনও মাস্ট। কাজেই ওঁরা বাংলাটা ওখানে শিখেছিলেন, কিন্তু হাতের লেখাটা বিয়ের পর। বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার পর বাবা আবার নতুন করে হাতের লেখা করিয়েছেন।'

'বাবা কতদূর পড়েছিলেন ?'

'বাবা ম্যাট্রিকের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে চলে যান। তখন থেকে আন্দোলন শুরু করেন, আর পড়াশুনো করেন নি।'

'এই যে মা পড়াশুনো করতেন, এই যে লিখতেন, বাবার তো সমর্থন ছিলই, কিন্তু বাড়ির অন্যান্য মহিলার কারও আপত্তি ছিল না ?'

'না, না। আমার দাদীমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি তো ছিলই না, বরং উনি নিজেও অল্পস্বল্প লিখতে পড়তে পারতেন। এবং খুবই উৎসাহ দিতেন লেখাপড়ার ব্যাপারে। আমার দাদুর ব্যাপারে—দাদু ছিলেন অদ্ভুত মানুষ, কট্টর আহ্‌লে হাদিস, শিষ্যদের উপদেশ দিতেন যে পর্দা মেনে চল, অমুক কর, তমুক কর ইত্যাদি ইত্যাদি। পীরতন্ত্রের উচ্ছেদ করে বেড়াচ্ছেন সব জায়গায়, বহু জায়গায় পীরের থান পর্যন্ত ভেঙেছেন। আবার হিন্দু জমিদারের গ্রামে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের কোরবানি দিতে না দেবার অধিকার তাঁদের নেই।

'এই দাদাজির আমাদের ব্যাপারে খুব শৈথিল্য ছিল। আমরা যে লেখাপড়া শিখছি, মেয়েরা যে বাড়ির মধ্যে থেকে, পর্দা মেনে লেখাপড়া শিখছে, মা লেখাপড়া করছেন এ সব ব্যাপারে অসাধারণ পারমিসিভ ছিলেন উনি। এগুলো উনি কিছু মনে করতেন না। শিষ্যরা অনেক সময় কৈফিয়ত চাইত ওঁর কাছে যে, মৌলভি সাহেব এটা কী হল ? তা উনি কোত্থেকে একটা হাদিসের অংশ তুলে বুঝিয়ে দিতেন।

'তো মায়ের সেই দুপুরবেলাকার দিনগুলোর কথা বলছিলাম। আমার মনে আছে যে দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে মা পড়তেন। এমন কি ছোটদের যে সমস্ত বই বেরোত তখন—ঐ বোধহয় কুলদারঞ্জন রায় বা *শিশুসাথী* পত্রিকা। আমার জন্য নিয়েছিলেন। আমি তো তখন কেবল টু-থ্রিতে পড়ি। ঐ গল্পগুলো উনি আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন, বুঝিয়ে দিতেন মানে। আমার পড়াশুনো, প্রাথমিক পড়াশুনোটা মায়ের হাতেই হয়েছিল। বাবা তো বাইরে থাকতেন।'

'বাবা লিখতেন না?'

'বাবাও লিখতেন। তবে বাবা লেখবার সময় খুব কম পেতেন, কারণ বাবা তো আন্দোলন করেই ঘুরে বেড়াতেন।'

'আপনার গল্পের নারীরা দেখেছি স্বতন্ত্র। তাদের ভিতরে একটা বিশেষ জোর থাকে যেন। যেমন *অলীক মানুষ* উপন্যাসে। আপনার আশপাশে কি এ ধরনের মেয়েরা অনেক ছিলেন?'

'আমার মায়ের একটা তেজস্বিতা ছিল। মায়ের আদলটা আমি বহু চরিত্রের মধ্যে—ঐ তেজস্বিতা অবচেতনভাবেই এসে গেছে।'

'এটা মাকে দেখে?'

'হ্যাঁ। মাকে দেখে। একবার আমাদের বাড়ির মাটির দেওয়ালটা ভেঙে গিয়েছিল। বাড়ি বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন ক্ষেত থেকে কিছু লোক উঠে এসে বাগানের আম গাছের নিচে বসে গল্প করতে লাগলো, বাড়িতে কাজ করত জুলেখা, জুলেখাকে মা পাঠালেন লোকগুলোকে চলে যেতে বলার জন্য। ঐ জুলেখা চরিত্রটিকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে। দাদী বারণ করেছিলেন। জুলেখার কথায় লোকগুলো পাত্তা দেয় নি। শেষে মা নিজে বেরিয়ে গিয়ে খুব বললেন। লোকগুলো ধীরে ধীরে চলে গেল। আরও কখনও আসে নি। আর একবার আমাদের বাড়িতে পুলিস এসেছিল। বাবা অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটার পর জেলায় জেলায় রাজনীতি করে বেড়াতেন। তখন তিনি নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বাড়ির দিকে পুলিসের নজর ছিল। একদিন এক টুকরো লাল কাগজ পেয়ে আমি হরফ চেনার চেষ্টা করছিলাম, মা কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। এর কদিন পর দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে পুলিস এল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিষিদ্ধ কিছুই পেল না। আমার মনে আছে, মা দারোগাবাবুর সঙ্গে তর্ক করছিলেন আর ঘোমটাটা খসে পড়ছিল। শেষে দারোগাবাবু সেলাম ঠুকে বললেন, 'ক্ষমা করবেন।' তারপর বেড়িয়ে গেলেন। মা আমাকে কোলে তুলে বলেছিলেন খোকা যদি ঐ কাগজটা বের না করত, তাহলে কী হত?'

'মার মতো মাসিও কি ও রকম—'

'মাসি অতোটা নন। মাসি লেখাপড়া খুব করেছেন। ওঁর হাতের চিঠি আছে। ঐ যে বলছিলাম যে, আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে ভাষায়, একেবারে স্বচ্ছন্দ! ঐ রকম গদ্য আমি—'

'বাঙালি মুসলমানের ভাষা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে; তাই না?'

'মুশকিল হয়েছে যে, এইটিনথ সেঞ্চুরির আগে অবধি, নবাবি আমল পর্যন্ত যে বাংলা চালু ছিল. বা যে বাংলা গ্রামাঞ্চলেও আমরা আমাদের বাল্যকাল পর্যন্ত শুনেছি কথোপকথনের বাংলা, আঞ্চলিক বাংলা, ডায়ালেক্ট—তার মধ্যে আরবি ফারসি সাধারণ শব্দ বেশি ব্যবহৃত হত। বোধহয় টেঁকচাঁদ ঠাকুরের লেখাতে এটা পাওয়া যায় খানিকটা। যেমন, আমাদের থিয়েটার ক্লাবের হিন্দু ছেলেরা ফিস্ট করবে, তো তারা বলছে যে

এতে বরকত হবে না। এই সেদিনকার কথা, ফিফটিজ-এর কথা। এখন এগুলো উঠে গেছে। হিন্দু স্যান্সক্রিটাইজড যে ভাষা, যেটা শুরু হল মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলে, যে আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্যান্সক্রিটাইজ্‌ড বাংলা চালু করল, তার প্রভাব পড়ায় মুসলমানদের বাংলাও অনেক স্যান্সক্রিটাইজ্‌ড হয়ে গেল। যে কোনও ভাষায় ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, যে ভাষা থেকে ধর্মটি এসেছে, ধর্মগ্রন্থটি রচিত হয়েছে, সে ভাষার প্রতি সব দেশেই একটা আক্ষরিক টান থাকে এবং তাই ভাষাটি সচল করে সবাই। মুসলমানদের যেমন আরবির দিকে ফারসির দিকে। হিন্দুর ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দিকে সেই টানটা ছিল। আর এই টান থাকার ফলে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম সব কিছুতে আস্তে আস্তে তৎসম শব্দ ক্রমে ক্রমে ঢুকে পড়লো।

'আমার দাদী বা দাদাজির সঙ্গে কথার্বাতা বলা বা আমাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বলার সময় ঐ টার্মগুলো এসে যেত। এসেই যেত, যেমন "খানা", "খানা খাবেন উনি", এই রকম আর কি। তবে এটা কমে আসছে। এটা কমে আসছে, আস্তে আস্তে শিক্ষাদীক্ষা বাড়ছে, তাই। এদেশে সংখ্যালঘুরাও সংখ্যাগুরুর কালচারের দিকে ভেসে যেতে বাধ্য। যার ফলে হচ্ছে কি, মেয়েরাও ঐ ভাষা ব্যবহার করছে, ছেলেরাও। এমন কি ঝোঁক, অ্যাকসেন্ট, বা কথা বলার যে ভঙ্গী, যাতে একটা তফাৎ ছিল, সেই তফাৎটুকু পর্যন্ত আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত আমি—অন্তত ছয়ের দশক পর্যন্ত—লক্ষ করলে বুঝতে পারতাম যে ইনি মুসলমান না হিন্দু। মানে শুধু শব্দ ব্যবহারে নয়, কথার ঝোঁকেও, টানেও।

'আসলে নবাব বাদশা, অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে পার্শিয়া, মধ্য এশিয়া, তুর্কিস্তান এই সব বহু জায়গা থেকে যারা এসেছিল, তারা তাদের নিজেদের ভাষা, আচার বিচারও সঙ্গে করে এনেছিল। আমি দেখেছি বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ—এই তিনটি জেলাতে এদের বংশধরদের বলা হয় মিঞা। এদের কথা আমার *স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান* উপন্যাসে লিখেছি। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত লেখাপড়াটা বেশির ভাগ চালু ছিল এই মিঞা শ্রেণীর মধ্যে। আর ছিল নিম্নবর্গীয় কনভার্টেড মুসলিম যাদের আতরাফ বলে—এরা ছিল হিন্দু কালচারের অনেক কাছাকাছি। আলকাপ গানের দলে থাকার সময় আমি দেখেছি—ওটা ছিল নিম্নবর্গীয় হিন্দু আর নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের মিলিত প্ল্যাটফর্ম। ফলে, ভাষায় যে তফাৎ, সেটা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা কমে গেছে। সাধারণ ভাবে উচ্চবর্গীয় মুসলমান সমাজে এখনও কিছু আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা, তাদের আমি দেখেছি। তাদের ফ্যামিলির ভেতরে, ঐ কথাবার্তার ভেতরে কী যেন একটু আলাদা। কাজেই একটি চরিত্র যদি লিখতে হয়, সে আমার মা-ই লিখুন বা আমিই লিখি, তখন ঐ সংলাপে ভাষা দিয়ে, ঐ ন্যারেশনের মধ্যে আরবি ফারসি শব্দগুলোর একটু আধিক্য আসতে হয়েছে।'

'আমাদের লেখিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে সমস্যাটা অন্যত্র। এই কাজটা করতে গিয়ে দেখেছি, অনেকের ক্ষেত্রেই ভাষা বেশ অপরিণত,

কনফিউজড্। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও আছে, নজরুলেরও, আবার সাধু চলিত মিলে মিশে যাচ্ছে—এই ধরণের সমস্যা। তখনকার পত্রপত্রিকায় যে ধরণের বাংলা লেখা হতো, মনে হয়, তার একটা প্রভাব পড়েছিল এদের ওপর। রোকেয়ার কথা অবশ্য আলাদা। রোকেয়া তো একেবারে বিশুদ্ধ একটা স্টাইলে—'

'হ্যাঁ, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কথা আলাদা। রহিমউন্নিসার কবিতায় আমি দেখছিলাম যে পুঁথি যুগ হলেও উনি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। বা চট্টগ্রামে যে সব লেখক ছিলেন তৎকালীন অষ্টাদশ, উনিশ শতকে, তারাও কিন্তু তৎসম শব্দ ব্যবহার করছেন। তবে দুটো ধারা যে ছিল, এটা সত্যি কথাই। কারণ, আমার স্মৃতির থেকে বলছি এবং এটা আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, এখনও অবধি দুটো ধারাই আছে। একটা ধারা হচ্ছে যে, যাঁরা তৎসম শব্দটাকে পুরোপুরি নিলেন অর্থাৎ হিন্দুয়াইজ্ড যে ল্যাঙ্গুয়েজ। অর্থাৎ এদেশের হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ, তাঁরা এগিয়ে আছেন অতএব তাঁদের শব্দগুলো ব্যবহার করা, যেমন মীর মশাররফ হোসেন। উনি নিজের নামের আগে শ্রী ব্যবহার করছেন। এবং যাকে তিনি এই উৎসর্গ করছেন তাকে "আর্য্যে" বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু আবার পাশাপাশি আর একটা ধারাও আছে। সেটা হল, মুসলিম ভোকাবুলারি ব্যবহার করা। মুসলিম জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে, অথবা প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে। আমার মায়ের বোধহয় ঈদের ওপর একটা লেখা আছে দেখছিলাম, পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। তো সেখানে কিন্তু ঐ ভাষাটা একটু আলাদা।'

'এই যে আপনার মায়ের লেখা *গুলিস্তাঁ* পত্রিকায় বেরোত, রোকেয়ার লেখা *নবনূর*-এ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর *সওগাত*-এ। এই সব মুসলমান-সম্পাদিত বাংলা পত্রপত্রিকা ছাড়াও তো তাঁদের বাড়িতে, অর্থাৎ যাঁদের বাড়িতে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল, তাঁদের কাছে *প্রবাসী, ভারতবর্ষ* এই সব পত্রিকাও আসত, তাই না ? কিন্তু এই যে মুসলমান-সম্পাদিত পত্র পত্রিকা, সেগুলোর বোধহয় অমুসলমান সমাজে তেমন প্রচার ছিল না।'

'না, এক *সওগাত* বাদে। *সওগাত*-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদিরা লিখছেন, বা কাজও করতেন। আর *সওগাত*-এ নাসিরুদ্দীন সাহেব তো নজরুলকে এমনভাবে নিয়েছিলেন। একেবারে ঘরের ভিতরে নিয়ে নিয়েছিলেন। *সওগাত*-এ ওটা ছিল। কিন্তু *মোহাম্মদী* বা অন্যান্য পত্রিকার অতটা প্রচার বা প্রভাব ছিল না। চেষ্টা করেছেন অনেকে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে লেখাবার। ঐ অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* তো *মোহাম্মদী*-তেই বেরিয়েছিলে ধারাবাহিকভাবে। ওঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুরা খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এক খুব সত্য যে, একটা শীতল উদাসিন্য, এটা আছে। আমি রিসেন্টলি বলেছি যে হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই বা ভয়ও নেই যে একটা শীতল উদাসিন্য আছে। খুঁটিয়ে মুসলিম সমাজকে জানা, পড়া বা বোঝার যে আগ্রহ, সেটা খুব একটা নেই। এটার কারণ—অনেক কিছু হতে পারে। মানে এক ধরনের রক্ষণশীলতা এখনও সমাজের ভেতরে থেকে গেছে। যেমন,

আমি খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। আমার ছোটবেলায় *আবার যখের ধন*, ঐ হেমেন রায়ের লেখা, খুবই প্রিয় ছিল। ছোটবেলায় আমার ছোট মামা এইটে এক গ্রীষ্মের দুপুরে শুনিয়েছিলেন। শোনানর পর একটা অদ্ভুত বিস্ময়কর জগৎ মনের মধ্যে তৈরি করে দিলেন। আমি আসলে খুব ভিতু ছিলাম বাল্যকালে, ছোট-মামা আমার 'মানিকবাবু' নাম দিলেন, আমার পরের একটি ভাইকে নাম দিলেন 'বিমল', একজনের নাম 'কুমার', একজনের নাম 'রামহরি', একজনের নাম 'গাঁটুলে সর্দার'। আবার আমি স্কুলজীবনেই পড়ি ঐ পথের পাঁচালি। পড়ার পর নিজেকে নিজের জীবনের সঙ্গে অপুকে এক মনে হতো, ঐ প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাফেরা এগুলো আমারও খুব বেশি ছিল। তো নিজেকে আমি এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এইটে ঠিক হিন্দুদের পক্ষে ততখানি সম্ভব ছিল কি না জানি না। কেউ যদি বলে মুসলমান সমাজ, সংস্কৃতির মধ্যে ফরেন এলিমেন্ট আছে, তাহলে বলব সাত আটশো বছর তো যথেষ্ট সময় এগুলো আত্মস্থ করার পক্ষে।

'নিম্নবর্গীয় সমাজে কিন্তু এটা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান খুব মিলে মিশে গিয়েছিল। আলকাপ দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরির সময় আমি দেখেছি। আমি দেখেছি যে কবিগানের লড়াইয়ে শেখ গোমানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন লম্বোদর চক্রবর্তী। এক মেলায়, মহরুল বলে গ্রামে, লম্বোদর চক্রবর্তী হয়েছেন মুসলমান যবন আর শেখ গোমানি হয়েছেন ব্রাহ্মণ। গোমানি তো যবনদের যতদূর পারে পরাস্ত করে দিচ্ছেন, যেমন কবিয়ালদের নিয়ম, আর লম্বোদর চক্রবর্তী মুসলমানদের হয়ে তাদের একেশ্বরবাদ, তাদের একতা, মানুষ হিসেবে স্টেটাস, অমুক তমুক এইসব দেখিয়ে এমন সুন্দর লড়াই করে যাচ্ছেন। মুসলিম শস্ত্র, সুফিজম্ তাঁর একেবারে *ঠোঁটস্থ*। এ রকম হিন্দু আমি দেখেছি অনেক, গ্রামীণ হিন্দু, সুফিজ্‌ম-এর ধারাগুলো খুব ভাল জানে। কত বাউল দেখেছি। হিন্দু বাউল। ঐ পঞ্চভূতের ফারসি টার্ম তাদের *ঠোঁটস্থ*। এই প্রবণতটা ব্রাহ্মদের মধ্যেও খানিকটা এসেছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র সেন তো কোরান অনুবাদ করলেন প্রথম, বাংলায়। কোনও মুসলমান আপত্তি করেছিল ? কেউ করে নি। বরং মৌলভী গিরীশ সেন বলে ডাকত। তো একশ্রেণীর ব্রাহ্মদের ভেতরে এই আগ্রহটা ছিল যে মুসলমান সমাজকে জানব। কিন্তু ব্যাপকভাবে মুসলিমদের জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহটা যে কোনও কারণেই হোক হয়ে ওঠে নি। এটা একটা খুব দুঃখের বিষয়। একটা কারণ হতে পারে এই যে হিন্দুরা বাইরের সমস্ত ধর্মকে আত্মসাৎ করেছিল, যা কিছু এসেছে তাকে আত্মসাৎ করেছে, ইসলাম ধর্মকে সুফিজ্‌মের মধ্যে দিয়ে হয়ত আত্মসাৎ করতে পারত, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক একটা মৌল কোন শক্তি ইসলামের মধ্যে বোধহয় ছিল, একটা প্রতিরোধ শক্তি. যার জন্য এটা সম্ভব হয় নি। হিন্দু ধর্মও এমন একটা ধর্ম যাকে ইসলাম গ্রাস করতে পারে নি। আমার এই কথাটার খানিকটা সাক্ষ্য মিলবে শান্তিনিকেতনের জুলিয়াস জার্মানুসের প্রবন্ধে। এর কোন অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে। সেটা গবেষণা-সাপেক্ষ বিষয়। মানে ফকিরের দরগায়, পীরের

দরগায় যাচ্ছে মুসলমানরা, হিন্দুরাও যাচ্ছেন। কিন্তু তার প্রতি ভালবাসা আছে বলে, বা ভক্তির, সেটা নয়। এটা হল ভয়-ভক্তি। আবার কথকতা, রামায়নের কথকতা শুনতে মুসলমানরা ভিড় করছে, কিংবা কৃষ্ণযাত্রার দলে মুসলমানরা রয়েছে, এটা হয়ত ইসলাম ধর্মে উৎসবের বড় অভাব, সেই জন্যে। মুসলমানদের ধর্মটা বড় সাদামাটা। ধর্মের সাংস্কৃতায়ন, যাকে বলে কালচালারাইজেশন অফ রিলিজিয়ন, কালচারের নানা দিক দিয়ে একটা ধর্মকে ফুটিয়ে তোলা, সেটা ইসলামের ক্ষেত্রে তেমন হয় নি। সুফিরা খানিকটা করবার চেষ্টা করেছিলেন কাওয়ালি গান ও অন্যান্য কিছুর মধ্যে দিয়ে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটা হয় নি। মুসলমানের উৎসব হলো শুধু খাওয়া আর নামাজ পড়া। ওদিকে হিন্দুদের নিজেদের এত উৎসব আছে। এটাও একটা দূরত্বের, অনাগ্রহের কারণ হতে পারে।'

'এই অনাগ্রহটা আমরা আমাদের কাজ করতে গিয়ে বার বার অনুভব করেছি। ধরুন এই যে পত্রপত্রিকা, যাতে আপনার মা বা তাঁর সমসাময়িক লেখিকরা লিখতেন, সেই পত্রপত্রিকাই বা ক'জন পড়তেন ? ক'জন জানতেন ওঁদের কথা ?'

'খুব, খুব কম সংখ্যক মানুষ। *সওগাত*, *গুলিস্তাঁ*, *মোহাম্মদী*-র গ্রাহকসংখ্যা খুবই কম ছিল। এই গ্রাহক ছিল মূলতঃ ঐ উচ্চবর্গীয় মুসলিমদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করত। মানে যারা মনে করছে মুসলমান সমাজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করা দরকার। অর্থাৎ এটা ঐ স্যার সৈয়দ আহমেদের স্কুল, মানে আলিগড় ধারা, তার থেকে এসেছিল। তো আমার ছোটবেলায় বর্ধমানের মঙ্গলকোটে গিয়ে দেখতাম আমাদের ফুফুজিদের বিরাট সংসার। গোটা একটা পাড়া ওঁদের। সেই ওঁদের বাড়িতে সব কিছু বইপত্তর। বেশির ভাগ বই-ই হলো মুসলিম লেখকদের। কবি কাদের নাওয়াজ ছিলেন, মঙ্গলকোটে বাড়ি, উনি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ধাঁচে কবিতা লিখতেন। পল্লীকবিতা লিখতেন উনি। "মরাল" নামে একটা কবিতা ছিল। আবার আমাদের মুর্শিদাবাদে দেখেছি কেশেডাঙা মাহমুদপুর সেখানে তিন চার ভাই ছিলেন খুব বর্ধিষ্ণু পরিবার, কাজী পদবি। ওঁদের বাড়িতে একবার আমার নানাজি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখেছিলাম যে প্রচুর পত্রপত্রিকা। পরে আলকাপ জীবনেও আমি ঐ পড়াশুনোর চর্চাটা দেখেছি। *আনোয়ারার* মত পপুলার বই অন্য কোন ভাষায় আছে কি না জানি না। কত সংস্করণ যে হয়েছে! আজ অবধি বোধহয় হচ্ছে।'

'আমরা তো রাস্তা থেকে কিনেছি।'

'হ্যাঁ। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। খুব ছেলেবেলায় পড়েছি।'

'নজিবর রহমান আবার আমাদের একজন লেখিকা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। আনোয়ারার মতন একটা সামাজিক উপন্যাস যেমন জনপ্রিয় হতে পেরেছিল, তেমনি কখনও কখনও একজন বিশেষ লেখকও হয়ত খুব আদরের হয়ে উঠেছিলেন, তাই না ? যেমন নজরুল—'

'হ্যাঁ, "মুসলিম বাংলার রবীন্দ্রনাথ" বলা হতো।'

'একটা বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে নজরুল আলাদা করে বাঙালি মুসলমান

সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।'

'নজরুল। হ্যাঁ, নজরুল। আসলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের যে হিস্টোরিক্যাল ট্র্যাজেডি সেটাকে নজরুলের জীবনের মধ্যে দেখা যায়। নজরুলকে বাধ্য হয়ে দুই নৌকায় পা দিতে হয়েছিল। কারণ একদিকে ইসলাম ডুবে যায় লিখতে হচ্ছে। মুসলমানদের খুশি করার জন্য। লিখতে হচ্ছে, না হলে মুসলমানরা তো কাফের বলছে, সেটা মুশকিল। আবার অন্যদিক উনি নিজের রাঢ়ের যে সংস্কৃতি, সেইটি উনি আত্মস্থ করে বসে আছেন। স্বাভাবিকভাবে পৌরাণিক উপমাগুলো এসেছে তাঁর লেখায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে নজরুলের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেটা এসেছিল, সেইটাকে মুসলমানরা গ্রহণ করতে পারছিল না। তখন উনি মুসলমানদের জন্যে অন্যভাবে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। আরবি, ফারসি লব্‌জটা খুব বেশি ব্যবহার করেছেন। তো এটা একটা ট্র্যাজেডি। বাংলায় তুর্কি সাম্রাজ্যের সময় [ত্রয়োদশ শতাব্দী] বাংলা সাহিত্যের এতখানি প্রসার ঘটল। অথচ উনিশ শতকের রেনেশাঁসের সময় সবাই তাকালেন ভারতের পশ্চিমের দিকে—বঙ্কিমচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথও। বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য অবহেলিত হলো। মোগলদের মন্দির ভাঙার ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল মুসলমানদের ইতিহাস। এই ভুল করেছেন সকলে—ব্রিটিশ, হিন্দু, মুসলমান সবাই। এই ভুলের জন্য বড় ক্ষতি হয়ে গেল।'

## পুনশ্চ

এম. আনোয়ারা বেগমের লেখা আমরা আলাদা করে অধ্যায়ভুক্ত করতে পারিনি, কিন্তু তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই-ই আমাদের আকৃষ্ট করেছে। এখানে তাঁর একটি গজল আমরা তুলে দিলাম।

**গজল**

আঁখির কোনে বাদল-ধারা
ঝ'রছে আমার দিবা-রাতি ;
বুকের তলে উতল হাওয়া
ক'রছে শুধুই মাতা-মাতি।
কী বেদনায় পরাণ কাঁদে
বলি কাহায় কেই বা শোনে ;
মরুর বুকে একলা আমি
নাইক আমার সাথের সাথী।
গোপন বনের কুসুম কুঁড়ি
না ফুট্‌তে সে যায় গো ঝরি'
আঁধার রাশি ঘনিয়ে আসে—
যায় নিভে এ জীবন-বাতি।

*গুঁলিস্তা*, চৈত্র ১৩৪০

# পরিশিষ্ট
## সফিয়া খাতুন বি.এ.

সফিয়া খাতুনের কথা প্রথম আমরা জেনেছিলাম আনিসুজ্জামানের *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র* গ্রন্থে। ঐ বইয়ের সূত্র ধরে আমরা 'বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা' প্রবন্ধটি সংগ্রহ করি *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* মাঘ ১৩২৯ থেকে। লেখিকার নামের পাশে 'বি.এ.' ডিগ্রির উল্লেখ আমাদের কৌতূহলী করে, লেখাটির ধার সেই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয়। রোকেয়া ছাড়া সমকালীন আর কোনও লেখিকার মধ্যে আমরা কিন্তু এমন চমক দেখিনি।

আনিসুজ্জামান তাঁর ঐ বইটিতে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *আন্নেসা* নামে একটি পত্রিকার কথাও লিখেছেন, সম্পাদিকা জনৈকা বেগম সফিয়া খাতুন।[১] *আন্নেসা* এবং সফিয়া খাতুনের উল্লেখ পেয়েছি সোনিয়া নিশাত আমিনের বইয়েও, তার বেশি তাতে পরিচয় দেওয়া নেই।[২] ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে *আন্নেসা* পত্রিকার যে কটি সংখ্যা আমরা দেখেছি তাতে কোথাও 'সফিয়া খাতুন' নামের পাশে কোনও ডিগ্রির উল্লেখ দেখিনি। এছাড়াও, *আন্নেসা*-র খানিকটা রক্ষণশীল সুরের সঙ্গে সফিয়া খাতুন বি.এ.-র লেখার শিক্ষিত, লিবারাল মেজাজেও কোনও মিল আমরা খুঁজে পাইনি।

কে ছিলেন 'বেগম সফিয়া খাতুন' ? 'সফিয়া খাতুন বি.এ.'-ই বা কে ছিলেন ? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারিনি। আমাদের কাজের সূত্রে 'সফিয়া খাতুন বি.এ'-র নামে প্রকাশিত বেশ কিছু লেখা *সচিত্র শিশির, ভারতবর্ষ, রূপ ও রঙ্গ* ইত্যাদি পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সব লেখাই মোটামুটি ১৩২৯ থেকে ১৩৩১-এর মধ্যে লেখা।

বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথম যুগের একজন গ্র্যাজুয়েট। যার লেখায় অভিজ্ঞতা, পড়াশুনো আর চিন্তাভাবনার এমন একটা ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে, তাঁর কথা সমকালীন কেউ লিখছেন না, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। চট্টগ্রামের লেখিকা উমরতুল ফজল, অর্থাৎ প্রয়াত সাহিত্যিক আবুল ফজলের স্ত্রী, তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনি এমন কোনও লেখিকাকে মনে করতে পারেন না ; মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনও এই রকম একজন উচ্চশিক্ষিতা মুসলমান মহিলার কথা কোথাও উল্লেখ করেননি ; সুফিয়া কামালের কাছে সফিয়া খাতুনের কোনও স্মৃতি ধরা নেই।

*সচিত্র শিশির*-এ প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় সফিয়া খাতুন বি.এ. তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছবি এঁকেছেন—ঐ টুকরো ছবিগুলির মধ্যে তেমন কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাইনি। যেমন, 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে (*ভারতবর্ষ,* ১৩৩০) তিনি লিখছেন

বাবার হাত ধরে ভগিনী নিবেদিতার কাছে পড়তে যাবার কথা ; 'পুজোর স্মৃতি' প্রবন্ধে (*সচিত্র শিশির*, আশ্বিন ১৩৩১) তিনি লিখছেন বাবার বন্ধু কাশীর 'মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ প্রসাদজী'র কথা ; আবার 'বাঙ্গালীর সাহিত্যনুরাগ' প্রবন্ধে সফিয়া খাতুন বি.এ. বলছেন, 'আমার পিতা আফগান, মাও তাই।' *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার* শ্রাবণ ১৩৩০-এ প্রকাশিত এই শেষোক্ত লেখাটিতে তিনি তাঁর অর্থনীতিবিদ ছোটভাইয়ের কথা বলছেন, 'আমার ছোট ভাইটি অক্সফোর্ড ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যলয় থেকে. . . .'

এইসব সূত্র ধরেও আমরা অনেক খুঁজেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশনের তালিকা, কলকাতার এমন কোনও মুসলমান অর্থনীতিবিদ যিনি সেই সময় বিলেত এবং জার্মানিতে পড়তে গিয়েছিলেন—কিন্তু সফিয়া খাতুনের পরিচয় জানতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

মনে হয়েছে—এবং এটা স্রেফ আমাদের অনুমান—যে সফিয়া খাতুন বি.এ. হয়ত কারও ছদ্মনাম ছিল। মাত্র দু তিন বছর লেখার পর কেন তিনি হারিয়ে গেলেন ? যদি এটা কারও ছদ্মনামও হয়ে থাকে, তাহলে কার এভাবে একজন মুসলমান মহিলার পরিচয় নিয়ে লেখা প্রকাশ করার ইচ্ছে হয়েছিল ? কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ? এই সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় কেউ দিতে পারবেন। এখানে আমরা 'সফিয়া খাতুন বি.এ.'-র লেখার নমুনা হিসেবে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করলাম মাত্র।

## একটা আইন পাশ করা দরকার

পড়েই যেন আপনারা হেসে ফেলবেন না যদিও বিষয়টি সত্যি হাসবার—কিন্তু এযে শুধু সত্যি নয় তিন সত্যির কথা। আইনটি হচ্ছে আমাদের দেশের বিয়ে পাগলা বুড়োদের বিরুদ্ধে। হুগলী জেল হতে আমাকে একটি ছেলে লিখেছেন, "আমার দাদামশাই (অর্থাৎ মায়ের কাকা) মাসখানেক হ'ল নাকি এক বিবাহ করেছেন। আমি বাইরে থাকতে বুড়ো আমার জন্যে বিয়ে করতে পারে নাই। দীন দরিদ্রকে কন্যাদায় হতে রক্ষা করবার জন্য নাকি এ কর্ম্ম করেছেন। আমার নবীনা দিদিমার বয়স ১৪ বৎসর। দাম হয়েছে ৫২৫ টাকা। কেমন সুন্দর মেয়ে বিক্রি। বাড়ীতে ছোট মাসী (অর্থাৎ বৃদ্ধের মেয়ে) বাল-বিধবা। ছোটমাসী আমার সমবয়সী।

"বলতে গেলে দাদামশায় আমার রাইভ্যাল। তাঁর টাকার জোর আছে, আমার টাকা নেই। ভাবুন টাকার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে ! আমি জেলে বসে শুধু কাঁদছি সেই হতভাগিনীর জন্যে ; সে যে দুদিন পরে বিধবা হ'য়ে যাবে। আমার ছোট বোনরাও তার চাইতে বয়সে অনেক বড়।"

সহৃদয় পাঠক ! একবার ভেবে দেখুন এই হতভাগা হাবাতে বুড়ো—যার সাড়ে তিনকাল চলে গেছে এখন যার শুধু মালা টপ্‌কাবার কথা, তার কাণ্ড কারখানা দেখুন।

এদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে লিখে বা ব্যঙ্গচিত্র এঁকে কি কোন লাভ আছে? তারা খবরের কাগজের নামও জানে না। কাজেই এদের এই কুপ্রবৃত্তি দূর করবার একমাত্র উপায়—এমন একটা আইন পাশ করা যাতে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের কোন বৃদ্ধ বিয়ে না করতে পারেন। যদি বিয়ে করে তা'হলে অন্ততঃ আমার মতে তাঁদের কম পক্ষে একটী বৎসর জেল দেওয়া উচিত এবং সেটা যাতে কোনদিনই বিনাশ্রম না হয়ে সশ্রম, এমন কি বিশেষ করে ঘানির কাজ করতে হয় সে রকম বন্দোবস্ত করলেও যেন মন্দ হয় না। আর একটা সংবাদ বলা বোধ হয় ভাল। উক্ত ভদ্রলোকটি তাঁর দাদামশাইয়ের সামাজিক বিচারে অনেকদিন হতেই সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হয়ে আছেন।

তার কারণ তিনি মুচী মদ্দফরাস ও মুসলমানের হাতে তৈরী খাবার খেতে ঘৃণা বোধ করেন না। তিনি অসহযোগী ; জাত বিচার যানেন না। এই তার অপরাধ। বাংলার পল্লীগুলির অবস্থা সত্য কি ভাববার বিষয় নয়? বাল-বিধবা কন্যাকে একাদশীর উপবাস করতে উপদেশ দিয়ে নিজে নাত্‌নীর বয়সী তরুণী ভার্য্যা নিয়ে বিলাস ব্যসনে দিন কাটানো যদি নারী নির্য্যাতন না হয় তবে এ পোড়া দেশের মেয়েদের নির্য্যাতনের মাপ কাঠিটা কত বড় তা'ত ভেবে পাচ্ছি না। যারা এখনও সমগ্র নারীজাতিকে নির্য্যাতিতা মনে করেন না তাদের চোখ এসব দেখে খুলবে কি? সহরে বসে শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলে আর শিক্ষিত মেয়েদের বিরুদ্ধে দু'কলম লিখে বাক্যবীর সাজবার কোন দরকার আছে কি?

একটা হাফেজী কথা আছে। "যে দোষ দেখিয়ে কর অন্যে তিরস্কার, সংশোধন কর আগে সে দোষ তোমার।" নিজের ঘরে কত আবর্জ্জনা আছে তা পরিস্কার না করে অন্যের দোষ দেখান কি বড় ভাল?

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রথাটা আমাদের সমাজে বন্ধ আছে। তার কারণ বুড়র জন্য অনেক বুড়ীও তৈরী হয়ে থাকেন। এটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বড় মন্দ নয়। তবে শিক্ষিত পরিবারে এসব ঘটতে বড় দেখা যায় না। তবে বিয়ের উপযুক্ত যুবক পুত্রকে অবিবাহিত রেখে পিতা দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায়। নিরুপমা বর্ষস্মৃতির ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয় জলধর বাবুর গল্পের প্লট বাস্তব জীবনে সম্ভবপর নয় বলেছেন কিন্তু আমি অসম্ভব বলতেও মোটেই প্রস্তুত নই। বাংলার তরুণ ঔপন্যাসিকদের কোন একজনের পিতা এমনি করে বিয়ে করেছেন। জানি না শ্রদ্ধেয় জলধর বাবু সে যুবককেই লক্ষ্য করে লিখেছেন কি না। কারণ জলধর বাবুর গল্পের একটা নাম আছে যে তাঁর প্রায় গল্পই বাস্তব মানব জীবনের ভিত্তির উপরে অবস্থিত।

বৃদ্ধরা যদিই এত সংযমহীন ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে নারাজ হয়ে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ নাতি ও নাতনীকে বিয়ের প্রহসন দেখিয়ে হাসাবার জন্য নেহাৎই যদি এত উতলা হয়ে পড়েন তবে তাদের কাছে নিবেদন এই যে অনেক বাল বিধবা আছেন তাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করলেই ত পারেন! এই কচি খুকীদের নিয়ে প্রহসনের দরকার কি বাপু? বিয়ে পাগলা বুড়োদের কাছে জিজ্ঞাসা এই যে নিজের বেলায় যে সংযমটা

একেবারে কচুপাতার জল, মেয়েদের বেলায় এত আইন কেন ? তারা কি আর এক ধাতু দিয়ে তৈরী ?

*সচিত্র শিশির*, অগ্রহায়ণ ১৩৩১

## তথ্যসূত্র

১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) পৃ. ৩৪৭

২. Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939* (Leiden, New York, Koln : E. J. Brill, 1996), pp. 233-234.

# গ্রন্থপঞ্জী

## সংকলনভুক্ত ও তৎকালীন লেখিকাদের রচনা


আখতার ইমাম, *আমার জীবন কথা,* ঢাকা : উন্মেষ প্রকাশন, ১৯৯৩

———, *ইডেন থেকে বেথুন,* ঢাকা : উন্মেষ প্রকাশন, ১৯৯০

———, *বিলেতের দিনগুলো,* ঢাকা : উন্মেষ প্রকাশন, ১৯৯৭

আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, *নিয়ন্ত্রিতা,* ঢাকা : রায়হান বেগম, ১৯৭৯

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *আমার চেতনার রং,* ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭

উমরতুল ফজল, *প্রিয়দিনের স্মৃতি,* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৭

নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, *নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী,* প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬ বঃ ; নতুন সংস্করণ, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম সম্পা., ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, *রূপজালাল,* প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬ ; নতুন সংস্করণ, মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, সম্পা., ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

ফাতেমা খানম, *সপ্তর্ষি,* ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪

মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা [ সিদ্দিকা], *পশারিণী,* নদীয়া : হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৩৮ বঃ

———, *মন ও মৃত্তিকা,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৪০

———, অরণ্যের সুর, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৯৬৩

মিসেস এম. রহমান, *চানাচুর,* হুগলী ; কাজী মহম্মুদর রহমান, ১৩৩৪ বঃ

———, *মুক্তির মূল্য,* কলকাতা : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস (প্রাপ্তিস্থান), ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বিজ্ঞাপিত

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর রচনা সংকলন,* মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, সম্পা., কুমিল্লা : রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, ১৯৮২

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, *মতিচূর* ১ম খণ্ড, কলকাতা : নবনূর কার্যালয়, ১৯০৪

———, *মতিচূর* ২য় খণ্ড, কলকাতা : গ্রন্থকর্ত্রী, ১৯২২

———, *পদ্মরাগ,* কলকাতা : গ্রন্থরচয়িত্রী, ১৯২৪

———, *অবরোধবাসিনী,* কলকাতা : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯৩১

———, *বেগম রোকেয়া রচনাবলী,* আবদুল কাদির সম্পা., ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

শামসুননাহার মাহমুদ, *পুণ্যময়ী,* কলকাতা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯২৫
______, *রোকেয়া-জীবনী,* প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮ ; নতুন সংস্করণ, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৬ ; ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬
______, *শিশুর শিক্ষা,* কলকাতা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯
______, *নজরুলকে যেমন দেখেছি,* কলকাতা : নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৫৮
সারা তয়ফুর, *স্বর্গের জ্যোতি,* প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ ; নতুন সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৩
সুফিয়া কামাল, *কেয়ার কাঁটা,* প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ ; নতুন সংস্করণ, ঢাকা : অনির্বাণ, ১৯৯২
______, *সাঁঝের মায়া,* প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮ ; নতুন সংস্করণ, ঢাকা : শাহেদ কামাল, ১৯৬৬
______, *একালে আমাদের কাল,* ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮

## লেখিকাদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *শামসুন নাহার মাহমুদ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩
জোবেদা খানম, *বেগম শামসুননাহার মাহমুদ,* ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৮৮
তাহমিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২
বেগম আকতার কামাল, *মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬
মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি,* (২য় সংস্করণ), ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬
রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
রশীদ আল ফারুকী, *নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
সিদ্দিকা মাহমুদ, *এম ফাতেমা খানম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
সেলিম জাহাঙ্গীর (ডঃ), *সুফিয়া কামাল,* ঢাকা : নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ১৯৯৩
সুতপা ভট্টাচার্য, *রোকেয়া,* কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৬

## আলোচিত সময় ও বিষয়ের ওপর আরও কিছু বই

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪ ; তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৩

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ১৮৩১-১৯৩০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯
আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম, সম্পা., *নারীর কথা : বাঙালী নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা,* ঢাকা : মুদ্রক, ১৯৯৪
আবুল ফজল, *রেখাচিত্র,* চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৫৫
______, *জীবন পত্রের যাত্রী,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮
______, *আবুল ফজল রচনাবলী,* চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৭৫
আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (তিন খণ্ড), ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৮, '৮৯, '৮৯
______, *আত্মকথা,* ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৮
আবদুল মৌদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭
ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *সিরাজী রচনাবলী . উপন্যাস খণ্ড,* ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭
ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩
কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, ১৯৫৬
কাজী আবদুল মান্নান, *উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস* (২য় সংস্করণ),. ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭
গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী, ১৯০০-১৯১৪,* কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৭
______, বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী, ১৯১৫-১৯৩০, কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৯৪
গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনীর প্রতিক্রিয়া,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
______, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
নজিবর রহমান, *আনোয়ারা,* প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ ; নতুন সংস্করণ, ঢাকা : আনন্দ প্রকাশন,
______, *গরীবের মেয়ে,* প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ ; নতুন সংস্করণ,ঢাকা: আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮৮
বেগম জাহান আরা, *বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান,* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৭
ভারতী রায়, সম্পা., *সেকালের নারী শিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০-১৩২১,* কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪
মজীর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা,* ঢাকা : দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭
মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫

মীর মশাররফ হোসেন, *মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৪
মুহম্মদ এনামুল হক, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (দুই খণ্ডে), ঢাকা চ হাসি প্রকাশনালয়, ১৯৬০
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *আমাদের সমস্যা*, ঢাকা : রেনেসাঁস পাবলিকেশনস, ১৯৪৯
______, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দুই খণ্ড), ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৩, ১৯৫৫
মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত : ১৯০১—১৯৩০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা : নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫
সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা* , কলকাতা : স্ত্রী, ১৯৯৫
লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯,
লুৎফর রহমান, *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭২
সেলিনা বাহার জামান, *হবীবুল্লাহ বাহার*, ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫
______, *স্মৃতি সুধায়*, ঢাকা : বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯১
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *অলীক মানুষ*, (দ্বিতীয় মুদ্রণ) কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪
______, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪
______, *স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate*, Yale : Yale University Press, 1992
Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims 1871-1906 : A Quest for Identity*, Delhi : Oxford University Press, 1981
Ahmed, Sufia, *The Muslim Community in Bengal, 1884-1912*, Dhaka : 1974
Amin, Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal 1876-1939*, Leiden; New York; Koln : E. J. Brill, 1996
Azim, Firdous & Niaz Zaman, *Infinite Variety : Women in Society and Literature*, Dhaka: University Press Limited, 1994
Borthwick, Meredith, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, Princeton : Princeton University Press, 1984

Hardy, Peter, *The Muslims of British India,* London : Cambridge University Press, 1972

Ikramullah, Begum Shaista S., *From Purdah to Parliament,* London : Cresset Press, 1967

Jahan, Roushan, ed., *Sultana's Dream and Selections from the Secluded Ones,* New York : 1988

Jones, Kenneth W., ed., *Religious Controversy in British India : Dialogues in South Asian Languages,* New York : State University of New York Press, 1992

Karlekar, Malavika, *Voices from Within : Early Personal Narratives of Bengali Women,* Delhi : Oxford University Press, 1991

Kaviraj, Narahari, *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,* New Delhi : People's Publishing House, 1982

Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil : Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society,* Bloomington : Indiana University Press, 1987

______, *Women and Islam,* Delhi : Kali for Women, 1993

Metcalf, Barbara Daly, *Perfecting Women : Maulana Ashraf Ali Thanawi's Behisti Zewar : A Partial Translation with Commentary,* Delhi : Oxford University Press, 1992

______, *Islamic Revival in British India : Deoband 1860-1900,* New Jersey: Princeton University Press, 1982

Minault, Gail, ed. *The Extended Family : Women and Political Participation in India and Pakistan,* Delhi : Chanakya Publications, 1981

Roy, Asim, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* Princeton : Princeton University Press, 1983

Roy, Bharati, ed., *From the Seams of History,* Delhi : Oxford University Press, 1996

Tharu, Susie & K. Lalita, eds., *Women Writing in India : 600 B. C. to the Present* (2 vols,) Delhi : Oxford University Press, 1991 & 1993

# নির্দেশিকা